কাকাবাবু সমগ্র ৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু সমগ্র ৩

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৪ মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০০

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7215-340-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৮০·০০

স্নেহের তাতনকে
(যার ভালো নাম সৌপর্ণ মিত্র)

এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
আ চৈ আ চৈ চৈ
উদাসী রাজকুমার
উল্কা-রহস্য
কলকাতার জঙ্গলে
কাকাবাবু ও বজ্রলামা
কাকাবাবু সমগ্র (১)
কাকাবাবু সমগ্র (২)
কাকাবাবু হেরে গেলেন ?
কালোপর্দার ওদিকে
খালি জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মিশর রহস্য
রাজবাড়ির রহস্য
সত্যি রাজপুত্র
সন্তু ও একটুকরো চাঁদ
সবুজ দ্বীপের রাজা
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

ভূমিকা

এই খণ্ডে কাকাবাবু ও সন্তুর কয়েকটি উপন্যাসের সঙ্গে তিনটি ছোট গল্পও রয়েছে। কাকাবাবু এমনই বড় মাপের মানুষ যে তাঁকে ছোট গল্পে ঠিক আঁটানো যায় না। সেই জন্য এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি গল্পই লেখা হয়েছে কাকাবাবুকে নিয়ে।

আপাতত এই তৃতীয় খণ্ডেই 'কাকাবাবু সমগ্র' শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু ও সন্তু আরও কয়েকবার অভিযানে বের হলে তারপর প্রকাশিত হবে আর একটি খণ্ড।

সূচী

নীলমূর্তি রহস্য ১১
মহাকালের লিখন ১৫৫
উল্কা-রহস্য ১৬৯
একটি লাল লঙ্কা ২৫৯
কাকাবাবু হেরে গেলেন ? ২৭৭
সাধুবাবার হাত ৩৫৫
সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ ৩৬১

গ্রন্থ-পরিচয় ৪৪৯

নীলমূর্তি রহস্য

॥ ১ ॥

দুপুরবেলা হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে গেল। একজন প্রোফেসর পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন, সেইজন্য। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কিছু ছেলেমেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। সন্তু কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে বৃষ্টিতে ভিজবে কি ভিজবে না, এই সময় তার বন্ধু জোজো তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "চল সন্তু, কোথাও ট্রেনে করে ঘুরে আসি।"

জোজো সন্তুদেরই পাড়ায় থাকে, প্রায়ই ওরা একসঙ্গে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে। জোজো একেবারে গুল ঝাড়বার রাজা। ওর কথা শুনলে মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত বড়-বড় লোক ওর বাবা-মা'কে চেনে। ফিডেল কাস্ত্রো ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন, ইন্দিরা গান্ধী এক সময় ওদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় জোজোর বাবাই তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, 'খবর্দার, বঙ্গোপসাগরে সেভেনথ ফ্লিট পাঠাবেন না, তা হলে আপনার প্রেসিডেন্টগিরি ঘুচে যাবে!' জোজোর বাবা শিবচন্দ্র সেনশর্মাকে সবাই এত মানে, কারণ তিনি একজন নাম-করা জ্যোতিষী। এমনকী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও নাকি আগের ইলেকশানের সময় ওর বাবার কাছ থেকে মন্ত্রপুত আংটি নিয়েছিলেন।

সন্তু জোজোর এই সব গল্প বিনা-প্রতিবাদে শুনে যায়। তার ভালই লাগে। জোজো সব সময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে তার বাবা অনেক বেশি বিখ্যাত। সন্তুর কোনও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কাগজে বেরুলেই জোজো এসে বলবে, 'আরে তুই তো মোটে নেপালে গিয়েছিলি! বাবা আমাকে গত মাসে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানিস? সাইবেরিয়ায়! কেন জানিস? না, সেটা বলা চলবে না, ভীষণ সিক্রেট, স্টেট সিক্রেট যাকে বলে, ফাঁস হয়ে গেলেই আমার ফাঁসি হবে।'

জোজোর ট্রেনে করে ঘুরে আসার প্রস্তাব শুনে সন্তু বলল, "কোথায় যাব? দিল্লি? বম্বে?"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ধুৎ, ওসব জায়গায় তো কতবার গেছি ; নিউইয়র্ক, মস্কো, হেলসিংকি দেখার পর কি আর দিল্লি-বম্বে ভাল লাগে ? এই সব বৃষ্টির দিনে যেতে হয় কোনও নতুন জায়গায় ; মনে কর, কোনও গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা স্টেশান, চারদিকে সবুজ গাছপালা, একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। একটাই দোকান আছে সেই গ্রামে, সেই দোকানে বসে তেলে-ভাজা, মুড়ি আর চা খাওয়া কী রকম দারুণ না ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, শুনতে বেশ ভাল লাগল। কিন্তু ট্রেনে যে চাপব, পয়সা পাব কোথায় ? পকেট তো ঢন্‌ঢন্ !"

জোজো এমনভাবে হাসল যেন সন্তুটা একেবারে ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না ! সে ঠোঁট উল্টে বলল, "বেড়াতে আবার পয়সা লাগে নাকি ? তুই আমার সঙ্গে আছিস না ? শিয়ালদা স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার আমার আপন মামা, আর হাওড়ার স্টেশন-মাস্টার আমার পিসেমশাই। তুই ইন্ডিয়ার কোথায় যেতে চাস বল না ! এক্ষুনি বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে পারি।"

সন্তু মিনমিন করে বলল, "স্টেশন-মাস্টার আত্মীয় হলেই বুঝি ট্রেনে বিনা পয়সায় চাপা যায় ; অন্য স্টেশনে ধরবে না ?"

জোজো বলল, "তুই টেস্ট করে দেখতে চাস ; চল, শিয়ালদায় চল, আমি তোকে হাতে-হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। টিকিট চাইবে কী রে ? আমাদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট, স্যালুন কাকে বলে জানিস, তাই জুড়ে দেবে। আমরা যেখানে বলব সেখানে থামবে !"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, পরে কোনওদিন তোর সঙ্গে ওইভাবে বেড়াতে যাব, এখন বাড়ি চলি।"

জোজো অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, "এর মধ্যে বাড়ি যাবি ? আজ তো আমাদের সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। এখন মোটে একটা দশ বাজে। এতখানি সময়, আমরা অনায়াসেই কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসতে পারি।"

সন্তু বলল, "এই কয়েক ঘন্টায় ট্রেনে চেপে কোথা থেকে ঘুরে আসব ?"

জোজো বলল, "কেন, ডায়মন্ডহারবার, বনগাঁ, চন্দননগর, উলুবেড়িয়া, যে-কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে, ফিরতে বড়জোর সন্ধে হবে।"

সন্তু ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে, জোজোর পাল্লায় পড়া মোটেই বুদ্ধির কাজ হবে না। ডায়মন্ডহারবার বা ওই সব জায়গায় যেতে-আসতেই তিন চার ঘন্টা লেগে যাবে। বাড়িতে কোনও খবর না দিয়ে শুধু-শুধু এরকম ঘুরতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

জোজো হঠাৎ যেন কিছু একটা আবিষ্কার করার মতন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "সোনারপুর ! মনে পড়েছে ! দ্যাট্স ইট ! চল্ সোনারপুর ঘুরে আসি। তোকে সিংহ দেখাব !"

সন্তু আর না হেসে পারল না। সোনারপুর জায়গাটার নাম সে শুনেছে, সে জায়গাটা আফ্রিকায় নয়, চব্বিশ পরগনায়। সেখানে সিংহ?

সন্তুর অবিশ্বাসী দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জোজো বলল, "তুই তো ইজিপ্টে গিয়ে উটের পিঠে চেপেছিস, তাই না, হাতির পিঠে চেপেছিস কখনও? বল, সত্যি করে বল?"

সন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, সে কখনও হাতির পিঠে চাপেনি।

জোজো বলল, "সোনারপুরে তোকে আমি হাতির পিঠে চাপাব। আমি তোর পাশেপাশে উটে চেপে যাব। সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে আসব!"

সোনারপুরে সিংহ শুধু নয়, উট, হাতি! উঃ সত্যি, জোজোকে নিয়ে আর পারা যায় না! গুলেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত! সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে সুন্দরবন ঘুরে এসেছে, ওই সোনারপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়েছিল। সোনারপুর তো দূরের কথা, গোটা সুন্দরবনেই একটাও হাতি নেই। উট আর সিংহ থাকার কথা তো কল্পনাও করা যায় না!

এইসময় ওদের আর-এক বন্ধু অরিন্দম পেছন থেকে এসে বলল, "এই, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কী গ্যাঁজাল্লি করছিস; বাড়ি যাবি না? এর পর রাস্তায় জল জমে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে!"

সন্তু বলল, "অরিন্দম, তুই সোনারপুর জায়গাটার নাম শুনেছিস?"

অরিন্দম বলল, "কেন শুনব না? এই তো শিয়ালদা লাইনে, বোধহয় চার পাঁচটা স্টেশন! আমি ওই স্টেশন দিয়ে পাস করেছি অনেকবার?"

"সোনারপুরে জঙ্গল আছে?"

"জঙ্গল? মানুষ থিকথিক করছে! ওই স্টেশন থেকে যতরাজ্যের তরকারিওয়ালারা ওঠে। তবে দু' চারটে বাগানবাড়ি আছে শুনেছি।"

"জোজো বলছে, ওই সোনারপুরে নাকি বাঘ-সিংহ, হাতি-উট-গণ্ডার ঘুরে বেড়ায়!"

অরিন্দম হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "ওফ্ জোজো, দিস ইস টু মাচ্! তুই সন্তুকে ভালমানুষ পেয়ে আর কত গুল ঝাড়বি? অ্যাঁ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আমি বাঘ কিংবা গণ্ডারের কথা বলিনি। সন্তু বাড়াচ্ছে। কিন্তু যদি সিংহ দেখাতে পারি?"

অরিন্দম বলল, "আফ্রিকার কোনও রাজা বুঝি তোর বাবাকে সিংহ প্রেজেন্ট করেছে? তুই মাঝে-মাঝে সিংহ নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে যাস?"

সন্তু বলল, "শুধু সিংহ নয়, জোজো বলছে, সোনারপুরে গেলে ও আমাদের হাতি কিংবা উটের পিঠে চাপাতে পারে।"

অরিন্দম বলল, "জোজো, তুই শুধু-শুধু কেন এই পচা কলেজে পড়ে আছিস? তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে নাম দে। নির্ঘাত ফার্স্ট হয়ে যাবি। তারপর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তোর নাম উঠে যাবে।"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ধুৎ, ওসব জায়গায় তো কতবার গেছি ; নিউইয়র্ক, মস্কো, হেলসিংকি দেখার পর কি আর দিল্লি-বম্বে ভাল লাগে ? এই সব বৃষ্টির দিনে যেতে হয় কোনও নতুন জায়গায় ; মনে কর, কোনও গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা স্টেশান, চারদিকে সবুজ গাছপালা, একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। একটাই দোকান আছে সেই গ্রামে, সেই দোকানে বসে তেলে-ভাজা, মুড়ি আর চা খাওয়া কী রকম দারুণ না ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, শুনতে বেশ ভাল লাগল। কিন্তু ট্রেনে যে চাপব, পয়সা পাব কোথায় ? পকেট তো ঢন্‌ঢন্ !"

জোজো এমনভাবে হাসল যেন সন্তুটা একেবারে ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না ! সে ঠোঁট উল্টে বলল, "বেড়াতে আবার পয়সা লাগে নাকি ? তুই আমার সঙ্গে আছিস না ? শিয়ালদা স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার আমার আপন মামা, আর হাওড়ার স্টেশন-মাস্টার আমার পিসেমশাই। তুই ইন্ডিয়ার কোথায় যেতে চাস বল না ! এক্ষুনি বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে পারি।"

সন্তু মিনমিন করে বলল, "স্টেশন-মাস্টার আত্মীয় হলেই বুঝি ট্রেনে বিনা পয়সায় চাপা যায় ; অন্য স্টেশনে ধরবে না ?"

জোজো বলল, "তুই টেস্ট করে দেখতে চাস ; চল, শিয়ালদায় চল, আমি তোকে হাতে-হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। টিকিট চাইবে কী রে ? আমাদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট, স্যালুন কাকে বলে জানিস, তাই জুড়ে দেবে। আমরা যেখানে বলব সেখানে থামবে !"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, পরে কোনওদিন তোর সঙ্গে ওইভাবে বেড়াতে যাব, এখন বাড়ি চলি।"

জোজো অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, "এর মধ্যে বাড়ি যাবি ? আজ তো আমাদের সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। এখন মোটে একটা দশ বাজে। এতখানি সময়, আমরা অনায়াসেই কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসতে পারি।"

সন্তু বলল, "এই কয়েক ঘন্টায় ট্রেনে চেপে কোথা থেকে ঘুরে আসব ?"

জোজো বলল, "কেন, ডায়মন্ডহারবার, বনগাঁ, চন্দননগর, উলুবেড়িয়া, যে-কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে, ফিরতে বড়জোর সন্ধে হবে।"

সন্তু ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে, জোজোর পাল্লায় পড়া মোটেই বুদ্ধির কাজ হবে না। ডায়মন্ডহারবার বা ওই সব জায়গায় যেতে-আসতেই তিন চার ঘন্টা লেগে যাবে। বাড়িতে কোনও খবর না দিয়ে শুধু-শুধু এরকম ঘুরতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

জোজো হঠাৎ যেন কিছু একটা আবিষ্কার করার মতন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "সোনারপুর ! মনে পড়েছে ! দ্যাট্‌স ইট ! চল্ সোনারপুর ঘুরে আসি। তোকে সিংহ দেখাব !"

সন্তু আর না হেসে পারল না। সোনারপুর জায়গাটার নাম সে শুনেছে, সে জায়গাটা আফ্রিকায় নয়, চব্বিশ পরগনায়। সেখানে সিংহ?

সন্তুর অবিশ্বাসী দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জোজো বলল, "তুই তো ইজিপ্টে গিয়ে উটের পিঠে চেপেছিস, তাই না, হাতির পিঠে চেপেছিস কখনও? বল, সত্যি করে বল?"

সন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, সে কখনও হাতির পিঠে চাপেনি।

জোজো বলল, "সোনারপুরে তোকে আমি হাতির পিঠে চাপাব। আমি তোর পাশেপাশে উটে চেপে যাব। সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে আসব!"

সোনারপুরে সিংহ শুধু নয়, উট, হাতি! উঃ সত্যি, জোজোকে নিয়ে আর পারা যায় না! গুলেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত! সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে সুন্দরবন ঘুরে এসেছে, ওই সোনারপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়েছিল। সোনারপুর তো দূরের কথা, গোটা সুন্দরবনেই একটাও হাতি নেই। উট আর সিংহ থাকার কথা তো কল্পনাও করা যায় না!

এইসময় ওদের আর-এক বন্ধু অরিন্দম পেছন থেকে এসে বলল, "এই, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কী গ্যাঁজাল্লি করছিস; বাড়ি যাবি না? এর পর রাস্তায় জল জমে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে!"

সন্তু বলল, "অরিন্দম, তুই সোনারপুর জায়গাটার নাম শুনেছিস?"

অরিন্দম বলল, "কেন শুনব না? এই তো শিয়ালদা লাইনে, বোধহয় চার পাঁচটা স্টেশন! আমি ওই স্টেশন দিয়ে পাস করেছি অনেকবার?"

"সোনারপুরে জঙ্গল আছে?"

"জঙ্গল? মানুষ থিকথিক করছে! ওই স্টেশন থেকে যতরাজ্যের তরকারিওয়ালারা ওঠে। তবে দু' চারটে বাগানবাড়ি আছে শুনেছি।"

"জোজো বলছে, ওই সোনারপুরে নাকি বাঘ-সিংহ, হাতি-উট-গণ্ডার ঘুরে বোড়ায়!"

অরিন্দম হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "ওফ্ জোজো, দিস ইস টু মাচ্! তুই সন্তুকে ভালমানুষ পেয়ে আর কত গুল ঝাড়বি? অ্যাঁ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আমি বাঘ কিংবা গণ্ডারের কথা বলিনি। সন্তু বাড়াচ্ছে। কিন্তু যদি সিংহ দেখাতে পারি?"

অরিন্দম বলল, "আফ্রিকার কোনও রাজা বুঝি তোর বাবাকে সিংহ প্রেজেন্ট করেছে? তুই মাঝে-মাঝে সিংহ নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে যাস?"

সন্তু বলল, "শুধু সিংহ নয়, জোজো বলছে, সোনারপুরে গেলে ও আমাদের হাতি কিংবা উটের পিঠে চাপাতে পারে।"

অরিন্দম বলল, "জোজো, তুই শুধু-শুধু কেন এই পচা কলেজে পড়ে আছিস? তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে নাম দে। নির্ঘাত ফার্স্ট হয়ে যাবি। তারপর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তোর নাম উঠে যাবে।"

জোজো গম্ভীরভাবে ডান হাতের পাঞ্জাটা বাড়িয়ে বলল, "কত বেট ?"

অরিন্দম বলল, "কিসের বেট ! তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে ফার্স্ট হবি কি না ? নিশ্চয়ই হবি ।"

জোজো বলল, "সে কথা বলছি না। আমি যদি এখন থেকে ঠিক দু'ঘন্টার মধ্যে তোদের হাতির পিঠে চাপাতে পারি, তা হলে কতটাকা বাজি হারবি ?"

অরিন্দম জোজোর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, "আহা রে, চাঁদু ! আমাদের বোকা পেয়েছিস ? চিড়িয়াখানায় গেলেই তো হাতির পিঠে চাপা যায় ।"

জোজো মিটিমিটি হেসে বলল, "চিড়িয়াখানায় নয় !"

অরিন্দম বলল, "তা হলে কোনও সার্কাসের হাতি !"

জোজো একইভাবে বলল, "সার্কাসেরও নয় ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আর উট আর সিংহ ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, সিংহ দেখাব । উটও দেখাব ।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "তুই সার্কাসের জানোয়ার দেখিয়ে আমাদের ঠকাবি না ?"

জোজো বলল, "কোন সার্কাসে সিংহ থাকে রে ? তা ছাড়া বলছি তো, সার্কাসের কোশ্চেনই উঠছে না ।"

অরিন্দম বলল, "তুই এই সবগুলো একসঙ্গে আমাদের দেখাবি ? তা হলে দশ টাকা বাজি !"

জোজো বলল, "ডান্ ! তা হলে চল, এক্ষুনি স্টার্ট করি ।"

বৃষ্টি বেশ জোর হয়েছে এখন । এর মধ্যে ট্রামে-বাসে উঠতে গেলেও ভিজে যেতে হবে । তবু তিনজনে দৌড় লাগাল । বাস স্টপে এসেই পেয়ে গেল একটা শিয়ালদার বাস ।

বাসে উঠে জোজো অরিন্দমকে বলল, 'তুই আমাদের তিনজনের টিকিটটা কেটে ফ্যাল তো !"

অরিন্দম বলল, "বাজির দশ টাকা থেকে এই বাসভাড়ার পয়সাগুলো কাটা যাবে ।"

সন্তু বলল, "কাটা যাবে কী রে, যোগ হবে বল্ । জিতব তো আমরাই ।"

জোজো বলল, "দ্যাখ না কী হয় !"

বাসে ভিড় বেশি নেই । ওরা আরাম করে বসল । সন্তু আর অরিন্দম পাশাপাশি, জোজো অন্য দিকে । এর মধ্যেই ওরা দুটো পার্টি হয়ে গেছে ।

সন্তু আর অরিন্দম পরে আছে প্যান্ট আর শার্ট । জোজোর গায়ে একটা মেরুন রঙের গেঞ্জি, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা 'ভিকট্রি' ।

ওই গেঞ্জিটা নাকি ব্রাজিল থেকে পেলে পাঠিয়েছে জোজোকে । জোজোর বাবার পাঠানো ফুল আর বেলপাতা পকেটে নিয়ে পেলে সব সময় খেলতে নামত ।

জোজোর চেহারাটা সুন্দর, ওই গেঞ্জিটায় তাকে সুন্দর মানিয়েছে।

সন্তু ফিসফিস করে অরিন্দমকে বলল, "আমরা তো যাচ্ছি ওর সঙ্গে কিন্তু জোজোর কাছ থেকে বাজির টাকা আদায় করতে পারবি ?"

অরিন্দম বলল; "আমি ঠিক আদায় করে ছাড়ব। এর আগে তো কেউ জোজোর কথা চ্যালেঞ্জ করেনি।"

জোজো তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে। হঠাৎ সে একটা চলন্ত গাড়ি দেখে মুখ বাড়িয়ে হাসল, হাতছানি দিল।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে গেল জানিস ?"

অরিন্দম বলল, "কী করে জানব ?"

হাসি-ঝলমলে মুখে জোজো বলল, "কপিল দেব ! আমার বাবার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছে। জানতুম, আসতেই হবে। এবারে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতে ভুলে গেছে, তাই তো এই কাণ্ড !"

অরিন্দম বলল, "চুপ, একটু আস্তে বল। সবাই শুনতে পাবে।"

জোজো বলল, "তোরা বিশ্বাস করছিস না ?"

অরিন্দম বলল, "আচ্ছা জোজো, তোর বাবা পরীক্ষায় পাশ করার কোনও মাদুলি-টাদুলি দ্যান্ ?"

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না। ওইটা কক্ষনো দ্যান না। তা হলে আমিই তো সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম !"

সন্তু মনে-মনে স্বীকার করল জোজোটার বুদ্ধি আছে। অরিন্দমের প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্যটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছে।

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল শিয়ালদায়। স্টেশনের মধ্যে ঢুকে অরিন্দম টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোতে যাচ্ছে, সন্তু তার হাত টেনে ধরে বলল, "ওদিকে যাচ্ছিস কী রে ! আমাদের তো টিকিট লাগবে না। আমরা যাব স্পেশাল কম্পার্টমেন্টে !"

জোজো বলল, "চল, আগে বড় মামার সঙ্গে দেখা অরে আসি।"

'স্টেশন-মাস্টার' লেখা একটা ঘরের সামনে এসে সে বন্ধুদের বলল, "তোরা এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে ফেলছি।"

দরজার বাইরে একজন বেয়ারা বসে আছে টুলে। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জোজো দরজা ঠেলে গেল ভেতরে। বেয়ারাটি হা হা করে তেড়ে গেল তার পেছনে।

জোজো কিন্তু তক্ষুনি বেরিয়ে এল না। মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। তারপর বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে।

সন্তু ভাবল, তা হলে সত্যিই কি জোজোর এত চেনাশুনো ?

জোজো কাছে এসে বলল, "একটা মজার ব্যাপার হয়েছে রে। আমার বড়মামাকে প্রাইম মিনিস্টার কী জন্য যেন ডেকেছেন। উনি তো দিল্লি চলে

গেছেন কাল।"

অরিন্দম বলল, "তুই যখন দরজা ঠেলে ঢুকলি, তখন দেখলুম যে, ওদিকে চেয়ারে একজন বসে আছেন!"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, উনি তো এখন অ্যাকটিং। ওঁকেও আমি খুব ভাল চিনি। উনি কী বললেন জানিস? আমাদের সোনারপুর যাওয়ার কথাটা উড়িয়েই দিলেন। উনি একটু বাদেই একটা ইনস্‌পেকশানে দমদম যাবেন, আমাদেরও সেই সঙ্গে যেতে বললেন। যাবি দমদম?"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "দমদমেও সিংহ আছে নাকি?"

জোজো বলল, "দমদম গেলে আমি তোদের ভাল চমচম খাওয়াতে পারি। একটা দোকানে চেনা আছে।"

অরিন্দম বলল, "কোথায় সিংহ আর কোথায় চমচম। আমি ভাই সিংহ দেখব বলে বাজি ফেলেছি।"

সন্তু বলল, "আমিও ভাই সিংহ দেখার জন্য এসেছি।"

জোজো এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে সোনারপুরেই যাওয়া যাক। এইটুকু তো মোটে রাস্তা, কতই বা টিকিটের দাম হবে। তোদের কাছে কত টাকা আছে রে?"

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা অবশ্য বিনা পয়সায় ট্রেনে যাওয়া নিয়ে কোনও বাজি ফেলিনি।"

অরিন্দম বলল, "স্টেশন-মাস্টার প্রাইম মিনিস্টার না রেল-মিনিস্টার কার কাছে যাবে, সে-বিষয়েও আমাদের তর্ক তোলা উচিত নয়।"

সন্তু বলল, "আমরা সোনারপুরে সিংহ দেখতে চাই।"

অরিন্দম বলল, "দ্যাট্‌স রাইট। তার সঙ্গে হাতি প্লাস উট।"

সন্তুর কাছে দু'টাকা আছে। অরিন্দমের কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট। জোজো বলল, "দে, দে, ওতেই হয়ে যাবে।"

অরিন্দম বলল, "ফেরার ভাড়া রাখতে হবে।"

জোজো বলল, "ফেরার জন্য চিন্তা করিস না। ওখানে আমার ছোট মেসোমশাই থাকেন, তাঁর গাড়িতে ফিরে আসব।"

বহু দূর দুর্গম জায়গা ঘুরে এলেও সন্তুর এই সামান্য দূরের একটা জায়গায় ট্রেনে করে যাওয়ার চিন্তায় বেশ উত্তেজনা হচ্ছে। দেখাই যাক না জোজোর গুলের দৌড় কতদূর যায়।

টিকিট কাটার পর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে-খুঁজে ওরা সোনারপুর লোকাল দেখতে পেল। দুপুর বেলায় ট্রেন, একেবারে ফাঁকা।

ট্রেনটা ছাড়ার পর সবে মাত্র একটু দূর গেছে, এমন সময় জোজো জিভ কেটে বলে উঠল, "এই রে, এতক্ষণে মনে পড়েছে! জায়গাটা তো সোনারপুর নয়। আমরা ভুল ট্রেনে চেপেছি।" ট্রেনের একটা পাখা দারুণ শব্দ করে

ঘুরছে। আর তিনটে পাখার জায়গায় কিছুই নেই। কামরার মেঝেতে অনেক মুড়ি ছড়ানো। কারুর হাত থেকে বোধহয় মুড়ির ঠোঙা পড়ে গিয়েছিল। সন্তু, জোজো আর অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, যদিও বসবার জায়গা খালি আছে অনেক। বাইরে থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন লোক বসে বসে শশা খাচ্ছে। সেই লোকটি বলল, "আপনারা বসুন না, শুধু-শুধু ভিজছেন কেন ?"

জোজো বলল, "আমরা ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছি। আমরা যাব বারুইপুর, এটা তো সোনারপুরের ট্রেন।"

সন্তু আর অরিন্দম চোখাচোখি করল। জোজোর চালাকি শুরু হয়ে গেছে। সিংহ-হাতি দেখাবার নাম করে কলা দেখাবে। এতক্ষণ সোনারপুর বলছিল, এবারে বারুইপুর হয়ে গেল। এরপর সিংহ হয়ে যাবে বেড়াল আর হাতি হয়ে যাবে ছাগল।

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "বারুইপুর যাবেন ? তার জন্য কি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হবে নাকি ? বসুন, এ ট্রেনেও যাওয়া যাবে।"

ওরা তিনজনে এবারে এসে বসল।

সন্তু ভাবল, ওই দাড়িওয়ালা লোকটি নিশ্চয়ই এদিকেই থাকে। সোনারপুরের সিংহ-হাতির কথা জিজ্ঞেস করলে, ও নিশ্চয়ই বলতে পারবে ?

সন্তু তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে আবার ভাবল, থাক। ট্রেনে যখন উঠে পড়াই গেছে, তখন শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কী হয় !

দাড়িওয়ালা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা বারুইপুরে কোথায় যাবেন ?"

জোজো বলল, "অংশুমান চৌধুরীর বাড়ি, আপনি চেনেন ? ওয়ার্ল্ড ফেমাস সায়েন্টিস্ট !"

লোকটি দু'দিকে মাথা নেড়ে জানাল যে, চেনে না।

সন্তু আবার তাকাল অরিন্দমের দিকে। বারুইপুরে শুধু সিংহই থাকে না, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরাও থাকে ! জোজোর স্টকে আরও কত কী আছে !

জোজো ওদের দিকে ফিরে বলল, "তোদের আগে এই অংশুমান চৌধুরীর কথা বলিনি, না ? আমার পিসেমশাই হন। উনি কী করেছেন জানিস ? সাইবেরিয়াতে বরফের তলায় সাত ফুট খুঁড়ে কয়েকটা গমের দানা পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে, ওখানে গমের খেত ছিল, কোনও এক সময় বরফে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ওই গমের দানাগুলো দশ হাজার বছরের পুরনো।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানল, ওই গমের দানাগুলো, অত বয়েস ?"

জোজো বলল, "ওসব টেস্ট করে বলে দেওয়া যায়। মাটির তলা থেকে যে কয়লা তোলা হয়, তাও টেস্ট করে বলা যায় কতদিনের পুরনো।"

সন্তু মাথা নাড়ল। এটা জোজো বানিয়ে বলছে না। কাকাবাবুর কাছ থেকে সেও কার্বন টেস্টের কথা শুনেছে।

সে জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "তোর পিসেমশাই ওই গমের দানাগুলো সাইবেরিয়া থেকে খুঁড়ে বার করেছেন ?"

জোজো বলল, "না, উনি খুঁড়ে বার করেননি। তা করেছে ওখানকার লোকেরাই। পিসেমশাই সাঙ্ঘাতিক একটা কাণ্ড করেছে। উনি ওই দশ হাজার বছরের পুরনো গমের দানা মাটিতে পুঁতে গাছ তৈরি করেছেন। সেই গাছে আবার গম ফলেছে।"

অরিন্দম বলল, "তাতে কী হয়েছে ?"

জোজো বলল, "তুই বুঝতে পারছিস না ? কত বড় ব্যাপার ! দশ হাজার বছরের পুরনো গম থেকে আবার গাছ হল !"

অরিন্দম বলল, "ধুস্ ! এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। পুঁতেছে, তা থেকে আপনা আপনি গাছ হয়েছে। এতে তোর পিসেমশাইয়ের কৃতিত্বটা কী ? তিনি কি ফুঁ দিয়ে দিয়ে গাছটা বড় করেছেন !"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তুই এসব বুঝবি না !"

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "ধান চাষের চেয়ে গমের চাষ অনেক সহজ।"

অরিন্দম বলল, "জোজো, তোর ওই পিসেমশাই আর কী কী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন শুনি ?"

জোজো বলল, "তোরা অ্যামির ধূমকেতুর নাম শুনেছিস ?"

অরিন্দম বলল, "সেটা আবার কী, হ্যালির ধূমকেতুর ছোট ভাই নাকি ?"

"জোজো বলল, "ঠিক তাই। তবে ছোট ভাই না বলে বড় ভাই বলতে পারিস। এই ধূমকেতুটা পৃথিবীতে ফিরে আসবে দু'শো বছর অন্তর অন্তর। আমার পিসেমশাই এটা আবিষ্কার করেছেন। দেখিসনি সব কাগজেই তো খবরটা বেরিয়েছিল !"

জোজো সন্তুর দিকে সরু চোখে তাকাল। অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিতে চায়, শুধু তার বাবা নয়, তার পিসেমশাইও সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে অনেক বেশি বিখ্যাত।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "ওই ধূমকেতুটার নাম অ্যামি কেন ?"

জোজো বলল, "পিসেমশাইয়ের নাম অংশুমান, মানে এ. এম.। তার থেকে অ্যামি।"

অরিন্দম বলল, "নামটা একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। নাম দেওয়া উচিত ছিল চৌধুরী'জ কমেট। যাক গে ! উনি আর কী আবিষ্কার করেছেন ?"

জোজো বলল, "এরকম অনেক আছে !"

অরিন্দম বলল, "উনি আকাশে ধূমকেতু আবিষ্কার করছেন। আবার বরফের তলা থেকে গমের দানা বার করছেন। প্রফেসার শঙ্কু নাকি ?"

জোজো বলল, "প্রফেসার শঙ্কু তো ফিকটিশাস্ ক্যারেকটার। আমার পিসেমশাইকে বারুইপুরে গেলেই দেখতে পাবি।"

"উনি বুঝি সিংহের পিঠে চেপে রোজ হাওয়া খেতে যান?"

"সিংহের সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্কই নেই। উনি জন্তু-জানোয়ার একদম পছন্দ করেন না। এমনকী, বেড়াল দেখলেও ভয় পান। একবার কী হয়েছিল জানিস? পিসেমশাইকে কেনিয়া থেকে ডেকেছেন খুব জরুরি কাজে। উনি যেতে রাজি হলেন না। কারণ, নাইরোবি শহরে যখন-তখন সিংহের গন্ধ পাওয়া যায়।"

"সন্তু, তুই কাকাবাবুর সঙ্গে একবার নাইরোবি গিয়েছিলি না?"

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, দু'বছর আগে।"

"কী হয়েছিল রে সেখানে?"

সন্তু বলল, "এখন আমার সেটা বলতে ইচ্ছে করছে না। জোজো একবার প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ দ্বীপে গিয়েছিল ওর বাবার সঙ্গে, সেই গল্পটা বরং শোনা যাক।"

ট্রেন এসে থেমেছে বালিগঞ্জ স্টেশনে।

জোজো জানলায় মুখ রেখে বলল, "দ্যাখ এদিকে বৃষ্টি নেই। একটু বাদাম কেন না, অরিন্দম। বেশ খিদে পেয়ে গেছে।"

ট্রেন থামা মাত্রই ছেড়ে দেয় বলতে গেলে। অরিন্দম একটা বাচ্চা বাদামওয়ালাকে ডাকতেই সে লাফিয়ে কামরায় উঠে পড়ল।

সন্তু বলল, "এদের কী মজা তাই না? টিকিট কাটতে হয় না, যখন যে-ট্রেনে ইচ্ছে উঠে পড়ে, যে-কোনও স্টেশনে নেমে পড়ে।"

অরিন্দম বলল, "আমারও ইচ্ছে করে এরকম ট্রেনে-ট্রেনে ঘুরে বেড়াতে। কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে বাদাম বিক্রির কাজ নিলে কেমন হয়?"

সন্তু বলল, "তাতে তোর একটা ক্ষতি হবে এই যে, তুই জোজোর গল্পগুলো শুনতে পাবি না।"

অরিন্দম বলল, "সেটা একটা বড় ক্ষতি।"

জোজো বলল, "আমি গল্প বলি না, আমি যা বলি সব সত্যি।"

তিন ঠোঙা বাদাম কেনা হল। এই স্টেশনে ওদেরই বয়েসি আর কয়েকটি ছেলে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুরু করে দিল খেলার আলোচনা। সন্তুদের আর গল্প জমল না। ওরাও শুনতে লাগল সেই গল্প।

সন্তুর শুধু ভয় হতে লাগল, এই ছেলেগুলোর সামনে জোজো যদি হঠাৎ বলে বসে যে, সুনীল গাভাসকার যে-বার ব্রাডম্যানের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করল সেবারে সে ওর বাবার কাছ থেকে মাদুলি নিতে এসেছিল, কিংবা কপিলদেব এখন ওদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে, তা হলে এরা কি শুধু হাসবে না চাঁটি মারতে শুরু করবে।

জোজো অবশ্য মুখ খুলল না। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। তার চোখ বোজা।

অরিন্দম একটু পরে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই জোজো, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?"

জোজো যেন মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, "না রে, আমি কক্ষনো দিনের বেলা ঘুমোই না। তবে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে একটু ধ্যান করে নিই।"

"ধ্যান করিস ? কেন ?"

"তোরা ধ্যান করার উপকারিতা তো জানিস না। মাঝে-মাঝে করে দেখলে পারিস। ঠিকমতন ধ্যান করা শিখলে চোখ বুজে ভবিষ্যতের অনেক জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।"

"মহা ঋষি মহেশ যোগী তোর কাকা না মামা কী যেন ?"

"তুই অনেকটা ঠিক ধরেছিস। মহেশ যোগী আমার জ্যাঠামশাইয়ের গুরু-ভাই। আমার জ্যাঠামশাই-ই মহেশ যোগীকে সব কিছু শিখিয়েছেন।"

"তোর জ্যাঠামশাই কোথায় থাকেন ?"

"গত কুড়ি বছর ধরে আমার জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাওয়া যায়নি। উনি মহেশ যোগীকে সব কিছু শিখিয়ে দিয়ে হিমালয়ের আরও গভীরে চলে গেছেন। শুনেছি, উনি এভারেস্টের ঠিক নীচেই থাকেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কে যেন বলেছিল, তোর জ্যাঠামশাই দুটো ইয়েতি পুষেছিলেন। লোকে যেমন বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পোষে, সে রকম তোর জ্যাঠামশাইও তাঁর গুহা পাহারা দেওয়ার জন্য দুটো ইয়েতিকে রেখেছিলেন। সন্তু, তুই শুনিসনি ?"

জোজো এমনভাবে একটা অবজ্ঞার হাসি দিল, যেন অরিন্দম নিছক একটি শিশু। তারপর বলল, "তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস ? ইয়েতি বলে আবার কিছু আছে নাকি ? সন্তু ওর কাকাবাবুর সঙ্গে একবার নেপাল থেকে কোথায় যেন গিয়েছিল, তারপর ফিরে এসে ইয়েতি সম্পর্কে গাঁজাখুরি গল্প রটিয়েছিল ! আমার জ্যাঠামণি কোনওদিন ইয়েতি দেখেননি !"

সন্তু বলল, "বারুইপুরে যদি আমরা সিংহ, হাতি, উট দেখতে পাই, তা হলে সেটা হবে ইয়েতি দেখার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার।"

জোজো বলল, "বাজি তো ধরাই আছে, আর একটুখানি ধৈর্য ধরে থাক !"

অরিন্দম বলল, "ওর পিসেমশাইকেও দেখে আসতে হবে।"

গড়িয়া স্টেশনে এক সঙ্গে অনেকে নেমে গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি এখন একটা খবরের কাগজ পড়ছে। বাইরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এদিকটায় আজ এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। মাটি একেবারে শুকনো।

সন্তু জানলা দিয়ে দেখছে বাইরের দৃশ্য। জোজো আর অরিন্দম কী কথা বলছে সে আর শুনছে না মন দিয়ে। সিংহ দেখা যাক বা না যাক, ট্রেনে করে

এই যে হঠাৎ খানিকটা ভ্রমণ হল, তাই-ই বা মন্দ কী! সন্তুর বেশ ভালই লাগছে।

লাইন সারানো হচ্ছে বলে এখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দু'দিকেই ফাঁকা মাঠ, একদিকে ট্রেনের লাইন ঘেঁষে একটা সরু রাস্তা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় সন্তু চমকে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, জোজো আর অরিন্দম যেন কী নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছে। সন্তু জোজোর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তুই কি বারুইপুরে আমাদের ভাল্লুক দেখাবার কথাও বলেছিলি?"

জোজো মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, "না, তা বলিনি। ওখানে ভাল্লুক নেই।"

সন্তু জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আছে। তুই জানিস না। ওই দ্যাখ ভাল্লুক!"
সবাই ছুটে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। কিন্তু অরিন্দম বা জোজো কিছুই দেখতে পেল না। জোজো তো ধরেই নিয়েছে যে, সন্তু মিথ্যে কথা বলেছে তাদের চমকে দেওয়ার জন্য, অরিন্দম অবশ্য সন্তুকে অবিশ্বাস করে না। সন্তু একেবারে বাজে কথা বলবে না। ওরা দু'জনেই বলতে লাগল, 'কই? কই?'
ট্রেনটা এত আস্তে যাচ্ছে যে চলছে কি না বোঝাই যাচ্ছে না। লাইনের ধারে ধারে কাজ করছে কয়েকজন লোক। ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। এর মধ্যে একটা ভাল্লুক দেখতে পাওয়ার চিন্তাটাই অসম্ভব বলে মনে হয়।

সন্তু বলল, "দেখতে পাচ্ছিস না? ওই যে বড় গাছটার নীচে...ভাল করে চেয়ে দ্যাখ!"

দৃশ্যটা অতি সুন্দর। একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের গোড়ায় বসে আছে একজন আধবুড়ো লোক, তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে একটা ভাল্লুক। ভাল্লুকটার গায়ের রোঁয়া উঠে গেছে খাব্‌লা-খাব্‌লা। লোকটার এক হাতে ডুগডুগি, আর এক হাতে সে ভাল্লুকটার মাথা চাপড়ে দিচ্ছে, ঠিক যেন ঘুম পাড়াচ্ছে।

বোঝাই যায় যে, এই লোকটা নাচের খেলা দেখায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছে। তা ছাড়া এই দুপুরের রোদ্দুরে কেইবা ভাল্লুক-নাচ দেখবে।

জোজো বলল, "ধুস্‌, এটা একটা ঘেয়ো মার্কা ভাল্লুক! তুই এমন চমকে দিয়েছিলি, সন্তু!"

অরিন্দম বলল, "তুই বুঝি বারুইপুরে আমাদের তাগড়া তাগড়া জোয়ান সিংহ দেখাবি? যদি শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারিস তো দেখব সার্কাসের একটা হাড়-জির-জিরে সিংহ!"

জোজো বলল, "কতবার বলছি না, সার্কাসের নয়! সার্কাসে বাঘ কিংবা হাতি থাকে, কিন্তু কোনও সার্কাসে সিংহের খেলা দেখেছিস? ওরা সিংহ পাবে

কোথায়। সিংহ কি আর গাছে ফলে !"

সন্তু বলল, "বারুইপুরের গাছে সিংহ ফলে নিশ্চয় !"

অরিন্দম বলল, "একী, ট্রেনটা যে একেবারে থেমে গেল।"

সত্যিই থেমে গেছে। কামরায় অন্য যে সব ছেলেরা একটু আগে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে খেলার আলোচনা করছিল, এখন তারা সবাই চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। ওদের অভ্যেস আছে। ওরা নিশ্চয়ই জানে যে, প্রতিদিন এখানে ট্রেন থেমে যায়।

জোজো বলল, "এই রে, ট্রেন এইভাবে টিকটিকিয়ে চললে যে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোরা তো কেউ বাড়িতে কিছু বলে আসিসনি !"

সন্তু বলল, "সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে।"

অরিন্দম বলল, "তা হলে আর কী হবে, চল ট্রেন থেকে নেমে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করি। এখন থেকে হাঁটলে সন্ধের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব নিশ্চয়ই। আজ আর সিংহটিংহ দেখার দরকার নেই। কী রে, সন্তু তাই করবি ?"

জোজো বলল, "তোরা যদি হাঁটতে চাস, আমার আপত্তি নেই। আমি একবার চার ঘন্টায় তিরিশ মাইল হেঁটে গিয়েছিলাম !"

অরিন্দম হো-হো করে হেসে উঠে সন্তুকে বলল, "দেখলি, দেখলি ! জোজো জানত এ লাইনের ট্রেন বেশি দূর এগোয় না। সিংহ-টিংহ সব ফক্কা !"

জোজোও হেসে উঠল একই রকমভাবে।

অন্য যাত্রীরা দু' একজন ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল ওদের দিকে। এরা এরকম পাগলের মতন হাসছে কেন ?

ট্রেনটা হঠাৎ আবার চলতে শুরু করে দিল। জোজো হাসি বন্ধ না করেই বলল, "তা হলে আমাদের ফেরা হচ্ছে না !"

এক সময় ওরা পৌঁছে গেল বারুইপুর স্টেশনে। জোজোর মুখে কিন্তু কোনও উদ্বেগের ছায়া নেই। এবার যে তার জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। তার জন্যও ভয় নেই ওর।

ওদের মধ্যে শুধু অরিন্দমের হাতেই ঘড়ি আছে। জোজো বলল, "ক'টা বাজে দ্যাখ তো।"

অরিন্দম বলল, "দুটো পনেরো !"

জোজো বলল, "ওঃ, ঢের সময় আছে। আমরা ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরে যেতে পারব। ভয় নেই, তোদের হেঁটে যেতে হবে না।"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে জোজো বলল, "দুটো রিকশা নিতে হবে। সন্তু আর অরিন্দম একটা রিকশায় ওঠ, আমি আর একটাতে উঠছি।"

নিজের রিকশায় উঠে জোজো বেশ জোরে জোরে বলল, "যে বাড়িতে সিংহ আছে সেই বাড়িতে চলো তো ?"

রিকশাওয়ালার চোখ বড়-বড় হল না, মুখ হাঁ হল না, সে কোনও প্রতিবাদ করল না। ঘাড় নেড়ে প্যাডেলে চাপ দিল।

সন্তু আর অরিন্দমেরই বিস্ময়ে চোখ গোল গোল হয়ে গেল। তা হলে এখানে সত্যিই সিংহ আছে নাকি ? বাড়িতে পোষা সিংহ ?

সাইকেল রিকশা চলতে লাগল অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে। তারপর আমাদের আগেকার আমলের মতো মস্ত বড় একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে থামল। জোজো আগের রিকশা থেকে নেমে মুখ ঘুরিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল, "গন্ধ পাচ্ছিস ?"

সত্যিই বাতাসে একটা জন্তু জন্তু গন্ধ ভাসছে।

লোহার গেট পেরিয়ে এক পাশে একটা বেশ উঁচু ঘর। তার সামনেটা লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে তাকাবার আগেই ওরা শুনতে পেল সিংহের চাপা গর্জন।

ভেতরে রয়েছে একখানা তাগড়া, জ্যান্ত সিংহ। মোটেই রোগা, হাড়-জিরজিরে নয়, সোনালি রঙের গা, মাথাভর্তি কেশর।

সন্তু আর অরিন্দম বিস্ময়ে কিংবা লজ্জায় কথাই বলতে পারছে না।

একটু বাদে অরিন্দম বলল, "জোজোর মুখে সত্যি কথা ? বাজি হেরে গেছি, তা স্বীকার করছি ! কিন্তু এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। হ্যাঁ রে, জোজো, এটা কি ম্যাজিক নাকি ?"

জোজো বলল, "ঠিক ধরেছিস ! এটা কার বাড়ি জানিস ? এটাকে ম্যাজিকের বাড়ি বলতে পারিস। এটা পি. সি. সরকার জুনিয়ারের বাড়ি, তিনিই এই সিংহটা পুষেছেন।"

"সিংহ পুষেছেন ? এখানে তিনি সিংহ পেলেন কোথায় ?"

"আফ্রিকার কোনও রাজা কিংবা প্রেসিডেন্ট ওঁকে একটা বাচ্চা সিংহ প্রেজেন্ট করেছিলেন, সেটাকেই তিনি খাইয়ে-দাইয়ে এত বড় করেছেন।"

"উনি ম্যাজিকে এই সিংহটা অদৃশ্য করে দিতে পারেন ?"

"ওঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এইবার চল, তোদের হাতি আর উট দেখাব ! সাইকেল রিকশা দুটোকে সেই জন্য ছাড়িনি।"

"থাক, আর কিছু দেখবার দরকার নেই।"

"না, না, না, তোদের দেখতেই হবে। তোরা আমার কথা অবিশ্বাস করেছিলি। ভেবেছিলি জোজো সব সময় গুল মারে, তাই না ?"

সন্তু ভাবল, জোজো আসলে খুব চালাক ছেলে। সবাই ওর কথা অবিশ্বাস করে বলে, মাঝে-মাঝে জোজো দু'একটা অদ্ভুত ধরনের সত্যি কথা বলে সবাইকে চমকে দেয়। এখন জোজোর কাছে বাজি হেরে যাওয়ার পর ওরা যদি শোনে যে, জোজো ওর বাবার সঙ্গে একবার মঙ্গল গ্রহ ঘুরে এসেছে, তাহলে কি চট করে উড়িয়ে দিতে পারবে ?

গেট থেকে বেরিয়ে জোজো বলল, "এর আগেরবার যখন এই সিংহটা দেখতে আসি, তখন কী হয়েছিল জানিস ?"

অরিন্দম বলল, "সিংহটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর তুই খালি হাতে ওকে পোষ মানিয়েছিলি ? তা হতে পারে, হতে পারে, আমি তোকে আর অবিশ্বাস করছি না রে, জোজো ।"

জোজো পাতলা হেসে বলল, "না, সে রকম কিছু হয়নি । তোর যত সব অদ্ভুত ধারণা ! সেবার আমরা বাবার সঙ্গে এসেছিলুম । আমার বাবা তো সব জীবজন্তুর ভাষা জানেন । বাবা এই সিংহটার সঙ্গে এক ঘন্টা আলাপ করে আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক নতুন খবর জেনে নিয়েছিলেন ।"

সন্তু হাসি চাপতে পারল না । জোজো এখন যা ইচ্ছে বলে যাবে । প্রতিবাদ করার উপায় নেই । সে তবু বলল, "তোর বাবা সিংহের সঙ্গে কীভাবে কথা বললেন ? হালুম হালুম করে ?"

জোজো বলল, "তুই একটা ইডিয়েট ! জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে চ্যাঁচামেচি করতে হয় না । মনে মনে বলতে হয়, অবশ্য ভাষাটা জানতে হয় ।"

সন্তু হার স্বীকার করে বলল, "ও !"

অরিন্দম বলল, "সেবারে আর কী হয়েছিল ?"

জোজো বলল, "আর বিশেষ কিছু হয়নি । চল, হাতি দেখতে যাবি চল !"

খানিক দূরের আর একটা ঘরে রয়েছে একটা হাতি । দুটি পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা । হাতিটা তখন মনের আনন্দে একটা কলাগাছ খাচ্ছে ।

জোজো বলল, "এটার পিঠে চাপবি ?"

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনেই একই সঙ্গে বলে উঠল, "না, না, দরকার নেই ।"

জোজো বলল, "কোনও অসুবিধে নেই । আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি । ভয়েরও কিছু নেই ।"

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনে আবার জোর দিয়ে 'না' বলল ।

জোজো বলল, "হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম । আগের বার আর-একটা কাণ্ড হয়েছিল । আগের বার ভুলে এই হাতিটার পিঠে চেপেই আমার পিসেশমাইয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলুম । তার ফলে গুলি খেয়ে মরছিলুম আর একটু হলে !"

সন্তু বলল, "কেন ? কে গুলি করতে এসেছিল ?"

"বাঃ, তোদের বলিনি যে আমার পিসেমশাই জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারেন না ! ওঁর বাড়িতে গোরু-ছাগল ঢোকে না, উনি কুকুর পোষেন না । বেড়াল নেই, ইঁদুর নেই, এমনকী আরশোলাও নেই ।"

অরিন্দম বলল, "আরশোলাও নেই সে বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ, আরশোলাও নেই, সত্যি !"

"তা হলে তো দারুণ কাণ্ড করেছেন বলতে হবে। আরশোলা তাড়ানো কি সোজা কথা ; শুনেছি অ্যাটমবোমায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও আরশোলারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না !"

"আমার পিসেশমাই একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তার ভাইব্রেশানে আরশোলা-পোকামাকড়ও সব মরে যায়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তোর পিসেশমাই তোকে দেখতে পেয়েও গুলি করতে এসেছিলেন ?"

জোজো বলল, "হয়তো আমাকে চিনতে পারেননি। আমি হাতির পিঠে চেপে ও বাড়ির গেটের দিকে এগোচ্ছি। এমন সময় শুনতে পেলুম ছাদের ওপর থেকে উনি চেঁচিয়ে বলছেন, 'আর এক পা এগোলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব গুলি করে !' আসলে অবশ্য কথাটা উনি নিজে বলেননি। ছাদে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ফিট করা আছে। কেউ কোনও জীব-জন্তু নিয়ে ওই বাড়ির এক শো গজের মধ্যে এলেই ওই যন্ত্র থেকে আপনি আপনি ওই রকম ভয়-দেখানোর কথা বেরিয়ে আসে।"

সন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলল, "চল, তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

জোজো বলল, "এখনও যে উট দেখা বাকি আছে ?"

সন্তু অরিন্দম আর উট দেখতে রাজি নয়। তারা বাজিতে হেরে গেছে। তারা এখন অংশুমান চৌধুরীকে দেখতে চায়।

জোজো বলল, "চল তা হলে।"

বাড়িটা আধখানা নতুন, আধখানা পুরনো। পুরনো বাড়িটার মাঝখান দিয়েই নতুন একটা দোতলা বাড়ি উঠেছে, সেই বাড়িটার রং হলদে, আর পুরনো অংশটার দেওয়ালে শ্যাওলা জমে আছে। সেদিককার দেওয়াল ফাটিয়ে উঠেছে একটা বেশ তেজি অশত্থ গাছ। গাছটা বাড়ির ছাদটার কাছে ছাতার মতন হয়ে আছে। বাড়ির ছাদে টিভি অ্যান্টেনা ছাড়া আরও যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বাড়ির লোহার গেটটা মস্ত বড়, কিন্তু মর্চে-ধরা। ওপরের দিকে বর্শা-বর্শা করা ছিল, তার মধ্যে ভেঙে গেছে কয়েকটা। গেটটা আধখানা খোলা, কাছাকাছি কেউ নেই। ভেতরে দেখা যায় খানিকটা বাগানের মতন, সেখানে একটা নাদুস-নুদুস চেহারার গোরু আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, তোর পিসেমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকতে গেলে কী আগে থেকে খবর দিতে হয় ? ছাদ থেকে কেউ গুলি টুলি করবে না তো !"

জোজো একটু ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, "না, না, আমার নিজের পিসেমশাইয়ের বাড়ি। আমি যখন খুশি যেতে পারি। তবে, কথা হচ্ছে..."

জোজো থেমে যেতেই অরিন্দম বলল, "তবে মানে ?"

সে ভয়ে-ভয়ে ছাদের দিকে তাকাল।

জোজো বলল, "আমি ভাবছি লোহার গেটটা ইলেট্রিফায়েড ছিল। হাত দিলে যদি শক্‌ মারে?"

সন্তু ভেতর-দিকটা দেখেছিল। সে বলল, "এই জোজো, তুই যে বললি তোর পিসেমশাই কোনও জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করেন না, বাড়িতে গোরু-ছাগল ঢোকে না? ওই যে দেখছি একটা গোরু?"

জোজো বলল, "তাই তো।"

সন্তু বলল, "এটাকে তো বাইরের গোরু মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে পোষা!"

অরিন্দম বলল, "হ্যাঁরে, এটা ঠিক তোর পিসেমশাইয়ের বাড়ি তো? ভুল করে অন্য বাড়িতে আসিসনি?"

জোজো বলল, "বাঃ, আমার পিসেমশাইয়ের বাড়ি আমি চিনব্‌ না? কতবার এসেছি! হ্যাঁ, গোরুটার কথা মনে পড়েছে। তবে প্রত্যেকদিন সকালে এই গোরুটাকে কার্বলিক অ্যাসিড মাখিয়ে চান করানো হয়।"

সন্তু বলল, "তারপর বোধহয় পাউডারও মাখানো হয়। দেখছিস না ওর গা'টা কেমন ধপধপ করছে!"

জোজো চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, "কেষ্ট! কেষ্ট!"

কয়েকবার এই রকম ডাকার পর বাড়ির ভেতরের দরজা খুলে একজন মাঝ বয়েসি মহিলা মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

জোজো বলল, "কেষ্ট আছে?"

মহিলাটি এবারে বেরিয়ে এলেন। লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা, হাতে একটা কাটারি।

তিনি বললেন, "কেষ্ট আবার কে? ও নামে তো কেউ এখানে থাকে না!"

সন্তু আর অরিন্দম তাকাল জোজোর দিকে। জোজো বলল, "এখানে বাগানের যে মালি ছিল..."

মহিলাটি বললেন, "বলছি তো কেষ্ট বলে কেউ নেই!"

জোজো বলল, "তা হলে বোধ হয় ওর নাম বিষ্টু!"

"এখানে কেষ্ট-বিষ্টু কেউ থাকে না!"

"ওঃ হো, মনে পড়েছে। তার নাম ভোলানাথ!"

"তুমি কি বাছা এখানে সব ঠাকুর-দেবতার নাম করতে এসেছ? ওই নামেও কেউ নেই!"

অরিন্দম ফিসফিস করে সন্তুকে বলল, "আর দরকার নেই, চল, ফিরে যাই!" সন্তুও মাথা নাড়ল।

অরিন্দম জোজোর পিঠে হাত দিতেই জোজো হো-হো করে হেসে উঠে হাত দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলল লোহার গেটটা। তারপর ভেতরে ঢুকে বলল, "শিবুর মা, আমায় চিনতে পারছ না। আমি জোজো! পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা

করতে এসেছি !"

মহিলাটির ভুরু কোঁচকানো ছিল, আস্তে আস্তে তা সোজা হয়ে গেল। তারপর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, "ওমা, জোজো ! তাই তো, চিনতেই পারিনি, তোমার যে একটু-একটু গোঁপ উঠে গেছে ! তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে কী সব কেষ্ট-বিষ্টুর নাম বলছিলে !"

জোজো বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, "আয় !"

তারপর সে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল, "পিসেমশাই আছেন তো ?"

মহিলা বললেন, "হ্যাঁ, আছেন। তবে ঘুমোচ্ছেন। রাত্তিরে তো ঘুমোন না, দুপুরে এই সময়টা ঘুমিয়ে নেন। তোমরা ওপরে গিয়ে বোসো গে !"

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকাল। জোজো আজ আগাগোড়াই নতুন কায়দা দেখাচ্ছে। সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সন্তু আর অরিন্দম অবিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তারপর সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করে সে কেষ্ট আর বিষ্টুর নাম বলছিল।

বাড়ির ভেতর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেখানে টানা একটা বারান্দার মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজা খুলে একটা ছাদ দেখা গেল, সেটা পুরনো বাড়ির অংশ। এই ছাদের ওপরেও ছাতা মেলে আছে অশত্থ গাছটা।

জোজো তার বন্ধুদের নিয়ে এল সেই ছাদে। সেখানে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছড়ানো রয়েছে। আজ কলকাতায় বৃষ্টি হলেও এখানে বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই।

জোজো বলল, "ব্যাস, আর কোনও চিন্তা নেই। পিসেমশাই আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন। যদি একটু দেরিও হয়, সন্তু বাড়িতে খবর দিয়ে দেওয়া যাবে টেলিফোনে !"

সন্তু ছাদের এক পাশের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দেওয়ালের মুখোমুখি সেঁটে রয়েছে দুটি বেশ তাগড়া চেহারার টিকটিকি। জোজো বলেছিল, ওর পিসেমশাই কোনও পোকামাকড়ও সহ্য করতে পারেন না, এ-বাড়িতে আরশোলাও নেই। তা হলে টিকটিকি রয়েছে কেন ? অবশ্য টিকটিকি বাইরে থেকে চলে আসতে পারে। কিন্তু পোকামাকড় না থাকলে টিকটিকি আসবে কেন ?

অশত্থ গাছটার ডালেও কিচির-মিচির করছে অনেক পাখি। জোজোর পিসেমশাই পাখি অপছন্দ করলেও কোনও উপায় নেই, আকাশ দিয়ে পাখির ওড়াওড়ি তো তিনি আটকাতে পারবেন না।

জোজো বলল, "ওই যে শিবুর মা'কে দেখলি, উনি নারকেল-কোরা, মুড়ি আর চিনি দিয়ে একটা চমৎকার খাবার তৈরি করেন। একটু বলে আসি, তোদের খিদে পায়নি ?"

অরিন্দম বলল, "খুব ! শুধু মুড়ি-নারকেল কেন, আর কিছু পাওয়া যাবে না ?"

জোজো বলল, "দেখছি !"

জোজো নীচে নেমে চলে গেল। সন্তু আর অরিন্দম চেয়ারে না বসে দাঁড়াল এসে পাঁচিলের পাশে।

অরিন্দম বলল, "সন্তু, দেখছিস তো, আজ জোজো তোকে খুব ডাউন দিয়ে দিচ্ছে। যা যা বলছে সব মিলে যাচ্ছে।"

সন্তু বলল, "জোজোটার সত্যি খুব বুদ্ধি আছে। আমি ভাবছি, ওর পিসেমশাই মানুষটি কেমন হবেন ! শুনলাম তো, রাত্তিরে ঘুমোন না, দুপুরে ঘুমোন।"

অরিন্দম বলল, "বৈজ্ঞানিকরা ওইরকম হয় ! একটু পাগল না হলে বোধহয় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। আইনস্টাইন নাকি অন্য লোককে জিজ্ঞেস করতেন, আমি কি খেয়েছি ? আর নিউটন একটা খাঁচায় দুটো পাখি পুষে খাঁচাটার দুটো দরজা বানিয়েছিলেন। বড় দরজা বড় পাখিটার জন্য, আর ছোট পাখিটার জন্য একটা ছোট দরজা !"

সন্তু হেসে উঠল।

অরিন্দম বলল, "ওর পিসেমশাইয়ের গাড়ি আছে বলল জোজো। গাড়িটা কোথায় ? দেখছি না তো !"

জোজো তক্ষুনি ফিরে এসে বলল, "আসছে, অনেক রকম খাবার আসছে। প্রথমে আসছে ডাবের জল। আয়, চেয়ারে বসি।"

বেতের চেয়ারগুলোতে বসবার পর সন্তু আবার দেওয়ালটার দিকে তাকাল। টিকটিকি দুটো তখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। অদ্ভুত প্রাণী এই টিকটিকি, সারাদিনে যে কতটুকু নড়াচড়া করে তার ঠিক নেই। দুটো টিকটিকি পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কী দেখছে !

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। টিকটিকি দুটো টপ্‌টপ্‌ করে দেওয়াল থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে। সন্তু অবাক হয়ে গেল। টিকটিকি তো এমনি-এমনি পড়ে যায় না। নীচে পড়ে গিয়েও ওরা নড়ছে না।

সন্তু চেয়ার ছেড়ে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল। টিকটিকি দুটো উল্টো পড়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, ওদুটো মরে গেছে।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ !"

ওরা দু'জনও উঠে এল সন্তুর কাছে। সন্তু বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ, এই টিকটিকি দুটো হঠাৎ এমনি এমনি মরে গেল !"

জোজো বলল, "টিকটিকি ? এ বাড়ির দেওয়ালে ? ও, বুঝেছি, তা হলে পিসেমশাই জেগে উঠেছেন ?"

॥ ২ ॥

অংশুমান চৌধুরী খুব রোগা আর লম্বা একজন মানুষ। গায়ের রং বেশ ফর্সা, মাথায় একটাও চুল নেই, দাড়ি-গোঁফ নেই, ভুরুর চুল সব পাকা, কিন্তু সেরকম বুড়ো থুরথুরে নন্। চোখ দুটি ঝকঝকে। তাঁর ঘরে অনেক কালের পুরনো একটা খাট, যার আর-এক নাম পালঙ্ক। খাটটি বেশ উঁচু, একটা টুলের ওপর পা দিয়ে সেটার ওপরে উঠতে হয়। সেটির সারা গায়ে কারুকার্য করা। ঘরের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো দুটি ছবি। একটি চাঁদের, আর একটি সূর্যের। দরজার পাশের দেওয়ালে, যেখানে আলো-পাখার সুইচ থাকে, সেখানে অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা সুইচ।

অংশুমান চৌধুরী ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে লাগলেন। খাটের মাথার কাছে একটা বেশ বড গড়গড়া। তার নলটা এত লম্বা যে, অংশুমান চৌধুরী সারা ঘরে পায়চারি করতে করতেও তামাক খেতে পারেন। তিনি পরে আছেন একটা ডোরাকাটা আলখাল্লা আর তাঁর পায়ের চটিজোড়া মনে হয় রুপো দিয়ে তৈরি। তিনি ঘুরে ঘুরে তামাক টানতে টানতে একটা গান ধরলেন, "এমন দিন কী হবে মা তারা..."। প্রত্যেকদিন বিকেলে এই সময় তাঁর গান গাওয়া অভ্যেস। তবে ওই একটি গান ছাড়া তিনি আর কোনও গান জানেন না।

দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে জোজো জিজ্ঞেস করল, "পিসেমশাই, আসব ?"

দারুণ চমকে গিয়ে অংশুমান চৌধুরী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কে ?"

জোজো বলল, "পিসেমশাই, আমি জোজো। হঠাৎ চলে এলাম !"

অংশুমান চৌধুরী যেন বেশ রেগে গিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "তুই জোজো, তাই না ? আমি প্রথমে ভাবলুম বুঝি দাজু ! সে যখন-তখন এসে বড্ড বিরক্ত করে। তারপর তোর কী খবর বল ! তোর বাবা আর ক'জন রাজা-উজিরকে খতম করল ?"

জোজো বলল, "পিসেমশাই, আমার কলেজের দু'জন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।"

অংশুমান চৌধুরী চোখ থেকে চশমাটা খুলে সন্তু আর অরিন্দমকে দেখলেন ভাল করে। তারপর বললেন, "এসো, ভেতরে এসো !"

ঘরের মধ্যে মস্ত বড় খাটখানা ছাড়া আর রয়েছে একখানা ইজিচেয়ার। তার ওপরে একখানা সুন্দর কাশ্মিরী শাল জড়ানো। সন্তু আর অরিন্দম ভেতরে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

জোজো তার পিসেশমাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "এই, এই, ছুঁস না আমাকে। ছুঁস না। তোর গায়ে কিসের গন্ধ, মনে হল জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ। নিশ্চয়ই ওই

সিংহ-টিংহগুলো দেখতে গিয়েছিলি !”

জোজো অপরাধীর মতন মাথা চুলকোতে লাগল ।

সন্তু অবাকভাবে তাকাল অরিন্দমের দিকে । জোজোর পিসেশমাইয়ের এত তীব্র ঘ্রাণশক্তি ? ওরা সিংহটার কাছে একটুখানি দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই তাদের গায়ে এত গন্ধ হয়ে গেছে ! এরকম কথা সন্তু কখনও শোনেনি ।

অংশুমান চৌধুরী নাক কুঁচকে বললেন, “জানিস না, আমি জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না ! দ্যাখ, আমার ঘরে কোনও চামড়ার জিনিস নেই । আমি বেল্ট পরি না । চামড়ার জুতো পরি না !”

সন্তু আর অরিন্দম নিজেদের কোমরে হাত দিল । ওরা যদিও বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছে, কিন্তু ওদের কোমরে চামড়ার বেল্ট । এ-ঘরে সত্যিই কোনও চামড়ার জিনিস নেই ।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, “ইচ্ছে করলে আমি ওই ম্যাজিশিয়ান ছোকরার পোষা সিংহ আর হাতিটাতিগুলোকে এখানে বসে বসেই মেরে ফেলতে পারি । ছোকরাকে আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দেব । ও যদি ওগুলোকে কলকাতায় নিয়ে না যায়, তা হলে মেরে ফেলতেই হবে ।”

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, “আমরা কি আমাদের বেল্ট বাইরে খুলে রেখে আসব ?”

অংশুমান চৌধুরী সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, “হঠাৎ বন্ধুদের নিয়ে বারুইপুরে এলি যে, এখানে কী দেখার আছে ?”

জোজো বলল, “আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য নিয়ে এসেছি ।”

অংশুমান চৌধুরী হেসে বললেন, “আমার সঙ্গে আলাপ ; এই বুড়োমানুষটার সঙ্গে কথা বলে ওদের কী ভাল লাগবে ?”

জোজো বলল, “আপনি একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষ !”

অংশুমান চৌধুরী হো হো করে হেসে বললেন, “বিশ্ববিখ্যাত বলছিস কেন ? বল্ মহাবিশ্ববিখ্যাত ! তা বিশুর মা তোদের কিছু খেতে টেতে দিয়েছে ? মুখচোখ তো শুকিয়ে গেছে দেখছি !”

জোজো বলল, “হ্যাঁ, আমরা খেয়েছি । পিসেমশাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই । আমার এই যে বন্ধুটাকে দেখছেন, ওর ডাক নাম সন্তু । ওর কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী । আপনি নাম শুনেছেন ? তিনি দু'একটা রহস্যের সমাধান করেছেন বলে কাগজে নাম বেরোয় মাঝে-মাঝে । আর সন্তুর পাশের জনের নাম অরিন্দম । ও আমার সঙ্গে বাজি ফেলে হেরে গেছে । ও বলেছিল... ।”

অংশুমান চৌধুরী এতক্ষণ সন্তু বা অরিন্দমের দিকে ভাল করে তাকাননি । এবারে তিনি সন্তুর মুখের দিকে দারুণ অবাকভাবে চেয়ে রইলেন । তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, “রাজা রায়চৌধুরী তোমার কাকা ? রাজা রায়চৌধুরী

মানে সেই যার একটা পা ডিফেকটিভ ?”

সন্তু মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ জানাল।

অংশুমান চৌধুরী নিজের কপালে বাঁ হাত দিয়ে একটা চাপড় মেরে বললেন, “নিয়তি, নিয়তি ! জানতাম একদিন দেখা হবেই।”

“তারপর তিনি ঘরের কোনায় গিয়ে কাচের একটা আলমারির পাল্লা খুলে একটা জরিবসানো টুপি বার করে মাথায় পরলেন। আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে টুপিটা ঠিকমতন বসাবার চেষ্টা করলেন একটুক্ষণ।

এবারে তিনি সন্তুর একেবারে কাছে চলে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাকাবাবু কি পুরোপুরি রিটায়ার করেছেন ? আজকাল আর কোনও সাড়াশব্দ পাই না ?”

সন্তু কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগেই জোজো বলল, “না, উনি রিটায়ার করেননি তো ? এই তো কয়েকমাস আগে উনি ইজিপ্ট গিয়েছিলেন, পিরামিডের মধ্যে কী যেন আবিষ্কার করার জন্য। সন্তু সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই পাননি সেখানে। কী রে, ঠিক না ? এবারে ইজিপ্টে গিয়ে তো তোরা পিরামিডের মধ্যে কিছুই খুঁজে বার করতে পারসিনি। তাই না ? সোনাদানা কিছু পেয়েছিলি ?”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু গিয়েছিলেন, পিরামিডের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে যেসব ছবি আঁকা আছে, তার ভাষা পড়তে। সোনাটোনা তো খুঁজতে যাননি। সোনা পেলেও আমরা নিতাম না।”

অংশুমান চৌধুরী ভুরু কুঁচকে বললেন, “পিরামিডের দেওয়ালের ভাষা ? ইয়রোগ্লিফিক্স ? রাজা রায়চৌধুরী আবার সে ভাষা পড়তে শিখল কখন ? ওটা তো আমার সাবজেক্ট !”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা পিসেমশাই, বাড়ির দেওয়ালে টিকটিকি বা আরশোলা বসলেও আপনি এই ঘরে বসেই মেরে ফেলেন কী করে ? সেটা আমাদের একটু দেখান না !”

অংশুমান চৌধুরী বললেন, “ওটা আর এমন কী ব্যাপার। এই যে সুইচগুলো দেখছিস, এর সঙ্গে প্রত্যেকটা ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে যোগ আছে। যখনই আমি মন দিয়ে কাজ করি, তখন কোনও পোকামাকড়ের খারাপ গন্ধ আমার নাকে এলেই আমি সেই জায়গায় সুইচ টিপে দিই, অমনি সেখানকার মেঝেতে, দেওয়ালে, ছাদে এমনই ভাইব্রেশান হয় যে, কোথাও পোকামাকড় আর সেখানে টিকতে পারে না। ছেলেবেলায় একটা কাঁকড়াবিছে আমায় কামড়ে ছিল ! মানে, ওরা তো কামড়াতে পারে না, হুল ফুটিয়ে দেয়। সেই থেকে আমি কোনও পোকামাকড় সহ্য করতে পারি না।”

জোজো বলল, “আপনি তো কুকুর-বেড়ালও...”

“একবার একটা কুকুরও কামড়ে দিয়েছিল আমাকে। তখন আমি ঠিক

করেছিলুম, পৃথিবী থেকে সব কুকুর ধ্বংস করে দেব ! ইচ্ছে করলেও পারি ।”

কথাটা শুনে সন্তু একটু শিউরে উঠল। তার নিজের একটা পোষা কুকুর আছে। সে কুকুর ভালবাসে। একবার একটা কুকুর কামড়েছে বলে ইনি সব কুকুর ধ্বংস করে দিতে চান !

অংশুমান চৌধুরী আবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি আমার এই টুপি-পরা চেহারাটা ভাল করে দেখে রাখো। তারপর বাড়ি ফিরে তোমার কাকাবাবুকে আমার কথা বলো ! তোমার কাকা রাজা রায় চৌধুরীকে আমি আমার জীবনের প্রধান শত্রু বলে মনে করি। দশ বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল আফগানিস্তানে। তখন উনি একটা ব্যাপারে আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। সে অপমান আমি আজও ভুলিনি। আশা করি, এবারে আবার দেখা হবে। এবারে আমি শোধ নেব !”

তারপর তিনি হেসে সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, “তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না !”

॥ ৩ ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারে কাকাবাবু একটা দরকারি বইয়ের খোঁজে এসেছিলেন। এখানে অনেকেই তাঁর চেনা। প্রধান গ্রন্থাগারিক নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। তারপর কাকাবাবু বই দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। সেখান থেকে বেরুতে বেরুতে সন্ধে হয়ে গেল। গেটের বাইরে এসে তিনি একটাও ট্যাক্সি দেখতে পেলেন না। সাধারণত চিড়িয়াখানার সামনে এই সময় অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। পরপর দুটো বাস এল, তাতে দারুণ ভিড়। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে এরকম ভিড়ের বাসে উঠতে পারেন না। তিনি ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক সময় একজন মোটাসোটা চেহারার লোক তাঁর সামনে থমকে দাঁড়াল। বিগলিতভাবে হেসে বলল, “কেমন আছেন, স্যার ?”

তারপর সে নিচু হয়ে কাকাবাবুর এক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাকাবাবু খুব বিব্রত বোধ করলেন। তিনি যাকে-তাকে প্রণাম করেন না, যার-তার প্রণাম নেওয়াও পছন্দ করেন না। তিনি একটুখানি পিছিয়ে গেলেন।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “কোথায় গেছিলেন, স্যার ?”

কাকাবাবু বললেন, “এই একটু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে...”

লোকটি কাকাবাবুর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বলল, “আপনাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার আছে।”

কাকাবাবু এবারে একটু কড়া গলায় বললেন, “কিন্তু আমি এখন একটু ব্যস্ত

আছি। দরকার থাকলে আপনি আমার বাড়িতে এসে দেখা করবেন।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আপনার ঠিকানাটা..."

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিয়ে বললেন, "এই যে, এতে আমার ঠিকানা পাবেন।"

লোকটি কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে বলল, "বাঃ! খুব উপকার হল। দেখা করব একদিন। সত্যি খুব দরকার।"

লোকটি আর দাঁড়াল না, হনহন করে চলে গেল ডান দিকে। কাকাবাবু সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কে লোকটা, আগে কোথাও দেখেছেন কি না কিছুই মনে পড়ল না।

পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, দিনকাল ভাল নয়। আপনি একলা-একলা রাস্তায় বেরোবেন না। বিশেষত সন্ধের পর। আপনার তো শত্রু কম নয়, কে কখন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে, তার ঠিক কী! যদি চান তো আপনার একজন বডিগার্ড ঠিক করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু পুলিশ কমিশনারের এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব সময় সঙ্গে একজন বডিগার্ড নিয়ে ঘোরার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তাঁর ওপর অনেকের রাগ আছে বটে। তিনি গুপ্তচক্র ভেঙেছেন, অনেক বদমাশকে জেলে ভরেছেন। তাদের সঙ্গী সাথীরা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু কাকাবাবুর ধারণা, যে-মানুষ নিজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার ঘর থেকে বেরোনোই উচিত না।

আরও মিনিটপাঁচেক দাঁড়াবার পর কাকাবাবুর ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেল। ট্যাক্সি পাওয়ার আর আশা নেই। কাকাবাবু হাঁটতে লাগলেন। ময়দানের দিকে গেলে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে এসে তিনি ব্রিজের ওপর উঠতে লাগলেন। সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তার দু'দিকে ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট। এইখানটায় কেমন যেন বুনো-বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। 'ক্যাঁকাও ক্যাঁকাও' করে কী একটা পাখি ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। কাকাবাবু ভাবলেন, অনেকদিন চিড়িয়াখানায় আসা হয়নি। মাঝে-মাঝে এলে মন্দ হয় না। চিড়িয়াখানায় এলে নতুন করে বোঝা যায়, এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও কতরকম প্রাণী আছে!

ব্রিজটার মাঝামাঝি যখন এসেছেন, তখন তাঁর পাশে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সেটা খালি। ড্রাইভারটি মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কোথায় যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হাওড়া স্টেশনেও যেতে পারি, টালিগঞ্জেও যেতে পারি। যেখানে আমার খুশি।"

ড্রাইভারটি বলল, "উঠে পড়ুন।"

কাকাবাবু তবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যেখানে যেতে চাইব, সেখানেই যাবেন তো ?"

ড্রাইভারটি বলল, "নিশ্চয়ই !"

কাকাবাবু এবারে দরজা খুলে ভেতরে এসে বললেন, "আপনি কি দেবদূত ? আজকাল তো ট্যাক্সিওয়ালারা সন্ধের পর কোথাও যেতে চায় না !"

ড্রাইভারটি হেসে বলল, "আমি তো আপনাকে চিনি। আমার গাড়িতে আপনি অনেকবার চেপেছেন। এখন কোথায় যাবেন, বলুন স্যার।'

কাকাবাবু তাকে বাড়ির ঠিকানা জানালেন। তাঁর মনটা খুশি হয়ে গেল। কলকাতা শহরটা তা হলে একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। পুলিশ কমিশনার তাঁকে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলেন, আবার এরকমও তো হয়, সন্ধেবেলা এক ট্যাক্সিওয়ালা অযাচিতভাবে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চান। কিংবা তিনি খোঁড়া বলেই কি ট্যাক্সিওয়ালাটির মায়া হয়েছে ? সেটাও খারাপ কিছু নয়। অনেক সময় তো এরা অসুস্থ লোককেও নিতে চায় না।

বাড়িতে ফিরেও মনটা খুশি-খুশি রইল। দরজা দিয়ে ঢোকার পর তাঁর বউদি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু তোমার সঙ্গে যায়নি ?"

কাকাবাবু বললেন "না তো ? আমি দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়েছিলাম।"

বউদি বললেন, "সাতটা বেজে গেল, সন্তু এখনও ফিরল না !"

কাকাবাবু কিছু না বলে হাসলেন। সন্তু এখন কলেজে পড়ে, মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেরি তো হতেই পারে। ও তো আর ছোট ছেলেটি নেই।

তিনি উঠে গেলেন ওপরে।

সন্তু ফিরল রাত ন'টার একটু পরে। মায়ের বকুনি ভাল করে না শুনেই সে ছটফটিয়ে বলল, "দাঁড়াও, পরে সব বলছি। কাকাবাবুর সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা আছে।"

দুমদাম করে ওপরে ছুটে এসে সে বলল, "কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে চেনো ? আজ তাঁর সঙ্গে..."

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে বললেন, "হাঁপাচ্ছিস কেন ? জামাটা ঘামে ভিজে গেছে। যা, আগে জামা-টামা খুলে চান করে আয় !"

কিন্তু সন্তুর এক মিনিটও তর সইছে না। সে এক্ষুনি বারুইপুরের ঘটনাটা কাকাবাবুকে জানাতে চায়। সে আবার কিছু বলার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু আবার বাধা দিয়ে বললেন, "উঁহু, এখন আমি কিছু শুনতে চাই না। আগে চানটান করে, খাবার খেয়ে, সেই সঙ্গে তোর মায়ের বকুনি খেয়ে তারপর আয়। তখন সব শুনব।"

চেয়ার ঘুরিয়ে কাকাবাবু আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

সন্তুকে বাধ্য হয়ে নীচে গিয়ে বাথরুমে ঢুকতে হল। আবার সে ওপরে উঠে

এল প্রায় আধঘন্টা বাদে।

কাকাবাবু বললেন, "বোস ! এবার বল, কলেজ থেকে কোথায় গিয়েছিলি ?"

সন্তু কাকাবাবুর কাছে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, "দুপুরে কলেজ থেকে আজ হঠাৎ বারুইপুরে চলে গিয়েছিলুম আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে..."

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "ট্রেনে গিয়েছিলি, না বাসে ?"

সন্তু বলল, "ট্রেনে। আমার বন্ধু জোজোর পিসেমশাই থাকেন সেখানে। তাঁরই নাম অংশুমান চৌধুরী। তিনি নাকি একজন বৈজ্ঞানিক।"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর, তিনি কী বললেন ?"

সন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি তাঁকে চেনো না ? নাম শুনে কিছু মনে পড়ছে না ?"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তোর বন্ধুর পিসেমশাইকে আমি চিনব কী করে ?"

"উনি যে বললেন, উনি একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক ?"

"তা হতে পারে। কিন্তু সব বৈজ্ঞানিককে তো আমি চিনি না !"

"উনি তোমাকে চেনেন। তোমার নাম জানেন !"

"কেমন চেহারা ভদ্রলোকের ?"

"অংশু মানে তো চাঁদ। ওর মাথাটা চাঁদের মতন !"

"তার মানে ?"

"ফর্সা মাথাটা ঠিক চাঁদের মতন চকচকে। একটাও চুল নেই। উনি বেশ লম্বা। আর রোগা।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে বললেন, "নাঃ, এরকম চেহারার কোনও লোককে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আফগানিস্তানে। বেশ কয়েক বছর আগে। ও হ্যাঁ, তখন ওঁর মাথায় টুপি ছিল। বাইরে বেরোবার সময় উনি নিশ্চয়ই টুপি পরেন। উনি বললেন, তুমি ওঁর কথা শুনলেই সব বুঝতে পারবে।"

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "আফগানিস্তানে ? টুপি পরা বাঙালি ? কী জানি ! আফগানিস্তানে তো আমি বেশ কয়েকবার গেছি ! সেরকম কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। এখন মনে পড়ছে না ! তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন, সন্তু ? ভদ্রলোককে যে আমার মনে পড়তেই হবে, তার কী মানে ?"

সন্তু চোখ বড় বড় করে বলল, "কারণ আছে, কারণ আছে ! ওই অংশুমান চৌধুরী তোমার শত্রু !"

কাকাবাবু হা-হা করে অট্টহাসি হাসলেন এবারে !

সন্তু বলল, "তুমি বিশ্বাস করছ না ? উনি নিজের মুখে বললেন সেকথা।

তুমি ওর জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু !”

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, “বড়-বড় ক্রিমিনালরা আমাকে শত্রু বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তোর বন্ধুর পিসেমশাই, তিনি আবার বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি আমার শত্রু হতে যাবেন কেন ?”

সন্তু বলল, “দশ বছর আগে তুমি আফগানিস্তানে কী একটা ব্যাপারে ওঁকে হারিয়ে দিয়ে অপমান করেছিলে।”

কাকাবাবু বললেন, “ধ্যাৎ ! কী সব বাজে কথা ! তুই এখন যা তো ! ওসব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে রসিকতা করেছেন।”

সন্তু আরও অনেক কিছু বলতে গেল, কিন্তু কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

সন্তু ক্ষুণ্ণভাবে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা সন্তু কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় একজন লোক এসে খোঁজ করল কাকাবাবুর। কাকাবাবু প্রত্যেক সকালবেলা বেড়াতে বেরোন, কোনও-কোনও দিন দু'চারজন লোকের সঙ্গে দেখা করে একটু দেরিতে ফেরেন। আজ তিনি এখনও ফেরেননি।

লোকটি বলল, সে এসেছে বারুইপুর থেকে। কাকাবাবুর জন্য একটা জিনিস আছে। সই করে সেটা রাখতে হবে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পিচবোর্ডের বাক্স। তার ওপরে লেখা, “টু রাজা রায়চৌধুরী। ফ্রম অংশুমান চৌধুরী, বারুইপুর।”

সন্তু বলল, “আমি সই করে রাখলে চলবে না ?”

লোকটি মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাতেও হবে।

লোকটি যাওয়ার পর সন্তু আর কৌতূহল সামলাতে পারল না। খুলে ফেলল বাক্সটা।

প্রথমে সন্তুর মনে হল বাক্সটার মধ্যে কিছুই নেই। একেবারে ফাঁকা। কেউ ঠাট্টা করে পাঠিয়েছে। তারপর সে ভাল করে দেখল, তলায় এক কোণে পড়ে আছে কয়েকটা চুল। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।

একতলার ঘরে খেতে বসে সন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল কাকাবাবুর জন্য। একটা বাক্সের মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পাঠাবার মানে কী ? এটা দেখে কাকাবাবু কী বলবেন ? ওঁর কি কোনও কথা মনে পড়ে যাবে ?

সাড়ে দশটার মধ্যেও কাকাবাবু ফিরলেন না। সন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছে না। তাকে কলেজে যেতেই হবে।

যাওয়ার সময় সে মাকে বলে গেল, “মা, কাকাবাবু এলেই এই বাক্সটা দেখিও। খুব দরকারি !”

রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাসে ওঠবার আগেও সন্তু একবার এদিক ওদিক

তাকিয়ে দেখল, কাকাবাবুকে দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। সন্তুর চিন্তার মধ্যে একটা দারুণ কৌতূহল রয়ে গেল।

কাকাবাবু ফিরলেন আরও এক ঘন্টা বাদে, সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মা ডেকে বললেন বাক্সটার কথা।

কাকাবাবু বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে ওপরে লেখা নামগুলো পড়লেন। তারপর বাক্সটা খুলে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। চুলগুলো তাঁর নজরে পড়ল না। তিনি ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশি সময় খরচ করলেন না।

তিনি বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বাক্সটা বসবার ঘরের একটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। তারপর রান্নার ঠাকুরকে বললেন, "তিন কাপ কফি চাই, আমার ঘরে দিয়ে এসো!"

দোতলায় কাকাবাবুর ঘরে একটা লম্বা সোফা ও কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। বিশেষ কাজের কথা থাকলে তিনি কোনও-কোনও লোককে ওপরের ঘরে নিয়ে আসেন। আজ যাঁরা কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা দু'জনেই অবাঙালি। এর মধ্যে একজনের নাম মাধব রাও, ইনি এ-বাড়িতে আগেও এসেছেন দু-একবার। ইনি পরে আছেন পা-জামা পাঞ্জাবি, অন্য লোকটি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, সাফারি সুট-পরা, সোফায় বসে তিনি একটি চুরুট ধরালেন।

কাকাবাবু একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই লোকটির দিকে। তারপর বললেন, "মাফ করবেন, এখানে চুরুট না খেলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?"

লোকটি তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে বললেন, "না, মানে, কেন বলুন তো! আপনার এখানে বুঝি..."

কাকাবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "আসলে ব্যাপার কী জানেন, আমি নিজে একসময় খুব চুরুট খেতাম। একসময় প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু চুরুট সম্পর্কে দুর্বলতাটা ছাড়তে পারিনি। সামনে কেউ চুরুট টানলে, সেই গন্ধটা নাকে এলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। কাজের কথায় মন বসাতে পারি না।"

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সামনের অ্যাশট্রেতে চুরুটটা নিভিয়ে দিয়ে বললেন, "না, না, থাক। আগে কাজের কথা হয়ে যাক।"

তিনি তাকালেন মাধব রাও-এর দিকে। অর্থাৎ কথাবার্তা মাধব রাও-ই চালাবেন।

মাধব রাও একটু ইতস্তত করে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, প্রথমেই আমি বলে রাখি, আমাদের প্রস্তাবটা শুনে আপনার একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু আপনি চট করে রেগে যাবেন না। আমাদের কথাটা আপনি একটু মন দিয়ে

শুনুন। তারপর ভাল মন্দ যা হয় আপনার মতামত জানাবেন। এর আগে আমি দু'একবার আপনার কাছে এসেছি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। কিছু কিছু ব্যাপারে সাহায্য চাইবার জন্য। কিন্তু এখন আমি রিটায়ার করেছি। সুতরাং এবারে আমি সরকারি পক্ষ থেকে আসিনি।"

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে মাথা নাড়লেন।

মাধব রাও আবার বললেন, আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁর একটু পরিচয় দিই। এঁর নাম অনন্ত পট্টনায়ক, ওড়িশার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং আমার বন্ধু। ওঁদের পরিবার খুব নামকরা পরিবার। সম্বলপুরে ওঁদের বাড়িতে বহু পুরনো মূর্তি ও ছবির সংগ্রহ আছে। আপনি যদি চান, আপনাকে সেখানে একবার নিয়ে গিয়ে সব দেখাতে চাই।"

মাধব রাও কথা বলছেন ইংরেজিতে। এবারে অনন্ত পট্টনায়ক ভাঙা বাংলায় বললেন, "আপনার জন্য সব সময় নেমন্তন্ন রইল। আপনি যদি চান তো আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যেতে পারি কলকাতা থেকে। এই সপ্তাহে যেতে পারবেন ?"

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "না, এক্ষুনি তো যাওয়া হবে না। পরে যদি কোনও সুযোগ হয় নিশ্চয়ই যাব।"

মাধব রাও এবারে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি কখনও মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলায় গেছেন ? ওদিকটা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, একবার গিয়েছিলাম, প্রায় বছর পনেরো আগে, তখন আমার দুটো পা-ই ভাল ছিল। অনেক ঘুরেছিলুম জঙ্গলে আর পাহাড়ে।"

মাধব রাও বললেন, "আপনি অবুঝমার পাহাড়ের দিকেও গিয়েছিলেন, যেখানে সহজে কেউ যেতে চায় না। ওখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আপনি কয়েকদিন ওদের মধ্যে ছিলেন।"

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "সে-কথা আপনি জানলেন কী করে ?"

"সেবার আপনার সঙ্গে পলাশ নন্দী বলে একটি ছেলে গিয়েছিল, দিল্লিতে সেই ছেলেটি কিছুদিন আমার আন্ডারে চাকরি করেছে, তার কাছ থেকে আপনার এই অভিযানের গল্প শুনেছি।"

"তা হলে আপনি জিজ্ঞেস করলেন কেন, আমি কখনও বস্তার জেলায় গেছি কি না ?"

মাধব রাও শুকনোভাবে হেসে ওঠে বললেন, "অনেকদিন আগে গিয়েছিলেন তো, আপনার মনে আছে কি না...তা ছাড়া এইভাবেই তো কথাবার্তা শুরু করতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এবারে আসল কাজের কথা হোক।"

মাধব রাও বললেন, "ওই বস্তার জেলায় ঝুংগি নামে একটা জায়গা আছে। সেটা জগদীশপুর থেকে একশো মাইল দূরে। সেখানে একজন আদিবাসী থাকে, তারা কিন্তু মারিয়া কিংবা মুরিয়া নয়, তারা আলাদা, তাদের নাম রোরো। এই রোরোদের মন্দিরে একটা মূর্তি অছে। কিন্তু সেখানে ওরকম কোনও মূর্তি থাকবার কথাই নয়। সেটা সূর্যমূর্তি। ভুবনেশ্বর টেম্পলের দেওয়ালে যেরকম একটি গামবুট-পরা পুরুষের মূর্তি আছে। অবিকল সেই রকম।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই মূর্তিটা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

মাধব রাও বললেন, "না, আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবে ছবি দেখেছি। কিছুদিন আগে পল হাউসমান নামে একজন বিদেশি ওই মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের নিয়ে একটি বই বার করেছেন, সেই বইতে ওই মন্দিরের ছবি। মূর্তির ছবি। রোরোদের গ্রামের ছবি সব আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য বইটা আমরা সঙ্গে এনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের গ্রামে কী মূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে আপনাদের এখানে আমার আছে আসার সম্পর্ক কী তা তো বুঝতে পারছি না?"

মাধব রাও ভুরু তুলে খুব আশ্চর্য হবার ভাব দেখিয়ে বললেন, "ওই রকম জায়গায় গামবুট-পরা সূর্যের মূর্তি কী করে গেল, সে কথা জানার জন্য আপনার কৌতূহল হচ্ছে না?"

কাকাবাবু বললেন, "তার চেয়েও বেশি কৌতূহল হচ্ছে আপনারা আমার কাছে কী চান তা জানবার জন্য!"

মাধব রাও এবারে অনন্ত পট্টনায়কের দিকে তাকালেন। তিনি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, ওই মূর্তিটা ছিল আমাদের বাড়ির সম্পত্তি। বেশ কিছু বছর আগে ওটা আমাদের বাড়ি থেকে চুরি গেছে। বাড়িরই কোনও কাজের লোক ওটা চুরি করছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। আমার বাবা তার ডায়রিতে এই মূর্তির কথা লিখে গেছেন। এতদিন ওই মূর্তিটার কোনও খোঁজ ছিল না। এখন পল হাউসমানের বইয়ের ছবি দেখে বোঝা গেল, আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিটিই ওখানে পৌঁছে গেছে কোনওভাবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওই মূর্তিটা আপনাদের বাড়িতে এসেছিল কীভাবে? তার কোনও রেকর্ড আছে?"

অনন্ত পট্টনায়ক বললেন, "না, তা নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওই রকম মূর্তি আদিবাসীদের পক্ষে বানানো সম্ভব নয়। ওরা নিজেরা এখন জুতো পরতেই

জানে না, ওরা কি গামবুট পরা কোনও দেবতার মূর্তি বানাতে পারে ? ওটা চোরাই মূর্তি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের বাড়ি থেকে মূর্তি চুরি গেছে পুলিশে খবর দিন। পুলিশ সেটা উদ্ধার করে দেবে।"

অনন্ত পট্টনায়ক বললেন, "কিন্তু ওই মূর্তিটা যে চুরি গেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। আমার ঠাকুরদার আমলে। তখন তো কিছু করা হয়নি। এতদিন পরে ও কথা বললে আর কে বিশ্বাস করবে ? তবে, মূর্তিটা আমাদেরই। ওরকম নীল পাথরের সূর্য মূর্তি আর কোথাও নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আমি মধ্যপ্রদেশের পুলিশের আই জি-র সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আদিবাসীদের গ্রাম থেকে ওই মূর্তি উদ্ধার করতে গেলে দাঙ্গা লেগে যাবে। ওরা যদি একবার খেপে যায়, তা হলে পুলিশকেও পরোয়া করে না।"

কাকাবাবু বললেন "সে তো ঠিকই বলেছেন তিনি।"

মাধব রাও বললেন, "সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি ওই সব আদিবাসীদের মধ্যে ঘুরেছেন। ওদের সঙ্গে থেকেছেন। ওই মূর্তিটা আদিবাসীদের গ্রামে কী করে গেল, সে রহস্য একমাত্র আপনিই সমাধান করতে পারেন।"

অনন্তবাবু বললেন, "আপনি যদি মূর্তিটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এজন্য আপনার খরচখরচা যা লাগবে, সব আমরা দিয়ে দেব তো বটেই। আমরা একলক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছি!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা নমস্কার। আপনারা এবারে আসুন। আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে।"

মাধব রাও বললেন, "এই রে, এই রে, আপনি রেগে যাচ্ছেন ? প্রথমেই তো বলেছি, আমাদের সব কথা শুনুন আগে..."

কাকাবাবু এবারে তীব্র স্বরে বললেন, "আপনাদের সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। আপনারা আমাকে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে একটা মূর্তি চুরি করতে বলছেন ? চোর হিসেবে আমার এমন সুনাম আছে, তা তো জানতুম না!"

মাধব রাও বললেন, "আরে, ছি ছি ছি, আপনি শুধু শুধু ভুল বুঝছেন আমাদের। আপনি নানারকম অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করেন, সেই জন্যই ভেবেছিলাম, আদিবাসীদের গ্রামে গামবুট-পরা একটি মানুষের মূর্তি কী করে গেল, সেই রহস্য সম্পর্কে আপনি কৌতূহলী হবেন। তারপর...ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে...ওদের ক্ষতিপূরণ...ওদের মন্দিরের জন্য আলাদা মূর্তি গড়িয়ে দিয়ে তারপর যদি আমাদের মূর্তিটা উদ্ধার করা যায়...আমার বন্ধু সেই কথাই

বলছিলেন ! আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি...

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। আমার সব কথা শোনা হয়ে গেছে। আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড !"

অনন্তবাবু বললেন, "শুনুন, ওই মূর্তিটা যে আমাদেরই পরিবারের সম্পত্তি, সে সম্পর্কে যদি একটা প্রমাণ আপনাকে এনে দেখাতে পারি ?"

কাকাবাবু তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন, "বললুম না, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাট অল। আমার সময়ের দাম আছে।"

এই সময় রঘু এসে হাজির হল তিন কাপ কফি নিয়ে।

তাতে কাকাবাবুর মেজাজ আরও চড়ে গেল। এত দেরি করে কফি আনবার কোনও মানে হয় ? এখন এই লোক দুটিকে কফি না খাইয়ে বিদায় করে দেওয়াটা অভদ্রতা। অথচ এই লোকদুটির সঙ্গে তাঁর আর এক মুহূর্তও সময় কাটাবার ইচ্ছে নেই।

মাধব রাও এবং অনন্ত পট্টনায়কও উঠে দাঁড়িয়েছেন। কাকাবাবু শুকনো গলায় বললেন, "কফিটা খেয়ে যান।

মাধব রাও হেসে বললেন, "ধন্যবাদ, এখন কফি খেতে গেলে গলায় বিষম লাগবে। আর একদিন এসে কফি খাব।"

অনন্ত পট্টনায়ক বললেন, "আমি কফি খাই না। মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এত রেগে গেলেন কেন বুঝলাম না। আপনার কাছে আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, আপনি তাতে রাজি হতে পারেন, নাও হতে পারেন। ব্যাস, এইটুকুই ! আপনি রাজি না হলে ফুরিয়ে গেল !"

কাকাবাবু অতিকষ্টে রাগ দমন করে বললেন, "আমি যদি রূঢ় ব্যবহার করে থাকি, সে জন্য মাপ চাইছি। এ-ধরনের কাজ আমি করি না। আপনারা অন্য কারও কাছে যান।"

লোক দুটি চলে যাওয়ার পরেও কাকাবাবু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর মাথাটা জ্বলছে। তিনি একটি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলেন, তাঁর মন বসল না।

একটু পরে স্নান করে, খেয়ে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। ফিরলেন অনেক রাতে।

কলেজ থেকে ফিরেই সন্তু দেখল, বারুইপুর থেকে পাঠানো সেই বাক্সটা বসবার ঘরেই পড়ে আছে। সে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিল। কাকাবাবু যখন ফিরলেন, তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে বারুইপুর থেকে একটি লোক আবার ঠিক ওই রকম একটি বাক্স নিয়ে এল !

আজ সন্তুর কলেজ ছুটি, আজ সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবে। অংশুমান চৌধুরী এসব কী অদ্ভুত জিনিস পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রলোকের

চোখের দৃষ্টি সেদিন সন্তুর ভাল লাগেনি। কাকাবাবুর ওপর খুব রাগ। উনি কাকাবাবুর কিছু একটা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই। অথচ ওঁর কথা সন্তুর মুখে শুনে কাকাবাবু একটুও পাত্তাই দিলেন না।

আজ যে বাক্সটা পাঠিয়েছেন, সেটার মধ্যেও প্রায় কিছুই নেই বলতে গেলে। চৌকো কাগজের বাক্সটা সুন্দরভাবে প্যাক করা, ওপরে কাকাবাবুর নাম লেখা। কিন্তু ভেতরে যে জিনিসটা রয়েছে, সেটা কেউ এরকম প্যাকেট করে পাঠাতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। একটুখানি আলুর তরকারি ! দু'তিন টুকরো আলু, তাতে মশলা মাখানো, কিন্তু ঝোল নেই, একেবারে শুকনো।

প্রথম দিন এল দু'তিনটে মানুষের চুল। তারপর এক চিমটে আলুর তরকারি। এর তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কালকের বাক্সটা দেখে কাকাবাবু কোনও মন্তব্যও করেননি, কিন্তু সন্তু যে এই ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না।

কাকাবাবু এখনও মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি। দরজার কলিং বেল শুনে সন্তু ছুটে গেল। খাকি প্যান্ট ও হাফ-শার্ট পরা একজন পিওন শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে রাজা চৌধুরী বাবুকা কোঠি হ্যায় ? সাহাব হ্যায় ঘর মে ?"

সন্তু বলল, "না, সাহেব আভি নেহি হ্যায়। আপকা কেয়া জরুরৎ হ্যায় ?"

লোকটি বলল, "হামারা সাহাব রায় চৌধুরী বাবুকো বুলায়া।"

সন্তু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপকা সাহাব কৌন হ্যায় ?"

লোকটি পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ইসমে লিখা হ্যায়। রায়চৌধুরীবাবু লৌটনেসে তুরন্ত ইধার যানে বলিয়ে ! বহুতই আর্জেন্ট হ্যায়।"

লোকটি কাগজটা দিয়ে চলে গেল। কাগজটি খুলে সন্তু আর-একপ্রস্থ অবাক হল। একটা সাধারণ হ্যান্ডবিল। পার্কস্ট্রিটের একটা কাপড়ের দোকানের নাম লেখা। বিজ্ঞাপন হিসেবে এরকম কাগজ রাস্তায় ছড়ানো হয়। ঠিকানার নীচে কেউ লাল কালির দাগ দিয়ে হাতে লিখে দিয়েছে ওয়ান পি. এম.।

সন্তুর চড়াত করে রাগ ধরে গেল। কাকাবাবুকে কেউ কখনও পিওন দিয়ে ডেকে পাঠায় না। কাকাবাবু সচরাচর কারও বাড়িতে যান না। কারও খুব দরকার থাকলে বাড়িতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কাকাবাবুর তো ডিটেকটিভগিরি করা পেশা নয়। চুরি-ডাকাতি বা খুন-জখমের কেস নিয়ে যারাই আসে, কাকাবাবু তাদের বলেন, আমার কাছে এসেছেন কেন, পুলিশের কাছে যান।

আর এই লোকটার এত সাহস, সাধারণ একটা হ্যান্ডবিল পাঠিয়ে সেই ঠিকানায় কাকাবাবুকে দেখা করতে বলেছে ? কে লোকটা ? এখনও দৌড়ে গেলে হয়তো ওই পিওনটিকে ধরা যায়। কিন্তু ও সম্ভবত কিছুই বলতে পারবে

না !

কাকাবাবু ফিরলেন একটু পরেই।

সন্তু প্রথমেই বলল, "কাকাবাবু, বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী কাল তোমাকে একটা বাক্স পাঠিয়েছেন, সেটা তুমি দ্যাখোনি ?"

কাকাবাবুর মুখখানা আজও থমথমে কোনও ব্যাপারে খুব চিন্তিত। গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি, ওর মধ্যে তো কিছু নেই। যা ছিল তুই বার করে নিয়েছিস ?"

"না তো। বাক্সটা ওই রকমভাবেই এসেছে। ওর মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পড়ে আছে। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।"

"চুল ?"

"হ্যাঁ, আজও একটা বাক্স এসেছে। তার মধ্যে যা আছে, সেটাও পাঠাবার কোনও মানে বুঝতে পারছি না।"

"আজ আবার কী এসেছে, দেখি ?"

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাক্সটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সেটার মধ্যে কয়েক পলক দেখলেন মাত্র। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, "ধ্যাত ? এ তো মনে হচ্ছে কোনও পাগলের কাণ্ড। ফেলে দে। এগুলো সব ফেলে দে !"

তারপর সন্তু একটু আগের হ্যান্ডবিলটার কথা বলল। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "এই দোকানে আমি কখনও যাইনি। চেনা কেউ পাঠায়নি। মনে হচ্ছে, কেউ কেউ আমাকে অকারণে বিরক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাতে তাদের কী লাভ কে জানে !"

"কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে একেবারেই চেনো না !"

"কিছুই তো মনে পড়ছে না। তা ওই সব বাক্স-টাক্স না পাঠিয়ে সে নিজে এসে দেখা করতেই তো পারে।"

"আমার বন্ধু জোজোকে ডাকব। ওর পিসেমশাই হয়, ও অনেক কিছু বলতে পারবে। তাতে তোমার মনে পড়ে যেতে পারে।"

"এরকম পাগলকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না এখন। তবু ঠিক আছে, ডাকিস তোর বন্ধুকে, শুনে দেখব !"

এরপর কাকাবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

সন্তু ঠিক করল, দুপুরবেলাতেই সে বেরিয়ে জোজোকে ডেকে আনবে। জোজো কাকাবাবুর সামনে কতরকম গুল ঝাড়তে পারে, সেটা দেখা যাক।

একটু বাদেই অরিন্দম এসে হাজির হল। সন্তু খুশি হয়ে বলল, "তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। চল। একটু পরে জোজোদের বাড়ি যাব। জোজোর সেই পিসেমশাই কী কাণ্ড করেছে জানিস। কাকাবাবুকে রোজ একটা করে বাক্স পাঠাচ্ছে।

অরিন্দম বলল, "কিসের বাক্স ?"

সন্তু ওকে খুলে বলল। বাক্স দুটো এনে দেখাল। অরিন্দম হেসে উঠে বলল, "আরে জোজোর পিসেকে দেখে আমি ভেবেছিলুম, দ্বিতীয় এক প্রোফেসর শঙ্কু। এখন দেখছি বোম্বাগড়ের রাজা। ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা! অতদূর থেকে লোক দিয়ে এত বড় একটা বাক্স ভরে পাঠাচ্ছে এঁটো দু' টুকরো আলুর দম। কেন বাবা, বেশি করে পাঠালেই পারত, আমরা খেয়ে নিতুম। আর এগুলো যে মানুষের চুল তুই কী করে বুঝলি, সন্তু? ভাল্লুকের লোমও তো হতে পারে!"

সন্তু বলল, "উনি জন্তুজানোয়ার সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? সেই জন্যই আমি বুঝে নিয়েছি মানুষের চুল।"

অরিন্দম বলল, "আমাদের বড় জামাইবাবু সায়েন্স কলেজে পড়ান। তাঁকে ওই নামটা বললুম, বড় জামাইবাবু বললেন তিনি ওই নাম জন্মে শোনেননি। তবে সেলফ-মেইড় সায়েন্টিস্ট হতে পারে। এরকম অনেক আছে। নিজের বাড়িতে কয়েকটা যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তারপর নিজেদের সায়েন্টিস্ট বলে প্রচার করে।"

"কাকাবাবুর ওপর এত রাগ কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। কাকাবাবুও কিছুই মনে করতে পারছেন না।"

হঠাৎ ওপর থেকে কাকাবাবু জোরে জোরে ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

অরিন্দম বলল, "তোকে কাকাবাবু ডাকছেন, যা শুনে আয়। আমি এখানে বসছি।"

সন্তু বলল, "তুইও চল না আমার সঙ্গে। কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

কাকাবাবু অরিন্দমকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এই-ই তোর বন্ধু জোজো নাকি?"

সন্তু বলল, "না, এর নাম অরিন্দম। এই অরিন্দমও আমাদের সঙ্গে বারুইপুরে গিয়েছিল।"

কাকাবাবুর মুখে এখন সেই গাম্ভীর্যের ভাবটা নেই। বরং ঠোঁট চাপা হাসি। তিনি বললেন, "ওই বারুইপুরের ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন আছে?"

সন্তু বলল, "তা তো ঠিক বলতে পারছি না। লক্ষ করিনি।"

"এ ভদ্রলোকের দেখছি সত্যিই মাথায় ছিট আছে। উনি আমায় এই যে এক-একটা বাক্স পাঠাচ্ছেন, এগুলো আসলে সাংকেতিক চিঠির একটা একটা টুকরো; বুঝলি! এরকম আরও পাঠাবেন। কিন্তু তার আর দরকার নেই, উনি কী বলতে চান আমি বুঝে গেছি। আমার সব মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আফগানিস্তানে তো নয়, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল পাঞ্জাব আর বেলুচিস্তানের সীমান্তে একটা ছোট জায়গায়। অনেকদিন আগেকার কথা। সেই জায়গার নাম ছিল কান্টালাপুরা। ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে

আমি বলে দিতুম যে আপনাকে আর কষ্ট করে চিঠি পাঠাতে হবে না।”

“কাকাবাবু, উনি চুল আর আলুর তরকারি পাঠিয়ে কী চিঠি লিখলেন?”

“তোদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমার আগেই ধরা উচিত ছিল, কিন্তু আমি মাথা ঘামাইনি। শোন্, বুঝিয়ে দিচ্ছি, চুলের ভাল বাংলা কী?”

“কেশ।”

“আর একটা আছে, কুন্তল। আর ওই যে আলুর তরকারিটুকু, ওটা কী জানিস, একটা শিঙাড়া ভাঙলে তার মধ্যে ঠিক ওইটুকু তরকারি দেখতে পাবি। ওকে বলে পুর। কচুরি, শিঙাড়া, পিঠে এই সবের মধ্যে নানারকম পুর দেওয়া থাকে না? তা হলে কী হলো, কুন্তলপুর। ওই যে কান্টালাপুরা জায়গাটার কথা বললুম, অনেকে বলে, ওই জায়গাটার আগেকার নাম ছিল কুন্তলপুর।”

অরিন্দম বলল, “শুধু ওই নামটা একটা কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন?”

“সেইজন্যই তো বলছি, ভদ্রলোকের মাথায় খানিকটা ছিট আছে। তবে লোক খারাপ নয়। একটু ছেলেমানুষ মতন, এই যা। তবে, সেবারে আমি ওর সঙ্গে খানিকটা খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলুম ঠিকই।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবু, কী হয়েছিল সেবারে?”

“সেটা আর তোদের শুনে দরকার নেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকেরা রেগে গিয়ে ভদ্রলোকের মাথার সব চুল কামিয়ে কী যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছিল, সেটা আমি চেষ্টা করেও আটকাতে পারিনি।”

“ওই জন্যই ওঁর মাথা জোড়া টাক। আর একটাও চুল গজায় না।”

“ভদ্রলোক যখন আমার ওপর এখনও খুব রেগে আছেন, তখন, আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে চাই। কিন্তু টেলিফোন না থাকলে মুশকিল। একটা চিঠি লিখলে তোরা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবি?”

“জোজোকে বললে দিয়ে আসতে পারে।”

“আচ্ছা তাই-ই লিখে দেব তা হলে।”

দুপুরবেলা সন্তু আর অরিন্দম গেল জোজোর বাড়িতে। দরজার বেল বাজাতেই দোতলার বারান্দায় জোজো এসে ওদের দেখল, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের চুপ করতে বলে ইশারায় জানাল যে সে নেমে আসছে।

অরিন্দম সন্তুর মুখের দিকে তাকাল, সন্তু বলল, “আমরা তো জোজোর নাম ধরে ডাকিনি, শুধু বেল বাজিয়েছি, তবু ও আমাদের চুপ করতে বলল কেন?”

অরিন্দম বলল, “সবাই যেরকম ব্যবহার করে, জোজোও তাই করবে, তুই এরকম আশা করিস কী করে?”

জোজো দরজা খুলে বাইরে এসে অতি সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে যেতে বন্ধুদেরও সঙ্গে ডাকল।

সন্তু আর অরিন্দম ওর দু'পাশে চলে এল, অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, “কী

ব্যাপার, দুপুরবেলা তোর বাড়ি থেকে বেরনো নিষেধ বুঝি ?"
জোজো ফিসফিস করে বলল, "না, না, তা নয়। আমাদের বাড়িতে এখন কে এসেছেন তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। বাবার সঙ্গে নিরিবিলিতে আলোচনা করছেন। গণ্ডগোল হলে বাবার ডিসটার্বেন্স হয়।"
অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "কে এসেছে রে, কে ?"
জোজো বলল, "সে নামটা বলা যাবে না ভাই। তা হলে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। উনি এসেছেন ছদ্মবেশে।"
"তোদের বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি টাড়ি তো দেখছি না।"
"তোদের মাথা খারাপ, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে স্পাইরা সব জেনে যাবে না ?"
"থাক বাবা, তা হলে নাম জেনে দরকার নেই।"
"তোরা হঠাৎ দুপুরবেলা এলি ? কী ব্যাপার ?"
সন্তু বলল, "তোকে অসময়ে এসে ডিসটার্ব করলুম, সে জন্য দুঃখিত। ব্যাপার কী জানিস, তোর পিসেমশাই আমাদের বাড়িতে দুটো চিঠি পাঠিয়েছেন..."
জোজো থমকে গিয়ে বলল, "চিঠি ? অসম্ভব ! আমার পিসেমশাই জীবনে কাউকে চিঠি লেখেন না। আমার বাবাকেই কক্ষনো চিঠি লেখেননি। আমার পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, উনিও চিঠি পেতেন না। উনি নাকি কলমও ছুঁতে চান না।"
অরিন্দম বলল, কেন, কলম তো কোনও জন্তু জানোয়ার নয় !"
জোজো বলল, "এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয় অরিন্দম। সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না। আমার পিসেমশাই তোদের বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন, মোট কথা এটা আমি বিশ্বাস করি না।"
সন্তু বলল, "উনি কলম দিয়ে কাগজে লিখে চিঠি পাঠাননি বটে, কিন্তু যা পাঠিয়েছেন তাকে চিঠিই বলা যায়। এখন কাকাবাবু একটা উত্তর দিতে চান। উনি অবশ্য হাতে লিখেই দেবেন, সেই চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবি ! কিংবা ঠিকানাটা বল পোস্ট করে দেব।"
জোজো আঙুল তুলে একটা জিপ গাড়ি দেখাল। একদম নতুন নীল রঙের জিপ। তার সামনের সিটে দু'জন লোক অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। যেন তাদের কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই।
অরিন্দম বলল, "তুই কি ভূতের মতন চারদিকে স্পাই দেখছিস নাকি ? স্পাই তোর কী করবে ?"
জোজো বলল, "আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে তোদের আড়ালে লুকোতে দে !"
জিপ গাড়ির লোক দু'জন এক সঙ্গে জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এল ওদের

দিকে।

॥ ৪ ॥

ঘুম থেকে ওঠার পর অংশুমান চৌধুরী প্রথমে খানিকক্ষণ গড়গড়া টানলেন। জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই জোর বৃষ্টি নামবে। অংশুমানের মুখে একটা খুশি-খুশি ভাব ফুটে উঠল। বৃষ্টি পড়লে তাঁর মেজাজ ভাল থাকে।

তিনি হাঁক দিলেন, "ভীমু ! ভীমু !"

বারান্দার দিকের দরজা খুলে একটি রোগা ছোটখাটো চেহারার লোক উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কিছু বলছেন ?"

অংশুমান হাতছানি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, একটু ভেতরে এসে বসো তো !"

লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বসল না, কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এই লোকটির চেহারা একসময় ছিল খুব গাঁট্টাগোট্টা, তখন এর নাম ছিল ভীমরঞ্জন ঘোষ। তারপর কী একটা অসুখে পড়ে রোগা টিংটিং-এ হয়ে গেছে। এখন আর ভীম নামটা মানায় না বলে অংশুমান ওকে ভীমু বলে ডাকেন।

অংশুমান গড়গড়ার নলে আবার টান দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ভীমু, ওই যে রাজা রায়চৌধুরী নামে লোকটা, যাকে সবাই আজকাল কাকাবাবু বলে ডাকে, তার ওপর তোমার দু'দিন ধরে ওয়াচ রাখতে বলেছিলুম। এবারে বলো, কী কী দেখলে।"

ভীমু ঘোষ পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "স্যার, ওই লোকটা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে বই পড়ে।

অংশুমান বললেন, "প্রথমেই রাত্তির দিয়ে শুরু করলে, বাবা ! তা তুমি কী করে জানলে ও রাত জেগে বই পড়ে ? তুমি কি ওই ঘরে ঢুকে দেখেছ ?"

ভীমু খুব লজ্জা পেয়ে বলল, "না, স্যার, ঘরে ঢুকে দেখিনি, তবে, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় রাত একটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে দেখেছি, ওই রাজা রায়চৌধুরীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।"

"আলো জ্বললেই যে বই পড়বে, তার কী কোনও মানে আছে ? ভাইপো'র সঙ্গে ক্যারাম খেলতে পারে ! যাক গে যাক, আর কী দেখলে ?"

'ভোরবেলা মর্নিংওয়াকে যায়।"

"অনেক রাত পর্যন্ত জাগে, আবার ভোরে হাওয়া খেতে বেরোয় ? সন্দেহজনক, খুবই সন্দেহজনক !"

"স্যার, ওই রাজা রায়চৌধুরী প্রতিদিন সকালে পার্কের একটা কোণের ছোট চায়ের দোকানে চা খায়।"

"এটা খুবই বোকামি করে। ইচ্ছে করলেই যে-কেউ ওর চায়ে একদিন বিষ মিশিয়ে দিতে পারে, তাই না ?"

"দেব স্যার ; দেব ? আমি কালই ওকে খতম করে দিতে পারি।"

ভীমুর চোখ-মুখ উত্তেজিত হয়ে উঠল। যেন এতক্ষণে সে একটা সত্যিকারের কাজের কথা শুনেছে।

অংশুমান হাসতে হাসতে বললেন, "আরে না, না। তোমাকে তো আগেই বলে দিয়েছি, ওই রাজা রায়চৌধুরীর গায়ে আঁচড়টি না লাগে, তা দেখবে ! রাজা রায়চৌধুরী বেঁচে না থাকলে আমি আমার অপমানের শোধ নেব কী করে ?"

ভীমু বলল, "আপনি যে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার কথা বললেন, স্যার ?"

"আমি বিষ মেশানোর কথা বলিনি। বললুম, অন্য যে-কেউ বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। সেরকম যাতে কেউ না দেয়, তুমি দেখবে। তারপর বলো ?"

"বইয়ের দোকানে গিয়ে খালি ম্যাপ কেনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েও ম্যাপ দেখে।"

"হুঁ, তারপর ?"

"ক্রাচ নিয়ে হাঁটে, ইচ্ছে করলে জোরে হাঁটতে পারে। কিন্তু দৌড়তে পারে না।"

"এটা তুমি ভারী নতুন কথা বললে ! ক্রাচ বগলে নিয়ে কেউ দৌড়তে পারে নাকি ? ক্রাচ কি রন্-পা ? আর কী আছে বলো !"

"আর কিছু নেই।"

"ভীমু, এ কাজে দেখছি তোমাকে রিটায়ার করিয়ে দিতে হবে। দু'দিন ঘুরে তুমি মোটে এই খবর জোগাড় করলে ? ওদের বাড়িতে কুকুর আছে কি না খোঁজ নিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, স্যার, কুকুর আছে। ওই ভাইপোটার পোষা। সেই কুকুরের নাম রকুকু।'

"এই খবরটাই তুমি এতক্ষণ বলোনি ? এই জন্যই তো আমি নিজে ওখানে যেতে পারব না। কী ঝামেলা বলো তো ? আচ্ছা, সন্ধের দিকে রায়চৌধুরী কোথায় যায়, তা খবর নিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, স্যার, দু'দিনই দেখলাম, সন্ধেবেলা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরোচ্ছেন। তারপর হেঁটে-হেঁটে ময়দানের দিকে যান।"

"বাঃ বাঃ ! খুব খবর। এটা ভাল খবর। ভীমু, গাড়ি বার করতে বলো। আজ আমি বেরোব। প্রায় দশদিন বোধহয় বাড়ির বাইরে যাইনি, তাই না ?"

"বড় জোর বৃষ্টি নেমেছে।"

"সেই জন্যই তো। যত বৃষ্টি, তত ভাল। তুমি তৈরি হয়ে গাড়িতে বসো। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে নীচে নামছি।"

ভীমু বেরিয়ে যেতেই অংশুমান ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটা ছোট্ট আলমারি খুলে বার করলেন নকল দাড়ি-গোঁফ, পরচুল। সেগুলো যত্ন করে লাগিয়ে মুখ দেখলেন আয়নায়। এখন তাঁর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে, বয়েসও মনে হচ্ছে

অনেক কম।

পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে, হাতে একটা রূপো-বাঁধানো ছড়ি নিলেন, পায়ের জুতোটা কাপড়ের।

অংশুমানের গাড়িটা আলাদা ধরনের। সমস্ত কাঁচে সবুজ রং করা। ভেতরে বসলে বাইরের রাস্তার কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি চলার সময় সমস্ত কাঁচ বন্ধ থাকে, যাতে রাস্তার কোনও কুকুর-বেড়াল দেখতে না হয়।

গাড়ির ড্রাইভারের নাম গুঙ্গা। সে আবার বোবা। তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। বাচ্চা বয়েসে এই ছেলেটা রেল-স্টেশনে ভিক্ষে করত। অংশুমান ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে মানুষ করেছেন। তারপর ও লেখাপড়া শিখতে পারবে না বুঝে ওকে গাড়ির ড্রাইভারি শিখিয়েছেন। ভাল খাওয়া-দাওয়া করে ছেলেটার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।

গাড়িটা এসে থামল চিড়িয়াখানার সামনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে আজ আর একটাও গাড়ি নেই। চিড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও লোকজনও দেখা যাচ্ছে না।

অংশুমান ঘড়ি দেখে বললেন, "সওয়া-সাতটা। রোজ ক'টার সময় তুমি রাজা রায়চৌধুরীকে বেরোতে দেখেছ?"

ভীমু বলল, "সাড়ে সাতটা থেকে আটটা।"

"তাহলে অপেক্ষা করে দেখা যাক। যদি এই বৃষ্টির জন্য আজ আগেই চলে যায়?"

"স্যার, বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে।"

"তা ঠিক।"

অংশুমান একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

মিনিট পনেরো বাদে বৃষ্টি একটু ধরেই এল। একেবারে থামল না, টিপিটিপি পড়ে চলল।

একটু বাদে দেখা গেল, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বড় গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। তিনি ছাতা ব্যবহার করেন না। একটা রেইন কোট গায়ে দিয়েছেন, মাথায় টুপি। তিনি কিছু চিন্তা করতে করতে আপনমনে আসছেন।

অংশুমান গুঙ্গার পিঠে চাপড় দিয়ে একটা ইঙ্গিত করলেন। গুঙ্গা বোবা বলে কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু সামান্য ইশারা ও চমৎকার বোঝে।

সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ঝট করে একটা ইউ টার্ন নিল। কাকাবাবু তখনও অনেক দূরে। গাড়িটা কাকাবাবুকে ছাড়িয়ে চলে গেল। অংশুমান আবার ইঙ্গিত করে গুঙ্গাকে থামতে বললেন। তিনি চান গাড়িটা কাকাবাবুর পেছন দিক দিয়ে আসবে।

কাকাবাবু চিড়িয়াখানার কাছে এসে একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকালেন। ট্যাক্সি পাওয়ার আশা নেই। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত হেঁটেই যাবেন

ঠিক করলেন।

তিনি ব্রিজের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। মাথায় ফেট্টি বাঁধা দু'জন গুণ্ডা চেহারার লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। একজনের হাতে ভোজালি, অন্য জনের হাতে রিভলভার। কাকাবাবু বাধা দেওয়ার কোনও সময় পেলেন না, তারা কাকাবাবুর দু'হাত চেপে ধরে টেনে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

অংশুমান গাড়ির মধ্যে বসে, এই দৃশ্য দেখে অবাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভীমু, এসব কী!"

ভীমু বলল, "জানি না তো, স্যার। অন্য পার্টি!"

অংশুমান তখন গুঙ্গার পিঠে বড়-বড় দুটো চাপড় মারলেন। গুঙ্গা তখনি গাড়িখানা ফুলস্পীডে চালিয়ে একেবারে ওদের পাশে এসে ঘ্যাঁচাক করে ব্রেক কষল।

অংশুমান সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে হাতের ছড়িটা বন্দুকের মতন তুলে বললেন, "এক সঙ্গে দু'টা গুলি বেরোবে। কে কে মরতে চাও?"

কাকাবাবুকে যে দু'জন ধরে ছিল তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। লড়াই করার চেষ্টা না করে তারা দৌড় মারল ব্রিজের তলার দিকে।

অংশুমান কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? একী, আপনি মিঃ রাজা রায়চৌধুরী না?"

কাকাবাবুর মাথার টুপিটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। তিনি সেটা তুলে নিয়ে হেসে বললেন, "কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমি খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছি মনে হচ্ছে! একদল আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আবার ঠিক সেই মুহূর্তেই এক দল এসে পড়ল আমাকে রক্ষা করতে! এ যে সিনেমার মতন ঘটনা!"

অংশুমান বললেন, "আপনাকে তো আগে চিনতে পারিনি। হঠাৎ দেখলুম দুটো গুণ্ডা এসে রাস্তায় একজন লোককে চেপে ধরল। তাই তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালিয়ে বাধা দিতে এলাম।

কাকাবাবু অংশুমানের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ করলেন। চিনতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আজকাল তো অন্যের বিপদ দেখলেও কেউ সাহায্য করতে আসে না। আপনি দেখছি ব্যতিক্রম। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আমাকে চিনলেন কী করে!"

অংশুমান বললেন, "কাছে এসে চিনলাম। আপনার ছবি দেখেছি। দূর থেকেও আপনাকে দেখেছি কয়েকবার। আপনি অবশ্য আমায় চিনবেন না। আমার নাম রতনমণি ঘোষ দস্তিদার। আমি কাগজের ব্যবসা করি। আসুন, আপনি গাড়িতে উঠে আসুন!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন?"

"আপনি যেদিকে যাবেন সেইখানেই পৌঁছে দেব।"

"বাঃ, এতো চমৎকার প্রস্তাব। ভাগ্যিস ওই গুণ্ডা দুটো এসে পড়েছিল, তাই আপনার গাড়ির লিফ্‌ট পেলাম। গুণ্ডা দুটোকেই আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।"

কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। অংশুমান আগে বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে। এবারে ভীমুকে সেই জায়গায় বসিয়ে তিনি এলেন পেছনে। তারপর বললেন, "আপনার মতন মানুষ, আপনার অনেক শত্রু। আপনি এভাবে একা একা সন্ধের পর যাতায়াত করেন ? এটা ঠিক নয়।"

কাকাবাবু জোরে জোরে হেসে বললেন, "আমার জীবনটা খুব দামি হয়ে গেছে নাকি ?"

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু বললেন, "দুটো রাস্তার গুণ্ডা আমার ওপর হামলা করতে এল কেন ? আমার কাছে তো দামি কোনও জিনিস নেই, টাকা-পয়সাও বিশেষ নেই। কেউ ওদের ভাড়া করে পাঠিয়েছে, কী বলেন ?"

অংশুমান বললেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

"আপনার কাগজের দোকান না মিল ?"

"মিল।"

"কোথায় আপনার মিল ?"

"এই ইয়ে কাঁচড়াপাড়ায় !"

কাকাবাবু হেসে অংশুমানের দিকে ফিরে বললেন, "আমার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাতে আমি লোকের মিথ্যে কথা শুনে চট করে ধরে ফেলতে পারি। কাঁচড়াপাড়ায় কোনও কাগজের মিল নেই। কস্মিনকালেও আপনার কাগজের ব্যবসা ছিল না। আপনার নামও রতনমণি ঘোষ দস্তিদার নয়। এবারে বলুন তো সত্যি করে। আপনি কে ?"

গাড়িটা বারুইপুরের দিকে গেল না। অংশুমান মাঝে মাঝে গুঙ্গার ডান কাঁধ আর বাঁ কাঁধ চাপড়াতে লাগল, সেই অনুযায়ী সে ডান দিকে বা বাঁ দিকে ঘোরাতে লাগল গাড়িটা। কাকাবাবু বললেন, "আমাকে বাড়িতে নামানোর ইচ্ছে নেই আপনার ? একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কোথায় যাচ্ছি ?"

কাকাবাবু অংশুমানের আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, প্রথম রাউন্ডে আপনি জিতলেন। আপনি ধরে ফেলেছেন যে আমি কাগজের ব্যবসায়ী রতনমণি ঘোষ দস্তিদার নই। আমি কে তা একটু পরেই জানবেন।"

তারপর অংশুমান মাথা হেলান দিয়ে চুপ করে ছিলেন খানিকক্ষণ।

এবারে কাকাবাবুর প্রশ্ন শুনে বললেন, "আপনার বাড়ি কোথায়, তা আমি জানি। আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার বাড়ির খোঁজ পাওয়া তো শক্ত নয়। তবে মুশকিল হচ্ছে কী, আপনার ভাইপো বাড়িতে কুকুর পোষে।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, আমার ভাইপো কুকুর পোষে, তাতে আপনার মুশকিলের কী হল ? ও, আপনি কুকুর পছন্দ করেন না, তার মানে...তার মানে...আপনি বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী...যিনি জন্তু জানোয়ারদের ঘৃণা করেন ?"

অংশুমান বললেন, "হ্যাঁ, এখন বারুইপুরে থাকি বটে, কিন্তু আপনি এর মধ্যে আমার চিঠি পাননি ?"

"আপনার চিঠি ? কুন্তলপুর, মানে কান্ট্রালা পুরা ?"

"মনে আছে, মিঃ রায়চৌধুরী ?"

"মনে ছিল না। আপনার ওই রহস্যময় বাক্স দুটি পাওয়ার পর সব মনে পড়ে গেল। সেই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, অংশুবাবু !"

"শুধু দুঃখিত বললেই চুকে গেল ? তাতেই আমি সব ভুলে যাব ?"

"তা হলে এতদিন পরে আপনি আমায় কোনও শাস্তি দিতে চান ?"

অংশুমান ভীমুর দিকে তাকালেন, সে এমনভাবে হাঁ করে আছে যে, মনে হয় সে কান দিয়ে শোনে না, মুখ দিয়ে শোনে।

অংশুমান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "মুখ বন্ধ কর।"

সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে অন্যদিকে তাকাল।

অংশুমান আবার কাকাবাবুকে বললেন, "আমার ড্রাইভার কানে শুনতে পায় না, আবার আমার এই অ্যাসিস্টান্টটি সব কথা শুনতে পায় বটে কিন্তু সব কথার মানে বোঝে না। আপনি একরকম বলবেন, ও অন্যরকম বুঝবে। সেইজন্য আমি ওর সামনে সবরকম কথা আলোচনা করতে চাই না। কোথায় নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যায় তাই ভাবছি।"

কাকাবাবু বললেন, "এই ময়দানেই তো কত ফাঁকা জায়গা। একটা কোথাও গাড়ি থামিয়ে কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।"

অংশুমান নাক কুঁচকে বললেন, "এই ময়দানে ! এখানে বড্ড গোবরের গন্ধ !"

"এতবড় ময়দান, বৃষ্টি পড়ছে...এখানে আপনি গোবরের গন্ধ পাচ্ছেন ?"

"কত গোরু-ঘোড়া-ভেড়া এখানে চরে বেড়ায় না ; ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে।"

"তা হলে কোথায় যেতে চান, বলুন, আমি আপনাকে একঘন্টার বেশি সময় দিতে পারব না কিন্তু।"

"মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এখন আপনি আমার গাড়িতে বসে আছেন। এ-গাড়ি থেকে কখন নামবেন, সেটা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে না, কী বলেন !"

"অন্যের ইচ্ছেতে গাড়ি করে ঘুরতে আমার একটুও ভাল লাগে না। আপনি আপনার গাড়িতে তুলেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। এখন আমি বৃষ্টির মধ্যেও হেঁটে

যেতে রাজি আছি। গাড়িটা থামাতে বলুন।"

"আরে আরে, আপনি জোর করে নামতে চান নাকি? আমার হাতে যে ছড়িটা দেখছেন, এটা একটা সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র। আপনার কাছে বন্দুক-পিস্তল থাকলেও কোনও লাভ নেই।"

কাকাবাবু কপাল কুঁচকে বললেন, "আমি সব সময় বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরব কেন? আমি কি চোর-ডাকাত নাকি? আপনিই বা আমাকে এরকম ভয় দেখাচ্ছেন কেন? এটা কি আপনার উচিত হচ্ছে?"

অংশুমান বললেন, "ঠিক আছে, চলুন, গঙ্গার ধারে যাওয়া যাক। এত বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে ওখানে কেউ এখন থাকবে না আশা করি।"

তিনি গুঙ্গার কাঁধে আবার চাপড় মারলেন।

আউটরাম ঘাট পেরিয়ে একটা জায়গায় গাড়িটা থামল। এখনও বেশ মাঝারি-জোরে বৃষ্টি পড়ছে। যারা রোজ এখানে বেড়াতে আসে, তারা কেউ নেই। জায়গাটা বেশ অন্ধকার মতন।

গাড়ির পেছন থেকে একটা ছাতা নিয়ে অংশুমান বললেন, "আপনি বসুন, আগে আমি ভাল করে দেখে নিই।"

দরজা খুলে তিনি নামতে গিয়েই বিকৃত গলায় চিৎকার করে ডাকলেন, "ভীমু! ভীমু!"

গাড়ি যেখানে থেমেছে, তার খুব কাছেই একটা কদমগাছের নীচে একটা কুকুর চুপচাপ বসে আছে।

ভীমু গাড়ি থেকে নেমে হুশ হুশ করে ছুটে গেল। সে কুকুর বেচারা বুঝলই না সে কী দোষ করেছে। সে ল্যাজ তুলে দৌড়ল।

ভীমু এদিক-ওদিক দেখে এসে বলল, "আর কিছু নেই, স্যার।"

অংশুমান কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তাঁর শরীর কাঁপছে। কুকুর দেখলে তাঁর এমন অবস্থা হয়। এমন মানুষকে তো জব্দ করা খুব সহজ!

একটুবাদে অংশুমান নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আর কিছু নেই, ঠিক দেখেছিস?"

ভীমু বলল, "হ্যাঁ স্যার!"

"আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী, আমরা গঙ্গার ধারে দাঁড়াই।"

রেল লাইন পেরিয়ে দু'জনে এলেন গঙ্গার ধারের রেলিং-এর কাছে। অংশুমান ভীমু আর গুঙ্গাকে নির্দেশ দিলেন খানিকটা দূরে দূরে দু'পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতে।

কাকাবাবুর ছাতার দরকার নেই। তাঁর গায়ে রেইন কোট, মাথায় টুপি।

অংশুমান ছাতা মাথায় দিয়ে কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, "কান্টালাপুরে আপনি আমায় যে অপমান করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নেওয়ার মতো আপনাকে আমি এক্ষুনি মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারি, বুঝলেন?

আপনাকে মেরে লাশটা জলে ফেলে দেব, ভাসতে-ভাসতে সেটা বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে যাবে, কেউ কোনওদিন আপনার খোঁজ পাবে না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এই ভয় দেখাবার জন্য আপনি আমাকে বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গার ধারে টেনে আনলেন ? আমাকে মেরে ফেলার ভয় এ-পর্যন্ত কত লোক দেখিয়েছে, কেউ কিন্তু এখনও মারতে পারেনি।"

অংশুমানও কাষ্ঠহাসি দিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে যে অস্ত্র আছে, সেটা আমার নিজের তৈরি। সেটা ব্যবহার করলে আপনার মুণ্ডুটা এই মুহূর্তে ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করব না। কেন জানেন ? কারণ আমি খুনি নই। আমি একজন বৈজ্ঞানিক। আমি মানুষের ক্ষতি করি না। উপকার করি। কান্টালাপুরে আপনি আমায় যে অপমান করেছিলেন..."

"শুনুন, অংশুমানবাবু কান্টালাপুরে সেবার আমি একটা সরকারি কাজে গিয়েছিলাম। আমাকে সেখানে অনেকে বলল, সেখানে একজন এমন অদ্ভুত লোক আছে যে, জলকে মদ করে দিতে পারে, লোহাকে সোনা করে দিতে পারে, ফুলকে প্রজাপতি বানিয়ে দেয়...সেই লোকটা একটা গুহার মধ্যে থাকে। শুনে আমার কৌতূহল হল। প্রথমে ভাবলুম, কোনও সাধুটাধু হবে বোধহয়। কিন্তু আপনি এমন একটা অদ্ভুত পোশাক পরে ছিলেন, তার ওপর আবার সেই গুহার মধ্যে অনেকরকম যন্ত্রপাতি...আপনাকে দেখে তো আমি বাঙালি বা ভারতীয় বলে চিনতে পারিনি। মনে হয়েছিল একটা বুজরুক। সেই লোকটা সাধারণ ম্যাজিক দেখিয়ে লোকদের ঠকাচ্ছে !"

"ঠকাচ্ছে মানে, আমি কি কারও কাছ থেকে পয়সা নিতাম ? ওখানকার লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করা আমার দরকার ছিল। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল ওই গুহাটা ব্যবহার করা। ওই গুহাতে অন্য গ্রহ থেকে কয়েকটা বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছিল, তাদের ফেলে যাওয়া একটা যন্ত্র আমি পেয়েছিলাম। ব্যাপারটা খুব গোপন রাখার জন্য..."

"অন্য গ্রহের প্রাণীর ব্যাপার আমি কিছু বুঝি না। আমি এখনও পৃথিবীর মানুষদের বোঝবার চেষ্টা করি। আমার ধারণা হয়েছিল, মিথ্যে কথা বলে লোকজনদের ঠকাচ্ছেন। লোহাকে সোনা করা, ফুলকে প্রজাপতি করা, এসব তো অতি সাধারণ ম্যাজিক।"

"যারা ম্যাজিক দেখায় তারা বুঝি লোককে ঠকায় ? তারা তো লোকদের আনন্দ দেয়।"

"কিন্তু তারা পরে বলে দেয়, এই সবই ম্যাজিক। মিথ্যে অন্য কথা বলে না। যাই হোক, আমি হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। অত লোকজনের সামনে আপনার ম্যাজিক ফাঁস করে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাতে লোকজন যে অত খেপে উঠবে, আপনার মাথা ন্যাড়া করে দেবে, তা আমি বুঝতে পারিনি।"

"তারপর থেকে আমার মাথায় চুল গজায়নি !"

"সেজন্য আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত !"

"আপনি দুঃখিত বলেই আমার অপমান চুকে গেল ? বাঃ, বাঃ।"

কাকাবাবু এবারে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। একটা হাতের ঝটকায় অংশুমানের ছাতাটা ফেলে দিয়ে তারপর দু'হাতে তার ঘাড় চেপে ধরে একটা ঝটকা মারলেন। অংশুমানের অতবড় লম্বা শরীরটা শূন্যে উল্টে গেল। কাকাবাবু তাঁকে রেলিং-এর ওপাশে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে ধরে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বললেন, "কেউ আমার দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখালে তার ওপর আমি একটু না একটু প্রতিশোধ না নিয়ে পারি না। এটা আমার একটা প্রতিজ্ঞা বলতে পারেন, এখন আপনাকে নীচের কাদার মধ্যে ফেলে দেব।"

অংশুমানের ওই অবস্থা দেখে দূর থেকে ছুটে এল ভিমু আর গুঙ্গা।

কাকাবাবু আবার আর এক হ্যাঁচকা টানে অংশুমানকে রেলিংয়ের পাশে ফিরিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

অংশুমানের হাত থেকে খসে পড়া ছড়িটা তিনি নিজে তুলে নিয়ে ওদের বললেন, "যাও, যাও, ঠিক আছে। যেখানে ছিলে, সেখানে যাও।"

অংশুমান দু'তিন মিনিট কোনও কথা বলতে পারলেন না। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে ভীমু আর গুঙ্গা সরে গেল দূরে।

কাকাবাবু অংশুমানের পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "কী হল, এত ঘাবড়ে গেলেন কেন ? অন্যদের মেরে ফেলার ভয় দেখাতে পারেন, আর নিজে এইটুকু বিপদে পড়েই কাবু ! যান, শোধবোধ ! আপনার ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। আপনিও রাগ মুছে ফেলুন !"

অংশুমান দু'হাতে মুখ ঢেকে দিলেন। এবার হাত সরিয়ে বলনেল, "মিঃ রায়চৌধুরী, সেই কান্টালার ঘটনার পর আমিও প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, আপনার ওপর কোনও প্রতিশোধ না নিলে আমার জীবনে কোনও শান্তি আসবে না। আমার সে প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হবে ?"

"ঠিক আছে, কী প্রতিশোধ নিতে চান, বলুন ? আমার ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট নয় ?"

"আপনি একা-একা আমার কাছে ক্ষমা চাইলে কী হবে। সবার সামনে আমার কাছে আপনাকে অপমান সইতে হবে। কিংবা কোনও প্রতিযোগিতায় আপনি হেরে যাবেন, তারপর সকলের সামনে সেটা স্বীকার করবেন।"

"কীরকম প্রতিযোগিতা বলুন ; সেটা ঠিক করেছেন ?"

"মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের এক গ্রামে টারকোয়াজের মূর্তি আছে। সেটা উদ্ধার করতে আপনিও যাবেন, আমিও যাব। দেখা যাবে, কে আগে সেটা উদ্ধার করতে পারে। আপনি, না আমি !"

কাকাবাবু প্রথমে কপাল কুঁচকে রইলেন। তারপর রাগ করার বদলে হেসে ফেলে বললেন, "আপনিই ওতে জিতবেন, আমি হার স্বীকার করছি। ওই প্রতিযোগিতাতে আমি নামছি না!"

অংশুমান দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন; "তা বললে তো আমি মানছি না। আপনাকে যেতেই হবে। না গিয়ে আপনার উপায় নেই!"

॥ ৫ ॥

জিপগাড়ির লোকদুটোকে দেখে জোজো দৌড় লাগালেও সন্তু দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়। অরিন্দম সন্তুর হাত ধরে টানতে লাগল। সন্তু একঝলক তাকিয়ে দেখল, জোজো নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে চলে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে।

লোক দুটো জোজোকেও তাড়া করে গেল না। সন্তুদের সামনে এল না, ডান দিকে একটু বেঁকে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে নাচতে লাগল দু'হাত তুলে।

সন্তু হো হো করে হেসে উঠল।

জোজো যাদের স্পাই ভেবে ভয় পেয়ে পালাল, সেই লোক দু'জন আসলে একটা ঘুড়ি ধরবার জন্য লাফাচ্ছে। একটা কালো রঙের চাঁদিয়াল ঘুড়ি কেটে এসেছে। দুলতে-দুলতে নামছে নীচের দিকে।

সন্তুরও ঘুড়ি ওড়াবার খুব শখ। এই বিশ্বকর্মা পূজার দিনেও সে সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে চোখ লাল করেছে। রাস্তায় চলতে চলতে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ চলতে দেখলে তার চোখ আটকে যায়। কিন্তু এরকম বয়স্ক দু'জন লোককে ঘুড়ি ধরার জন্য রাস্তার মাঝখানে লাফাতে সে আগে কখনও দেখেনি।

আরও দু'তিনটে বাচ্চাকাচ্চা ছেলেও সেখানে ছুটে গেছে ঘুড়িটা ধরার লোভে। তাদের হাতে কঞ্চি ও আঁকশি। সেইরকম একটা ছেলের আঁকশিই প্রথম ঘুড়িটাকে ছোঁয়, কিন্তু জিপগাড়ির লোকদুটির মধ্যে যে বেশি লম্বা সে লাফিয়ে ঘুড়িটাকে ধরে নেয়।

তারপর ওদের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেদের ঝগড়া লেগে যায়।

সন্তুর আবার হাসি পায়। জোজো এই লোকদুটোকে স্পাই ভেবেছিল!

অরিন্দমকে সে বলল, "দেখলি জোজোর কাণ্ডটা?"

জোজো রাস্তার মোড়ে চলে গিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে। এবারে ওদের দেখে হাতছানি দিল।

সন্তু অরিন্দমকে আবার বলল, "জোজোর এই সব কায়দার মানে কী, বুঝলি তো? ও আমাদের ওর বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না।"

অরিন্দম বলল, "তুই ঠিক বলেছিস, সন্তু। এর আগে আমি দু'তিনবার জোজোর কাছে এসেছি। প্রত্যেকবারই জোজো আমার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। কেন এরকম করে বল্ তো?"

সন্তু বলল, "তার মানে, জোজো চায় না ওর বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাক। ও যত গুলটুল মেরেছে, সব তা হলে ধরা পড়ে যাবে।"

অরিন্দম মোড়ের মাথায় এসে বলল, "এই জোজো, তুই আমাদের স্পাই-এর মুখে ফেলে পালিয়ে এলি ?"

জোজো চোখ বড়বড় করে বলল, "চুপ ! আস্তে। সাবধানের মার নেই। বুঝলি ? স্পাইরা কখন কী সেজে থাকে, কিছু বলা যায় না। তোরা সঙ্গে আছিস বলেই ওই লোকদুটো অন্যরকম হয়ে গেল। নইলে আমি ডেফিনিট যে, ওরা আমাদের বাড়ির ওপরেই নজর রাখছে !

অরিন্দম বলল, "তা বলে দিনের বেলা তোর বাড়ির সামনে থেকে তোকে ধরে নিয়ে যাবে ? তুই কি বাচ্চা, না এটা মগের মুল্লুক ?"

জোজোদের পাশের বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে জিপ গাড়িতে উঠলেন। তারপরেই গাড়িটা স্টার্ট দিল।

সন্তু বলল, "ওই যে চলে গেল স্পাইদের গাড়ি !"

জোজো তখনও বলল, "তোরা আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ? আমাদের ওই পাশের বাড়িটা কী ডেঞ্জারাস না, জানিস না তো ! প্রত্যেক মাসে ওই বাড়িতে ভাড়াটে পাল্টায়। কেন জানিস, আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখবার জন্য ! একদিন দেখি যে, ওরা ওদের ছাদের ওপর একটা র‍্যাডার বসাচ্ছে। আমাদের বাড়ির ছবিটবি সব তুলে নেবে ভেবেছে !"

সন্তু বলল, "র‍্যাডার ? পাশের বাড়ির ছবি তোলার জন্য র‍্যাডার লাগে বুঝি ?"

জোজো বলল, "আজকাল সায়েন্সের কতরকম উন্নতি হয়েছে তোরা জানিস না ! অন্ধকারে ছবি তোলা যায়। শুধু শব্দ শুনে তা থেকে ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। রেডিও ফোটো কী ভাবে আসে ? সাউন্ডে আসে।"

অরিন্দম বলল, "তা হলে তোদের বাড়ির সব ছবি পাশের বাড়ি থেকে তুলে নিল ! তুই গিয়ে কয়েকখানা ছবি চাইলেই পারিস।"

জোজো বলল, "আমাদের সঙ্গে অত সস্তায় বাজিমাত করা যায় না। বারুইপুরের পিসেমশাইকে খবরটা দিতেই উনি একখানা অ্যান্টির‍্যাডার যন্ত্র ফিট করে দিলেন আমাদের বাড়ির কাছে। ব্যস, এখন ওদের সব ছবি ভুল উঠবে।"

সন্তু বলল, "যাক্ গে, এসব কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আসলে যে কাজের জন্য এসেছি, তোর বারুইপুরের পিসেমশাই-এর ঠিকানাটা লিখে দে।"

জোজোর কাছে কাগজ নেই, অরিন্দমের পকেটের একটা নোট বই থেকে পাতা ছিঁড়ে জোজো লিখে দিল ঠিকানাটা।

তারপর ফিসফিস করে বলল, "এটা খুব সিক্রেট। আর কাউকে

দেখাসনি !”

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনেই হেসে ফেলল আবার। ওরা বারুইপুরে অংশুমান চৌধুরীর বাড়ি দেখে এসেছে। ঠিকানাটা অতি সাধারণ চৌধুরী লজ, বারুইপুর, এটা এমন কী গোপন ব্যাপার হতে পারে।

সন্তু বলল, “ঠিক আছে, আর কাউকে বলব না। এবারে যাই।”

জোজো বলল, “তোরা এই দুপুর রোদ্দুরে এসেছিস, চল, তোদের কপিলের শরবত খাওয়াই। আমাদের পাড়ার এই শরবত ওয়ার্ল্ড ফেমাস। পেলে যখন কলকাতায় ফুটবল খেলতে এসেছিল, তখন তাকে এই শরবত খাওয়ানো হয়েছিল। মস্ত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।”

সন্তুদের বাড়িতে তার কোনও বন্ধু এলে সন্তুর মা-ই শরবত বানিয়ে দেন কিংবা অন্য খাবারটাবার দেন। কিন্তু জোজোর ব্যাপারই আলাদা। সে বন্ধুদের খাওয়াতে নিয়ে এল একটা দোকানে।

দোকানটি তেমন বড় নয়, সেরকম সাজানো-গোছানোও নয়। দেওয়ালে ঝুল-কালি জমে আছে। কাউন্টারে যিনি বসে আছেন তাঁর খালি গা। দেওয়ালে একটি মা-কালীর ছবি আর একটি লম্বা তালগাছের।

শরবত অবশ্য খেতে মন্দ না।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, “পেলের সার্টিফিকেটটা কোথায় রে? দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখেনি?”

জোজো মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, “তুই কি পাগল হয়েছিস? পেলে এই দোকানে আসবে? পেলে এসেছিল আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের বাড়িতে। এই দোকান থেকে বানিয়ে তাকে শরবত খাওয়ানো হয়েছিল। পেলে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে তক্ষুনি লম্বা সার্টিফিকেট লিখে দিল। এমন দামি জিনিস কি হাতছাড়া করা যায়? সেটা আমরাই রেখে দিয়েছি। এই দোকানের মালিককে দিইনি। মাঝে মাঝে দেব দেব বলি অবশ্য।”

সন্তু বলল, “তোর সঙ্গে দেখা হলে সময়টা বেশ কেটে যায় রে!”

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর সন্তু বাড়ি চলে এল। বিকেলবেলা তার পাড়ার ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলার কথা।

কিন্তু সন্ধের আগেই বৃষ্টি নেমে গেল। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল খেলা। ক্লাবঘরে সন্তু খানিকটা বসে রইল। যদি বৃষ্টি থামে। তা আর হল না, সেই যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল আর আলো ফুটল না, বৃষ্টিও থামল না।

বৃষ্টিতে ভিজতে সন্তুর খুব ভাল লাগে। র‍্যাকেটটা ক্লাবে জমা রেখে সন্তু বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। বৃষ্টির তেজ কম। সন্তুদের বাড়ি মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের পথ। বাড়ির কাছাকাছি এসে সন্তু দেখল, তাদের বাড়ির দরজার কাছে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর তার কুকুরটা এক টানা ডেকে চলেছে।

সন্তু জোরে পা চালিয়ে এসে পড়তেই অবাক হয়ে দেখল, এই লোকদুটি

দুপুরবেলার সেই ঘুড়ি-ধরা লোক দুটি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল রঙের জিপ গাড়ি।

লম্বা লোকটি বলল, আচ্ছা ভাই, তোমার নামই তো সন্তু ? তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। তোমার জন্য একটা খবর আছে।"

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, "বলুন !"

লম্বা লোকটি বলল, "রাজা রায়চৌধুরী তোমার কাকা হন তো ?"

সন্তু মাথা হেলাল।

অন্য লোকটি বলল, "উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এক জায়গায়। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এ-কথাটা অন্য কাউকে বলতে বারণ করেছেন। তুমি বাড়িতে ছিলে না, তাই আমরা অপেক্ষা করছি।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেল। এটা এমন একটা সস্তা কায়দা যে আজকাল এসব কেউ বিশ্বাস করে না। কলকাতা শহরের মধ্যে কাকাবাবু এক জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আর সন্তুকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? কলকাতায় কি কাকাবাবুর চেনাশুনো মানুষের অভাব ? তিনি এইভাবে অচেনা লোককে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন কেন ?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "উনি কোথায় আছেন ?"

লম্বা লোকটি বলল, "উনি ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন, কোমরে চোট লেগেছে। ওঁর চেনা একজন লোক দেখতে পেয়ে আলিপুরের একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছেন। টেলিফোনে তোমাদের বাড়িতে খবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু লাইন পাওয়া যায়নি।"

ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা শুনে সন্তু একটু বিচলিত হল। কাকাবাবু প্রায় রোজই এখন ওখানে যাচ্ছেন। এই লোকদুটো সেই খবর রাখে।

কাকাবাবু সন্তুকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, এইরকমভাবে কোনও অচেনা লোক এসে কাকাবাবুর নাম করে সন্তুকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে সে যেন কখনও না যায়। কিন্তু কাকাবাবুর তো সত্যি কোনও দুর্ঘটনা হতে পারে হঠাৎ ! বাস থেকে পড়ে গিয়ে যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন..."

সে জিজ্ঞেস করল, "নার্সিংহোমটার নাম কী বলুন তো !"

লম্বা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "প্যারাডাইস নার্সিংহোম, তেইশ নম্বর আলিপুর রোড সাত নম্বর কেবিন !"

সন্তু বলল, "আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ির ভেতর থেকে আসছি।"

ভেতরে ঢুকে সে তার কুকুরটাকে চুপ করাল। মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। মাকে কি এই ঘটনাটা জানানো উচিত। মা শুধুশুধু চিন্তা করবেন। মা সন্তুকে একা যেতে দিতে রাজি হবেন না। পুলিশে খবর দিতে চাইবেন।

কিন্তু বিপদ সন্তুকে হাতছানি দেয়। এই লোকদুটো কী মতলবে এসেবে তা

জানার জন্য সন্তুর দারুণ কৌতূহল হল। সে আর দেরি করতে পারছে না।
সে এই ব্যাপারটা সংক্ষেপে একটা কাগজে লিখে ফেলল খসখস করে। তারপর কাগজটা চাপা দিয়ে রাখল কাকাবাবুর টেবিলে।
সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে বলল, "মা, আমি একটু ঘুরে আসছি।"
মা বাথরুমে। তিনি বললেন, "এই মাত্র ফিরেই আবার বেরুচ্ছিস যে, কোথায় যাচ্ছিস?"
সন্তু বলল, "আসছি, একটু বাদেই আসছি।"
বাইরে এসে সে লোকদুটির সঙ্গে জিপ গাড়িতে চড়ে বসল। তারপর সে লম্বা লোকটিকে বলল, "আপনাদের আমি দুপুরে এক জায়গায় দেখেছি। সত্যিকারের ব্যাপারটা কী বলুন তো?"
লম্বা লোকটি হেসে সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বল, "আমরা ভাল লোক। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও বিপদ হবে না।"
সত্যিই আলিপুরের একটা নার্সিংহোমের সামনে এসে থামল জিপ গাড়িটা। বৃষ্টি এখনও পড়ে চলেছে। লোডশেডিং-এর জন্য রাস্তাঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু গাড়ির হেড লাইটে দেখা যায় এই বৃষ্টির মধ্যেও রাস্তায় লোকজনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই।
সন্তুর খিদে পেয়ে গেছে বেশ। ব্যাডমিন্টন খেলার পরেই বাড়ি ফিরে তার কিছু খাওয়া অভ্যেস। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। সেই দুপুরবেলা জোজো এক গেলাস শরবত খাইয়েছিল, তারপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। সেই শরবতটা নাকি হজমি শরবত, তাতে পেটের সব কিছু হজম হয়ে গেছে!
গাড়িটা পার্ক করার পর লম্বা লোকটি সন্তুকে বলল, "নেমে এসো ভাই; খুব বেশি দেরি হয়নি, কী বলো? আশা করি, তোমার কাকাবাবু ভাল আছেন।"
নার্সিংহোমের সামনেই খয়েরি রঙের স্যুট পরা একজন বেশ রাশভারী চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। লম্বা লোকটি তার কাছে গিয়ে বলল, ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি, স্যার। কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি।"
লোকটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো আমার সঙ্গে। তোমার কাকাবাবু ভাল আছেন।"
লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের কাজ শেষ তো স্যার? এবার আমরা যেতে পারি?"
"হ্যাঁ, ঠিক আছে।"
"আমাদের টাকাটা স্যার?"
"স্যুট-পরা লোকটি পকেট থেকে একটা খাম বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, তোমাদের পুরো পেমেন্ট আছে।
"কাল আবার লাগবে?"

"না, আপাতত লাগবে না। আবার দরকার হলে তোমাদের খবর দেব।" লম্বা লোকটি সন্তুর দিকে হাত নেড়ে বলল, "চলি ভাই!"

স্যুট-পরা লোকটি ভুরু কুঁচকে হাতের ঘড়ি দেখল। যেন সে আর কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরে, অনেকরকম মানুষজন দেখে সন্তু খানিকটা লোক চিনতে শিখেছে। কোন্ মানুষটা ভাল আর কোন্ মানুষটার মন হিংসে আর লোভে ভরা, তা সন্তু প্রথম দেখেই বুঝতে পারে। এই স্যুট-পরা লোকটিকে তার খারাপ লোক বলে মনে হল না।

কিন্তু এর পরেই সে লোকটির মুখ থেকে এক আশ্চর্য কথা শুনল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু কত নম্বর ক্যাবিনে আছেন? কোন্ তলায়?"

লোকটি সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে বলল, "তোমার কাকাবাবু এখানে নেই। তোমাকে একটা মিথ্যে কথা বলে এখানে আনানো হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। তোমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করবে না।"

সন্তু প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই লোকটা বলে কী? কলকাতা শহরের রাস্তায় সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে বলছে যে, সন্তুকে সে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে? সন্তু এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠে লোক জড়ো করে লোকটাকে ছেলে ধরা বলে ধরিয়ে দিতে পারে!

সন্তু ততটা বাচ্চা নয় যে, তাকে ছেলেধরায় ধরে আনবে। সন্তু এক্ষুনি চলে যেতে চাইলে এই লোকটার সাধ্য আছে ধরে রাখার?

সন্তু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "তার মানে? আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে নিয়ে আসার কারণটা কী?"

লোকটি বলল, "ঠিক মিথ্যে কথাও নয়। তোমার কাকাবাবুর এখানে এসে পড়ার কথা ছিল। দু'জন লোক পাঠিয়েছিলাম ওঁকে নিয়ে আসার জন্য। উনি যদি সহজে আসতে রাজি না হন, যদি ধস্তাধস্তি হয়, উনি গায়ে-মাথায় চোট পান, তা হলে এই নার্সিং হোমে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলাম। কিন্তু উনি এলেন না, লোকদুটো ফিরল না। কী যে হল বুঝতে পারছি না। আজকাল এইসব লোকজনও অপদার্থ! টাকাও নেবে, কাজও করবে না!"

সন্তুর ক্রমশ ভুরু ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠাণ্ডাভাবে এসব কী বলছে লোকটা?

"কাকাবাবুকে জোর করে ধরে আনতে পাঠিয়েছেন? কেন?"

"কোনও খারাপ মতলবে নয়। এই একটু কথাবার্তা বলার জন্য। এখন কী করা যায় বলো তো?"

"কিছু মনে করবেন না, আপনি কি পাগল?"

"এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছ ভাই? আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয়!"

"অন্ধকারে আপনাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে তো ভালই মনে

হয়েছিল কিন্তু এখন আপনার কথাবার্তা শুনে...কাকাবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য তো আমাদের বাড়িতে গেলেই পারতেন। তার বদলে জোর করে ধরে আনা...”

“তোমার কাকাবাবু যে বড্ড গোঁয়ার। এমনিতে কথাবার্তা শুনতে চান না।”

“আমি চলি!”

“কোথায় যাবে?”

“বাড়ি ফিরে যাব। এখান থেকে ভবানীপুরে কত নম্বর বাস যায়?”

লোকটি আবার ঘড়ি দেখল। একটা দোকানের আলো একটু একটু রাস্তায় পড়েছে, ঘড়ি দেখবার জন্য লোকটিকে সেই আলোর কাছে যেতে হল। তারপর ফিরে এসে চিন্তিতভাবে বলল, “তুমি যদি যেতে চাও, যেতে পারো। কোন্ বাস যায় আমি ঠিক বলতে পারব না। বাসস্ট্যান্ডে ফিরে জেনে নাও। তবে, আমার মনে হয় তোমার কাকাবাবুকে হাওড়া স্টেশনেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।”

সন্তু আবার চমকে উঠে বলল, “হাওড়া স্টেশনে, কেন?”

“কথা ছিল, তোমার কাকাবাবুকে এখানে আনা হবে প্রথমে, তোমাকেও আনিয়ে নেওয়া হবে। তারপর সবাই মিলে হাওড়া যাওয়া হবে। ট্রেনের টিকিট কাটা আছে। এখন মনে হচ্ছে, কোনও কারণে ওরা সোজাসুজি হাওড়াতেই চলে গেছে।”

“আমাদের ট্রেনে করে কোথায় নিয়ে যাবেন?”

“তা বেশ দূর আছে।”

“কাকাবাবু তো আমায় বাইরে যাওয়ার কথা কিছু বলেননি?”

“উনি কি আর এমনি যেতে চাইবেন? ওঁকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমাকে অবশ্য অজ্ঞান করবার দরকার নেই। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে তুমি এমনি এমনিই যেতে চাইবে।”

“আপনার সমস্ত কথাই আমার গাঁজাখুরি মনে হচ্ছে।”

“তুমি বাড়ি চলে যেতে পারো। আসলে তোমাকে আমাদের সে রকম কোনও দরকারই নেই। তোমার পড়াশুনা নষ্ট করে শুধু শুধু অনেকগুলো দিন বাইরে কাটাবার কোনও মানে হয় না। এই কথাই আমি সবাইকে বলেছিলাম। তা ওরা বলল, তুমি নাকি তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে সব জায়গায় যাও। তুমি সঙ্গে না থাকলে ওঁর অসুবিধে হবে। সেই জন্যই তোমাকে আনা।”

লোকটি আর একবার ঘড়ি দেখে বলল, “নাঃ, আর দেরি করা যায় না। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতেই হবে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন ছাড়বে। তোমার কাকাবাবুকে আমি বলব, তুমি আসতে রাজি হওনি।”

“কাকাবাবুকে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাওয়া এত সোজা ভেবেছেন?

আপনাদের মাথা খারাপ ?”

“একটা ইঞ্জেকশানের তো মামলা। অন্ধকার রাস্তায় পেছন থেকে টপ করে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দিলে উনি আর কী করবেন ? তবে ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না, এটা আমি বলে দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।”

“আপনারা কোন ট্রেনে যাবেন ?”

“ন'টা পাঁচের ট্রেনে।”

“আমি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে দেখতে চাই আপনার কথা সত্যি কি না !”

“আমি একদম মিথ্যে কথা বলি না। যেতে চাও, চলো !” কাছেই দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজা খুলে লোকটি বলল, “এসো !”

একটু আগেই সন্তু ভেবেছিল, সে মানুষ চেনে। এখন সে এই লোকটিকে কিছুই বুঝতে পারছে না। লোকটির কথাবার্তা মোটেই গুণ্ডা বদমাশদের মতন নয়। লেখাপড়াজানা ভদ্রলোকের মতন, অথচ সে ঠাণ্ডা মাথায় কাকাবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া, অজ্ঞান করা এই সব বলছে !

সন্তু আরও ভাবল, এই লোকটি তাকে এখন জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে না। সে যাচ্ছে নিজের ইচ্ছেতে। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কী ? এইসব কথা শুনে নিশ্চিন্তভাবে বাড়িতে ফিরে যাওয়া যায় ?

ড্রাইভার নেই, গাড়ি চালাচ্ছে লোকটি নিজেই। কিছুদূর আসবার পর, লোডশেডিং-এর এলাকা ছাড়িয়ে আলো-ঝলমল একটা পাড়ায় এসে লোকটি বলল, “কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে। সামনেই একটা বড় দোকান আছে। তোমার কাকাবাবু চা বেশি ভালবাসেন, না কফি ?”

সন্তু বলল, “কফি।”

“উনি চিনি খান নিশ্চয়ই। মিষ্টি বিস্কুট না নোনতা বিস্কুট ? তুমি চকোলেট ভালবাস নিশ্চয়ই ?”

লোকটি এমনভাবে কথা বলছে যেন সে সন্তু-কাকাবাবুর কোনও আত্মীয়। গাড়ি থামিয়ে একটা দোকানে ঢুকে লোকটি বেশ অনেকক্ষণ দেরি করল। এদিকে বলছিল ট্রেনের সময়ের আর বেশি দেরি নেই।

একটা মস্ত-বড় প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসে লোকটি বলল, “যাক্ সব কিছুই পাওয়া গেছে। আর কোনও চিন্তা নেই। তুমি একটা চকোলেট খাবে নাকি এখন ?”

লোকটি পকেট থেকে একটা চকোলেট-বার বার করে এগিয়ে দিতে সন্তু আর আপত্তি করল না। তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে ট্র্যাফিক জ্যাম। সন্তুরই উদ্বেগ হতে লাগল। যদি ট্রেন ছেড়ে যায়। লোকটি কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন থামিয়ে নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে তারপর বলল, “তুমি রাত্তিরে বাড়ি না ফিরলে তোমার মা চিন্তা করবেন

তো ? ঠিক আছে, আমরা লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ট্রেন ছাড়তে আর কত দেরি ?"

'আর দশ মিনিট আছে। তবে, আমি না পৌঁছলে ট্রেন ছাড়বে না। আমাদের লোক আছে, চেন টেনে দেবে।"

একটু বাদেই আবার গাড়ি চলল। লোকটি নিজের গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল স্টেশনের মধ্যে। তারপর নেমে পড়ে বলল, "ন' নম্বর প্ল্যাটফর্ম !"

দু'জনকে দৌড়তে হল এবার। আর মাত্র এক মিনিট বাকি। ফার্স্টক্লাস কামরার সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, স্যুট-পরা লোকটিকে দেখে তারা হাত তুলল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা সরাসরি এখানে চলে এসেছ ? নার্সিং হোমের সামনে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি !"

অন্য লোকটি বলল, "কী করব, প্ল্যানটা যে পাল্টে গেল।"

"এখন সব ঠিকঠাক আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, মানে, এই ছেলেটির কাকাবাবুকে আনা হয়েছে ?

"হ্যাঁ স্যার।"

"ঠিক আছে, গাড়ির চাবি নাও। গাড়ি গ্যারাজে তুলে রাখবে। যাওয়ার পথে মিঃ চৌধুরীর বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাবে। বলবে যে, সন্তু সম্পর্কেও চিন্তা বা ভয়ের কিছু নেই। দিন দশেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

স্যুট-পরা লোকটি সন্তুর দিকে তাকাতেই সন্তু বলল, "আমি আগে একবার দেখতে চাই কাকাবাবু সত্যি আছেন কি না !"

"ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ওঠো। গার্ড হুইশ্‌ল দিয়েছে।"

ট্রেনে উঠে লোকটি বলল, "একদম ধারের কুপে। নম্বর হল এক।'

সন্তু দৌড়ে গেল সে দিকে। ট্রেন নড়তে শুরু করে দিয়েছে। এখনও সন্তু ইচ্ছে করলে লাফিয়ে নেমে পড়তে পারে। এক নম্বর **কুপেটির** দরজা বন্ধ। সন্তু খোলার জন্য টানাটানি করতে লাগল। দরজায় দুম্‌দুম্ করে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, "কাকাবাবু ! কাকাবাবু ! ভেতরে কে, খুলুন, খুলুন !"

ট্রেন ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গিয়ে স্পিড নিয়েছে।

কুপের দরজা খুলল একজন মোটাসোটা মাঝবয়েসী লোক। খাকি প্যান্টের ওপর সাদা হাওয়াই শার্ট পরা, মুখভর্তি দাড়ি। সন্তুর সঙ্গে যেন অনেক দিনের চেনা, এইভাবে বলল, "এসো !"

দরজা খোলা মাত্র সন্তু ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। একদিকের সিটে কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু কাকাবাবু নন। কাকাবাবু লম্বা-চওড়া মানুষ, যে শুয়ে আছে সে মোটামুটি সন্তুর সমান। মুখটা চেনা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু এখানে নেই ! সন্তুকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে আসা হয়েছে !

প্রথম থেকেই সন্তুর এরকম সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আলিপুরে যে লোকটির সঙ্গে দেখা হল, যে গাড়ি করে সন্তুকে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে এল, তাকে সন্তুর খারাপ লোক বা মিথ্যেবাদী বলে মনে হয়নি । তা হলে সন্তুর এতটা ভুল হল ।

সন্তু পেছন ফিরে তাকাল । ট্রেন বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে । এখন আর লাফিয়ে নেমে পড়া যায় না ।

একটুও ভয় না পেয়ে সন্তু রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? কাকাবাবু কোথায় ?"

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি অবাকভাবে বলল, "কাকাবাবু ? কে ভাই তোমার কাকাবাবু ?"

সন্তু আবার জোর দিয়ে বলল, "আমার কাকাবাবুর নাম রাজা রায়চৌধুরী, তিনি কোথায় ?"

"আমি তো ভাই তোমার কাকাবাবুকে চিনি না । তিনি কোথায় তা আমি জানব কী করে ? তুমি এসো ভেতরে এসে বোসো !"

"তা হলে কি কাকাবাবু অন্য কোনও কুপেতে আছেন ?"

"তাও তো আমি জানি না । তোমার কাকাবাবু এই ট্রেনে চেপেছেন বলে মনে হয় না । তা হলে আর আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে কেন ?"

সন্তু অন্য কুপেগুলিতে উঁকি মেরে এল । সব কটারই দরজা খোলা । তার মধ্যে দুটি একদম খালি । অন্যগুলোতে অন্য যাত্রীরা রয়েছে । যে লোকটি সন্তুকে হাওড়ায় নিয়ে এসেছে । সেও এই কামরায় কোথাও নেই । সে ওঠেনি । দরজার কাছে খাবারদাবারের প্যাকেট পড়ে আছে ।

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি সেই প্যাকেটটি তুলে নিয়ে সন্তুকে বলল, "এসো । কিছু খেয়েটেয়ে নেওয়া যাক !"

সন্তুর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে । তাকে এইভাবে মিথ্যে কথা বলে ট্রেনে তোলা হল কেন ? কারা এসব করছে ? এতে তাদের কী লাভ ? সন্তু কি ছেলেমানুষ নাকি ? সে তো পরের স্টেশনেই নেমে পড়তে পারে । তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে অন্য যাত্রীদের কাছে সাহায্য চাইবে ।

সে খাকি প্যান্ট পরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী আমি জানতে চাই । আমাকে কেন এই ট্রেনে তোলা হল ?"

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি হেসে বলল, "আমার ওপর রাগ করছ কেন ?

আমি ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানি না । আমাকে প্রশ্ন করলেও উত্তর দিতে পারব না ।

আমার ওপর শুধু ভার পড়েছে তোমাদের দু'জনকে এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া । তোমাদের কোথাও অযত্ন হবে না ।"

"কোথায় পৌঁছে দেওয়া ?"

"সেটা বলতে পারি। এখন বলতে কোনও ক্ষতি নেই। সম্বলপুরে।"

"সম্বলপুরে ? সেখানে গিয়ে আমি কী করব ?"

"তা তো ভাই আমি জানি না। সম্বলপুরে তোমাদের নিতে অন্য লোক আসবে। আমি তোমাদের হ্যান্ডওভার করেই ফেরত ট্রেনে চলে আসব। সুতরাং সম্বলপুরে গিয়ে তুমি কী করবে, তা তো আমি জানি না।"

"সম্বলপুরে আমি যাব কেন ? আমি পরের স্টেশনেনেমে যাব।"

লোকটি কয়েক পলক সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের দাড়ি চুলকে বলল, "সেটা একটা কথা বটে। তুমি যদি যেতে না চাও, তা হলে কি আমি তোমাকে জোর করে আটকে রাখব ? সেরকম কোনও কথা তো আমাকে বলা হয়নি। আর অল্পবয়েসী ছেলেদের ওপর জোরজার করা আমি পছন্দ করি না। তোমার যেতে ইচ্ছে না হলে যেও না। আমি সম্বলপুরে গিয়ে বলব দু'জনের বদলে একজন এসেছে !"

"আর একজন কে ?"

"নামটাম কিছু জানি না। তোমার নামও তো জানি না। ওই ওখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পরের স্টেশন তো খড়্গপুর, পৌঁছতে অনেক দেরি আছে। ততক্ষণ তুমি ভেতরে এসে বোসো !"

সন্তু ভেতরে এসে চাদর ঢাকা লোকটির দিকে তাকাল। তার মুখটা দেওয়ালের দিকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

খাকি প্যান্টপরা লোকটি খাবারের প্যাকেটটি খুলে বলল, "বাঃ বাঃ, অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে। ভাল স্যান্ডউইচ আছে। এই যে ভাই, খাবে নাকি ? খাও, খাও, খাবারের ওপর রাগ করতে নেই।"

একখানা চকোলেট খেয়ে সন্তুর খিদে মেটেনি। খাবার দেখেই তার খিদে আবার বেড়ে গেল। কিন্তু এদের খাবার কি খাওয়া উচিত ?

বেশি চিন্তা না করে সন্তু দু'খানা স্যান্ডউইচ হাতে তুলে নিল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "পরের স্টেশনে নেমে তুমি কি বাড়ি ফিরে যাবে ? ট্রেনের টিকিট কাটার সময় আছে ?"

"সে আমি বুঝব !"

"আমি তোমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে পারি। ধার হিসেবেই নিও। আমার ঠিকানা দিয়ে দেব। যদি পারো কখনও ফেরত পাঠিও !"

সন্তুর আবার খটকা লাগল। এ কী ধরনের লোক এরা ? মিথ্যে কথা বলে, অন্যায়ভাবে তাকে ট্রেনে চাপিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি কিংবা কোনওরকম জোরও করেনি। এমনকী সন্তু ফিরে যেতে চাইলে ট্রেনের টিকিট কাটার পয়সা দিয়ে দেবে বলছে ?

স্যান্ডউইচ দুটো খেয়ে নিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে, তা কি

জানতে পারি ?”

লোকটি বলল, “হ্যাঁ, কেন জানতে পারবে না। আমি তো চোর-ডাকাত নই যে নাম লুকোব। আমার নাম মনোহর দাস। একটা সিকিউরিটি সার্ভিস অফিসে কাজ করি। আমাদের কাজ হল, লোকের দামিদামি জিনিসপত্র পাহারা দেওয়া। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনা, কোনও লোক হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা, এইসব। এখন আমার ডিউটি পড়েছে, তোমাদের দু'জনকে ভালভাবে সম্বলপুরে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু জোর করে ধরে নিয়ে যেতে হবে, সেরকম কোনও ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়নি। তোমাকে কি কেউ জোর করে ট্রেনে তুলেছে ? তুমি তো একাই এসেছ দেখছি।”

“আমাকে মিথ্যে কথা বলে আনা হয়েছে।”

“সে তোমায় কে কী বলেছে, তা বাপু আমি জানি না। খড়্গপুরেই নেমে পড়ো তাহলে। এখনও ফেরার অনেক ট্রেন পাবে।”

ঘুমন্ত লোকটি একটা শব্দ করে পাশ ফিরল। এবারে সন্তু এমন চমকে গেল যে তার বুকটা কাঁপতে লাগল ভূমিকম্পের মতন।

মুখ থেকে চাদরটা সরে গেল। ঘুমন্ত লোকটি আর কেউ নয়, তার বন্ধু জোজো !

সন্তু ভাবল, তা হলে এই সব কি জোজোর কারসাজি ? জোজো এইভাবে কোনও প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে ! জোজোটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

সে উঠে গিয়ে জোজোর বুকে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, “এই জোজো, ওঠ ! ওঠ ! মটকা মেরে আর কতক্ষণ থাকবি।”

জোজো কোনও সাড়া দিল না।

দু'তিনবার ঝাঁকুনি দেওয়ার পর সন্তু বুঝতে পারল, জোজো ঘুমের ভান করে নেই। তার শরীরটা অসাড়, তার জ্ঞান নেই। সন্তু এবারে ভয় পেয়ে গেল।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “ওর কী হয়েছে ?”

মনোহর দাস উঠে এসে জোজোর নাকের কাছে হাত দিয়ে নিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখল। জোজোর নাড়ি দেখল। তারপর বলল, “না, চিন্তার কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে আছে। আমিও সেইরকম সন্দেহ করেছিলুম। ওরা ঘুমন্ত অবস্থায় শুইয়ে দিয়ে গেল। এমন অবেলায় কেউ কি অঘোরে ঘুমোতে পারে ? ছিঃ, এইটুকু লোককে কি কারুর অজ্ঞান করা উচিত ?”

“মনোহরবাবু, ওর কখন জ্ঞান ফিরবে ?”

“তা তো বলতে পারব না ভাই। আমি তো ডাক্তার নই। তবে ঘণ্টা দু'একের বেশি লাগবে না মনে হয়।”

সন্তু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। খড়্গপুর পৌঁছবার আগে যদি জোজোর জ্ঞান না ফেরে তা হলে সে নামবে কী করে ? জোজোকে ফেলে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কে কোন্ মতলবে তাকে আর জোজোকে একসঙ্গে ধরে

নিয়ে যেতে চায় ?

মনোহর দাস একটার পর একটা খাবার খেয়ে যাচ্ছে। একটু পরে সে বলল, “এখন এক কাপ চা পেলে বেশ জমত। দেখা যাক খড়্গপুরে চা-ওয়ালা পাওয়া যায় কি না। আমি এক কাজ করব, বুঝলে! খড়্গপুরে অনেকক্ষণ ট্রেন থামবে। আমি এক কাপ চা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব তুমি তার পরে নেমে যেও। আমি সম্বলপুরে পৌঁছে বলব আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই একফাঁকে একটি ছেলে নেমে গেছে। ব্যাস আমার আর কোনও দায়িত্ব রইল না। আমি ঘুমোতে পারব না, এরকম তো কোনও কথা নেই।”

সন্তু বলল, “কিন্তু আমার বন্ধুকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি তো একলা নামতে পারি না।”

“এই লোকটি তোমার বন্ধু বুঝি ?”

“হ্যাঁ, আমরা এক কলেজে পড়ি। কালকে ক্লাস আছে। আমাদের দু'জনেরই আজ রাত্তিরেই বাড়ি ফেরা দরকার।”

“তোমরা দু'জনেই চলে গেলে...সে বড় খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে। তাহলে আর আমার চাকরি থাকবে না। দু'জনকে পৌঁছে দেওয়ার কথা, তার মধ্যে একজনও পৌঁছল না, তা কি হয় ? তুমি শুধু তোমার দায়িত্ব নাও !”

“আপনি বুঝি আপনার কোনও বন্ধুকে এরকম অবস্থায় ফেলে পালাতে পারেন ?”

“এটা বড্ড শক্ত প্রশ্ন করলে, ভাই। উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। আমি এটা বুঝব কী করে, আমার তো কোনও বন্ধুই নেই। অফিসে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা চান্স পেলেই ল্যাং মারে।”

“আপনি বলছেন, আপনি সিকিউরিটির লোক, তার মানে কি পুলিশ ?”

“না, না। প্রাইভেট, প্রাইভেট কোম্পানি আমাদের। লোকে আমাদের ভাড়া করে। মনে করো, আমরা হচ্ছি ভাড়াটে দারোয়ান।”

“এরকম বিচ্ছিরি চাকরি করেন কেন ?”

“অন্য চাকরি কে দেবে ? তুমি দেবে ? তোমার বাবাকে বলে দেবে তো ?”

“আপনার সঙ্গে আর্মস আছে ?”

“তা আছে ছোটখাটো। তবে বিশেষ কাজে লাগে না।”

“ছোটখাটো মানে ? ছুরি না রিভলভার ?”

“ধরে নাও দুটোই। রিভলভারের লাইসেন্স আছে বটে। কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও গুলি ছুঁড়িনি। গুলির যা দাম !”

“ছুরি ব্যবহার করেছেন তা হলে ?”

“ছুরিটা কাজে লাগে দড়িফড়ি কাটবার জন্য। এসব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? তোমাদের ওপর আমি ছুরি গোলাগুলি চালাব ভেবেছ ? কখনও না ! শেষকালে খুনের দায়ে পড়ি আর কী ! তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়েও যদি

পালাতে চাও, তাতেও বাধা দেব না। চাকরি যায় যাক।"

খড়্গপুর স্টেশন এসে গেল। সন্তু আবার জোজোকে ধাক্কা মারল কয়েকবার। জোজোর জ্ঞান ফেরার কোনও চিহ্নই নেই। সন্তু অসহায়ভাবে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। এখন সে কী করবে?

মনোহর দাস চা-ওয়ালা ডেকে পরপর দু'ভাঁড় চা খেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সন্তুর দিকে সে আড়চোখে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে।

একটু পরে সে বলল, "যতদূর মনে হচ্ছে, বন্ধুকে ছেড়ে তুমি একলা যাবে না! চমৎকার, এই তো চাই। এমন না হলে আর কিসের বন্ধুত্ব! বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তুমি এক কাপ চা খাবে নাকি?"

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

॥ ৬ ॥

কাকাবাবু একবার চোখ মেলেই আবার চোখ বুজিয়ে ফেললেন। এখনও চোখের পাতাদুটো খুব ভারী। ঘুম কাটেনি। শরীরটা দুলছে। শরীরটা দুলছে না মাথা ঘুরছে? কিংবা তিনি কি শূন্যে ভাসছেন? তাঁর ইচ্ছে করল চোখ খুলে ভাল করে দেখতে। কিন্তু কিছুতেই আর তাকাতে পারছেন না।

মিনিট পনেরো আবার অজ্ঞানের মতন ঘুমিয়ে কাকাবাবু দু'চোখ মেললেন। আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সেইজন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। শরীরটা এখনও দুলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, জলতেষ্টা পেয়েছে খুব। অতিকষ্টে তিনি পাশ ফিরলেন।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, "জল খাবেন?"

কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আগে তিনি মনে করবার চেষ্টা করলেন, তিনি কোথায় রয়েছেন? কখন ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুমোবার আগে কোথায় ছিলেন, তাঁর এসব কিছুই মনে পড়ল না।

"মিঃ রায়চৌধুরী, জল খাবেন?"

প্রচণ্ড মনের জোর এনে কাকাবাবু এক ঝটকায় উঠে বসলেন। তার মাথা ঘুরতে লাগল, মনে হল গায়ে একটুও জোর নেই। তারই মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি রয়েছেন একটি রেলের কামরায়। বেশ বড় কামরা কিন্তু তাতে আর একজন মাত্র লোক রয়েছে। লোকটির গায়ে একটা পাতলা সাদা কোট, হাসপাতালের ডাক্তাররা যেরকম পরেন।

ঘুমের ঘোরে কাকাবাবু একটুও বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। লোকটির দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন বেশ কয়েক মুহূর্ত।

লোকটি একটি ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল ঢেলে নিয়ে কাছে এসে বলল, "জলটা খেয়ে নিন, ভাল লাগবে।"

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে সবটা জল খেয়ে নিলেন ঢকঢক

করে। তারপর গেলাসটি ফেরত দিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ !"

সাদা কোট পরা লোকটা বলল, "শরীর খারাপ লাগছে না তো ? খিদে পেয়েছে ?"

কাকাবাবু মনে মনে ভাবলেন, এটা ট্রেনের কামরা, না হাসপাতাল ? কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি চারদিক ভাল করে চেয়ে দেখলেন। সবকটা জানলা বন্ধ। তবে এটা সাধারণ রেলের কামরা নয়। স্পেশাল ব্যাপার। খুব সম্ভবত সেলুন কার। এক পাশটা লেবরেটরির মতন। কিছু যন্ত্রপাতি ও টেস্ট-টিউব ইত্যাদি রয়েছে। ট্রেনটা খুব জোর ছুটছে। সেই জন্যই তার শরীরটা দুলছে।

সাদা কোট পরা লোকটি বলল, "আপনি একটানা ঠিক সতেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন।"

যেন এটা মোটেই আশ্চর্য হওয়ার মতন কোনও কথা নয়, এইভাবে কাকাবাবু বললেন,"ও !"

কামরার এক কোণে তাঁর ক্রাচ দুটো রয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবার মতন তাঁর শরীরের জোর নেই। মাথাটা ঠিক মতন পরিষ্কার হয়নি। সেইজন্যই কাকাবাবু ঠিক করলেন, এখন তিনি এই লোকটিকে কোনও কথাই জিজ্ঞেস করবেন না।

লোকটি আবার বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, "কিছু খাবেন, স্যার ? চা কিংবা কফি ?"

কাকাবাবু বললেন, "এক কাপ কফি খেতে পারি। ট্রেন থামুক।"

"ট্রেন থামার দরকার নেই। আমি কফি তৈরি করে দিচ্ছি। দুধ-চিনি থাকবে তো ?"

"না, শুধু কালো কফি।"

লোকটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল গরম করল। তারপর এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল, সঙ্গে দুটি বিস্কুট।

কাকাবাবু বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই কফি ও বিস্কুট শেষ করলেন। এবং অনেকটা চাঙ্গা বোধ করলেন।

লোকটি বলল, "কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনার পাল্স একটু দেখব ?"

কাকাবাবু ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। লোকটি সত্যিই ডাক্তার, কাকাবাবুর নাড়ি টিপে ধরে দেখল। তারপর ব্লাড প্রেশার মাপল। খুশির সঙ্গে বলল, "বাঃ, সব ঠিকঠাক আছে।"

সবকটা জানলা বন্ধ, ভেতরে চড়া আলো জ্বলছে, এখন দিন কি রাত তা বোঝা যাচ্ছে না। তবু কাকাবাবু কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।

একটু পরে পাশের একটা দরজা খুলে ঢুকলেন অংশুমান চৌধুরী। তাঁর মাথায় টুপি, হাতে একটা রুপো বাঁধানো ছড়ি। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে

হাসিমুখে তিনি কিছু বলতে যেতেই কাকাবাবু আগেই বললেন, "কী খবর ? ভাল ?"

অংশুমান চৌধুরী বেশ চমকে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কাকাবাবু নিশ্চয়ই রাগারাগি করবেন।

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি এখন ভাল বোধ করছেন তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "চমৎকার। এই ছেলেটি কফি আর বিস্কুট খাওয়াল। শুনলাম, একটানা সতেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, সেটাও বেশ ভাল ব্যাপার, অনেকদিন ভাল ঘুম হচ্ছিল না।"

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর উলটো দিকের একটা বেঞ্চে বসে পড়ে বললেন, "বাঃ, তা হলে কাজের কথা শুরু করা যাক !"

কাকাবাবু দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "থাক, এখন কাজের কথা-টথা থাক। আবহাওয়ার কথা বলুন ! গরমটা বেশ কমে গেছে, কী বলুন !"

অংশুমান চৌধুরী অট্টহাসি হেসে বললেন, "আপনি মশাই বিচিত্র মানুষ। আপনার ওপর রাগ আছে আমার, অথচ আপনার কথা শুনে না হেসেও পারি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার ওপর একটুও রাগ নেই, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার হাসি পায় না। আপনি বরং কিছু মজার কথা বলুন তো !"

অংশুমান গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আমি আর আপনি একই সঙ্গে সম্বলপুর যাচ্ছি। আমাদের প্রতিযোগিতার খেলা এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সম্বলপুর ভাল জায়গা। বেড়াবার পক্ষে ভাল জায়গা।"

"শুধু সম্বলপুর নয়, তারপর জঙ্গলেও যেতে হবে।"

"তাও মন্দ নয়, অনেকদিন জঙ্গলে যাওয়া হয়নি। আমি অনেকদিন ট্রেনে চাপিনি। বেশ ভালই লাগছে।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, আমার মাথায় চুল নেই। আর কোনওদিন চুল গজাবে না। কিন্তু আপনার মাথা ভর্তি চুল। আমি আপনার চুল দিয়ে বাজি ফেলেছি। এবারের খেলায় আপনি যদি হেরে যান তা হলে আপনার মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমি একটা আড়ক তৈরি করেছি। সেই আড়ক মাখিয়ে দিলে আপনার মাথাতেও আর কখনও চুল গজাবে না।"

"বাজি ফেলেছেন ? কার সঙ্গে বাজি ফেলেছেন ? আমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হবে, অথচ আমি তার কিছুই জানলাম না ?"

"বাজিটা আমি নিজের মনে মনেই ফেলেছি। আর আমি যদি হেরে যাই। তা হলে আমি নিজেও এর পর থেকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটব। কোনওদিন আর

দু'পায়ে হাঁটব না।"

কাকাবাবু এবারে মুচকি হেসে বললেন, "এইটা আপনি একটা মজার কথা বলেছেন। হার-জিতের কথা আসছে কী করে ? আমি আপনার সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতায় নামছিই না !"

"নামছেন না কী মশাই, প্রতিযোগিতা তো এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমরা কী আর এমনি এমনি সম্বলপুর যাচ্ছি ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমি সম্বলপুরে যাচ্ছি না !"

এর মধ্যে ট্রেনটার গতি কমে এসেছে। কোনও একটা স্টেশন আসছে। কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটো নিলেন। তারপর ডাক্তারটির দিকে ফিরে অনুরোধের সুরে বললেন, "দরজাটা একটু খুলে দিন তো ভাই !"

ডাক্তারটি তাকাল অংশুমান চৌধুরীর দিকে। অংশুমান চৌধুরীও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি কি নামতে চাইছেন নাকি ? না, না এখানে আপনার নামা হবে না।"

কাকাবাবু দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "আপনি আমাকে ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশান দিয়ে জোর করে এতটা পথ নিয়ে এসেছেন। এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ জন্য আমি আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতুম। কিন্তু তা দিচ্ছি না। এবারেও আপনাকে ক্ষমা করছি। দয়া করে, আপনি আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

অংশুমান রেগে উঠে বললেন, "ক্ষমা ? আপনি আমাকে ক্ষমা করবার কে ? এবারে আপনার মাথা ন্যাড়া না করে আমি ছাড়ছি না।"

অংশুমান এক পা এগোতেই কাকাবাবু ক্রাচ তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তাঁর হাতের লাঠিটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারটির বুকে সেই ক্রাচটি ঠেকিয়ে বললেন," আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

ডাক্তারটি অসহায়ভাবে বলল, "না না। আমি আপনাকে বাধা দেব কেন ? সেটা তো আমার কাজ নয়।"

ট্রেন থেমে গেছে। কাকাবাবু দরজার হাতল ঘুরিয়ে বললেন, "গুড বাই।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এখানে আপনি জোর করে নামতে চান নামুন। পরে আপনাকে আসতেই হবে সম্বলপুরে। আপনার ভাইপো সন্তু এতক্ষণে সম্বলপুরে পৌঁছে গেছে !"

॥ ৭ ॥

জোজোর জ্ঞান ফিরল আরও তিন ঘণ্টা বাদে। ততক্ষণে সন্তুর ঝিমুনি এসে গেছে। খড়্গাপুরে সে জোজোকে ফেলে নামতে পারেনি, তার পরেও জোজোর জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় সে অনেকক্ষণ বসেছিল। খাকি পোশাক পরা লোকটাও চা খাবার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তু আর একা কতক্ষণ

জেগে থাকবে ?

জোজো চোখ মেলেও শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় ধড়মড় করে উঠে বসল। সন্তু ও খাকি পোশাক-পরা লোকটির দিকে সে তাকাল অবাকভাবে। তাকে কখন ট্রেনে তোলা হয়েছে, তা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না। রাত্রির ট্রেন ছুটছে দারুণ জোরে। জানলা খোলা, বাইরে শুধু অন্ধকার। কুপের দরজাটাও খোলা।

এদিক-ওদিক চোখে বোলাতেই জোজোর চোখ পড়ল স্যান্ডউইচের বাক্সটা। ঘুম ভাঙতেই খিদেতে তার পেট জ্বলছে দাউ দাউ করে। কোনও দ্বিধা না করে সে বাক্সটা তুলে নিল। তাতে তখনও গোটা তিনেক স্যান্ডউইচ অবশিষ্ট আছে। জোজো প্রথমে একটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর খেতে শুরু করে দিল। তিনটেই শেষ করে ফেলল সে। দেওয়ালের একটা হুকে একটা ওয়াটার বটল ঝুলছে। সেটা নামিয়ে সে জল খেল অনেকখানি।

এবারে সে সন্তুর মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে দেখল। সত্যিই সন্তু কিনা। তার ভুরু কুঁচকেই আছে। এখনও সে কিছু বুঝতে পারছে না। খাকি পোশাক পরা লোকটাকেও সে লক্ষ করল ভাল করে। একে সে জীবনে কখনও তো দেখেনি। লোকটি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জোজো এবারে কুপের দরজার কাছে গিয়ে বাইরেটায় উঁকি দিল। সরু করিডরটা জনশূন্য। এখন কত রাত কে জানে!

"ল্যাট্রিনটা বাঁ দিকে!"

জোজো চমকে পেছনে ফিরে তাকাল। খাকি পোশাক-পরা লোকটার নাক ডাকছিল একটু আগে, কিন্তু আসলে সে ঘুমোয়নি? লোকটা কিন্তু চোখ বুজেই আছে এখনও।

লোকটি আবার বলল, "বাথরুমে যাবে তো, যাও ঘুরে এসো!"

জোজোর সত্যিই বাথরুমে যাওয়া দরকার। সে কোনও কথা না বলে বাঁ দিকে চলে গেল। বাথরুমের কাছেই একটা আলাদা সীটে একজন কন্ডাক্টর গার্ড বসে বসে ঢুলছে। এখন বেশ গভীর রাত, মনে হচ্ছে। এই কামরায় আর কেউ জেগে নেই মনে হয়। কোথায় যাচ্ছে এই ট্রেন?

বাথরুম সেরে জোজো ফিরে এল কিন্তু কুপের মধ্যে ঢুকল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকল, "সন্তু! এই সন্তু!"

খাকি পোশাক-পরা লোকটি চোখ বোজা অবস্থাতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ্ শ্ শ্ শ্! এত জোরে কথা বলে না! ভেতরে এসে কথা বলো!"

জোজো এবারে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

লোকটি বলল, "ভেতরে এসে শুয়ে পড়ো না ভাই। এত রাত্রে কেন গোলমাল করছ? আমি কেউ না। আমি একজন অতি সাধারণ লোক! তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

এত কথাবার্তায় সন্তু জেগে উঠল। তাকে চোখ মেলতে দেখেই জোজো বলল, "এই সন্তু, উঠে আয়! শিগগির উঠে আয়। আমি পুলিশ ডেকেছি। এক্ষুনি পুলিশ এসে এই স্পাইকে অ্যারেস্ট করবে!"

খাকি পোশাক-পরা লোকটা এবারে উঠে বসে বিরক্ত ভঙ্গি করে বলল, "হাড়জ্বালালে দেখছি! চলন্ত ট্রেনে পুলিশ আসবে কী করে? এলে তো আসবে পরের স্টেশনে? পরের স্টেশন আসতে এখনও দুঘণ্টা দেরি আছে। ততক্ষণ ভেতরে এসে বসো!"

তারপর সে সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "তোমার বন্ধুকে বলো না, আমি কি তোমাদের মারছি না ধরছি? তোমরা পালাতে চাও পালাবে, থাকতে চাও থাকবে। তা ছাড়া আমি স্পাই হতে যাব কোন্ দুঃখে? ওসব ঝামেলায় আমি নেই!"

জোজো সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি লোকটাকে চিনিস?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

জোজো বলল, "আমি চিনি। রামপ্রতাপ সিং-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট। রামপ্রতাপ সিং হল আমার বাবার এক নম্বরের শত্রু। বিলাসগড়ের রাজার ছেলেকে রামপ্রতাপ সিং গুম করতে গিয়েছিল, আমার বাবা তার সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিল। এখন সেই রাগে রামপ্রতাপ সিং আমাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল! আমি কিন্তু অজ্ঞান হইনি। এতক্ষণ চোখ বুজে সব শুনেছি।"

খাকি পোশাক-পরা লোকটি চোখ বড় বড় করে বলল, "ওরে বাবা, এ যে এক লম্বা চওড়া গল্প। রামপ্রতাপ সিং-এর নাম আমি বাপের জন্মে শুনিনি! বিলাস গড়টাই বা কোথায়?"

সন্তু বলল, "জোজো, ভেতরে এসে বোস। আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জোজো এবারে ভেতরে এসে বলল, "আমি গার্ডসাহেবকে সব বলে এসেছি। উনি টরে টক্কা করে পরের স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ট্রেন থামলেই পুলিশ এসে এই স্পাইটাকে অ্যারেস্ট করবে!"

লোকটি উঠে কুপের দরজাটা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগাল। তারপর তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বসল, "এই, স্পাই স্পাই করবে না বলে দিচ্ছি! পুলিশ আসে তো ভালই, আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাব। তুমি তো খুব চালু দেখছি। এর মধ্যে গার্ডকে খবর দিয়ে এলে?"

সন্তু জোজোর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। ঘুম থেকে উঠেই জোজোর উদ্দাম কল্পনা শক্তি চালু হয়ে গেছে!

জোজো লোকটিকে বলল, "আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন?"

"পুলিশ এলে খুলে দেব। রাত্তিরে দরজা বন্ধ করে রাখাই নিয়ম। যদি

চোর ছ্যাচোড় ঢুকে পড়ে। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন শুয়ে পড়ো। রাত্তিরটায় আর ঝঞ্ঝাট কোরো না।"

জোজো বলল, "মোটেই আমরা এখন ঘুমোব না !"

"তা হলে তো দেখছি, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। তুমি যা বিচ্ছু ছেলে দেখছি, আমি ঘুমোলে যদি আমার বুকের ওপর চেপে বসো ! তোমার বন্ধুটি কত ভাল, এতক্ষণ কিছু করেনি !"

সন্তু বলল, "জোজো, ওনার কাছে রিভলভার ছুরি দুটোই আছে !"

লোকটি বলল, "আচ্ছা সে কথা বলে ওকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ? আমি তোমাদের বয়েসী ছেলেদের ওপর ছুরি-বন্দুক চালাব না মোটেই। সঙ্গে রাখতে হয় বলে রাখা। শোনো ভাই, একটা কথা বলি, পুলিশ যদি আসে, আমি নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেব। আর যদি না আসে, তাহলে আর রাত্তিরে দরজা খুলো না। সকাল হলে দেখা যাবে। আমি এখন শুয়ে পড়ছি কেমন ? যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি, আমার গায়ে-টায়ে যেন হাত দিতে যেও না। আমার ঘুম খুব পাতলা !"

লোকটি সত্যিই আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। জোজো এসে বসল সন্তুর পাশে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই আগে বল তো, তোকে এরা কী করে নিয়ে এল এখানে ?"

জোজো বলল, "আমি চেতলা পার্ক দিয়ে শর্টকাট করছিলুম, বুঝলি। লোডশেডিং, মানুষ জন দেখা যায় না। এমন সময় চারজন লোক হঠাৎ আমায় ঘিরে ধরল। আমি ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছি, জানিস তো ? টপাটপ এক একজনকে ঘায়েল করতে লাগলুম। তিনজন চিৎপটাং হয়ে গেল, শুধু অন্ধকারের মধ্যে একজন হঠাৎ আমার পিঠে বুঝি ইঞ্জেকশান-এর সিরিঞ্জ ফুটিয়ে দিল ! তাতে আমি টেমপোরারি, কিছুক্ষণের জন্য..."

সন্তু বুঝল, জোজোর কাছ থেকে আসল ঘটনাটা সহজে জানা যাবে না। জোজো অনেকখানি রং না চড়িয়ে কিছুই বলতে পারে না। সন্তুর ঘুম পাচ্ছে। জোজো বহুক্ষণ ঘুমিয়ে বা অজ্ঞান হয়ে ছিল। কিন্তু সন্তু তো বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি। জোজোর কথা শুনতে শুনতে তার ঝিমুনি এসে গেল।

পরের স্টেশনে পুলিশ এল না, তার পরের স্টেশনেও। সন্তু যখন আবার ভাল করে জেগে উঠল, তখন ভোর হয়ে গেছে। জোজোও তার কাঁধে হেলান দিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। খাকি পোশাক পরা লোকটি এর মধ্যেই উঠে পড়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

সন্তুর চোখে চোখ পড়তেই সে বলল, "তৈরি হয়ে নাও, এবারে নামতে হবে !"

একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনটা এসে থামল। সন্তু ভেবে দেখল এখানে নেমে

পড়া ছাড়া উপায় নেই। লোকটা তাদের কোথায় নিয়ে যায় দেখাই যাক না। এ পর্যন্ত এই লোকটা তাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। এখন চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করা যেতে পারে বটে। কিন্তু লোকজনদের সে কী বলবে? এই লোকটা তাদের দু'জনকে জোর করে ধরে এনেছে? সে আর জোজো দু'জনেই কলেজে পড়া ছাত্র, তারা ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে। এ কথা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে? এরকম কথা সন্তু মুখ ফুটে বলবেই বা কী করে? তা ছাড়া এই লোকটা তো সত্যিই সন্তুকে জোর করে আনেনি। সন্তু খড়্গপুরে নেমে যেতে চাইলে লোকটা তো একবারও আপত্তি করেনি। তা হলে দেখাই যাক না, কী উদ্দেশ্যে তাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে!

সে জোজোকে ঠ্যালা মেরে বলল, "এই ওঠ!"

জোজো চোখ মেলেই জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ এসেছে?"

খাকি পোশাক পরা লোকটি বলল, "চলো, আগে নামি স্টেশনে। তারপর সেখানে পুলিশের খোঁজ করা যাবে এখন। এখানে কিন্তু ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।"

ওরা নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ছোট স্টেশন, আর দুতিনজন মাত্র যাত্রী নেমেছে এখানে। লোকজন বিশেষ নেই। স্টেশনের বাইরে সুন্দর ফুলের বাগান।

একজন ফর্সা, লম্বা মতন লোক, পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, এগিয়ে এল ওদের দিকে। সঙ্গে একটা বেশ বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

হাসি-হাসি মুখে লোকটি তিনজনের দিকেই বলল, "কী আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? রাত্রে ঘুম হয়েছে?"

লোকটির ভাব ভঙ্গি এমন যেন সন্তুদের সঙ্গে তার অনেক দিনের চেনা। যেন কোনও আত্মীয় ওদের স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছে। অথচ সন্তু এই লোকটিকে কোনওদিন দেখেনি। সে জোজোর দিকে তাকাল। জোজোও লোকটিকে চেনে বলে মনে হয় না। যদিও জোজো ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে।

খাকি পোশাক পরা লোকটি বলল, "রাত্তিরে মশাই একদম ভাল ঘুম হয়নি। আমি এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমোব। তারপর বিকেলের ট্রেনে ফিরব।"

পকেট থেকে একটা লম্বাটে নীল খাতা বার করে পাতা উল্টে বলল, "নিন, এখানে সই করুন; দু'জনকেই ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছেন তো?"

সিল্কের জামা পরা লোকটি খাতাটায় সই করে দিল।

"আমার ডিউটি ওভার? সব ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ। আপনি যেতে পারেন!"

খাকি পোশাক পরা লোকটি সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলি ভাই! ভাল থেকো! ভাল বেড়ানো হোক তোমাদের!"

সে লাইন পেরিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

সিল্কের জামা পরা লোকটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার নাম সন্তু, আর এর নাম জোজো, তাই না ! আমার নাম লর্ড আর আমার এই কুকুরের নাম টম্ ! চলো, তবে যাওয়া যাক।"

জোজো বলল, "নমস্কার মিঃ লর্ড। আচ্ছা, এখানকার থানাটা কোথায় একটু বলতে পারেন ?"

সিল্কের জামা পরা লর্ড বলল, "থানা ? তা একটু দূরে আছে। থানায় কিছু দরকার আছে বুঝি ? সে যাওয়া যাবে বিকেলের দিকে। তোমাদের কাকাবাবু আর পিসেমশাই অপেক্ষা করে আছেন, চলো, দেরি করলে ওনারা চিন্তা করবেন।"

॥ ৮ ॥

সন্তুর নাম শুনে কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। সম্বলপুরে সন্তু ? দু'জন ভদ্রলোক একদিন একটা বিদঘুটে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। একটা নীল পাথরের মূর্তি উদ্ধারের ব্যাপারে। তাঁকে সম্বলপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল খুব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সন্তুকে আগেই ধরে নিয়ে গেছে। এই অংশুমান চৌধুরী লোকটিকে পাগল বলে মনে হয়। সন্তুকে নিয়ে কী করবে কে জানে !

কাকাবাবু দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আমার ওপর আপনার রাগ থাকতে পারে, তা বলে আমার ভাইপো একটা ছোট ছেলে, তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ? আপনাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম ! সন্তুর কয়েক বেলা পড়াশুনো নষ্ট হবে..."

অংশুমান চৌধুরী মেঝে থেকে তাঁর রুপো বাঁধানো লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটার ওপর এমন মমতার সঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন, যেন সেটা তাঁর নিজের হাত কিংবা পা।

মুখ না তুলে তিনি বললেন, "আপনাকে ক্রাচ দুটো ব্যবহার করতে দিয়েছি। সেটাই কি আমার ভদ্রতা নয় ? তা বলে যখন তখন ক্রাচ তুলে মারতে আসবেন, এটাই কি আপনার ভদ্রতা ? আমি ইচ্ছে করলেই আপনার ক্রাচ দুটো সরিয়ে রাখতে পারতুম কি না ? তখন তো এক পাও হাঁটতে পারতেন না !"

তরুণ ডাক্তারটি এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, "এই রকম মারামারির ব্যাপার হবে জানলে আমি অসতুম না। আমাকে এনগেজ করা হয়েছিল ট্রেনে একজন অসুস্থ লোকের দেখাশুনো করার জন্য।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "তোমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল ! তোমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স যা জানে না

সেরকম একটা ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি। সেই ওষুধ একটা পিনের ডগায় অতি সামান্য একটু লাগিয়ে যেকোনও মানুষের শরীরে ফুটিয়ে দিলে, সে পাঁচ-ছ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে! কত বড় আবিষ্কার ভেবে দ্যাখো তো! বড়-বড় খুনে ডাকাতকেও এই সামান্য একটা পিন ফুটিয়ে কাবু করে দেওয়া যাবে! এই আবিষ্কারের জন্য আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার সেই ওষুধ আমার গায়ে ফুটিয়ে পরীক্ষা করেছেন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে?"

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন, কেন? বসুন! আমার ঝুলিতে এরকম আরও অনেক রকম ওষুধ আছে, বুঝলেন? কাজেই এর পর আর হঠাৎ ওরকম যখন-তখন ক্রাচ তুলে মারবার চেষ্টা করবেন না। আপনার একটা পা তো নষ্ট হয়ে গেছেই। এরপর যদি আপনার একটা হাত কিংবা একটা চোখ নষ্ট হয়, সেটা কি ভাল হবে?"

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন বুঝি? আমাকে মেরে ফেলা বরং সহজ, কিন্তু আমাকে ভয় দেখানো কিন্তু খুব শক্ত।"

অংশুমান চৌধুরী ডাক্তারটির দিকে ফিরে বললেন, "পাশের কেবিনে গিয়ে বলুন তো, আমাদের জন্য কফি আর টোস্ট দিতে। একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।"

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, অংশুমান চৌধুরী গোটা একটা সেলুন-কার ভাড়া নিয়েছেন। অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা কে খরচ করছে? অংশুমান চৌধুরী নিজে না সম্বলপুরের সেই দুই ভদ্রলোক? নীল পাথরের মূর্তিটা তা হলে সাধারণ কোনও মূর্তি নয়। এবারে তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল, মূর্তিটা একবার অন্তত দেখা দরকার। তাছাড়া যদি সন্তুকে সম্বলপুরে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সে পর্যন্ত তো যেতেই হবে!"

দরজার কাছ ছেড়ে তিনি সিটে এসে বসলেন।

অংশুমান চৌধুরী কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "আপনার ভাইপোর জন্য চিন্তা করছেন তো? আপনি আপনার ভাইপোর পড়াশুনোর কোনও খোঁজ খবরই রাখেন না। ওদের কলেজে পরীক্ষার সিট পড়েছে বলে পরশু থেকে ওদের সতেরো দিন ছুটি। এই ছুটিতে আমাদের সঙ্গে একটু জঙ্গলে বেড়িয়ে আসবে তাতে ক্ষতি কী? আপনারও চোখ কিংবা হাত নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু আপনার মাথা ন্যাড়া করে দিতে চাই। আমার মতন আপনার মাথাতেও চুল থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আপাতত আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি বরং আর একটু ঘুমিয়ে নিই। সম্বলপুর এলে আমায় ডেকে দেবেন।"

"আপনি কফি-টোস্ট খাবেন না?"

"ধন্যবাদ। এখন আমার আর কিছুর দরকার নেই।"

কাকাবাবু লম্বা সিটের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। কয়েক মিনিট বাদে ঘুমিয়ে পড়লেন সত্যি-সত্যি।

কয়েক ঘণ্টা বাদে একজন কেউ তাঁর গায়ে ঠ্যালা মেরে জাগাল। কাকাবাবু চোখ মেলে দেখলেন। এ সেই রোগা ভীমু।

সে বলল, "উঠুন স্যার, নামতে হবে।"

কাকাবাবু উঠে বসলেন, ট্রেন থেমে আছে। কামরার দরজা খোলা। ডাক্তারটি আগেই নেমে গেছে, অংশুমান চৌধুরী মাথায় টুপি পরে ছড়িটি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কাকাবাবুর দিকে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আপনি নামুন আগে। আমি সব শেষে নামব। ভীমু সব ঠিক ঠাক আছে তো ?"

ভীমু বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার !"

এমন সময় প্ল্যাটফর্মে ঘ্যা-ঘ্যা-ঘ্যা করে একটা দিশি কুকুর ডেকে উঠল। অংশুমান চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভীমু ! ও কিসের ডাক ? কোন জন্তুর ?"

ভিমু বলল, "স্যার, চারজন কুলি লাগিয়েছি সব কুকুর বেড়াল তাড়িয়ে দিতে। একটা বোধহয় কোনওরকমে আবার এদিকে চলে এসেছে। ওরা ঠিক তাড়িয়ে দেবে !"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আগে দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে নাও সব ক্লিয়ার কি না !"

ভীমু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, "ওই যে চলে যাচ্ছে, একটা ছোট্ট নেড়ি কুত্তা। এই ভাগাও, ভাগাও, একদম বাহার হাটাও, উধার খাড়া রহো !"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "প্ল্যাটফর্মে গন্ধ স্প্রে করে দাও। আমি এখানেও বদ গন্ধ পাচ্ছি।"

কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিলেন। তারপর ক্রাচ দুটি বগলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

প্ল্যাটফর্মে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কাকাবাবুকে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলল, "নমস্কার রাজাবাবু ! নমস্কার ! পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো ! বড্ড লম্বা জার্নি। ঘুম হয়েছিল আশা করি।"

কাকাবাবুকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য খানিকটা কসরত করতে হয়। সেই লোকটি কাকাবাবুকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও কাকাবাবু নিজেই কোনওক্রমে নামলেন নীচে। তারপর বললেন, "আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না !"

নীল রঙের সাফারি সুট পরা লম্বা মতন সেই লোকটি বিগলিতভাবে হেসে

বলল, "আমার নাম অসীম পট্টনায়ক। আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আপনার মতন বিখ্যাত লোক যে এখানে আসতে রাজি হয়েছেন সে জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ হয়েছি। আজ সন্ধে বেলাতেই মিটিং, আপনি দুপুরে রেস্ট নিয়ে নেবেন, তারপর..."

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "মিটিং, কিসের মিটিং ?"

যুবকটি বলল, "এখানকার দু-তিনটি ক্লাব মিলে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছে, সেখানে আপনি আপনার দু-চারটি অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবেন। আমার দাদা বলেছেন কী আপনি আসতেই চাইছিলেন না... আমরা খুব আশা করে ছিলাম..."

যুবকটি পিছন ফিরে বলল, "এই মালা, মালা কোথায় ?"

পেছন থেকে দু'জন লোক ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এল এবং কাকাবাবু কোনও আপত্তি জানাবার আগেই তাঁর গলায় পরিয়ে দিল।

কাকাবাবু মনে-মনে রাগলেও মুখের ভাবটা গম্ভীর করে রাখলেন। তাঁকে যে জোর করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, তা যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেই জন্যই বোধহয় এইসব ফুলের মালা টালার ব্যবস্থা ! মিটিং-এ বক্তৃতা দেওয়ার কথা তো তাঁকে এর আগে কেউ একবারও বলেনি।

অসীম পট্টনায়ক বলল, "আসুন স্যার। এদিকে আসুন। গাড়ি রয়েছে।"

কাকাবাবু বিনা প্রতিবাদে এগিয়ে গেলেন ওদের সঙ্গে ট্রেন জার্নির পরই তাঁর স্নান করতে ইচ্ছে করে। জামা-কাপড় পালটাতে ইচ্ছে করে। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও পোশাক নেই। এইসব চিন্তাই তাঁর মাথায় ঘুরছে এখন। অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা বড় স্টেশান ওয়াগানে উঠতে গিয়ে তিনি দেখলেন, কাছেই একটা থামের আড়ালে একটা ছোট বিড়াল ছানা বসে আছে গুটিসুটি মেরে। কাছাকাছি আর কোনও কুকুর বিড়াল দেখতে পেলেন না। ভীমুর লোক সেগুলোকে সব তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিড়াল ছানাটি বোধহয় ওদের চোখে পড়েনি।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু অসীম পট্টনায়ককে জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে কত দূর যেতে হবে ?"

অসীম বলল, "খুব বেশিদূর নয় স্যার। মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জার্নি।"

"যাওয়ার পথে আমরা কি শহরের মধ্য দিয়ে যাব ?"

"তা যেতে পারি। যদিও অন্য রাস্তা আছে। কেন বলুন তো স্যার ?"

"একটা জামা-কাপড়ের দোকানের সামনে নামতে হবে। আমার দু-একটা গেঞ্জি-জামা কেনা দরকার।"

"সেজন্য চিন্তা করবেন না, স্যার। সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের

এখানে যখন দয়া করে এসেছেন, তখন আপনার সব দায়িত্ব আমাদের।"

"আমার গেঞ্জি জামা আমি নিজে দেখে কিনতে চাই।"

"বলছি তো স্যার, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই তো, উনিও এসে গেছেন।" কাকাবাবু দেখলেন স্টেশন গেট পেরিয়ে বাইরে আমাদের অংশুমান চৌধুরী। চোখে কালো চশমা। এক হাতে তিনি নিজের নাক টিপে আছেন, অন্য হাত ধরে আছে তাঁর সহকারী ভীমু। খুব সম্ভবত চোখ বুজে আছেন অংশুমান চৌধুরী।

অসীমরা এগিয়ে গেল তাঁকে গাড়ির কাছে খাতির করে নিয়ে আসার জন্য। অংশুমান চৌধুরীর জন্য আর-একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে। পাশেই সেই গাড়িটা দাঁড়াল। সে গাড়ির সব কাচ রং করা। সিনেমার নায়ক-নায়িকারা এই রকম কাচ তোলা গাড়িতে যায়।

অংশুমান চৌধুরী সেই গাড়ির কাছে এলেন। তখনও চোখ খোলেননি। তবে নাক থেকে হাতটা সরিয়ে বললেন, "ভীমু আমার লাঠিটা কই?"

ভীমু বলল, "লাঠিটা যেন কার হাতে দিলাম? লাঠি, লাঠি, এই, স্যারের লাঠিটা দাও।"

অংশুমান চৌধুরী বিরক্তভাবে বললেন, "আমার লাঠি তুই অন্য লোকের হাতে দিয়েছিস? ইডিয়েট, বলেছি না, ওটা কক্ষনো কাছ ছাড়া করবি না। কোথায় গেল লাঠি, কে নিল?"

উত্তেজিতভাবে অংশুমান চৌধুরী একটু ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই তাঁর এক পায়ের একটা ধাক্কা লাগল বিড়াল ছানাটার গায়ে, অমনি বিড়াল ছানাটা ভয় পেয়ে খুব জোরে ডেকে উঠল। ম্যা -ও -ও! ফ্যাঁচ!

সঙ্গে সঙ্গে অংশুমান চৌধুরী তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ও কী? ওটা কী? ওরে ভীমু ওটা কোন্ প্রাণী।"

অসীম বলল, "ও কিছু নয় স্যার, একটা সামান্য বিড়াল!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমায় আঁচড়ে দিয়েছে? ভীমু, আঁচড়ে দিয়েছে? কামড়ে দিয়েছে?"

ভীমু বলল, "না স্যার, কিছু করেনি!"

অংশুমান চৌধুরী বলল, "হ্যাঁ, আঁচড়ে দিয়েছে। আমি টের পাচ্ছি! জ্বালা করছে। ওরে বাপরে, মেরে ফেলবে আমাকে! ভীমু বিশ্বাসঘাতক..."

কথা বলতে-বলতে অংশুমান চৌধুরী অত বড় লম্বা শরীরটা নিয়ে ধপাস করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

॥ ৯ ॥

স্টেশন থেকে বেরোবার সময় সন্তু লক্ষ করল, এটা সম্বলপুর স্টেশন নয়। যদিও ট্রেনের খাকি পোশাক পরা লোকটি বলেছিল, তাদের সম্বলপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই জায়গাটার নাম ধওলাগড়। ছোট স্টেশন, তার বাইরে সুরকির রাস্তা। সেখানে দু-তিনটি সাইকেল রিকশা আর-একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। সন্তু আগে থেকেই বুঝতে পারল, টাঙ্গাটা এসেছে তাদের জন্যই। সাধারণ ভাড়ার টাঙ্গা নয়। বেশ ঝকমকে তকতকে, ঘোড়াটিও বেশ তেজী।

সিল্কের পাঞ্জাবি পরা লর্ড নামের লোকটি সামনের দিকে উঠে বসল গাড়োয়ানের সামনে। দু'বার শিস দিয়ে ডাকল, "টম! টম!" কুকুরটি এক লাফ দিয়ে চলে এল তার পাশে। তারপর লর্ড সন্তু আর জোজোদের দিকে ফিরে বলল, "তোমরা ভাই পেছন দিকে উঠে পড়ো!"

সন্তু উঠতে যাচ্ছিল, জোজো তার হাত ধরে টেনে নামাল। তারপর সে সামনের দিকে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যে আমাদের নিতে স্টেশনে এসেছেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছে?"

লর্ড বলল, "কেউ তো পাঠায়নি, আমি নিজেই এসেছি।"

জোজো বলল, "আপনি কী করে জানলেন আমরা এই ট্রেনে আসব? আমাদের দু'জনের নামই বা জানলেন কী করে?"

"এসব সামান্য ব্যাপার জানা এমন কী শক্ত? মানুষের নামের সঙ্গে চেহারার খুব মিল থাকে। তোমার নাম জোজো, তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, তোমার নাম কিছুতেই সন্তু হতে পারে না। আর তোমার বন্ধুটিকে দেখলে বোঝা যায় সে খুব শান্ত-শিষ্ট ছেলে, তাই তার নাম সন্তু! আর আমাকে দেখলেই কি মনে হয় না, আমার নাম লর্ড?"

এই কথা বলে সে হেসে উঠল হা-হা করে। জোজো কিন্তু হাসল না, ভুরু কুঁচকে বলল, "সরি, আমার তা মনে হয়নি। যাই হোক, আপনি এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?"

লর্ড বলল, "ওই যে বললাম, তোমার পিসেমশাই আর ওর কাকাবাবুর কাছে! অর্থাৎ মিঃ অংশুমান চৌধুরী আর মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীর কাছে।"

"ওঁরা দু'জনে একই জায়গায় আছেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!"

"আই ডোন্ট বিলিভ ইউ!"

তারপর সে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সাউন্ডস ভেরি ফিসি, বুঝলি? আমার পিসেমশাই আর তোর কাকাবাবু একই জায়গায় রয়েছেন। এটা বিশ্বাস করা যায়?"

পকেট থেকে একটা দামি সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরাতে ধরাতে লর্ড

বলল, "বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী আছে ? আমার সঙ্গে গেলেই তো দেখতে পাবে।"

জোজো বলল, "আমরা যদি আপনার সঙ্গে না যেতে চাই ?"

লর্ড ভুরু তুলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল জোজোর দিকে। গাড়োয়ানটির দিকে ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলল। তারপর আবার জোজোর দিকে ফিরে বলল, "না যদি যেতে চাও, তা হলে কী আর জোর করে ধরে নিয়ে যাব ? মিঃ রায়চৌধুরী আর মিঃ চৌধুরী বললেন, এই ছেলেদুটি বেড়াতে ভালবাসে, আজ বিকেলবেলা জঙ্গলে যাওয়া হবে..."

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আপনি বলুন তো, অংশুমান চৌধুরীকে কী রকম দেখতে ?"

লর্ড আবার শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "পরীক্ষা করা হচ্ছে আমাকে ? এ তো বেশ মজার ব্যাপার ! আমার কত কাজ নষ্ট করে তোমাদের নিতে এলুম এখানে, আর এখন আমাকেই তোমরা অবিশ্বাস করছ ? মিঃ অংশুমান চৌধুরী বেশ লম্বা, আমার চেয়েও লম্বা, গায়ের রং ফর্সা, মাথায় একটা টুপি, সেই টুপিটা খুললেই অমনি দেখা গেল মাথায় একটাও চুল নেই !"

জোজো সন্তুর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কী করবি ?"

সন্তু বলল, "চল, যাওয়া যাক !"

দু'জনে উঠে বসল টাঙ্গার পেছনে। সেটা একটু বাদেই বেশ জোরে দৌড়তে লাগল। রাস্তা ভাল নয়। ঝাঁকুনির চোটে ওদের লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হচ্ছে।

সেই অবস্থাতেই জোজো সন্তুর কাছে ফিসফিস করে বলল, "এই লোকটা নির্ঘাত স্পাই !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল "কাদের স্পাই ?"

"তা জানি না। তবে স্পাই হতে বাধ্য। দেখছিস না, কী রকম পলিশ্‌ড চেহারা, আর মিটিমিটি হাসছে।"

স্পাইরা সিল্কের জামা পরে মিটিমিটি হাসে কি না, সে সম্পর্কে সন্তুর কোনও ধারণা নেই। জোজো তো যাকে-তাকে যখন-তখন স্পাই বানিয়ে ফেলে। তবে একটা জিনিস অদ্ভুত লাগছে। এ-পর্যন্ত কেউ তার ওপর একবারও জোর জবরদস্তি করেনি। প্রথমে যে লোকদুটো কাকাবাবুর নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল, তাদের অবিশ্বাস করে সন্তু তো না যেতেও পারত ! তারপর হাওড়া স্টেশনে আসা, ট্রেনে ওঠা...কেউই তাকে জোর করে আনেনি। অবশ্য জোজোকে এরা অজ্ঞান করে এনেছে। সত্যি কি পিঠের মধ্যে কিংবা জোজোর হাতে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল ? মুশকিল হচ্ছে, জোজোর মুখ থেকে ঠিক ঠিক ঘটনাটি জানাই শক্ত।

টাঙ্গাটা যে রাস্তা দিয়ে চলছে, সেদিকে কোনও বাড়ি-ঘর নেই। ফাঁকা

এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। দূরে একটা পাহাড়ের রেখা। এরা কোথায় চলেছে কে জানে!

একটা জায়গায় দেখা গেল কয়েকটা দোকানপাট। সেখানে টাঙ্গাটা থেমে গেল হঠাৎ। লর্ড পেছন ফিরে বলল, "এখানে খুব ভাল জিলিপি পাওয়া যায়। একটু জিলিপি খাওয়া যাক, কী বলো? তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?"

রাত্তিরে ভাত-টাত কিছু খাওয়া হয়নি। দু'একটা মাত্র স্যান্ডউইচ। সন্তুর খিদে পেয়েছে খুবই। জিলিপির নাম শুনেই যেন তার খিদে আরও বেড়ে গেল।

লর্ড নেমে পড়ল জিলিপি নেওয়ার জন্য। তার কুকুরটাও লাফ দিয়ে নামল তার সঙ্গে সঙ্গে। এত বড় চেহারার একটা কুকুর। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করে না। শুধু সে খুব জোরে জোরে ল্যাজ নাড়ে।

জিলিপি ভাজার গন্ধ নাকে আসছে। জোজো হঠাৎ বলল, "ওই দ্যাখ সন্তু! রাস্তার ওপাশের বাড়িটা!"

সেটা একটা একতলা টালির বাড়ি। তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা "পুলিশ চৌকি"। সামনে একটা ভাঙা লরি দাঁড়িয়ে আছে।

জোজো বলল, "ওই তো থানা। ওখানে একটা খবর দিতে হবে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "থানায় কী বলবি?"

জোজো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তড়াক করে নেমে গেল টাঙ্গা থেকে। সন্তু নামল না। থানায় গিয়ে কী বলা হবে? এই লোকটা তাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? এ কথা শুনলে পুলিশরা হাসবে না? যারা জোর করে নিয়ে যায়, তারা কখনও থানার কাছে গাড়ি থামিয়ে জিনিস কেনে?

জোজো বেশি দূর যেতে পারল না। রাস্তাটা পার হতেই টম তীব্রভাবে ছুটে গিয়ে সোজা তার বুকের ওপর দুটো থাবা মেলে দাঁড়াল। জোজো চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, সেইভ মি! সেইভ মি!"

লর্ড দৌড়ে যেতে যেতে হুকুমের সুরে বলল, "টম, টম, কাম ব্যাক! কাম হিয়ার!"

প্রভুর হুকুম শুনে টম ছেড়ে দিল জোজোকে। ততক্ষণে সন্তুও নেমে পড়েছে। টমকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে, খুব ট্রেনিং পাওয়া কুকুর। সহজে কামড়াবে না, শুধু ভয় দেখাবে।

লর্ড জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, হঠাৎ তুমি দৌড়তে গেলে কেন? টম কারও দৌড়নো পছন্দ করে না।"

জোজো বলল, "আমার ছোট বাথরুম পেয়েছে।"

লর্ড হেসে বলল, "ও, এই ব্যাপার! তা আমাকে আগে বললেই হত। ওই যে বড় গাছটা দেখা যাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে মাঠে নেমে যাও। আস্তে-আস্তে

যাও, দৌড়বার দরকার নেই।"

টম সন্তুর কাছে এসে তার গায়ের গন্ধ শুঁকে তারপর সন্তুর উরুতে মাথা ঘষতে লাগল। যেন সে সন্তুর কাছ থেকে আদর চাইছে। সন্তু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

লর্ড জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাড়িতে কুকুর আছে বুঝি ?"

সন্তু মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকে টম ঠিক টের পেয়েছে। তুমি যখন কুকুর ভালবাস, তোমার সঙ্গে টমের খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। চলো জিলিপি খেতে শুরু করি !"

জোজো একটু বাদে ফিরে এল। সন্তু লক্ষ করল, জোজো থানায় ঢুকল না। জিলিপি খাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর ওরা আবার চাপল টাঙ্গায়।

চলতে শুরু করে জোজো বলল, "তুই ভাবিস না, আমি কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছি। ওটা আমার অভিনয়, বুঝলি। স্রেফ অভিনয়। আসলে আমি শেষ মুহূর্তে মাইন্ড চেঞ্জ করলুম। ভেবে দেখলুম, থানায় গিয়ে কী হবে ? এই মিস্ট্রিটা আমরাই সল্‌ভ করব। তুই আর আমি, পুলিশের সাহায্যের কোনও দরকার নেই। সম্বলপুর কোন্ স্টেটের মধ্যে রে ?"

"ওড়িশায় !'

"ওঃ, তবে তো কোনও চিন্তার নেই। ওড়িশার পুলিশের একজন আই. জি. আমার ছোট কাকার বন্ধু। আমাদের বাড়িতে কতবার এসেছেন। একবার তাঁকে খবর পাঠালেই...তাঁর নাম শুনলেই এরা ঘাবড়ে যাবে।"

"কী নাম তাঁর ?"

"চুপ ! এখন বলব না, এই লোকটাকে এক্ষুনি কিছু জানাবার দরকার নেই। তুই ঘাবড়াসনি, সন্তু, আমি যখন সঙ্গে আছি, তোর কোনও চিন্তা নেই।"

"ভাগ্যিস তুই এই কথাটা বললি, জোজো। সত্যি আমি একটু একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম।"

আর আধঘণ্টা পরে টাঙ্গাটা এসে থামল একটা বাগানবাড়ির সামনে। দোতলা সাদা রঙের বাড়ি, অনেক কালের পুরনো, কোথাও কোথাও দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। বাগানটারও বিশেষ যত্ন নেই।

টাঙ্গা থামতেই টম লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেল বাগানের মধ্যে। সেখানে আর দুটো ছোটখাটো চেহারার কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিশ্চয়ই বাইরের কুকুর, টমকে দেখেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে পালাল।

জোজো লর্ডকে জিজ্ঞেস করল, "আমার পিসেমশাই এই বাড়িতে রয়েছেন ?"

লর্ড বলল, "হ্যাঁ, সেই রকমই তো কথা !"

"ইমপসিবল ! এখানে এত কুকুর ! ইউ আর এ লায়ার !"

এবারে রেগে গেল লর্ড। তার ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল। সে কড়া গলায় বলল, "কী, তুমি আমাকে লায়ার বললে ? ঠিক আছে, বিশ্বাস করতে না চাও, এসো না। তোমাকে কি আমি ধরে রেখেছি ? তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।"

তারপর সে তো গটগট করে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

॥ ১০ ॥

স্নান করে, খাওয়াদাওয়া সেরে কাকাবাবু ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তাঁর কিন্তু আজ তিনি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই বাড়িটায় পৌঁছবার পর কাকাবাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কাকাবাবু তখনই বলেছিলেন, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাই।

আসবার পথে একটা দোকানে গাড়ি থামিয়ে কাকাবাবু দু'জোড়া করে প্যান্ট গেঞ্জি ইত্যাদি কিনে এনেছেন। তাঁর গায়ে এখন নতুন পোশাকের গন্ধ। ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। জীবনে তিনি অনেক ভয়ংকর প্রকৃতির লোক দেখেছেন। অনেক বিপদে পড়েছেন, অনেকবার খুদে ডাকাতের হাতে বন্দী হয়েছেন, কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে পরিচিত লোকেরা তাঁকে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেছে, এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। এরা সম্বলপুর স্টেশনে তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে পর্যন্ত, যেন তিনি একজন সম্মানিত অতিথি। অথচ ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশান দিয়ে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা হালকা করে দেখছিলেন। এখন তাঁর মনে মনে রাগ জমছে। অংশুমান চৌধুরীর পাগলামি তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তবে, অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে এখানকার যারা হাত মিলিয়েছে, তাদেরও একবার ভাল করে দেখা দরকার। সন্তুকেই বা এরা কোথায় রেখেছে ?

কাকাবাবু দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে একটা টানা বারান্দা পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ঘর। বারান্দার রেলিংয়ের ওপরে গ্রিল লাগানো, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনের রাস্তা। এরা কোনও পাহারার ব্যবস্থা রাখেনি। কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এরা ভাল করেই জানে যে, সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে কাকাবাবু একা-একা চলে যাবেন না।

বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা আসতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন সিঁড়ির পাশের একটি ঘরের দরজা খোলা। সেখানে বসে আছে অসীম পট্টনায়ক, আর কাকাবাবুর পূর্ব পরিচিত মাধব রাও। অসীম পট্টনায়কের গায়ে এখনও নীল

সাফারি সুট আর মাধব রাও পরে আছে পাজামা আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। মাধব রাওয়ের বয়েস ষাটের বেশি হলেও বেশ শক্ত সমর্থ শরীর, নাকের নীচে মোটা গোঁফ।

কাকাবাবুকে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। মাধব রাও খাতির করে বললেন, "আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন তাই ডিস্টার্ব করিনি। ভালমতন বিশ্রাম হয়েছে তো?"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "আসুন স্যার, ভেতরে এসে বসুন। আমাদের আজকের সন্ধেবেলার মিটিংটা ক্যানসেল হয়ে গেছে। পরে আর একদিন হবে। মিঃ অংশুমান চৌধুরীও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।"

কাকাবাবু এই ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখা, তা দেখে কাকাবাবুর চা তেষ্টা পেল, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে মাধব রাওয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মাধব রাওয়ের ঠোঁটে একটা লম্বা চুরুট। কিছুদিন আগে মাধব রাও অন্য একজন ভদ্রলোককে নিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাকাবাবু ওঁকে চুরুট খেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর সামনে। আজ মাধব রাও চুরুট নামালেন না মুখ থেকে, ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মাধব রাও, আপনি এক সময় দিল্লিতে সরকারি চাকরি করতেন, তাই না?"

মাধব রাও মাথা হেলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক, আপনার মনে আছে দেখছি। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতাম, এখন রিটায়ার করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "রিটায়ার করার পর এইসব ইল্‌লিগ্যাল কাজ শুরু করেছেন? আপনার নামে অভিযোগ জানালে আপনার পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে!"

দারুণ অবাক হয়ে মাধব রাও বললেন, "ইল্‌লিগ্যাল কাজ? আপনি বলছেন কী? আই অ্যাম স্ট্রিকটলি অন দা সাইড অব ল।"

"কিডন্যাপিং। অ্যাবডাকশান, এসব বেআইনি কাজ নয়? আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা জোর করে ধরে এনেছেন।"

এবারে অসীম পট্টনায়ক অবাক হয়ে বলল, "জোর করে? আপনার তো স্যার সম্বলপুরে একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা। আপনি নিজে আসতে রাজি হয়েছেন।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "আমি কোনওদিন কোনও পাবলিক মিটিংয়ে যাই না। এখানকার কোনও মিটিংয়ের কথাও আমি আগে শুনিনি। আমাকে আনা হয়েছে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে কিংবা অজ্ঞান করে, আর সন্তুকে কীভাবে আনা হয়েছে তা আমি এখনও জানি না। তারও সম্বলপুরে আসবার কোনও

কারণ নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আপনি রেগে যাচ্ছেন মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি সব কথা আগে শুনুন। আপনাকে গোড়া থেকে খুলে বলছি, সব শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আমাদের কোনও দোষ নেই। তার আগে একটু চা খাওয়া যাক। আপনি চা খাবেন তো, না কফি আনব?"

কাকাবাবু বললেন, "চা হলেই চলবে। আগে আপনি কি বলতে চান, সেটাই শুনি।"

একটা ট্রে-তে টি পট কাপ, ছাঁকনি ইত্যাদি সব সাজানো রয়েছে। পট থেকে কয়েকটি কাপ চা ঢালতে-ঢালতে মাধব রাও বললেন, "আমার বন্ধু অনন্ত পট্টনায়ক একটা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। তিনি থাকলে তাঁর মুখ থেকেই সব শুনতেন। যাই হোক, আমিই বলছি, আমি আর অনন্তবাবু কলকাতায় আপনার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম, মনে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে। আপনারা আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি পরিরষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে প্রস্তাবে আমি ইন্টারেস্টেড নই। ঠিক কি না?"

মাধব রাও একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, সেদিনও আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন, আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বলা যায়। তা আপনার বাড়ি, আপনার যদি কোনও লোকের কথা পছন্দ না হয়, তাহলে তো চলে যেতে বলতেই পারেন। তাতে আমরা কিছু মনে করিনি। আপনাকে অনুরোধ করেছিলুম, একবার অন্তত সম্বলপুর থেকে ঘুরে যেতে, তাতেও আপনি রাজি হননি!"

"সেই জন্যই আমাকে জোর করে ধরে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন?"

"আরে ছি ছি, আপনার মতন লোককে জোর করে ধরে আনতে পারি কখনও? সে-রকম চিন্তা আমরা মনেও কখনও স্থান দিইনি। আপনি রিফিউজ করার পর আমরা আরও দু' একজনের কাছে যাই। তাদের মধ্যে মিঃ অংশুমান চৌধুরী কাজটা করতে রাজি হন। কিন্তু তিনি একটা শর্ত দেন। তাঁর কাজে আপনাকেও পার্টনার করে নিতে হবে। আমরা বললুম, সেটা তো সম্ভব নয়। আপনি রাজি হবেন না। তো, তিনি বললেন, সে দায়িত্ব তিনিই নেবেন। তিনিই আপনাকে সম্বলপুরে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন। কী করে তিনি আনবেন, তা আমরা কিছুই জানি না। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে, একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা বলে আপনাকে রাজি করানো হয়েছে।"

"মাধব রাও, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"রায়চৌধুরীবাবু, আপনি যে-কোনও শপথ করতে বলুন। আমি সেই শপথ নিয়ে বলব যে, আপনাকে জোর করে ধরে আনার কথা আমরা চিন্তা করিনি, কোনও ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা।"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "স্যার, আমরা নাম-করা ফ্যামিলি এখানকার। আমাদের বাড়িতে কারুকে জোর করে আটকে রাখব, এ তো অতি লজ্জার কথা ! আপনি একজন সম্মানীয় অতিথি।"

কাকাবাবু বললেন, "আর আমার ভাইপো সন্তু, সে এখানে এল কী করে ?"

মাধব রাও বললেন, "অংশুমানবাবুই বলেছিলেন যে, দুটি ছোকরাও এই সঙ্গে আসবে। তবে তাদের মধ্যে একজন আপনার ভাইপো কি না তা আমরা জানব কী করে ?"

"দুটি ছোকরা মানে ? কত বয়েস তাদের ?"

"এই আঠারো-উনিশ হবে। কলেজের ছোকরা মনে হয়। অংশুমানবাবু কেন তাদের আনিয়েছিলেন, তাও আমরা জানি না।"

"সেই ছেলেদুটি কোথায় ?"

"তারা আছে অন্য বাড়িতে। তাদের চার্জও আমরা নিইনি। অংশুমানবাবুর চেনা লোক তাদের ভার নিয়েছে।"

"অংশুমানবাবু ভেবেছেন কী ? তিনি যা খুশি তাই-ই করবেন। ডাকুন অংশুমানবাবুকে।"

"তাঁকে তো এখন ডাকা যাবে না। স্টেশনে পড়ে গিয়ে উনি কোমরে চোট পেয়েছেন, মনেও একটা শক পেয়েছেন। তাই ওঁর নিজের ডাক্তার ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"মাধব রাও, আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে জানতাম। এই অংশুমান চৌধুরী আপনাদের কী সাহায্য করবে ? যে লোক একটা বিড়ালের বাচ্চা দেখে ভয় পায়, সেই লোক যাবে জঙ্গলের মধ্যে একটা মূর্তি উদ্ধার করতে ?"

মাধব রাও গোঁফে তা দিতে দিতে নিঃশব্দে হাসলেন, চুরুটটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বললেন, "আমাদের বরাবরই ধারণা, আপনিই একমাত্র আমাদের সাহায্য করতে পারেন। অংশুমান চৌধুরী আপনাকে এখানে আসতে রাজি করাবেন শুনেই আমরা তাঁর সব কথা মেনে নিয়েছি।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা মূর্তি চুরির মতন জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাইছেন, আপনার লজ্জা করে না ? আমি কিছুতেই আপনাদের প্রস্তাবে রাজি হব না। আমি আজ রাতেই কলকাতার ট্রেন ধরব, তার আগে আমার ভাইপো সন্তুকে এনে দিন আমার কাছে।"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "স্যার হিরাকুদ ড্যাম দেখতে যাবেন না ? সম্বলপুর এসে হিরাকুদ না দেখে কেউ ফিরে যায় না। আর আমাদের সেই মিটিংটা হবে পরশুদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন। আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাঁকে সব কথা খুলে বলব।"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "ট্যাক্সির দরকার কী আমাদের বাড়ির গাড়ি আছে,

তাতে আপনি যেখানে ইচ্ছে করবেন, সেখানেই যেতে পারবেন।"

মাধব রাও বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি আমাদের নামে আর একটা মিথ্যে দোষ দিলেন। আমরা আপনাকে কোনও মূর্তি চুরি করার কথা একবারও বলিনি, আমরা আপনাকে অনুরোধ করেছি একটা চুরি-যাওয়া মূর্তি উদ্ধার করে দিতে। সেটা কি অপরাধ? আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব? আপনি এ-কাজ করতে রাজি হোন বা না হোন, এ বাড়ির মূর্তির কালেকশানটা একবার দেখবেন? একটু দেখুন না, কতক্ষণই বা লাগবে? তারপর আপনি না হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাবেন।"

কাকাবাবু অগত্যা রাজি হলেন। পুরনো মূর্তি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আছে। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, চলুন!"

বাড়িটি পুরনো আমলের। দেখেই বোঝা যায় বেশ শৌখিন লোকের বাড়ি। তবে এখন এ-বাড়িতে বিশেষ কেউ থাকে না। এই পরিবারের মেয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা এখন থাকে ভুবনেশ্বরের অন্য একটি বাড়িতে।

একতলার সিঁড়ির নীচে খানিকটা অন্ধকার-মতন জায়গা। তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে অসীম পট্টনায়ক একটা লুকোনো দরজা খুলল চাবি দিয়ে। মাধব রাও কাকাবাবুকে বললেন, "আসুন, আপনার আর একটু কষ্ট হবে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, আমাদের স্ট্যাচু কালেকশানের ঘরটা মাটির নীচে।"

মাটির নীচের ঘর শুনেই কাকাবাবুর খটকা লাগল। মাধব রাও এতক্ষণ যা বলল, তা সবই যদি মিথ্যে হয়, তা হলে এবারে ওরা তাঁকে মাটির নীচের ঘরে নিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করতে পারে। ওদের দু'জনের সঙ্গে কাকাবাবু গায়ের জোরে পারবেন না, তা ছাড়া মাধব রাওয়ের কাছে রিভলভার থাকা খুবই সম্ভব। কাকাবাবুর কাছে কিছুই নেই।

তবু তাঁকে যেতেই হবে। এখন আর যাব না বলা যায় না। তিনি মাধব রাওয়ের পেছন-পেছন চললেন। অসীম আগেই নেমে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চমৎকার নিয়ন আলোর ব্যবস্থা আছে, এমনকী, পাখাও আছে। ঘরটি বেশ বড়, তাতে বেশ কিছু ছবি এবং গোটা কুড়ি-পঁচিশ মূর্তি সাজানো।

মাধব রাও বললেন, "অনন্তবাবু থাকলে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমিও কিছু-কিছু জানি। এই যে মূর্তিগুলি দেখছেন, এগুলো আগে ওপরেই থাকত। অনন্তবাবুর বাবার শখের কালেকশান। এ-বাড়ির ছাদে একটা ঠাকুরঘর আছে। এক সময় সেখানে পুজোও হত। এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে দামি মূর্তিটাই চুরি গেছে। তারপর থেকে অন্য মূর্তিগুলো এই ঘরে এনে সাবধানে রাখা হয়েছে। এই যে এই দিকটায় আসুন!"

ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কাঠের বেদীর ওপর দুটি ছোট-ছোট নীল রঙের নারী মূর্তি রয়েছে। বেদীর দু' পাশে মূর্তি দুটি বসানো, মাঝখানটা ফাঁকা।

মাধব রাও ডাকলেও কাকাবাবু চট করে সেদিকে গেলেন না। অন্য মূর্তিগুলি যত্ন করে দেখতে লাগলেন। কয়েকটি বেশ পুরনো মনে হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে যেরকম মূর্তি আছে, অনেকটা সেই ধাঁচের। কাকাবাবু দু' একটা মূর্তির গা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কিছু পরীক্ষা করলেন। তারপর চলে এলেন মাধব রাওয়ের কাছে।

মাধব রাও বললেন, "এই যে দুটি নীল মূর্তি দেখছেন, এ দুটি রাধা আর লক্ষ্মীর। এর মাঝখানে একটা ছিল বিষ্ণু মূর্তি। ওপরের ঠাকুর ঘরে সেই মূর্তিটাই পুজো করা হত। সেই মূর্তিটাই চুরি গেছে, অবশ্য অনেককাল আগেই চুরি হয়েছে। কিন্তু এখন সেটার সন্ধান পাওয়া গেছে। মূর্তিটি কিন্তু বেশ বড়। টারকোয়াজের মূর্তি, এক হিসেবে সেটা অমূল্য। সেটার একটা ছবি আছে না, অসীম ?"

অসীম বলল, "হ্যাঁ, এখানেই তো ছিল, দেখছি।"

অসীম নিচু হয়ে ছবিটা খুঁজতে লাগল, কাকাবাবু ছোট একটা নীল মূর্তি হাতে তুলে নিয়ে, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

কাঠের বেদীটার তলা থেকে অসীম ছবিটা তুলে আনল। সেটা একটা হাতে-আঁকা ছবি। সেটা বিষ্ণু মূর্তির ছবি বলে চেনা যায় না। দাঁড়ানো অবস্থায় একজন পুরুষ, তার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গাম বুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট। ভুবনেশ্বরে এরকম একটা সূর্য মূর্তি আছে।

কাকাবাবু ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে যেতেই সিঁড়িতে একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন নেমে আসছে। অসীম বলল, "কে ?" মাধব রাও পকেটে হাত দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল লম্বা ছিপছিপে একজন মানুষ, মাথায় তার একটাও চুল নেই, চোখে কালো চশমা। অংশুমান চৌধুরী। তাঁর হাতে একটা বড় কাগজের বাক্স।

কয়েক পা এগিয়ে এসে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছবি দেখে উনি কী বুঝবেন ?"

কাগজের বাক্সটা খুলে তিনি বড় একটা নীল রঙের পুরুষ-মূর্তি বার করে উঁচু করে ধরে বললেন, "এই দেখুন সেই আসল মূর্তি।"

॥ ১১ ॥

স্টেশন ওয়াগানটা কোশুগাঁওতে যখন পৌঁছল তখন রাত প্রায় এগারোটা। চারদিক একেবারে নিঝুম, রাস্তায় আর কোনও গাড়ির শব্দ পর্যন্ত নেই। কোনওদিকে এক বিন্দু আলোও দেখা যায় না।

গাড়ি চালাচ্ছেন মাধব রাও নিজেই। কাকাবাবু বসে আছেন তার পাশেই।

গাড়ির মধ্যে রয়েছে অংশুমান চৌধুরী আর তাঁর সহকারী ভীমু। তাদের কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

গাড়ি থামিয়ে মাধব রাও বললেন, "ব্যাস, এই পর্যন্ত! সারা দিন গাড়ি চালিয়ে আমি একেবারে থকে গেছি। আজ রাতের মতন এখানেই রেস্ট নিতে হবে।"

অংশুমান চৌধুরী ঘুমোচ্ছিলেন। গাড়ি থামতেই তিনি জেগে উঠে বসলেন, "পৌঁছে গেছি? কোথায় এলাম? এ জায়গাটার নাম কী?"

মাধব রাও বললেন, "এই তো আপনার কোণ্ডাগাঁও। দেখুন, মাইল পোস্টে নাম লেখা আছে। এবারে কী করবেন?"

অংশুমান চৌধুরী জানলা দিয়ে টর্চ ফেলে রাস্তাটা দেখলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে ডান দিকের রাস্তাটায় চলুন। এক মাইলের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি দেখতে পাবেন, সেখানেই থামবেন। ভীমু, তৈরি হয়ে নে!"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল এবং খানিক বাদে একটা বড় সাদা বাড়িও পাওয়া গেল। সেটা একটা পি.ডব্লু.ডি.-র বাংলো। গেটখোলা, গাড়ির আওয়াজ শুনেই গেটের বাইরে একটি লোক এসে দাঁড়াল।

ভীমু আগে গেট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, "সব ঠিক আছে?"

লোকটি বাংলাতেই বলল, "হ্যাঁ স্যার। সব ঠিক আছে। এখানে কুকুর-বিড়াল কিছু নেই। রান্না-টান্নাও সব করে রেখেছি।"

কাকাবাবু এক দৃষ্টিতে সামনের অন্ধকার দেখছিলেন চুপ করে। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। অনেক দূরে মাদলের শব্দ হচ্ছে, ডুং-ডুং, ডুং-ডুং।

মাধব রাও বললেন, "এবারে নামুন, মিঃ রায়চৌধুরী।"

কাকাবাবু আস্তে আস্তে নামলেন। ডাকবাংলোর গেটের কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু এখানে আছে?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, আপনার ভাইপো আর আমাদের জোজো এখানেই আছে। কোনও চিন্তা নেই।"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "সন্তু, সন্তু?"

কোনও উত্তর এল না। ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "ছেলেদুটি তো চলে গেছে, স্যার?"

অংশুমান চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, "চলে গেছে? তার মানে? কোথায় চলে গেছে?"

লোকটি বলল, "আজ সন্ধেবেলাতেই চলে গেল। ওরা বলল যে, এই জায়গাটা ভাল লাগছে না। তাই বোধহয় নারানপুরের দিকে গেল।

"সঙ্গে কে ছিল?"

"সঙ্গে আর একজন লোক ছিল, নাম ঠিক জানি না।"

কাকাবাবু অংশুমান চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি সন্তুর কথা বলে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এখানেও সন্তুর দেখা পাওয়া গেল না। এরপরেও কি আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এখানেই থাকার কথা ছিল। সন্ধেবেলা ওরা দু'জনে কেন চলে গেল তা আমি জানি না। আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলব কেন? নারানপুর এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাল সকালেই খোঁজ করা যাবে।"

"আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ, মানে, তারা তো ছিলই এখানে। এই, ইয়ে, ছেলে দুটি ডাকবাংলোর খাতায় নাম-টাম লেখেনি?"

ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "হ্যাঁ স্যার, লিখেছে। ওদের সঙ্গের লোকটি সব চার্জ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "কই, খাতাটা দেখাও এঁকে।"

সবাই ঢুকে এল ডাকবাংলোর মধ্যে। কাকাবাবু খাতাটা দেখলেন। সন্তু নিজের নাম লিখেছে। সুনন্দ রায়চৌধুরী। হাতের লেখাটা সন্তুরই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "আপনার চালাকিটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। আপনারা সন্তুকে বলেছেন, আমি এক জায়গায় আছি। সেই শুনে সন্তু সেখানে যাচ্ছে। আবার আমাকে বলছেন, সন্তু ওমুক জায়গায় আছে। আমিও তাই শুনে সেখানে যেতে রাজি হচ্ছি। সন্তুকে এখান থেকে সরানো হল কেন আমি জানতে চাই।"

অংশুমান চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, "আরে মশাই, আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন? আপনার ভাইপো যদি নিজের ইচ্ছেয় অন্য জায়গায় চলে যায়, তা হলে আমি কী করব?"

কাকাবাবু এর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, মাধব রাও হাত তুলে বললেন, "আগে আমাকে একটা কথা বলতে দিন। আমি খুব টায়ার্ড। এই বাংলোতে আমার থাকার ইচ্ছে নেই। আমি আজ রাতেই জগদলপুরে চলে যাব। তার আগে আমার বন্ধু অনন্ত পট্টনায়কের পক্ষ থেকে একটা ফাইনাল কথা বলে নিতে চাই।"

ডাকবাংলোর লোকটির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবেন, প্লিজ। আমি এঁদের দুজনের সঙ্গে প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।"

লোকটি বাইরে চলে যেতেই মাধব রাও দরজা বন্ধ করে দিলেন। চুরুট ধরিয়ে বললেন, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আপনাকে কিংবা আপনার নেফিউ-কে কলকাতা থেকে নিয়ে আসার ব্যাপারে

আমাদের কোনও দোষ দিতে পারবেন না। এসব ব্যবস্থা করেছেন মিঃ অংশুমান চৌধুরী। সে আপনি ওঁর সঙ্গে বুঝে নেবেন। আমরা কেউ আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমরা শুধু আমাদের চুরি যাওয়া মূর্তিটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের মূর্তি সম্পর্কে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আমার কথাটা শেষ করতে দিন। এরপর থেকে আমরা আর আপনাদের কাছে থাকব না। আমি জগদলপুরে দিন-দশেক থাকব। এর মধ্যে আপনাদের একজন যদি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারেন, তাহলে আমরা তিন লক্ষ টাকা দেব। সব খরচ-খরচা আপনাদের। আর যদি দু'জনে এক সঙ্গে উদ্ধার করে আনেন, তা হলে টাকাটা দু'জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আমি কতবার বলব যে, আপনাদের ওই মূর্তি-টুর্তির ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই ?"

মাধব রাও বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি শেষবার অনুরোধ করছি, আপনি আমার সঙ্গে ওরকম ধমক দিয়ে কথা বলবেন না। আপনি কাজ করতে চান না, তো ইউ মে গো টু হেল ! আপনার যা খুশি করুন। আমাদের অফার আমি জানিয়ে দিয়েছি, এখন আমি চলে যাচ্ছি !"

কাকাবাবু মাধব রাও-এর হাত চেপে ধরে বললেন, "না, এখন আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এখন আপনি আমাকে নারানপুরে নিয়ে চলুন। আমি আজ রাতেই সন্তুর খোঁজ করতে চাই।"

মাধব রাও এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অন্য হাতটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আমার ওপর গায়ের জোর ফলাবার চেষ্টা করবেন না। তার ফল ভাল হবে না। আপনাকে আমি নারানপুরে নিয়ে যেতে বাধ্য কেন হব ? আমি কি আপনার হুকুমের চাকর ?"

কাকাবাবু কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "না, আপনি আমার হুকুমের চাকর নন। আমি আপনার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেছি বলে দুঃখিত। আমার মেজাজ ঠিক নেই। আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা কেন অকারণে ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছেন ?"

অংশুমান চৌধুরী কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "কী রাজা রায়চৌধুরী, মাধব রাওকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ? আপনাকে তো সবাই খুব বীরপুরুষ বলে জানে !"

কাকাবাবু বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ কখন শিশুপালকে বধ করেছিলেন জানেন ?

শিশুপালের একশোটা অপরাধ ক্ষমা করবার পর। আপনার অপরাধও কিন্তু প্রায় একশোটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "নিজে ভয় পেয়ে উলটে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? এবার আমার গায়ে একটু হাত ছোঁয়ালে কিন্তু আপনার অন্য পাটা আস্ত রাখব না। আমি যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। আমার যথেষ্ট টাকা আছে। আমার আর টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। ওদের ওই তিন লাখ টাকা পুরস্কারের লোভে আমি-এ কাজে নামিনি। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট চ্যালেঞ্জ আছে। আপনি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারলে ওই তিন লক্ষ টাকা আপনিই পাবেন, আমি ভাগ বসাতে যাব না। আর আপনার আগেই আমি যদি মূর্তিটা সরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সবার সামনে আপনাকে মাথার চুল আর ওই গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে। এবারে আপনাকে আমি ন্যাড়া করবই।"

কাকাবাবু এখনও মাধব রাও-এর হাত ছাড়েননি। অংশুমান চৌধুরীর দিকে তিনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধব রাও-এর চোখ থেকে তিনি চোখ সরাননি। তাঁর ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি খুব মৃদু স্বরে বললেন, "এক্সকিউজ মি!"

তারপরই তিনি বিদ্যুৎ গতিতে মাধব রাও-এর হাত ধরে জোরে একটা টান দিলেন। সেই টানে অতবড় চেহারাটা নিয়েও মাধব রাও উঠে গেলেন শূন্যে, তারপর হুড়মুড়িয়ে পড়লেন অংশুমান চৌধুরীর ঘাড়ে। আচমকা আঘাত পেয়ে অংশুমান চৌধুরী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন।

বিশেষ ব্যস্ততা না দেখিয়ে কাকাবাবু মাধব রাও-এর কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিলেন। অংশুমান চৌধুরীর হাতের লাঠিটা ঠেলে দিলেন দূরে। তারপর মাধব রাও-এর দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "উঠুন, আশা করি আপনার বেশি লাগেনি। আমি দুঃখিত।"

মাধব রাও-এর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এখনও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এইমাত্র যে-কাণ্ডটা ঘটে গেল সেটা ম্যাজিক না অন্য কিছু!

অংশুমান চৌধুরী উপুড় হয়ে পড়ে যন্ত্রণায় উঁ উঁ করছেন। কাকাবাবু মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন, "এনাফ অফ দিস মাংকি বিজনেস। মাধব রাও, আপনি দেখুন, ওই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে কি না। ওর দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করছে না। কিছুতেই আমি রাগ সামলাতে পারছি না। ওকে টেনে তুলুন।"

কাকাবাবু মাধব রাও-এর রিভলভারটা খুলে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। সেফটি ক্যাচটা তিনি লক করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হয়তো আপনারা জানেন না, তাই জানিয়ে রাখছি যে, আমার হাতের ছ'টা গুলির

একটাও ফসকায় না। আমার একটা পা খোঁড়া তাই আমার দুটো হাতে চারজন মানুষের শক্তি। আর মাথাটাও, লোকে বলে, বেশ ধারালো। এরপর থেকে আর কোনও রকম চালাকি আমি সহ্য করব না। উঠে বসুন, আমরা এক্ষুনি নারানপুর যাব। সেখানে সন্তুকে পেয়ে গেলে কালই আমি বাড়ি ফিরব। আপনাদের মূর্তি গোল্লায় যাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।"

অংশুমান চৌধুরী দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠেছেন। কাকাবাবু বললেন, "দেরি করবেন না, উঠুন!"

প্রায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালেন অংশুমান চৌধুরী। কাকাবাবু তাঁর জামার পকেট থাবড়ে দেখলেন আর কোনও অস্ত্র আছে কি না। তারপর রিভলভারের নলের এক খোঁচা দিয়ে বললেন, "নারানপুরে গিয়ে যদি সন্তুকে দেখতে না পাই, তাহলে আপনার ভগবানও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।"

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোবার পর ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "স্যার, খাবার গরম করব?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বাংলোতে কুকুর নেই কেন? কুকুর পোষা ভাল। রাত্তিরবেলা খাবার-দাবার বেঁচে গেলে কুকুরগুলো খেতে পারে। আমাদের এখন খাওয়ার সময় নেই।"

রাত্রির অন্ধকারে স্টেশন ওয়াগনটা ছুটে চলল আবার।

॥ ১২ ॥

একটা গাড়ির আওয়াজে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতেই তার খুব পাতলা ঘুম। তা ছাড়া নতুন কোনও জায়গায় প্রথম রাত্তিরে অন্তত ভাল করে ঘুমই হয় না।

রাত এখন ক'টা হবে কে জানে! দুটো-তিনটের কম নিশ্চয়ই নয়। সন্তুরা শুতেই গেছে বারোটার পর। পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে জোজো। বিছানায় শোওয়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ে, এক ঘুমে রাত কাবার করে দেয়।

গাড়ির শব্দটা দূর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। মনে হল, বাংলোটার চার পাশ দিয়ে গাড়িটা একবার ঘুরে এল, তারপর গেটের কাছে থামল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসে ডাকল, "জোজো, জোজো!"

জোজো উঠল না। সন্তু দু' তিনবার ধাক্কা দিল তাকে। বাংলোর দরজায় খটখট করে শব্দ হচ্ছে, একবার কেউ ডেকে উঠল, "সন্তু, সন্তু!"

কাকাবাবুর গলা চিনতে পেরেই সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, মাধব রাও, ভীমু আর অংশুমান চৌধুরী, তাদের পেছনে রিভলভার হাতে কাকাবাবু। তাঁর এক বগলে শুধু ক্রাচ। সন্তু সামনের তিনজনকে এড়িয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দারুণ স্বস্তির

সঙ্গে বলল, "কাকাবাবু ! তুমি এসেছ !"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে না তাকিয়ে আদেশের সুরে বললেন, "টর্চটা ফেলে দাও, মাথার ওপর হাত তোলো !"

লর্ড নামের লোকটিও আওয়াজ শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঘুম চোখে সে প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর কড়া সুরের হুকুম শুনে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

কাকাবাবু তার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "অংশুমান চৌধুরী, আপনার লোককে বলুন, মাথার ওপর হাত তুলতে, আমি বেশি সময় নষ্ট করতে পারব না।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওরে লর্ড, হাত তোল। যা বলছে শোন !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা সবাই ভেতরে ঢুকুন। সন্তু তুই গিয়ে আলোটা জ্বেলে দে।"

বাংলোটার মাঝখানের ঘরটা খাওয়ার ঘর। একটা গোল টেবিল ও চারখানা চেয়ার রয়েছে। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে অংশুমান চৌধুরী, ভীমু, মাধব রাও আর লর্ড সেই চেয়ারগুলোতে বসলেন। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। রিভলভারটা নামালেন না।

এবার তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন,"তোর বন্ধু কোথায় ?"

সন্তু বলল, "জোজো ঘুমোচ্ছে। ডেকে আনব ?"

কাকাবাবু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে এরপর লর্ড-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি এই ছেলে দুটিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছ ?"

লর্ড যেন আকাশ থেকে পড়ল এই কথা শুনে। চোখ বড়-বড় করে সে বলল, "কিডন্যাপ করব, আমি ? কেন ? আমি কত কষ্ট করে ছেলে দুটির সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছি। যেখানে যেতে চাইছে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি, আর আপনি বলছেন, ওদের কিডন্যাপ করেছি ? ওদের কি ধরে রাখা হয়েছে, না বেঁধে রাখা হয়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের কলকাতা থেকে এতদূর টেনে আনা হল কেন ? আমি সেটা জানতে চাই !"

লর্ড সেইরকমই অবাকভাবে বলল, "ওদের কলকাতা থেকে টেনে আনা হয়েছে ? কী আজব কথা বলছেন মশাই ? আমি স্বচক্ষে দেখলুম, ওরা ট্রেন থেকে নামল, আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছেতে গাড়িতে চাপল, সম্বলপুরে গেল, তারপরেও আমাকে এতদূর পর্যন্ত ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, ওরা নাকি আপনাকেই খুঁজছে !"

এই সময় জোজোকে নিয়ে ফিরে এল সন্তু। লর্ড ওদের দিকে আঙুল তুলে বলল, "আপনি ওদেরই জিজ্ঞেস করুন না। একবারও ওদের গায়ে হাত দিয়েছি ? একটুও জোর করেছি !"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওদের কেন কলকাতা থেকে আনা হয়েছে আমি বলছি। জোজোকে এনেছি সন্তুকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। একজন বন্ধু থাকলে আপনার ভাইপো সন্তু একা-একা বোধ করবে না। আর সন্তুকে আনা হয়েছে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য। আপনি বাইরে গেলেই এই ছেলেটি আপনার সঙ্গে থাকে, আমি জানি। আমাকে সাহায্য করবার জন্য যেমন ভীমু আছে, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যও তেমন আপনার ভাইপো থাকবে, এই আমি চেয়েছিলুম। আমি ফেয়ার কমপিটিশানে বিশ্বাস করি!"

কাকাবাবু বিদ্রুপের সঙ্গে হেসে বললেন, "চুরির কমপিটিশান, তাও আবার ফেয়ার আর আনফেয়ার! সন্তু, তুই আর তোর বন্ধু জানিস আসল ব্যাপারটা কী?"

সন্তু দু' দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার একটা আদিবাসী গ্রামে একটা নীল পাথরের দেবতার মূর্তি আছে। এরা সেটা চুরি করতে চায়। এই অংশুমান চৌধুরী সেই মূর্তিটার একটা নকল বানিয়ে এনেছে। কোনওরকমে সেই আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে নকল মূর্তিটা রেখে আসল মূর্তিটা চুরি করে আনাই এদের মতলব।"

মাধব রাও বাধা দিয়ে বললেন, "আমি আপত্তি করছি, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি বারবার বলছেন কেন চুরি? ওটা আমরা উদ্ধার করতে চাই, মূর্তিটার আসল মালিক আমরা, আদিবাসীরাই ওটা চুরি করেছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করতে গেলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে, সেই জন্য আমরা অন্য পথ নিতে চাইছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা যে আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে কোনও এক সময় চুরি হয়েছিল, সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে। পুলিশের সাহায্য না নিয়ে গোপনে-গোপনে মূর্তিটা বদলে আসাও এক ধরনের চুরি। আমি তো আপনাদের কোনও সাহায্য করবই না, বরং আপনাদের মতলব যাতে বানচাল হয়ে যায়, আমি সে ব্যবস্থা করব। আমি আজ রাত্তিরেই এখানকার এস. ডি. ও.-কে খবর দেব।"

তারপর তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা এখানে কি গাড়িতে এসেছিস?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। ওই লর্ড চালিয়ে এনেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আর-একটা গাড়ি আছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা সেই গাড়িতেই যাব। এক্ষুনি রওনা হতে চাই, সন্তু তুই তৈরি হয়ে নে।"

সন্তু বলল, "আমি তৈরি। কিন্তু জোজো কী করবে?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ও কি আমাদের সঙ্গে যেতে চায়?"

জোজো একবার তার পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল, একবার কাকাবাবুর

দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "আমি কলকাতায় ফিরে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

তিনি এগিয়ে এসে রিভলভারটা দোলাতে দোলাতে বললেন, "ভীমু, তোমার মনিবকে নিয়ে ওই ঘরটায় ঢুকে পড়ো। মাধব রাও, আপনিও উঠে পড়ুন, ওই ঘরের মধ্যে যান। আজকের রাতটা আপনাদের তিনজনকে একসঙ্গে কাটাতে হবে।"

মাধব রাও উষ্ণভাবে বললেন, "আপনি আমাকেও কেন আটকে রাখতে চান? আমি আপনার কোনও ক্ষতি করিনি, আপনাকে জোর করে এখানে নিয়েও আসিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "মাধব রাও, চাকরি থেকে রিটায়ার করে আপনার নিরিবিলিতে শান্তিতে জীবন কাটানো উচিত ছিল। চোরাই মূর্তির ব্যবসা করতে গেলে তো কোনও না কোনও সময় ধরা পড়তেই হবে!"

মাধব রাও রাগ সামলাতে না পেরে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে তেড়ে এলেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ক্রাচটা তুলে মাধব রাও-এর পেটে খোঁচা দিয়ে আটকালেন। তারপর বললেন, "আপনারা দুজনে মিলে আমার মেজাজ খুবই খারাপ করে দিয়েছেন। রাগের মাথায় আমি হঠাৎ গুলি চালিয়ে ফেলতে পারি। প্রাণে মারব না বটে, কিন্তু পা খোঁড়া করে দেব; যান, ওই ঘরের মধ্যে যান!"

অংশুমান চৌধুরী কোনও প্রতিবাদ না করে আগেই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। তাঁর পেছনে পেছনে ভীমু। তারপর মাধব রাও। লর্ডও ঢুকতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তার দিকে হাত তুলে বললেন, "তুমি দাঁড়াও! আমার একটা পা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে আমি আর গাড়ি চালাতে পারি না। তুমি আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে!"

অন্য তিনজন ঘরে ঢুকে পড়ার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "ওই দরজায় তালা লাগিয়ে দে। আজকে রাতটা ওখানেই থাক ওরা। এই বাংলোর চৌকিদার কোথায়?"

সন্তু বলল, "আমরা আর কাউকে দেখিনি। এই বাড়িটা খালিই ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা আছে। যাক, ভালই হল। ওরা চ্যাঁচামেচি করলেও এখন এত রাতে কেউ শুনতে পাবে না। কাছাকাছি আর তো কোনও বাড়ি দেখলুম না।"

বাংলোর বাইরে এসে, বাইরের দরজাতেও তালা লাগিয়ে ওরা উঠে পড়ল একটা অ্যামবাসাডর গাড়িতে। লর্ডের পাশে কাকাবাবু। পেছনে সন্তু আর জোজো। এমনিতে এত স্মার্ট ছেলে জোজো, কিন্তু এখন তার মুখ দিয়ে একটাও কথা ফুটছে না।

কাকাবাবু লর্ডকে বললেন, "আসবার পথে আমি থানায় একটা আলো

জ্বলতে দেখেছি। প্রথমে সেখানে চলো, এস. ডি. ও.-র বাড়ি খোঁজ করতে হবে।”

লর্ড কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, “তোমার ভয় নেই, তোমাকে আমি এখন পুলিশে ধরিয়ে দেব না। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।”

এবারে লর্ড বলল, “আমি কোনও দোষ করিনি। পুলিশ আমাকে ধরবে কেন!”

কাকাবাবু বললেন, “বেশ তো, ভাল কথা।”

আলো দেখে থানাটা সহজেই চেনা গেল। কিন্তু সেখানে কেউ জেগে নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজনকে তোলা গেল, সে একজন কনস্টেবল। সে ভাল করে কথাই বলতে চায় না। তবে তার কাছ থেকে এইটুকু জানা গেল যে, এস. ডি. ও. কিংবা পুলিশের কোনও বড় অফিসার এখন নারানপুরে নেই। কী একটা জরুরি ডাক পেয়ে তাঁরা জগদলপুর গেছেন। সেখানে আরও বড়-বড় অফিসাররা মিটিং করতে এসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, জগদলপুরেই যাওয়া যাক তাহলে। বড় অফিসারের সঙ্গে কথা না বললে কোনও কাজ হবে না।”

গাড়িটা আরও খানিক দূরে যাওয়ার পর কাকাবাবু লর্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি অংশুমান চৌধুরীর লোক না মাধব রাও-পট্টনায়কদের লোক?”

লর্ড বলল, “আমি কারও লোক নই। আমি একজন বেকার। আমার ওপর এই ছেলে দুটির দেখাশুনোর ভার দেওয়া হয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “বেকারের নাম লর্ড। বাঃ, বেশ ভাল তো!”

লর্ড বলল, “মা-বাবা এই নাম দিয়েছেন, আমি তার কী করব?”

“তোমার জামাকাপড় দেখেও তো বেকার বলে চেনা যায় না। খুব শৌখিন বেকার বলতে হবে। তোমাকে এই কাজের দায়িত্ব কে দিয়েছে?”

“সেটা বলতে পারব না। নিষেধ আছে।”

“তোমার কানের মধ্যে রিভলভারের নলটা ঢুকিয়ে দিলেও বলবে না?”

“দেখুন স্যার, আমি নতুন গাড়ি চালাতে শিখেছি। আপনি এরকম ভয় দেখালে হঠাৎ অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।”

“ঠিক আছে, তোমাকে আর ভয় দেখাব না। তুমি শুধু আর একটা কথার উত্তর দাও। যে নীল মূর্তিটার জন্য এতসব কাণ্ড হচ্ছে, এত টাকা খরচ হচ্ছে, সেই নীল মূর্তিটার বিষয়ে তুমি কিছু জানো?”

“না, কিছুই জানি না। আমি কোনও মূর্তির কথা শুনিনি।”

“তুমি কি নির্বোধ? তোমাকে কেউ বলল, দুটি অচেনা ছেলেকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে, আর তুমি অমনি তাই শুরু করে দিলে? একবারও জানতে চাইলে না, কেন, কী ব্যাপার?”

"আমি ভেবেছিলাম, এটা কিছু একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক।"

"তোমার দেখছি অদ্ভুত সেন্‌স অব হিউমার ! তুমি যে সত্যি কথা বলছ না, তা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। মিথ্যে কথা বলার সময় মানুষের গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোয়, আমি সেই গন্ধ পাই !"

পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিস ?"

সন্তু সবই শুনছিল, সে বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার একটা খটকা লাগছে। একটা পাথরের মূর্তির জন্য এরা এতখানি ঝুঁকি নিল কেন ? মূর্তিটার জন্য এরা তিন লাখ টাকা পুরস্কার দিতে চায়, তা ছাড়াও আরও অনেক খরচ করছে। আদিবাসীদের একটা ঠাকুরের সাধারণ মূর্তির তো এত দাম হতে পারে না।"

সন্তু বলল, "মূর্তিটা একবার দেখে গেলে হয় না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছি। আমার কলকাতায় ফেরা খুবই দরকার। কিন্তু মূর্তিটা একবার না দেখে যেতেও ইচ্ছে করছে না।"

লর্ড এই সময় গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

লর্ড কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "রাস্তার ওপরে...ওরা কারা ?"

হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হল, দু'জন ওভারকোট পরা লোক ঝুঁকে পড়ে রাস্তার ওপরে কী যেন দেখছে। তারপর আর একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল, মানুষ নয়, দুটো ভাল্লুক। এই গাড়ির দিকেই মুখ করে আছে।

লর্ড ভয় পেয়ে গাড়িটা ঘোরাতে যেতেই সেটা হুড়হুড়িয়ে গড়িয়ে গেল ডান পাশের একটা খাদে।

॥ ১৩ ॥

সন্তুর প্রথমে মনে হল, সে জলে ডুবে যাচ্ছে। খুব গভীর সমুদ্র, তার মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সব দিক নীল, শুধু নীল। প্রচণ্ড ঢেউয়ের শব্দ। তারপরই সন্তুর মনে পড়ল, সে তো সাঁতার জানে, তা হলে শুধু শুধু ডুবে যাচ্ছে কেন ? সে হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে শুরু করল। তার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল।

আসলে, একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা উলটে যাওয়ার সময় সন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা খাদের দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবু চিৎকার করে সবাইকে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়তে বলেছিলেন, তখন লাফাতে গিয়ে কোনও একটা কঠিন জিনিসে তার মাথা ঠুকে গিয়েছিল।

জ্ঞান ফেরার পর সন্তু আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখতে পেল, মিশমিশে

কালো অন্ধকার রাত। কোথায় নীল জলের সমুদ্র? তার মাথায় অসম্ভব ব্যথা। কানের মধ্যে যেন ব্যথার কামান গর্জন হচ্ছে।

একটু পরে সে উঠে বসেও ঝিম মেরে রইল। মাথার ব্যথাটার জন্য সে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করল, রক্ত পড়ছে কি না। কিন্তু রক্ত টের পেল না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তারা দুটো ভাল্লুক দেখেছিল। সেই ভাল্লুক দুটো কোথায়?

এবারে সে ব্যথা ভুলে গিয়ে ছটপটিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা বেশ ঢালু মতন। মাটিতে হাত চাপড়ে চাপড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে কার গায়ে যেন হাত লাগল। চমকে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

যার গায়ে সন্তুর হাত লেগেছে, সে-ও বলে উঠল, "কে?"

গলা শুনে চিনতে পারা গেল জোজোকে। সন্তু তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "এই জোজো, কী হল রে? গাড়িটা কোথায় গেল? কাকাবাবু?"

জোজো বলল, "তা জানি না! তুই কে রে, সন্তু? ঠিক তো, সত্যি সন্তু তো?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"ওরে সন্তু, আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি রে? আমরা বোধহয় মরেই গেছি। গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। মরার পর এই রকম হয়, চোখে কিছুই দেখা যায় না।"

"ধ্যাত! কী পাগলের মতন বকছিস! তোর হাত-পা কিছু ভাঙেনি তো?"

"কী জানি, ভেঙেছে কি না! মরার পর আর ব্যথাট্যাথা টের পাওয়া যায় না।"

"তুই আগে ক'বার মরেছিস? মরার পর কী হয়, তুই জানলি কী করে?"

"গাড়িটা তাহলে নেই কেন? আমরা অন্য জায়গায় চলে এলুম কীভাবে?"

"গাড়িটা বোধহয় আরও অনেকটা গড়িয়ে নেমে গেছে। আমার হাত ধর, চল, আস্তে-আস্তে এগোই! কাকাবাবুকে খুঁজতে হবে। বেশি শব্দটব্দ করিস না। ভাল্লুক দুটো তো কাছাকাছি থাকতে পারে।"

"ভাল্লুক?"

জোজো এমনভাবে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে যে, সে তাল সামলাতে পারল না, দু'জনে মিলে গড়িয়ে নেমে গেল খানিকটা।

সেই অবস্থাতেও সন্তুর একটু হাসি পেয়ে গেল। জোজো অন্য সময় খুব লম্বা-চওড়া কথা বলে, কিন্তু আসলে সে বেশ ভিতু।

অন্ধকার খানিকটা চোখে সয়ে গেলে সন্তু দেখতে পেল, ডান পাশে বেশ

খানিকটা দূরে গাড়িটা দুটো গাছের ফাঁকে আটকে আছে। সন্তুরা কি এত জোরে লাফিয়েছিল ? কিংবা গাড়িটা নামতে নামতে হঠাৎ বোধহয় ডান দিকে বেঁকে গেছে। ইঞ্জিন বন্ধ, আলোও জ্বলছে না। কোনও শব্দ নেই। কাকাবাবুর কী হল ? খোঁড়া পা নিয়ে উনি শেষ মুহূর্তে লাফাতে পেরেছিলেন তো ? আর লর্ডই বা কোথায় গেল ?

আর একটু কাছে এগোতেই দেখা গেল, গাড়ির পাশে দুটি ছায়া মূর্তি। দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন যখন, তখন কাকাবাবু কিংবা লর্ড কেউই জখম হননি।

সন্তু কাকাবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাওয়ার আগেই জোজো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠল, "ভা-ভা-ভা..."

সন্তু বলল, 'তুই ভাবছিস বুঝি ভাল্লুক ? আরে না, গাড়িটার গাছে ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ শুনে নিশ্চয়ই ভাল্লুক দুটো পালিয়েছে।"

কিন্তু জোজো ঠিকই দেখেছে। একটা ছায়ামূর্তি এপাশে মুখ ফেরাতেই স্পষ্ট চেনা গেল। কোনও সন্দেহ নেই, ভাল্লুকই বটে। অন্ধকারের মধ্যে তাদের ঠিক ওভারকোট পরা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এই গরমকালে কাকাবাবু কিংবা লর্ড কারও গায়েই কোট নেই।

তার পরেই যা ঘটল, তা দেখে সন্তু একেবারে শিউরে উঠল। গাড়িটার সামনের দরজা খোলা, সেখানে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাল্লুক একজন মানুষকে টেনে বার করল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষটিকে চেনা গেল। কাকাবাবু !

কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে আছেন। ভাল্লুক দুটো কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে। এখন কাকাবাবুকে বাঁচাবার একটাই মাত্র উপায় আছে। সন্তু উঠে দাঁড়িয়েই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "হেই ! হেই ! হেই !"

জোজো পেছন ফিরে দৌড় মারল। সন্তু পাগলের মতন চিৎকার করতে করতে মাটি থেকে পাথর তুলে তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল ভাল্লুক দুটোর দিকে। দূর থেকে জোজো বলল, "সন্তু গাছে উঠে পড় ! গাছে উঠে পড় !"

সন্তুর চিৎকারেই কাজ হল। বোঝা গেল যে, ভাল্লুকরা মানুষের চ্যাঁচামেচি একেবারেই পছন্দ করে না। কাকাবাবুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারা গুটগুট করে উলটো দিকে দৌড়তে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল একটা গুলির আওয়াজ।

সন্তু দেখতে পেল, মাটিতে পড়ার পরই কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসেছেন, তাঁরই হাতে রিভলভার।

সন্তু এবারে ছুটে এল গাড়ির কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, গাড়ি থেকে আমার ক্রাচ দুটো বার কর তো ! উঃ, বাপরে বাপ, কী ঝঞ্ঝাট, কী ঝঞ্ঝাট ! কোথা থেকে দুটো ভাল্লুক এসে জুটে সব গণ্ডগোল করে দিল ! জোজো কোথায় ?"

সন্তু ক্রাচ দুটো বার করতে করতে বলল, "জোজো আছে। কাকাবাবু, তোমার কী হয়েছিল ? তুমি গাড়ি থেকে লাফাওনি ?"

কাকাবাবু গাড়িটা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "লাফাতে যাচ্ছিলুম, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই লর্ড নামের ছোকরাটা আমার জামার কলার ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। তাতে আমাকে শুয়ে পড়তে হল। তার মধ্যে সে লাফিয়ে পালাল। আমি আর পারলাম না। গাড়িটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।"

"একটা ভাল্লুক তোমাকে ধরেছিল..."

"হ্যাঁ রে, তখনও আমি অজ্ঞান ছিলাম। ভাল্লুকটা আমায় তুলতেই জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি ভাল্লুক, ভেবেছিলাম কোনও মানুষই বুঝি। তারপর বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারছিলাম না, কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করার উপায় নেই, এমনভাবে ধরেছে, উঃ, কী নখের ধার, আমার উরুতে আর পাঁজরায় নখ বসে গেছে। তুই না চ্যাঁচালে বোধহয় আমাকে চেপ্টে পিষে মেরে ফেলত !"

যেদিকে ভাল্লুক দুটো গেছে, সেদিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, "গুলির শব্দ শুনেছে, আর বোধহয় এদিকে ফিরে আসবে না !"

"কাকাবাবু, লর্ড কোথায় গেল ?"

"যদি আহত না হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই দৌড়ে পালিয়েছে, দ্যাখ্ তো, গাড়ির মধ্যে একটা টর্চ ছিল না ?"

সন্তু গাড়ির মধ্যে টর্চ খুঁজতে লাগল। কাকাবাবু প্যান্টের পকেট চাপড়ে বললেন, "ও, আমার কাছেই তো লর্ডের টর্চটা রেখেছিলাম। এটা আবার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল কি না কে জানে ?"

পকেট থেকে টর্চটা বার করে কাকাবাবু সুইচ টিপলেন। সেটা জ্বলল।

সন্তু জোরে ডাকল, "জোজো, এই জোজো। এদিকে আয়, ভয় নেই !"

একটু দূরে একটা গাছের ওপর থেকে চিঁচিঁ গলায় শোনা গেল, "আমি নামতে পারছি না !"

টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একটা শাল গাছের ওপরে পাতলা ডালে গুটিসুটি মেরে বসে আছে জোজো। শাল গাছ মাটি থেকে অনেকখানি সোজা উঠে যায়, কোনও ডালপালা থাকে না। জোজো ওই গাছে উঠল কী করে ? বিপদের ভয়ে মানুষ কী না পারে !

কাকাবাবু বললেন, "এ যে দেখছি সেই ভাল্লুকের গপ্পই সত্যি হয়ে গেল। এক বন্ধুকে ছেড়ে আর-এক বন্ধু গাছে উঠে গেল।"

সন্তু বলল, "যেমনভাবে উঠেছিস, তেমনভাবেই নেমে আয়।"

জোজো বলল, "পারব না, আমার মাথা ঘুরছে। আমি পড়ে যাব !"

"তা হলে তুই থাক ওখানে বসে। আমরা কী করে তোকে নামাব ?"

কাকাবাবু বললেন, “ওহে, তুমি গাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ো। তারপর হাত ছেড়ে দিলে আমরা নীচের থেকে তোমাকে লুফে নেব। করো, করো, তাড়াতাড়ি করো। বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না।”

মাটিতে পা দিয়েই জোজো বলল, “আমার জুতো ?”

সন্তু এক ধমক দিয়ে বলল, “এখন আমরা তোর জুতো খুঁজব নাকি ? কোথায় ফেলেছিস নিজে দ্যাখ !”

কাকাবাবু চতুর্দিকে টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। লর্ডের কোনও চিহ্ন নেই। তার কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই সে দৌড়ে পালিয়েছে।

কাকাবাবু গাড়ির ভেতরটাও ভাল করে খুঁজে দেখে বললেন, “গাড়িটা খুব সম্ভবত বেশি ড্যামেজ হয়নি। এখনও চালানো যায়, কিন্তু লর্ড চাবিটা নিয়ে গেছে। যাতে পরে আমরা আর চালাতে না পারি।”

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, “ইস, চাবিটা নেই ! তা হলে আমি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতুম !”

সন্তু কাকাবাবুর অলক্ষ্যে জোজোর মাথায় একটা গাঁট্টা মারল। এত কাণ্ডের মধ্যেও জোজোর গুল মারার অভ্যাস যায়নি। জোজো আবার গাড়ি চালানো শিখল কবে ?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “নারানপুর বাংলো থেকে আমরা কতটা দূর চলে এসেছি রে সন্তু ? খুব বেশি দূর হবে না।”

সন্তু বলল, “বড় জোর ছ-সাত মাইল।”

কাকাবাবু বললেন, লর্ড এ ছ-সাত মাইল হেঁটেই চলে যেতে পারবে। নিশ্চয়ই ও এদিককার রাস্তাঘাট চেনে। ওখানে আর একটা গাড়ি আছে। সেই গাড়ি নিয়ে সবাই মিলে আমাদের ধরতে আসতে পারে। ওদের কাছে আরও কোনও অস্ত্র থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। অংশুমান চৌধুরী এবারে সহজে ছাড়বে না।”

সন্তু বলল, “আমাদের এই জায়গা থেকে সরে পড়তে হবে।”

কাকাবাবু জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওহে, তোমার পিসেমশাই মানুষটি খুব সুবিধের নয় !”

জোজো অমনি বলল, “ঠিক বলেছেন। সেইজন্যই তো আমার পিসিমার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া। আমার বাবা বলেছেন, কক্ষনো ওই পিসেমশাইয়ের বাড়িতে যাবি না !”

“তা হলে বারুইপুরে তোমার পিসেমশাইয়ের বাড়িতে সন্তুকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন ?”

“সে তো শুধু একবার দেখাবার জন্য। তখন কি আমি জানি যে, পিসেমশাই আপনাকে চেনেন আর আপনার ওপর ওঁর খুব রাগ ?”

"তা অবশ্য ঠিক। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ভদ্রলোক আমাদের শুধু শুধু এই মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত টেনে এনে এই ঝঞ্ঝাট বাধালেন। এখন এ-জায়গাটা থেকে দূরে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আবার আমরা ভাল্লুক দুটোর খপ্পরে না পড়ে যাই।"

জোজো বলল, "আজকের রাতটা কোনও গাছে চড়ে কাটিয়ে দিলে হয় না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো ক্রাচ বগলে নিয়ে গাছে চড়তে পারব না। তোমরা দু'জনে চেষ্টা করে দেখতে পারো।"

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "তুই আবার ওই শালগাছটায় উঠতে পারবি?"

জোজো বলল, "আমি হিমালয়ে গিয়ে অনেক গাছে চড়েছি। তবে সেসব অন্য গাছ। শাল গাছে চড়া ঠিক প্র্যাকটিস নেই।"

"আপাতত আমরা হিমালয়ে যাচ্ছি না, সুতরাং এখানকার গাছেও ওঠা হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়িটা যেখানে আটকেছে, তার খানিকটা নীচেই একটা নদী আছে দেখলুম। ওই নদীর ধারে যাওয়ার দরকার নেই। রাত্তিরবেলা অধিকাংশ জন্তু-জানোয়ার নদীতে জল খেতে আসে। মধ্যপ্রদেশের এই সব জঙ্গলে বাঘও আছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যাওয়াই ভাল। ঠিক রাস্তার ওপর দিয়ে নয়।"

টর্চটা হাতে নিল সন্তু। সে মাঝে-মাঝে আলো জ্বেলে দেখে নিতে লাগল সামনেটা। অন্যরা চলল তার পেছনে পেছনে।

খানিক দূর যাওয়ার পরই একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সন্তু বলল, "ওই ওরা আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কি লর্ড নারানপুরে পৌঁছে যেতে পারবে? মনে হয় না। হয়তো অন্য কোনও গাড়ি। অন্য গাড়ি হলে আমরা লিফ্ট নিতে পারি।"

সন্তু বলল, "যদি কোনও সর্টকাট থাকে, লর্ড তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। এসব জায়গায় সন্ধের পর গাড়ি বিশেষ চলেই না। এত রাতে আর কার গাড়ি আসবে? তবু, রাও-এর গাড়ি দেখলে তো আমরা চিনতে পারব। এখন আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। খানিকটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে। অন্য গাড়ি হলে চেঁচিয়ে থামাব।"

কাকাবাবু রিভলভারটা হাতে নিলেন। সন্তু নিভিয়ে দিল টর্চ।

গাড়িটা একটু আগেই থেমে গেল। প্রথম দু-এক মিনিট গাড়ি থেকে কেউ নামল না। ইঞ্জিনের শব্দ হতে লাগল ধক-ধক ধক-ধক করে। জ্বলতে লাগল হেডলাইট। তারপর গাড়ি থেকে প্রথমে নামল রাও, তারপর ভীমু, তারপর লর্ড, তার মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। একেবারে শেষে অংশুমান চৌধুরী।

রাও-এর হাতে রাইফেল, অংশুমান চৌধুরীর হাতে তার লাঠি, ভীমুর হাতেও কী যেন একটা রয়েছে।

রাও জিজ্ঞেস করলেন, "এই জায়গাটাই তো ঠিক ?"

লর্ড বলল, "হ্যাঁ, আমার মনে আছে, এ রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি। ডান দিকে একটু খুঁজলেই নিশ্চয়ই গাড়িটা পাওয়া যাবে।"

"কেউ কি সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে ?"

"মনে তো হয় না। কাছাকাছি থাকবে ওরা।"

অংশুমান চৌধুরী জোরে দু'বার নিঃশ্বাস টেনে বললেন, "ভীমু এখানে একটা জন্তু-জন্তু গন্ধ পাচ্ছি।"

ভীমু বলল, "কই না তো স্যার। কিছু তো দেখা যাচ্ছে না !"

"দেখা না গেলেও গন্ধ পাওয়া যায়। খুব বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ।"

লর্ড বলল, "এইখানেই দুটো ভাল্লুক ছিল, সেই গন্ধ পেতে পারেন। জঙ্গলে এসে কোনও না কোনও জন্তুর গন্ধ পাবেনই ! এড়াবেন কী করে ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "সে ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি। ভীমু আমার লাঠিটা ধর তো !"

পকেট থেকে তিনি একটা মুখোশ বার করলেন। সেটা দু'হাত দিয়ে টেনে ঠিক করতে করতে বললেন, "এটা আমার নিজের তৈরি। জঙ্গলের জন্য স্পেশ্যাল, কোনও গন্ধ আমার নাকে আসবে না। হাওয়া ছেঁকে আসবে।"

অংশুমান চৌধুরী মুখোশটা পরে ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখটা বদলে গেল, নাকের জায়গাটা এমন অদ্ভুত যেন একজন মানুষের দুটো নাক। সেই মুখোশ পরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন, "এবার রাজা রায়চৌধুরীকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। লোকটার বড্ড বাড় বেড়েছে।"

রাও বললেন, "অংশুমানবাবু আপনি আর ভীমু এই গাড়িটার কাছে দাঁড়ান, ভাল করে নজর রাখবেন। আমরা অন্য গাড়িটার অবস্থা দেখে আসছি।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ঠিক আছে, চটপট ঘুরে আসুন।"

নিস্তব্ধ রাত, ওদের প্রত্যেকটি কথাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গাড়ির হেড লাইটটা জ্বালাই রয়েছে। মুখোশ-পরা অংশুমান চৌধুরীকে মনে হল অন্য গ্রহের মানুষ। হাওয়ায় একবার গাছের পাতার সরসর শব্দ হল। একটা বড় ঝুপসি গাছের মধ্যে কিসের যেন একটা ঝটাপটির আওয়াজ শোনা গেল।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ভীমু, দেখে আয় তো ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না ?"

ভীমু বলল, "না স্যার, মনে হচ্ছে, পাখির বাসায় সাপ ঢুকেছে।"

"কী করে তুই বুঝলি ? পাখির বাসায় সাপ কেন ঢুকতে যাবে, সাপ তো মাটির গর্তে থাকে।"

"সাপ পাখির ডিম কিংবা বাচ্চা চুরি করে খেতে যায়।"

"সাপেরা চোর হয় ? ঠিক আছে, তোর কথা সত্যি কি না দেখা যাক।"

অংশুমান চৌধুরী তাঁর লাঠিটা তুলে টিপ করলেন। ঝুপসি গাছটায় এখনও ঝটাপটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অংশুমান চৌধুরীর লাঠির ডগা থেকে কয়েক ঝলক আগুনের শিখা ছুটে গেল সেই দিকে। গুলি নয়, কারণ, কোনও শব্দ নেই, শুধু আগুন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই গাছের খানিকটা অংশ ঝলসে গেল, আর চিঁচিঁচিঁ করে কয়েকটা বাচ্চা পাখির কান্না আর ক্রোয়াঁ ক্রোয়াঁ শব্দে একটা বড় পাখির আর্তনাদ। তারপর বাসা সমেত পাখিগুলো খসে পড়ল মাটিতে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "যা ভীমু, দেখে আয় ওর মধ্যে সাপ আছে নাকি ?"

প্রায় দু'শো গজ দূরে, একটা মোটা শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু সব দেখছেন। আস্তে-আস্তে সন্তু আর জোজোও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

কাকাবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের নিঃশব্দ থাকতে বললেন। তারপর আর-একটা হাতের ইঙ্গিত করে ওদের বোঝালেন পিছিয়ে যেতে। তিনি নিজেও এক-পা এক-পা করে পেছোতে লাগলেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে তাঁরা চলে এলেন অনেকখানি বনের গভীরে। কাকাবাবু রিভলভার হাতে নিয়ে মাঝে-মাঝেই ঘুরে দেখছেন চারদিক। হঠাৎ কোনও হিংস্র জানোয়ার সামনে পড়ে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

একটা ফাঁকা জায়গা দেখেও তিনি থামলেন না। সন্তু আর জোজোকে ফিসফিস করে বললেন, "ওরা আমাদের খুঁজবে। প্রথমে রাস্তার ওই দিকটায়, যে দিকে গাড়িটার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সেই দিকেই দেখবে। তারপর এদিকে আসবে। ওদের কাছে ভাল অস্ত্রশস্ত্র আছে। সম্ভবত রাও-এর গাড়ির বুটে কিংবা নারানপুরের ওই বাড়িতে এসব জমা করা ছিল। ওদের সামনাসামনি পড়ে গেলে আমাদের ধরা দিতেই হবে, বুঝলি ? সেই জন্য আমাদের আরও অনেকটা ভেতরে চলে যাওয়া দরকার।

এবারে কাকাবাবু টর্চটা মাটির দিকে মুখ করে জ্বালালেন। গোল করে খানিকটা জায়গা দেখে নিয়ে আবার বললেন, "বড়-বড় জন্তু-জানোয়ারকে বেশি ভয় নেই, তারা চট করে মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দেখিস, হঠাৎ কোনও সাপের গায়ে পা না পড়ে। আমি আলো দেখাব, তোরা আমার পেছন-পেছন

আয়।”

আরও প্রায় এক ঘন্টা চলার পর কাকাবাবু থামলেন। বড়-বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, “ওঃ, হাঁপিয়ে গেছি। গাড়ি ছেড়ে ওরা এতটা দূরে আসবে না মনে হয়। এবারে বিশ্রাম নেওয়া যাক।”

জঙ্গলের মাঝখানে মাঝেমাঝে হঠাৎ-হঠাৎ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। এই জায়গাটাও সেরকম ফাঁকা, এমনকী সামান্য ঘাসও নেই। এদিক ওদিকে ছড়ানো কয়েকটা পাথর। এক পাশে একটা গাছ ঠিক মাঝখান থেকে ভাঙা, দেখলে মনে হয় হাতিতে ভেঙেছে। আকাশ মেঘলা। চাঁদ বা একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু সেই ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে বসে পড়ে বললেন, “এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক। তোরা দু'জনে শুয়ে পড়, ঘুমিয়ে নে, আমি পাহারা দিচ্ছি।”

সন্তু বলল, “ঘুমোবার দরকার নেই। আমরাও জেগে থাকব।”

জোজো বলল, “হ্যাঁ, আমরাও জেগে থাকব।”

কাকাবাবু বললেন, “সবাই মিলে জাগার তো কোনও মানে হয় না। না ঘুমিয়ে পারা যাবে না। কাল অনেকখানি হাঁটতে হবে। আমাকেও ঘুমিয়ে নিতে হবে খানিকটা। রাত্তিরটা তোরা ঘুমো, ভোর হওয়ার পর আমিও ঘন্টা দু-এক ঘুমিয়ে নেব।”

সন্তু আর জোজো তবু আপত্তি করতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, তোরা শুয়ে থাক। যদি ঘুম আসে তো ঘুমোবি!”

একটু পরেই জোজোর নাক দিয়ে পিঁচ-পিঁচ শব্দ হতে লাগল। সন্তু তখনও ঘুমোয়নি। হঠাৎ বহু দূরে একটা যেন রাইফেলের গুলির শব্দ হল। সন্তু তখনই উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। কাকাবাবু বললেন, “ওরা কাকে গুলি করছে?”

সন্তু বলল, “বোধ হয় সেই ভাল্লুক!”

“হ্যাঁ, হতে পারে। ভাল্লুক খুব কৌতূহলী প্রাণী, সহজে ওই জায়গা ছেড়ে যাবে না। ওখানেই ঘুর ঘুর করবে।”

“কাকাবাবু, এদিকে কী যেন ছুটে আসছে।”

কাকাবাবু রিভলভার তুলে ডানদিকে ফিরলেন। জঙ্গলের শুকনো পাতার খরখর শব্দ হচ্ছে। কিছু যেন ছুটে আসছে এদিকেই।

কাকাবাবু কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনে বললেন, “মানুষ নয়, বুনো শুয়োর হতে পারে।”

তারপরই তিনি দেখতে পেলেন বনের মধ্যে পাশাপাশি দু'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। অন্ধকারে যে-কোনও জন্তুর চোখই আগুনের মতন জ্বলে, শিকারিরা ওই চোখের রং দেখে বুঝতে পারে কোনটা কী প্রাণী।

কাকাবাবু বললেন, "ও দুটো খরগোশ ! দ্যাখ, চোখ কতটা নিচুতে !"

সত্যিই দুটো খরগোশ জঙ্গল ছেড়ে চলে এল ফাঁকা জায়গায়। এখানে যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে সে জন্য তারা ভ্রূক্ষেপও করল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল অন্য দিকে।

তারপর আর কোনও শব্দ নেই। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সন্তু শুয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম এসে গেল তার চোখে।

একসময় একটা চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল সন্তুর। চোখ মেলেই দেখল, ভোরের আলো ফুটে গেছে। পাখি ডাকছে। আর পাগলের মতো জোজো চিৎকার করছে, "মরে গেলুম, মরে গেলুম !"

ঘুমের ঘোরে জোজো গড়িয়ে গিয়েছিল খানিকটা দূরে। কাকাবাবু আর সন্তু সেখানে এসে দেখল কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছে জোজো, দু'হাতে মাটি চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, "বাঁচাও, বাঁচাও, মরে যাচ্ছি, মরে গেলুম।"

সন্তু ভাবছে জোজো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছে !

কাকাবাবু দু'হাতে জোজোকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে খানিকটা সরে এসে আবার মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "ইস, এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। জোজো, চোখ বুজে থাকো, চোখ খুলো না। ভয় নেই !"

সন্তু এবারে দেখতে পেল জোজোর সারা গায়ে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। তার মুখখানা এত পিঁপড়েতে ছেয়ে গেছে যে চেনাই যাচ্ছে না। যেন কোটি কোটি পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করেছে জোজোকে।

কাকাবাবু জোজোর জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, "সন্তু, তুই ওর মুখ থেকে পিঁপড়ে ছাড়া, মাটি থেকে ধুলো নিয়ে ঘসে দে, চোখ দুটো সাবধান।"

জামা-প্যান্টের মধ্য দিয়েও পিঁপড়ে ঢুকে গেছে, তাই কাকাবাবু চটপট ওর সব পোশাক খুলে দিলেন। যন্ত্রণায় জোজো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

সন্তু আর কাকাবাবু তাকে জোর করে সেখান থেকে তুলে আবার আর-একটা জায়গায় শোয়ালেন। সেখানে কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা ঝরে পড়ে আছে। সেই শুকনো পাতা ঘষা হতে লাগল তার গায়ে।

এক সময় সব পিঁপড়ে ছাড়ানো হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে জোজোর সারা শরীর ফুলে গেছে। মুখখানা পাকা বাতাবি লেবুর মতন। চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেছে তার। সে ফ্যাসফ্যাস করে নির্জীবভাবে বলতে লাগল, "জল, জল !"

পিঁপড়ে ছাড়াতে গিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুরও কম পরিশ্রম হয়নি। তাঁদেরও জলতেষ্টা পেয়ে গেছে। এখন জল কোথায় পাওয়া যায় !

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর দোষ নেই, গড়াতে গড়াতে খানিকটা দূরে চলে গেছে তো ! ওখানে একটা উঁচু মতন ঢিবি, ওটা লাল পিঁপড়ের বাসা।

ঘুমের ঘোরে জোজো ওই ঢিবিটাকে বালিশ বলে জড়িয়ে ধরেছে। ঢিবিটা ভেঙে যেতেই পিলপিল করে পিঁপড়েরা বেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ করেছে।”

সন্তু বলল, “ওর গাঢ় ঘুম। আমার গায়ে প্রথমে একটা দুটো পিঁপড়ে উঠলেই আমি জেগে যেতুম।”

কাকাবাবু বললেন, “আমাকেও এর মধ্যে কয়েকটা পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছে, ওইটুকু প্রাণীর কী বিষ, আমার হাত জ্বালা করছে।”

সন্তু জোজোর সামনে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, “জোজো, জোজো, এখন উঠতে পারবি ?”

জোজো ফিসফিস করে বলল, “আমি চোখ মেলতে পারছি না। আমি কি মরে গেছি ?”

জোজোর চোখের পাতা দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

কাকাবাবু জোজোর প্যান্ট আর শার্ট ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিলেন তার মধ্যে আর পিঁপড়ে আছে কিনা। তারপর সন্তুকে বললেন, “এগুলো পরিয়ে দে। ও যদি হাঁটতে না পারে, ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর নীলমূর্তি খুঁজতে যাওয়া হবে না। এখন ছেলেটার চিকিৎসা করানোই সবচেয়ে আগে দরকার।”

সন্তু জোজোর পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর বলল, “জোজো, জোজো, আমি তোর হাত ধরছি, একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।”

জোজো বলল, “পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে। আমি মরে যাচ্ছি রে, সন্তু !”

এরই মধ্যে জোজোর গায়ে সাঙ্ঘাতিক জ্বর এসে গেছে। সে থরথর করে কাঁপছে।

সন্তু বলল, “আমি ওকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারি। কাকাবাবু, তুমি একটু ধরো...”

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো রেখে, জোজোকে তুলে দিতে গেলেন সন্তুর কাঁধে। হঠাৎ একটা কুকুরের ডাক শুনে দু'জনেই চমকে তাকালেন সামনের দিকে।

ফাঁকা জায়গাটার একধারে, জঙ্গলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তিন জন মানুষ, তাদের খালি গা, পরনে নেংটি, হাতে তীর-ধনুক, আর প্রত্যেকের পাশেই একটা করে কুকুর।

॥ ১৫ ॥

গাড়ি থেকে স্যান্ডউইচ-এর প্যাকেট আর চা-ভর্তি ফ্লাস্ক নিয়ে এল ভীমু। নদীর ধারে বালির ওপর একটা ম্যাপ সামনে বিছিয়ে বসে আছেন অংশুমান চৌধুরী। ভীমু কাগজের গেলাসে চা ঢেলে একটা করে দিল সবাইকে।

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। হাওয়ায়

বেশ শীত-শীত ভাব। নদীর ওপারের জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে নতুন সূর্যের রেশমি-লাল ছটা।

অংশুমান চৌধুরীর মুখে সেই দুটো নাকওয়ালা-মুখোশ। দুই কানে লাগানো একটা ওয়াকম্যানের মতন যন্ত্র, যাতে বাইরের যে-কোনও আওয়াজের মধ্য থেকে ছেঁকে শুধু মানুষের গলার আওয়াজ যায়। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গামবুটের মতো জুতো।

চা ও স্যান্ডউইচ খাওয়ার পর অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এবার দেখা যাক, রাজা রায়চৌধুরী আর ছেলে দুটো কোন দিকে যেতে পারে। এখানে জঙ্গল বেশি ঘন নয়, দিনের বেলা এখানে ওরা বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।"

লর্ড বলল, "আমার মনে হয়, রাস্তার অন্য কোনও গাড়িতে লিফ্‌ট নিয়ে ওরা এতক্ষণ কোণ্ডাগাঁওতে ফিরে গেছে। রাজা রায়চৌধুরী কলকাতায় ফেরার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিল।"

রাও বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ কী? আমাদের নীলমূর্তিটা উদ্ধার করা নিয়ে কথা। আপনিই তো সেটা পারবেন!"

রাও-এর দিকে ফিরে কটমট করে তাকিয়ে অংশুমান বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আমি আগে ন্যাড়া করে তবে ছাড়ব!"

কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার পর তিনি একটু শান্ত হলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে তোমরা চেনো না, অতি ধুরন্ধর লোক। একবার সে যখন ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, তখন সহজে হাল ছাড়বে না! রাজা রায়চৌধুরী এখন দুটো ব্যাপার করতে পারে। হয় সে জগদলপুরে গিয়ে পুলিশকে সব কথা জানাবে, তারপর পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে আমাদের আটকাবে। কিংবা, সে নিজেই অবুঝমাড়ের দিকে চলে গিয়ে আমাদের আগেই নীলমূর্তিটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।"

রাও জিজ্ঞেস করলেন, "উনি আমাদের আগে ওখানে কী করে পৌঁছবেন? অনেকটা দূর তো!"

অংশুমান ম্যাপে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখো নারানপুর, এই দিকে জগদলপুর, আর এই এখানে অবুঝমাড়, এখান থেকেও আরও চোদ্দ-পনেরো মাইল যেতে হবে পাহাড়ি রাস্তায়।"

লর্ড বলল, "রাজা রায়চৌধুরী খোঁড়া লোক, পনেরো মাইল পাহাড়ে উঠতে তার সারাদিন লেগে যাবে! যদি শেষ পর্যন্ত উঠতে পারে!"

অংশুমান বললেন, "আমি ওকে কোনও ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। আমাদের এখন উচিত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবুঝমাড় পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা!"

ভীমু বলল, "কারা যেন আসছে!"

সবাই মুখ তুলে তাকাল। নদীর ওপারের জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। তাদের হাতে একটা করে টাঙ্গি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা আছে। নদীতে জল কম, অনায়াসে হেঁটে পার হওয়া যায়।

লর্ড বলল, "ওরা নিরীহ সাধারণ লোক, জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছে।"

রাও বললেন, "ওরা নদী পেরিয়ে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।"

লর্ড বলল, "আসুক না, ওরা আমাদের দেখলেও কিছু বলবে না। এখানকার লোকেরা খুব কম কথা বলে।"

অংশুমান চৌধুরীর মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, এবার তোমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখাচ্ছি। ভীমু, আমার হ্যান্ড ব্যাগটা নিয়ে আয় তো গাড়ি থেকে!"

ভীমু দৌড়ে গাড়ি থেকে একটা বেশ মোটাসোটা ব্যাগ নিয়ে এল। অংশুমান সেটা খুলে প্রথমে বেশ বড় সেন্টের শিশির মতন শিশি বার করলেন। তাতে স্প্রে করার ব্যবস্থা আছে। তারপর নিজে যেমন মুখোশ পরে আছেন, সে রকম আরও কয়েকটা মুখোশ বার করে অন্যদের বললেন, "এগুলো তোমরা মুখে লাগিয়ে নাও!"

লর্ড প্রতিবাদ করে বলল, "আমরা মুখোশ পরব কেন? এগুলো বিচ্ছিরি দেখতে!"

অংশুমান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "যা বলছি করো! সময় নষ্ট করো না।"

উলটো দিকের লোকগুলো বোধহয় অনেকটা হেঁটে এসেছে। তাই তক্ষুনি নদী পার না হয়ে কয়েকজন বসে জিরোতে লাগল। কয়েকজন নদীর জলে চোখ-মুখ ধুতে শুরু করল। একজন গাছের নিচু ডালে উঠে দোল খেতে লাগল বাচ্চাদের মতন।

অন্যদের মুখোশ লাগানোর পর অংশুমান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই বার দ্যাখো আমার খেলা।"

তিনি এগিয়ে গিয়ে নদীর একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওপারের লোকগুলো তাঁকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। অংশুমান হাতের শিশিটা উঁচু করে তুলে ফোঁসফাঁস করে স্প্রে করতে লাগলেন তাদের দিকে।

কয়েকবার মাত্র এই রকম করে তিনি ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে পড়ে বললেন, "এইবার দ্যাখো মজাটা! কেউ কথা বলো না!"

ওপারের লোকগুলো মাথার ওপর হাত তুলে হাই তুলতে লাগল। যারা নদীর জলে নেমেছিল, তারা ওপারে উঠে গিয়ে বসে পড়ল, দু'জন শুয়ে পড়ল। অন্যরাও শুয়ে পড়ল একে-একে। যে লোকটা গাছের ডালে দোল খাচ্ছিল, সে ধপাস করে পড়ে গেল নীচে। সামান্য উঁচু থেকে পড়েছে। তার তেমন লাগবার কথা নয়। কিন্তু সে আর উঠে দাঁড়াল না, যেমনভাবে

পড়েছিল, সেইরকমভাবেই স্থির হয়ে রইল।

শিউরে উঠে রাও বললেন, "ওরা মরে গেল?"

অংশুমান কোনও উত্তর না দিয়ে মুচকি-মুচকি হেসে মাথা নাড়তে লাগলেন।

রাও আবার উত্তেজিতভাবে বললেন, "আপনি ওদের মেরে ফেললেন? ওরা অতি নিরীহ সাধারণ মানুষ!"

অংশুমান বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ? আমি কি খুনি? অতগুলো লোককে এমনি-এমনি মেরে ফেলব কেন? ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিলুম!"

রাও তবু অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আপনি এতদূর থেকে কী একটা স্প্রে করলেন, আর অমনি লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল; এরকম কোনও ওষুধ আছে নাকি? অসম্ভব!"

"মিস্টার রাও, বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এটা আমার নিজের আবিষ্কার! এই ওষুধ স্প্রে করে আমি একটা গোটা গ্রামের লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।"

"মাফ করবেন, মিস্টার চৌধুরী, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমরা কোনও খুন-জখমের মধ্যে যেতে চাই না।"

"তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি নদীর ওপারে গিয়ে ওদের দেখে এসো।"

"লর্ড, আমার সঙ্গে যাবে? একবার দেখে আসতে চাই।"

ওরা দু'জনে পা থেকে জুতো খুলে নদীতে নামল। নদীর মাঝখানেও হাঁটুর বেশি জল নয়। তবে স্রোতের বেশ শব্দ আছে।

রাও ওদিকের মানুষগুলোর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখল ওদের নিশ্বাস পড়ছে স্বাভাবিকভাবে। হাতের নাড়ি টিপে দেখল, তাও স্বাভাবিক। সবাই সত্যিই ঘুমন্ত। যে-লোকটা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, সে নাক ডাকছে।

রাও অস্ফুটভাবে বললেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য!"

লর্ড বলল, "ওই অংশুমান চৌধুরী মোটেই সাধারণ নয়। ওর দিকে তাকালে আমারই মাঝে-মাঝে ভয় করে।"

রাও বললেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, দুটো পাখি পড়ে আছে। এ-দুটোও কি ঘুমিয়ে আছে, না মরে গেছে?"

লর্ড বলল, "পাখি দুটোকে তুলে নিই, পরে মাংস রেঁধে খাওয়া যাবে!"

রাও বললেন, "না, না, থাক। শুধু শুধু পাখি মারা আমি পছন্দ করি না!"

ওরা আবার ফিরে এল নদীর এ-পারে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "দেখলে তো? ওরা এখন ঠিক পাঁচ ঘন্টা ঘুমোবে। একেবারে গাঢ় ঘুম। যখন উঠবে, তখন আবার পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে

উঠবে। কাজে বেশি উৎসাহ পাবে। এই ঘুমের ওষুধে কোনও ক্ষতি হয় না!"

রাও বললেন, "আপনি এই ওষুধ বাজারে বিক্রি করলে তো বড় লোক হয়ে যাবেন! এরকম ইনস্ট্যান্ট ঘুমের ওষুধের কথা আমি কখনও শুনিইনি!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমার কোনও আবিষ্কার আমি বিক্রি করি না। আমার টাকাপয়সার কোনও অভাব তো নেই! এবারে তা হলে রওনা হওয়া যাক!"

লর্ড বলল, "দুটো গাড়িই নিয়ে যাওয়া হবে?"

রাও বললেন, "না, শুধু-শুধু দুটো গাড়ি নিয়ে গিয়ে লাভ কী! একটা এখানে রেখে গেলেই তো হয়।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "না, এখানে ফেলে রাখা চলবে না। রাজা রায়চৌধুরী যদি গাড়িটা ব্যবহার করতে চায়, সে রিস্‌ক আমরা নিতে পারি না। লর্ড তুমি ওই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলো। ওটা আমরা ন্যারানপুরে রেখে যাব। তুমি আগে এগিয়ে পড়ো। আমরা রাও-এর গাড়িতে যাচ্ছি, তোমাকে তুলে নেব। কিছু খাবার দাবার জোগাড় করে নিতে হবে।"

রাত্তিরেই লর্ড তার গাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। সবাই মিলে চলে এল সেই গাড়িটার দিকে। অংশুমান চৌধুরী চোখে একটা কালো চশমা পরে নিয়ে বললেন, "কাল যে ভাল্লুকটাকে গুলি করা হয়েছিল, সেটা কী মরেছে?"

রাও বললেন, "না, আমি শুধু ওকে ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালিয়েছিলাম।"

"ওটা আবার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে না তো?"

"দিনের বেলা এদিকে আসবে না বোধহয়।"

"রাও তোমার গাড়িতে আমরা এদিক-ওদিক আর একটু খুঁজে দেখব। যদি রাজা রায়চৌধুরী আর ছেলে দুটিকে পাওয়া যায়। আধ মাইলের মধ্যে ওদের দেখা গেলেই আমাকে বলবে।"

দুটি গাড়িই স্টার্ট দিয়ে চলে এল বড় রাস্তায়। তারপর রাওয়ের গাড়িটা ঢুকে পড়ল রাস্তার উলটো দিকের জঙ্গলে।

তিনটে কুকুর এক সঙ্গে হিংস্রভাবে ডেকে উঠল। তীর-ধনুকওয়ালা মানুষ তিনজন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সন্তুদের দিকে। কাকাবাবু জোজোকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সন্তুকে বললেন, "ভয় পাসনি রে, এরা নিরীহ, শান্ত লোক। এরা আমাদের ক্ষতি করবে না।"

তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিন্দিতে বললেন, "আমাদের ওই ছেলেটিকে বিষ পিঁপড়ে কামড়েছে, তোমরা এর কিছু ওষুধ জানো?"

একজন লোক এগিয়ে গেল জোজোর দিকে। আর একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ওকে কী করে পিঁপড়ে কামড়াল? তোমরা এখানে শুয়ে

ছিলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমরা সারারাত এখানেই শুয়ে ছিলাম।"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "ও।"

কেন যে এই তিনজন অচেনা মানুষ এই জঙ্গলের মধ্যে সারারাত শুয়ে ছিল, তা আর সে জানতে চাইল না। যেন এটা একটা খুব সাধারণ ঘটনা।

কুকুর তিনটে সন্তু আর কাকাবাবুর গায়ের কাছে এসে লাফালাফি করছে। সন্তু কুকুরকে ভয় পায় না, তার নিজেরই একটা কুকুর আছে। কিন্তু এই কুকুরগুলোর কেমন যেন হিংস্র আর জংলি-জংলি ভাব।

কাকাবাবুই বললেন, "তোমাদের কুকুর সামলাও তো।"

যে-লোকটি জোজোকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল, জোজো তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

সন্তু বলল, "জোজো, জোজো, একটু চুপ করে থাক।"

সেই লোকটি মুখ ফিরিয়ে আগে নিজের সঙ্গীদের কী যেন বলল। তাদের সম্মতি পেয়ে কাকাবাবুকে বলল, "এ ছেলেটাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে চলুন। আমরা সারিয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই চল রে, সন্তু!"

জোজো তবু ভয় পাচ্ছে। এখন সে আর সন্তুর কাঁধে চড়তে রাজি হল না, নিজেই উঠে দাঁড়াল। সে যে খুবই কষ্ট পাচ্ছে তা বোঝা যায়। তার চোখ দুটো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। সন্তু ধরে ধরে নিয়ে চলল তাকে।

এই লোক তিনটি বড্ড তাড়াতাড়ি হাঁটে। এদের সঙ্গে তাল মেলানো সন্তুদের পক্ষে মুশকিল। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "একটা ব্যাপার কী জানিস, এরা অনায়াসে আট-দশ মাইল হেঁটে যায়, এদের গ্রামটা কত দূর কে জানে!"

একটা টিলার কাছে এসে সেই তিনজনের মধ্যে দু'জন খুব বিনীতভাবে কাকাবাবুকে বলল যে, তাদের একটু অন্য দিকে যেতে হবে। কাজ আছে। বাকি লোকটি কাকাবাবুদের গ্রামে নিয়ে যাবে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের গ্রামটা কত দূরে?"

তৃতীয় লোকটি হাত তুলে এমনভাবে দেখাল, যেন মনে হল খুবই কাছে। এতদূর আসার পর আর ফেরা যায় না। কাছে হোক বা দূরে হোক, যেতেই হবে। কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো, তোমার নাম কী ভাই!"

লোকটি বলল, "লছমন।"

"লছমন, তোমরা কি ছত্রিশগড়ী না মুরিয়া?"

"মুরিয়া। আমাদের গ্রামের নাম ছোটা বাংলা।"

বাংলা কথাটা শুনে সন্তু অবাক হয়ে তাকাল কাকাবাবুদের দিকে। কাকাবাবু বললেন, "বাংলা হচ্ছে আসলে বাংলো। এদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও

বোধহয় সরকারি বাংলো-টাংলো আছে।"

আরও প্রায় আধ ঘন্টা হাঁটার পর ওরা পৌঁছল একটা গ্রামে। ছোট-ছোট গোল ঘর, কিন্তু মানুষজন বিশেষ দেখা গেল না। দু'চারজন শুধু অতি বুড়োবুড়ি এক-একটা বাড়ির সামনে বসে আছে। অন্য সবাই নিশ্চয়ই কাজ করতে গেছে মাঠে কিংবা জঙ্গলে।

লছমন ওদের একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় বাড়িতে নিয়ে এসে বলল, "এটা ঘোটুল, ঘোটুল! এখানে তোমরা বসো!"

কাকাবাবু বললেন, "ও ঘোটুল! বুঝলি সন্তু। এখানে গ্রামের অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা রাত্রে এসে থাকে। এদের সমাজের ছেলেমেয়েরা বাবা-মা'র সঙ্গে থাকে না, বাচ্চা বয়েস থেকেই আলাদা থাকতে শেখে।"

ওদের বসিয়ে রেখে লোকটি চলে গেল। খানিক বাদেই সে দু'জন থুরথুরে বুড়ো মানুষকে নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একটা মাটির হাঁড়ি আর এক গাদা ঘাস পাতা। বুড়ো দু'জন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল জোজোকে। তারপর সেই ঘাসপাতার মধ্য থেকে বেছে-বেছে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মাটির হাঁড়ির ভেতরের কী একটা কালো রঙের তরল জিনিসের সঙ্গে মেশাতে লাগল।

আন্দামানের একটা দ্বীপে জারোয়াদের একটা গ্রামে গিয়েছিল সন্তু। সেই গ্রামের ঘরবাড়ি কিংবা মানুষজনের সঙ্গে এই গ্রামটার চেহারা কিংবা মানুষজনের বিশেষ কিছু তফাত নেই। কিন্তু জারোয়ারা হিংস্র, তারা পোশাক পরে না, তাদের দেখলেই ভয় করে। আর এই মুরিয়ারা কিন্তু খুবই ভদ্র। বুড়োদুটিও এসেই আগে কাকাবাবুকে হাতজোড় করে প্রণাম করেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "এদের ওষুধে অনেক সময় ম্যাজিকের মতন কাজ হয়। আমার আগের অভিজ্ঞতা আছে। সন্তু, তুই দ্যাখ, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।"

পাশেই একটা চাটাই পাতা আছে। কাকাবাবু তার ওপর শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বোঝা গেল যে, ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

সন্তু হিন্দি খুব কম জানে, এদের হিন্দিও অন্যরকম। তবু সে আকারে ইঙ্গিতে এদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। কোনও অসুবিধে হল না। জোজোর সারা গায়ে কাদার মতন ওষুধ লেপে দিয়ে একটা তালপাতার পাখা এনে একজন জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। জোজোও ঘুমিয়ে পড়ল সেই হাওয়া খেয়ে। সন্তু জেগে বসে রইল একা।

দুপুরবেলা একদঙ্গল লোক দেখতে এল ওদের। লছমন ভাত আর কলাইয়ের ডালও নিয়ে এসেছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুলতে হল তখন।

কাকাবাবু উঠেই চোখ কচলাতে-কচলাতে বললেন, "জোজো কোথায়?"

জোজোকে দেখে তিনি চিনতেই পারলেন না। চেনা সম্ভবও নয়।

জোজোর গায়ে মাখানো পুরু কাদার মতন ওষুধ এখন শুকিয়ে গিয়ে মাটি মাটি রং হয়েছে। জোজোকে এখন দেখাচ্ছে কুমোরটুলির রং-না-করা একটা মাটির মূর্তির মতন।

লছমন জোজোর পাশে বসে পড়ে সেই ওষুধ খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল। খানিকবাদে সব উঠে গেলে জোজোর হাত ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে দু' হাঁড়ি জল ঢেলে দিল তার মাথায়। জোজো একটুও আপত্তি করছে না।

ভিজে গায়ে ফিরে এসে সে বলল, "এখন বেশ ভাল লাগছে রে, সন্তু। একটুও ব্যথা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখলি এদের আশ্চর্য চিকিৎসা।"

এরপর খেতে বসতে হল ওদের। গরম গরম লাল রঙের ভাত আর কলাইয়ের ডাল অপূর্ব লাগল। জোজো আর সন্তু দু'জনেই ভাত খেয়ে নিল অনেকখানি। কাকাবাবু বললেন, একটা করে আলুসেদ্ধ থাকলে আরও ভাল লাগত, কী বল? তবে রাত্তিরে যদি থাকিস, তা হলে এরা শুয়োরের মাংস খাওয়াতে পারে। এরা রাত্তিরেই ভাল করে খায়।"

খাওয়া হয়ে গেলে কাকাবাবু তিন-চারজন বয়স্ক লোককে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানারকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

তারপর তিনি মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে ম্যাপ আঁকতে লাগলেন মাটির ওপরে।

ম্যাপের চর্চা করা কাকাবাবুর শখ। তিনি চোখ বুজে বঙ্গদেশের ম্যাপ এঁকে দিতে পারেন। কিন্তু এখানকার লোকরা ম্যাপ বোঝে না। কাকাবাবু যে জায়গাটার সন্ধান জানতে চাইছেন, সেটা এরা বুঝতে পারছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু এবার একটা ছোট মন্দির আঁকলেন, তারপর তার সামনে একটা লম্বামতন মূর্তি। কাকাবাবু সেটার ওপর আঙুল দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মন্দিরটা কোথায় বলতে পারো?"

তিনজন বৃদ্ধ মাথা নেড়ে "হ্ হ্ হ্ হ্" করতে লাগল। কিন্তু কোথায় যে মন্দিরটা সেটা কিছুই বলতে পারে না।

বাইরে যে কয়েকজন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর আঁকা ছবিটা দেখল মন দিয়ে। তারপর সে ছবিটার সামনে শুয়ে পড়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, "আমি জানি। আমি দেখিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কত দূরে? কতক্ষণ লাগবে যেতে?"

লোকটি বলল, "এই সামনে একখানা পাহাড়, তার পরের পাহাড়ে।"

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখন হাঁটতে পারবে? আমাদের মনে হয়, বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, হাঁটতে পারব।"

"তা হলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক !"

তিনজন বুড়ো তখন কাকাবাবুর হাত চেপে ধরল। তারা কাকাবাবুকে ছাড়তে চায় না। কাকাবাবুকে তারা রাত্তিরটা থেকে যেতে বলছে।

কাকাবাবু কিছু বলতে যেতেই তারা "না, না, না, না" বলে মাথা নাড়ছে। কাকাবাবু অতি কষ্টে তাদের বোঝালেন যে, এখন একটা বিশেষ কাজে তাঁকে চলে যেতেই হবে, ফেরার সময় তিনি এখানে আসবার চেষ্টা করবেন।

তারপর তিনি লছমনকে একপাশে ডেকে দু'খানা কুড়ি টাকার নোট তার হাতে দিতে গেলেন। লছমন সে টাকা কিছুতেই নেবে না। খুব জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

শেষপর্যন্ত কাকাবাবু লজ্জিত হয়ে টাকাটা পকেটে পুরে ফেললেন।

সন্তুদের তিনি বললেন, "এরা কীরকম ভদ্র দেখছিস ? আমাদের যত্ন করে খাওয়াল, জোজোর চিকিৎসা করল...এরা গরিব হতে পারে কিন্তু খুব আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। আবার রাত্তিরে থেকে যেতে বলছে। আমাদের উচিত ছিল, এদের কিছু উপহার দেওয়া, কিন্তু কিছুই তো নেই আমাদের কাছে।"

যে-লোকটি মন্দিরের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তার নাম শিবু। সে লছমনকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। আবার শুরু হল হাঁটা।

সামান্য একটা জঙ্গল পার হওয়ার পরেই উঠতে হবে পাহাড়ে। ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে কাকাবাবুর খুবই কষ্ট হয়। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে লাগলেন। ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর কপাল দিয়ে। মাথার ওপর গনগন করছে দুপুরের সূর্য। জঙ্গলের মধ্যে তবু ছায়া-ছায়া ভাব ছিল, এই পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া।

সেই পাহাড়টি পেরিয়ে যাওয়ার পর একটা ছোট নদী পার হতে হল। সে-নদীতে এখন জল প্রায় নেই, বালিই বেশি। সামনেই একটা ছোট পাহাড়, সেটা ছোট-ছোট খাদে ভরা। এখানে ঢেউয়ের মতন একটার পর একটা পাহাড়।

তলা থেকেই দেখা যায়, সেই পাহাড়ের মাঝখানে একটা মন্দিরের চূড়া। শিবু হাত দেখিয়ে বলল, "ওই যে !"

কাকাবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এত কাছে যে মন্দিরটা হবে, তা তিনি আশাই করেননি। আগের গ্রামের বৃদ্ধরা তা হলে বলতে পারল না কেন ? তারা কি ছবিটা দেখে বুঝতে পারেনি।

নতুন উৎসাহ নিয়ে কাকাবাবু এবারে উঠতে লাগলেন পাহাড়টায়। মন্দিরটা দেখে সন্তুর ইচ্ছে করছে দৌড়ে আগে আগে উঠে যেতে। কিন্তু কাকাবাবু তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না, জোজো কোনও রকমে তার কাঁধ ধরে ধরে হাঁটছে। বেচারি জোজো পিঁপড়ের কামড় খাওয়ার পর থেকে একেবারে চুপসে

গেছে, মুখে আর কোনও কথা নেই।

কপা কপ্ কপা কপ্ শব্দ শুনে সন্তু একবার পেছন ফিরে তাকাল। ছোট-ছোট ঘোড়ায় চেপে চারজন লোক আসছে এদিকে। এখানে একটা পায়ে-চলা পথ আছে, সন্তুরা একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘোড়াগুলো তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, লোকগুলো তাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল বটে কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না।

ছোট হলেও এই পাহাড়টা বেশ খাড়ামতন, ঘোড়াগুলোও উঠছে আস্তে-আস্তে। কাকাবাবু খুবই হাঁপিয়ে গেছেন, কিন্তু একবারও থামবার কথা বলছেন না।

মন্দিরটার কাছে পৌঁছতে আরও প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল।

একটা চৌকো মতন পাথরের মন্দির, তাতে সাদা চুনকাম। এমন কিছু পুরনো নয়। কাছাকাছি কোনও গ্রাম নেই, এখানে এরকম একটা মন্দির কে তৈরি করল কে জানে!

কাকাবাবু সামনের চাতালে দাঁড়িয়ে রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন। সন্তু দৌড়ে গেল মন্দিরের ভেতরের মূর্তিটা দেখবার জন্য। ধুতি-পরা একজন লোক পেছন ফিরে বসে আছে মূর্তিটার সামনে। খালি গা, পিঠের ওপর বেশ মোটা একটা পৈতে।

মূর্তিটা প্রায় এক হাত উঁচু, নীলচে রং, ঠিক কোন্ যে ঠাকুর, তা বোঝা গেল না। অনেকটা যেন মা-কালীর মূর্তির মতন, কিন্তু জিভ-কামড়ানো নয়। পায়ের নীচে মহাদেবও নেই। ধুতি-পরা পুরোহিতটির চেহারা দেখেও এখানকার আদিবাসী মনে হয় না।

কাকাবাবু এবারে আস্তে-আস্তে এসে সন্তুর কাছে দাঁড়ালেন। তারপরই অবাক হয়ে বললেন, "আরে, এ মূর্তিটা তো নয়। এ তো অন্য মন্দির!"

সন্তু বলল, "নীল রং কিন্তু!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হোক, অংশুমান চৌধুরীর কাছে আমি মূর্তিটার একটা কপি দেখেছি। সেটা একেবারে অন্যরকম। আরও লম্বা। সেটা পুরুষের মূর্তি, পায়ে গামবুট। আমরা ভুল জায়গায় এসেছি।"

মন্দিরের পুরোহিতটি এবারে মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে খুব অবাকভাবে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বস্তারের জঙ্গলে, একটা ছোট পাহাড়ের ওপর মন্দিরের পুরোহিতকে বাংলায় কথা বলতে শুনে ওরা তিনজনেই অবাক। সন্তু জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "আপনি বাংলা জানেন? কী করে বাংলা শিখলেন?"

পুরোহিতটি ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললেন, "বাঙালির ছেলে বাংলা জানব না? অবশ্য বাঙালি ছিলাম অনেক আগে, এখন আর নেই।"

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আসুন, মন্দিরের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন, "একটু জল খাব।"

পুরোহিত মন্দিরের পেছন দিয়ে গিয়ে একটা পেতলের ঘটি ভর্তি জল আনলেন। খুব ঠাণ্ডা জল। ওরা তিনজনেই জল খানিকটা পান করল, আর খানিকটা দিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিল।

জোজো বলল, "আর একটু জল খাব।"

এবারে পুরোহিত আর এক ঘটি জলের সঙ্গে আনলেন কয়েকটা তিলের নাড়ু। সেগুলো এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু মিষ্টি খেয়ে তারপর জল খান। নইলে তেষ্টা মিটবে না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আগে দণ্ডকারণ্যে ছিলেন, তাই না ?"

পুরোহিত এবারে চমকে গেলেন খানিকটা। কাকাবাবুর মুখের দিকে একটুক্ষণ অবাকভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি কী করে বুঝলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বাংলার মধ্যে পূর্ববঙ্গের একটা টান আছে। তাই আন্দাজ করা এমন কিছু শক্ত নয়।"

পুরোহিত বললেন, "আমার নাম ধনঞ্জয় আচার্য। এক সময় দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু কলোনিতে ছিলাম। সেখানে কষ্ট ছিল খুব। একদিন মা কালী আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "তুই ডুমডুমি পাহাড়ে যা, সেখানে আমার ভাঙা মন্দির দেখতে পাবি। সেখানে গিয়ে আমার মূর্তি স্থাপন কর, তা হলে তুই উদ্ধার পেয়ে যাবি। ডুমডুমি পাহাড় কোথায় তা তো চিনতাম না। ক্যাম্প ছেড়ে তবু বেরিয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন এই দিকের সব পাহাড়ে ঘুরেছি। কতদিন কিছু খাওয়া জোটেনি, কখনও গাছের ফলমূল খেয়ে কাটিয়েছি। তারপর এই পাহাড়ে এসে ভাঙা মন্দিরের সন্ধান পেলাম। তখন ভেবেছিলাম, এখানে মন্দিরে যদি থেকে যাই, তা হলে খাব কী ? এই পাহাড়ের ওপর কে আসবে ? তবু রয়ে গেলাম। প্রথম তিনদিন-চারদিন একজন মানুষও আসেনি, আমি একেবারে উপবাস করে কাটিয়েছি। ঠিক করেছিলাম, যদি না খেতে পেয়ে মরতে হয়, তবু এখান থেকে যাব না। তারপর আস্তে-আস্তে লোকেরা কী করে যেন এই মন্দিরের কথা জেনে গেল। এখন অনেকেই আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখছি তো, ঘোড়ায় চড়ে অনেক লোক আসছে।"

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "আমি ছাড়া আরও পাঁচজন লোক এখন এই মন্দিরে থাকে। আমি পাহাড় থেকে নীচে নামি না। ওরাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনে। আপনারা এদিকে এলেন কী করে ? এ পর্যন্ত এখানে আর কোনও বাঙালি আসেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরাও এদিকে এসেছি একটা মন্দিরের খোঁজে। কাছাকাছি গ্রামের একজন লোক আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এল। কিন্তু আমি খুঁজছি একটা অন্য মন্দির। আপনি বোধহয় আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।"

কাকাবাবু তাঁকে গামবুটের মতন জুতো পরা পুরুষ-দেবতার মূর্তিটির কথা বুঝিয়ে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই মূর্তিটি এই তল্লাটে কোথায় আছে বলতে পারেন?"

ধনঞ্জয় আচার্য দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না, এরকম কোনও মূর্তির কথা আমি শুনিনি। বললাম তো, আমি এই পাহাড় থেকে নীচে নামি না। আপনি বলছেন, জুতো-পরা মূর্তি। এটা আবার কী ঠাকুর?"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমি জানি না। বইয়ে পড়েছি এই মূর্তিটার কথা, সেইজন্যেই সেটা দেখার এত কৌতূহল।"

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "দেখি আমার লোকেরা কেউ কিছু সন্ধান দিতে পারে কি না!"

তিনি দু'জন লোককে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে ওখানকার ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সন্তুরা সেই ভাষা এক বর্ণ বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেবারে নেপাল গিয়ে তুই তো খুব ঘোড়ায় চেপেছিলি। মনে আছে? এখন ঘোড়ায় চাপতে পারবি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, পারব।"

জোজো এতক্ষণে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সে বলল, "আমি খুব ভাল ঘোড়া চালাতে জানি। বাবার সঙ্গে একবার টার্কিতে গিয়ে প্রত্যেকদিন ঘোড়ায় চড়ে কত মাইল যে গেছি!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তা হলে তো খুব ভাল কথা। ভাবছি, এই পুরুতমশাইয়ের কাছ থেকে দুটো অন্তত ঘোড়া ধার চাইব। এখান থেকে ঘোড়ায় যেতে পারলে অনেক পরিশ্রম বাঁচবে।"

কাছেই একটা গাছে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা আছে। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল জোজো, আমরা একটু ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস করি। ওদের বললে ওরা নিশ্চয়ই একটু চাপতে দেবে।"

জোজো নাক সিঁটকে বলল, "এইটুকু ছোট ছোট ঘোড়া, এতে কী চাপব! এগুলো তো গাধা! আমি বিরাট-বিরাট ঘোড়া, যাকে ওয়েলার ঘোড়া বলে, সেই ঘোড়ায় চাপতে পারি!"

সন্তু বলল, "ওই গাঁট্টাগোট্টা লোকগুলো এই ছোট ঘোড়ায় চেপেই তো ঘুরে বেড়ায়। আমরা কেন পারব না? চল না দেখি!"

সন্তু জোজোর হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। গাছতলায় যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, "আমাদের একটু

ঘোড়ায় চাপতে দেবেন ?”

ওদের সঙ্গে শিবু নামে যে লোকটি এসেছিল, সেও গল্প করছিল এখানকার লোকদের সঙ্গে। সেই শিবু সন্তুদের কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলল ওদের।

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। দুটো ঘোড়া খুলে এনে ওদের সাহায্য করল পিঠে চাপতে। তারপর একজন করে ঘোড়ার দড়ি ধরে হাঁটাতে লাগল ঘোড়াটাকে। ওরা গোল হয়ে খানিকটা জায়গা ঘুরল।”

সন্তু বলল, “এই ঘোড়াগুলো বেশ শান্ত রে, জোজো। কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।”

জোজো ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, “বাঃ, এগুলো আবার ঘোড়া নাকি, গাধার অধম। আমি ঘোড়া ছুটিয়েছি, এইট্টি, নাইনটি মাইলস্ স্পিডে! আরব দেশের আসল ঘোড়া।”

সন্তু তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, “আপনি একবার একটু ছেড়ে দিন না, নিজে নিজে চালাই!”

দু'জন লোকই ঘোড়ার দড়ি ছেড়ে দিল। জোজো তার ঘোড়ার পেটে একটা লাথি মেরে চেঁচিয়ে বলল, “হ্যাট, হ্যাট, হ্যাট...”

সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা তড়বড়িয়ে ছুটতে শুরু করল, আর জোজো ছিটকে পড়ে গেল তার পিঠ থেকে। তবে সৌভাগ্যবশত সে পড়ল একটা ঝোপের ওপর, তার চোট লাগল না।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জামা ঝাড়তে-ঝাড়তে জোজো বলল, “দেখলি, দেখলি সন্তু, কীরকম একখানা ড্রাইভ দিলাম ? তুই পারবি ?”

কাকাবাবু মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ওদের দেখছেন আর হাসছেন।

এরপর তিনি নিজে যখন ঘোড়ায় চাপবেন, তখন জোজো আর সন্তুও বোধহয় হাসবে। তাঁরও অনেকদিন ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস নেই, তা ছাড়া খোঁড়া পা নিয়ে অসুবিধে হবে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া এখানে পায়ে হেঁটে বেশি দূর ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়।

ধনঞ্জয় আচার্য তাঁর লোকদের সঙ্গে কথা শেষ করে কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, “হ্যাঁ, ওদের একজন ওই মূর্তিটার কথা জানে। নিজের চোখে দেখেনি, তবে অন্যদের কাছে শুনেছে। ওর কথা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ওখানে আপনার যাওয়ার দরকার নেই।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কেন বলুন তো ?”

ধনঞ্জয় বললেন, “জায়গাটা অনেক দূর। অবুঝমাড় পেরিয়ে আরও অনেকখানি। আপনি তিরাংদের নাম শুনেছেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি মারিয়া, আর মুরিয়াদের কথা জানি। এই সব জায়গায় আগে একবার ঘুরেছি। কিন্তু তিরাংদের কথা তো শুনিনি।”

“এদের কথা খুব কম লোকই জানে। মাত্র দু'তিনখানা গ্রামে এরা থাকে।

এদের একটা গ্রামে এই মূর্তি আছে। সেখানে বাইরের লোক বিশেষ কেউ যায় আসে না।"

"এরা কি হিংস্র নাকি ? বাইরের লোক দেখলে আক্রমণ করতে আসে ?"

"সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা এমনিতে বেশ শান্ত। কিন্তু কোনও কারণে রেগে গেলে তখন আর হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না। তখন একেবারে খুন করে ফেলতেও এদের চোখের একটি পাতাও কাঁপে না। আপনি নিজে...মানে...আপনার দুটি পা ঠিক নেই, সঙ্গে দুটি অল্পবয়েসী ছেলে, এই অবস্থায় আপনাদের ওদিকে যাওয়া উচিত হবে না।"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "মুশকিল কী জানেন, আমি যদি যেতে নাও চাই ছেলেদুটি ছাড়বে না। ওরা বড্ড জেদি। জায়গাটা ঠিক কোথায়, আপনি একটু ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দেবেন ?"

"জেনেশুনে আপনাদের ওই বিপদের মধ্যে পাঠাই কী করে ?"

"কাছাকাছি গিয়ে দেখে আসি অন্তত, সে-রকম বিপদ দেখলে ভেতরে ঢুকব না। আর একটা কথা, ধনঞ্জয়বাবু আপনার শিষ্যদের তো বেশ কয়েকটা ঘোড়া রয়েছে দেখছি। তার থেকে দুটো ধার নিতে পারি ? ঘোড়া ছাড়া অতদূর যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা ঘোড়াদুটো বাবদ কিছু টাকা জমা রেখে যাব আপনার কাছে।"

"টাকার কথা উঠছে না, আপনাদের আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

কাকাবাবু তবু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধনঞ্জয় আচার্যকে দিয়ে একটা ম্যাপ আঁকিয়ে নিলেন। ওখানে কোনও সাদা কাগজ নেই, মন্দিরের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছিল, তারই একটা পাতা ছিঁড়ে নেওয়া হল। কলম পাওয়া গেল সন্তুর কাছে।

ধনঞ্জয় আচার্য এককালে একটু-আধটু লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু গত পঁচিশ বছর কিছুই লেখেননি, তাই বাংলা অক্ষর লিখতে ভুলে গেছেন। অবুঝমাড় লিখতে গিয়ে 'অ' অক্ষরটাই লিখতে পারেন না।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি জায়গাগুলোর নাম বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।"

দেখতে-দেখতে সন্ধে হয়ে এল। মন্দিরের কাছাকাছি জঙ্গলের গাছে অনেক রকম পাখি ডাকছে। একটু দূরে একটা কোনও পাখি খুব জোরে পিঁয়াও পিঁয়াও করে ডাকছে, গলায় তার সাংঘাতিক জোর।

সন্তু বলল, "এটা কী পাখি ? এরকম ডাক তো শুনিনি !"

জোজো বলল, "এটা মোটেই পাখি নয়, এটা ফেউয়ের ডাক। বাঘ বেরুলেই পেছন পেছন ফেউ বেরোয় শুনিস্নি ? আমি খুব ভাল চিনি।"

সন্তু বলল, "ভ্যাট্, ফেউ আবার কী ? ফেউ তো আসলে শেয়াল, বাঘ দেখে ভয় পেয়ে শেয়ালের ডাক তখন বদলে যায়। এটা পাখিরই ডাক।"

জোজো বলল, "তুই কিছু জানিস না। এটা পাখি হতেই পারে না। এটা নির্ঘাত ফেউ।"

দু'জনে তর্ক করতে করতে এক সময় বাজি ধরে ফেলল। এক বোতল কোল্ড ড্রিংক।

ওরা কাকাবাবু আর ধনঞ্জয় আচার্যর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ডাকছে?"

কাকাবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "ওটা তো ময়ূর। এদিকের জঙ্গলে কিছু ময়ূর আছে।"

সন্তু প্রথমে লজ্জা পেল। ময়ূরের ডাক সে আগে অনেক শুনেছে, তার চিনতে পারা উচিত। এখানে ডাকটা খুব জোরে শোনাচ্ছে।

তারপরই সে জোজোকে বলল, "তুই হেরে গেছিস! কোল্ড ড্রিংকটা পাওনা রইল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে খাওয়াতে হবে কিন্তু!"

জোজো বলল, "হেরেছি মানে? ময়ূর কি পাখি?"

আবার তর্ক লাগিয়ে দিল ওরা।

কাকাবাবু ধনঞ্জয় আচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলের মধ্যে মন্দির করেছেন, এখানে বুনো জন্তু-জানোয়ার আসে না?"

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "সন্ধের দিকে প্রায়ই হাতি আসে। আজ তো এখানেই থাকছেন আপনারা। হয়তো দেখতে পেয়ে যাবেন।"

॥ ১৬ ॥

ভোরবেলাতে আবার যাত্রা শুরু হল। একটি ঘোড়ার পিঠে জোজো আর সন্তু। আর একটি ঘোড়ায় কাকাবাবু। দুটোর বেশি পাওয়া গেল না। তা ছাড়া জোজো নিজে আলাদা একটা ঘোড়া চালাতেও পারত না।

কাকাবাবু তাঁর ক্রাচ দুটো বেঁধে এক পাশে ঝুলিয়ে নিয়েছেন। একটা পা প্রায় অকেজো হলেও তাঁর ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না। কাকাবাবুকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে, খানিকটা যাওয়ার পর তিনি উৎফুল্ল ভাবে বললেন, "দ্যাখ, সন্তু, এখন কি কেউ আর আমাকে খোঁড়া লোক বলতে পারবে? ভাবছি, এরপর থেকে কলকাতা শহরেও একটা ঘোড়ায় চেপে ঘুরলে কেমন হয়। তা হলে আর ক্রাচ লাগবে না। গাড়ি চালাতে গেলেও অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক আর ক্লাচ সামলাবার জন্য দুটো পা লাগে। ঘোড়া চালাবার জন্য সে ঝামেলা নেই। এই ঘোড়াটাও বেশ শান্ত। বিখ্যাত বীর তৈমুর লঙও নাকি খোঁড়া ছিল। সেও তো এক পায়ে ঘোড়া ছুটিয়েই কেল্লা ফতে করেছে!"

জোজো বলল, "জানেন কাকাবাবু, নেপোলিয়ন চলন্ত ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নিতেন!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ! নেপোলিয়ন বিছানায় শুয়ে ঘুমোনো একেবারে পছন্দ করতেন না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, আমি কিন্তু বাপু ঘোড়ার পিঠে ঘুমোতে পারব না!"

সন্তু বলল, "জোজো এমনভাবে বলছে, যেন ও নেপোলিয়নকে ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়তে নিজের চোখে দেখেছে! না-শুয়ে বুঝি ঘুমোনো যায় না!"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে সুর পালটে বলল, "আমার এক কাকা আছেন, কানপুরে থাকেন, উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। এমন কী ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটেন।"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন।

তাঁর ঘোড়াটা যাচ্ছে আগে-আগে। ম্যাপ দেখে তিনি মনে-মনে একটা রাস্তা ছকে নিয়েছেন। পাকা রাস্তা এড়িয়ে জঙ্গলের মধ্য-দিয়েই এগোতে হবে। অংশুমান চৌধুরীরা গাড়িতে যাবেন, তাঁদের পাকা রাস্তা দিয়েই যেতে হবে, তাঁদের সামনে পড়া চলবে না। অংশুমান চৌধুরীরা দলে ভারী, তাঁদের সঙ্গে অস্ত্রও অনেক বেশি। কাকাবাবুর কাছে রয়েছে শুধু একটি রিভলভার, তাতে মোটে চারখানা গুলি। ওঁদের কাছ থেকে কাকাবাবু রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্সট্রা গুলি তো আর নেওয়া হয়নি।

আদিবাসীদের একটা মূর্তির জন্য অংশুমান চৌধুরী প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, অনেক রকম ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং কাকাবাবু বাধা দিতে গেলে তিনি সহজে ছাড়বেন না।

আগের রাত্তিরটায় নিরামিষ ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে, ভাল করে ঘুমিয়ে নেওয়া হয়েছে। সন্তু আর জোজো হাতি দেখার জন্য জেগে ছিল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতি আর আসেনি এদিকে, ওরা দূরে গাছপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ শুনেছে শুধু।

ধনঞ্জয় পুরোহিত ওদের যত্ন করেছেন খুবই। আসবার সময় তিনি মস্ত এক পোঁটলা ভর্তি চিঁড়ে আর গুড় দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে, জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোথাও খাবার না পাওয়া গেলে এই চিঁড়ে-গুড় খেয়েই পেট ভরানো যাবে।

এখানে জঙ্গল খুব ঘন নয়, মাঝে-মাঝে পার হতে হচ্ছে ছোট-ছোট টিলা। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। এক জায়গায় দেখা গেল এক ঝাঁক বাঁদর। তারা গাছের ডালে দোল খেতে-খেতে খুব কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল এই দলটাকে। যেন প্যান্ট-শার্ট পরা মানুষ তারা আগে কখনও দ্যাখেনি।

একটু পরে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওদের দলটা তো আগে আগে এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া ওরা গেছে গাড়িতে। এতক্ষণে কি ওরা মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যায়নি?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা গাড়িতে গেলেও সবটা গাড়িতে যাওয়া যাবে না। তিরাংদের ওই গ্রামটা পাহাড়ের একেবারে ওপরে। বেশ বড় পাহাড়। ওদের তুলনায় আমাদের বরং একটা সুবিধে আছে, আমরা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের ওপরে অনেকটা উঠে যেতে পারব।"

জোজো বলল, "একটা কাজ করলে হয় না? আমাদের পাহাড়ে ওঠার দরকার কী? আমরা পাহাড়টার কাছে পৌঁছে নীচে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারি। ওদের গাড়িটার আশেপাশে। তারপর ওরা মূর্তিটা চুরি করে নেমে এলে আমরা হঠাৎ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কেড়ে নেব। ব্যাস! তারপর ওদের গাড়িটাও পেয়ে যেতে পারি!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যে এই কথাটা ভাবলে, ওরাও কি এটা ভাবতে পারে না? অন্যপক্ষকে কখনও বোকা ভাবতে নেই। ওরাও পাহাড়ের নীচে, গাড়িটার কাছে কোনও ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, আমরা সেখানে পৌঁছলেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আড়াল থেকে! এই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের তিনজনকে খুন করে রেখে গেলেও কেউ টের পাবে না।"

সন্তু বলল, "আমাদের উচিত উলটো দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া!"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও ঠিক সেটাই ভেবে রেখেছি। তিরাংদের গ্রাম যে-পাহাড়টার ওপর, সেটাকে দূর থেকে দেখতে অনেকটা গণ্ডারের মাথার মতন। দেখলেই চেনা যাবে। ধনঞ্জয় পুরুতের একজন আদিবাসী শিষ্যের কাছ থেকে আমি সে পাহাড়ের উলটো দিকে যাওয়ার রাস্তাটাও জেনে নিয়েছি। একটা শর্টকাট আছে।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আমার পিসেমশাই আপনাকে একটা কমপিটিশানে নামাতে চেয়েছিলেন, আপনি রাজি হননি তখন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে সেই কমপিটিশানে নামতে হল।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, তা ঠিক। আমরা এখন অনায়াসে কলকাতার দিকে রওনা হতে পারতুম। কিন্তু মূর্তিটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহল হচ্ছে। এমন কী দামি মূর্তি হতে পারে, যার জন্য পট্টনায়ক, রাও আর অংশুমান চৌধুরী কাঠ-খড় পোড়াচ্ছেন? সেই জন্যই একবার দেখে যেতে চাই।"

জোজো বলল, "কিন্তু ওদের আগে পৌঁছতে হবে আমাদের।"

সন্তু বলল, "আমরা তো পৌঁছবই! যদি তা না পারি, আগেই যদি তোর পিসেমশাই মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যায়, তা হলে বারুইপুর পর্যন্ত তাড়া করে যাব!"

জঙ্গলটা এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে এসেছিল, হঠাৎ সামনে দেখা গেল একটা মস্ত বড় জলাশয়। অনেকটা হ্রদের মতন। কাকাবাবু ঘোড়া থামিয়ে বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর! অপূর্ব!"

জায়গাটা সত্যি ভারী সুন্দর। জল একেবারে স্বচ্ছ। মাঝখানেও ফুটে আছে

অনেক লাল রঙের শালুকফুল। একঝাঁক সাদা বক বসে আছে কাছেই। একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ থেকে টুপটাপ করে ফুল খসে পড়ছে জলে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোরা এসে একটু ধর তো আমাকে, এখানে একবার নামব।"

খোঁড়া পা নিয়ে ঘোড়ায় উঠতে ও নামতে কষ্ট হয় কাকাবাবুর। সন্তু নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে এল।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, এখানে থামলেন ? আমাদের দেরি হয়ে যাবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "যতই ব্যস্ততা থাক, কোনও সুন্দর জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে নেই। সন্তু, তোকে আগে একবার রামায়ণের সেই অংশটার কথা বলেছিলুম না ? রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, সোনার হরিণ মেরে ফিরে এসে সীতাকে না পেয়ে রাম পাগলের মতন খুঁজছেন, খুঁজতে-খুঁজতে পম্পা সরোবরের তীরে এসে রাম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সীতার কথা ভুলে গিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। এই জায়গাটা পম্পা সরোবরের চেয়ে খারাপ কিসে ?"

ঘোড়া থেকে নেমে কাকাবাবু হ্রদটার তীরে গিয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে ছেটালেন। তারপর বললেন, "আঃ, কী ঠাণ্ডা জল ! এক-এক সময় আমার কী মনে হয় জানিস, সন্তু, এই যতসব বদমাস আর গুণ্ডাদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়ে কত সময় নষ্ট করি। তার চেয়ে ওসব ছেড়েছুড়ে এই সব সুন্দর জায়গায় এসে সময় কাটালে কত ভাল লাগত ! আজকাল আর ওই সব কাজের ভার নিতেও চাই না, তবু পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়।"

সন্তু বলল, "এখানে তো ওই অংশুমান চৌধুরী তোমাকে জোর করে টেনে এনেছে !"

কাকাবাবু বললেন, "যাই হোক, তবু তো এই একটা সুন্দর জায়গা দেখা গেল !"

মুখ-টুখ ধুয়ে, ঘাসের ওপর বসে পড়ে তিনি আবার বললেন, "ঘোড়া দুটোকে জল খেতে দে। ওদেরও তো বিশ্রাম দরকার।"

তারপর তিনি হাতে-আঁকা ম্যাপটা খুলে দেখতে লাগলেন। সন্তুও ঝুঁকে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করল ম্যাপটা। কাকাবাবু আঙুল দিয়ে এক জায়গায় দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওরা বলেছিল, এখানে একটা বড় জলাও থাকবে। উলটো দিকে একটা ছোট পাহাড়। এখান দিয়ে কোনাকুনি যাওয়া যেতে পারে। আমার কী মনে হয় জানিস, সন্তু, এখন তো সবে শীত শেষ হয়েছে, এদিকে এখনও বর্ষা নামেনি, এই হ্রদের জল বেশি হবে না। আমরা ঘোড়া নিয়ে যদি এই হ্রদটা পার হয়ে যেতে পারি, তা হলে অনেকটা সময় বেঁচে যাবে !"

"যদি বুক-জলের বেশি হয় ?"

"তাতেও ক্ষতি নেই। ঘোড়া সাঁতার কাটতে পারে। আমরাও ডুবে যাব না। ও, ভাল কথা, তোর বন্ধু জোজো সাঁতার জানে তো ?"

"মনে তো হয় জানে। তবে বিশ্বাস নেই।"

জোজো ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। সন্তু তাকে ধমক দিয়ে বলল, "এই জোজো, তুই আবার যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ছিস ? যদি ফের পিঁপড়ে কামড়ায় ?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, "ওরে বাবা, এখানেও পিঁপড়ে আছে নাকি ?"

"শোন, তুই সাঁতার জানিস তো ?"

"সাঁতার ? হেঃ, কী বলছিস ? কতবার আমি সাঁতারে গঙ্গা এপার ওপার করেছি। একবার বাবার সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরে ঘোরার সময় আমাদের মোটরবোট উল্টে গেল, আমাদের গাইড যে ছিল, সে সাঁতার জানত না, আমি তাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে বাঁচালুম !"

সন্তু হাসি মুখে বলল, "তা বেশ করেছিস ! এখন আমরা এই লেকটা পেরুব ঘোড়ায় চেপে, ঠিক আছে তো ?"

জোজো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "এটা ভারী তো একটা লেক, হাঁটুজল হবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, জামা প্যান্ট ভিজে যাবে, শুধু শুধু এটা পার হওয়ার দরকার কী ? পাশ দিয়ে গেলেই তো হয়।"

ঘোড়া দুটো জল খাচ্ছিল, হঠাৎ এক সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করল বাঁ দিকে, কান দুটো লটপট করতে লাগল। তারপর পেছন ফিরে ছুট লাগাবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, শিগগির ওদের লাগাম ধর !"

কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও নিজেই লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন, অন্য ঘোড়াটাকে সন্তু আর জোজো দু'জনে মিলেও আটকাতে পারল না। সে তীরবেগে ছুটে মিলিয়ে গেল জঙ্গলে।

কাকাবাবু বললেন, "একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। এই ঘোড়াতেই তিনজন উঠতে হবে।"

তিনজন সওয়ার নিয়েই এই ঘোড়াটা তড়বড়িয়ে চলে এল লেকের প্রায় মাঝখানে।

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও হিংস্র জানোয়ার এসেছিল, তাই ঘোড়া দুটো ভয় পেয়েছে। বাঘ-টাঘ হওয়াই সম্ভব।"

জোজো অবিশ্বাসের সুরে বলল, "দিনের বেলায় বাঘ ?"

সন্তু বলল, "কেন, দিনের বেলা বাঘ বেরুতে পারবে না, এমন কোনও

আইন আছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “এই জঙ্গলে লেপার্ড আছে জানি। লেপার্ডরা মানুষকে আক্রমণ করতে সাহস পায় না, কিন্তু ওরা ঘোড়ার মাংস খুব ভালবাসে। কিন্তু...একটা ঘোড়া চলে গেল...এখন তিনজনে মিলে এই একটা ঘোড়ায় কী করে যাব ? এ বেচারী বেশিক্ষণ আমাদের বইতে পারবে না।”

সন্তু বলল, “লেকটা পার হওয়ার পর আমি আর জোজো হেঁটে যাব। তুমি ঘোড়ায় যাবে। পাহাড়ে ওঠার সময় তিনজনে এর পিঠে বসে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।”

পেছন ফিরে তাকিয়েও ওরা অবশ্য বাঘ বা লেপার্ড দেখতে পেল না। ঘোড়াটা হ্রদ পার হয়ে এসে গা-ঝাড়া দিতে লাগল। হ্রদটায় সত্যিই জল বেশি ছিল না। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো ঘোড়াটার সঙ্গেই বাঁধা আছে, চিঁড়ে-গুড়ের পোঁটলাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্য ঘোড়াটার সঙ্গে-সঙ্গে।

কাকাবাবু আপত্তি করলেন না, তিনি একা বসে রইলেন ঘোড়ার পিঠে, সন্তু আর জোজো হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। এটাই সুবিধেজনক।

সামনের ছোট টিলাটার পাশ ঘুরে অন্য দিকে যেতেই চোখে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা কুঁড়েঘর। ঠিক গ্রাম নয়, সব মিলিয়ে তিনটে মাত্র বাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, “দু'হাত উঁচু করে রাখ। ওরা যেন না ভাবে যে, আমরা এদের শত্রু।”

তিনি নিজেও হাত তুললেন মাথার ওপর।

একটা বাড়ির সামনে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন লোক। পাশে তীর-ধনুক। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেও লোকটা একবারও নড়ল-চড়ল না, মুখ তুলে তাকালও না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, “লোকটা মরে গেছে নাকি ? কেউ ওকে মেরে রেখে গেছে ?”

॥ ১৭ ॥

কাছেই একটা ছোট ঝরনা, সন্তু আঁজলা করে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগল লোকটির চোখে-মুখে। আগেই সে লোকটির নাকে হাত দিয়ে দেখে নিয়েছে যে তার নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনও কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে। কাকাবাবু ঘোড়াটিকে একটা কুঁড়েঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে অতিকষ্টে নিজেই নামলেন। সেই ঘরের সামনে আর একটি মেয়ে শুয়ে আছে। সেও অজ্ঞান। এই মেয়েটির মুখেও জলের ঝাপটা দেওয়া হল, তবু সে চোখ মেলল না।

জোজো অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখে এসে অবাক হয়ে বলল, “আরও চারজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কী ব্যাপর বলুন তো, কাকাবাবু ?”

কাকাবাবু বললেন, “এ যে দেখছি রূপকথার মতন। ঘুমন্ত পুরী। এখন

বেলা সাড়ে এগারোটা, সবাই এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে !"

সন্তু বলল, "এটা ঘুম নয়। এরা নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, বিষাক্ত কোনও ফল-টল খেয়েছে বোধহয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাই মিলে বিষাক্ত ফল খাবে ? তা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক, আমাদের তো এখানে কিছু করার নেই। ওদের নিশ্বাস পড়ছে যখন, বেঁচে উঠবে নিশ্চয়ই ! আমাদের আর এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

জোজো কাকাবাবুকে আবার ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল। সন্তু কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে ঘুরে দেখে এল। তার মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল, সেটা মেলেনি। এদিকে গাড়ি যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই, এমন জঙ্গলে গাড়ি চালাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অংশুমান চৌধুরীরা তা হলে এদিকে আসেনি।

কাকাবাবু ঘোড়ায় চড়ে এগোলেন, সন্তু আর জোজো ঠিক পাশাপাশি না থেকে খানিকটা দূরে দূরে রইল। কেন যেন মনে হচ্ছে, কাছাকাছি কোনও বিপদ ও‍ৎ পেতে আছে।

জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছে, ওরা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে, কিন্তু পাহাড়ের মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। তিরাং-রা যে-পাহাড়ে থাকে, সেই পাহাড়ের একটা চূড়া গণ্ডারের শিঙের মতন। ওরা কি সেই পাহাড়েই উঠছে ?

আরও খানিকটা যাওয়ার পর পাওয়া গেল একটা ফাঁকা জায়গা। তার এক কোণে তিন-চারটে মোষ ঘাস খাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে জোজোর খিদে পেয়ে গেল। সকাল থেকে ওদের কিছু খাওয়া হয়নি। চিঁড়ে-গুড়ের পুঁটুলিটা চলে গেছে পলাতক ঘোড়াটার সঙ্গে। এখন দুপুর প্রায় দুটো।

জোজো বলল, "ওদিকে যখন মোষ চরছে, তখন কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম আছে। তিরাংদের গ্রাম হতে পারে।"

কাকাবাবু ঘোড়া থামিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের দিকে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে জোজো আর সন্তুকে চুপ করতে বললেন। একেবারে স্থির হয়ে রইল ওরা। দু'একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে মোষগুলো ঘাস খাওয়া শেষ করে আস্তে-আস্তে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ফুঃ ! ওগুলো তোরা সাধারণ মোষ ভেবেছিস ! ও তো বাইসন। জঙ্গলের সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। বাঘেরা ওদের ভয় পায়। ওরা দল বেঁধে তাড়া করলে হাতিও সামনে দাঁড়াতে পারে না।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, জংলিদের গ্রামের কী একটা মূর্তি সেটা দেখতে যাওয়া কি আমাদের খুবই দরকার ? এই ঝুটঝামেলা বাদ দিলে হয় না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই ফিরে যেতে চাস নাকি ?"

জোজো বলল, “এখন ফিরে গিয়ে পরে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে আসলেই তো হয়। এত কষ্ট করার কোনও মানে হয় না।”

কাকাবাবু বললেন, “তাই তো, জোজো একা তো ফিরে যেতে পারবে না? কে ওর সঙ্গে যাবে? সন্তু, তুই যাবি নাকি?”

সন্তু বলল, “সে কোশ্চেনই ওঠে না। আমি মোটেই ফিরতে চাই না।”

জোজো অভিমানের সঙ্গে বলল, “কাকাবাবু, আপনি বারবার বলেছিলেন যে, আপনি আমার পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কমপিটিশানে নামবেন না। এখন তো আমার পিসেমশাই কাছাকাছি নেই, তবু আপনি ইচ্ছে করে তাকে ফলো করছেন!”

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ঠিকই বলেছ। কিন্তু কী করি, কৌতূহল সামলাতে পারছি না যে। ওই মূর্তিটার ওপর বাইরের লোকের কেন এত লোভ, সেটাই জানতে ইচ্ছে করছে খুব। এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয়?”

জোজো বাচ্চা ছেলের মতন বলল, “আমার খিদে পেয়েছে! বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকলে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।”

সন্তু বলল, “আমাদের বুঝি খিদে পায় না? কিন্তু এই জঙ্গলে কোনও ফল-টলের গাছও দেখছি না।”

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, “বরং তাড়াতাড়ি চলো, তিরাংদের গ্রামে গেলে ওরা নিশ্চয়ই কিছু খেতেটেতে দেবে!”

আবার শুরু হল চলা। যে দিকে বাইসনগুলো গেছে, তার উলটো দিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব সন্তর্পণে আরও খানিকটা যাওয়ার পর চোখে পড়ে গেল গণ্ডারের শিং-এর মতন সেই পাহাড়। খুব কাছেই। মাঝখানে শুধু একটা সবুজ উপত্যকা। এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়ের গ্রামের ঘরবাড়িও চোখে পড়ে একটু একটু।

কাকাবাবু বললেন, “এই তো এইবার এসে গেছি! আর কতক্ষণ লাগবে, বড়জোর এক ঘন্টা?”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু এখানে গাড়িতে আসার কোনও উপায় নেই। ওদেরও হেঁটে আসতে হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওরা আসবে পাহাড়ের উলটো দিক থেকে। অবুঝমাড়ের রাস্তা ওইদিকেই হবে। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তোদের জন্য নামব। একসঙ্গে যেতে গেলে তোরা হাঁপিয়ে যাবি। জোজো, এখন থেকে তুমি সন্তুর কাছাকাছি থাকো, দু'জনে আলাদা হয়ে গেলে আবার খুঁজতে সময় লাগবে।”

কাকাবাবু নেমে গেলেন ঢালু উপত্যকার দিকে।

সন্তু জোজোর একটা হাত ধরে বলল, “মোটে তো একবেলা খাসনি, তাতেই

তুই এত কাহিল হয়ে গেলি ?”

জোজো বলল, “কাল দু'বেলাই যে নিরামিষ খেয়েছি। নিরামিষে কি পেট ভরে ? উঃ, কতদিন যে একটা ডিমসেদ্ধ খাইনি !”

সন্তু বলল, “তিরাংরা যদি ভাল লোক হয়, তা হলে ওদের গ্রামে নিশ্চয়ই মুর্গির ডিম পাওয়া যাবে। মনে মনে ভাব। একটু পরেই ডিমসেদ্ধ খাব, একটু পরেই ডিমসেদ্ধ খাব, তা হলে দেখবি খিদেটা কমে যাবে।”

জোজো রেগে গিয়ে বলল, “ধ্যাত ! খাবার কথা ভাবলে খিদে আরও বেড়ে যাবে না !”

দু'জনে হাত ধরে দৌড় মারল নীচের দিকে। মাইলখানেক দূরে কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা বড় গাছের নীচে। ওদের দেখে বললেন, “তোরা এখানে একটু জিরিয়ে নে, আমি আবার এগোচ্ছি !”

এইরকম তিনবার করবার পর, গণ্ডার পাহাড়ের সিকি ভাগ উঠে কাকাবাবু বললেন, “এইবার একটা পরীক্ষা আছে। সামনে চেয়ে দ্যাখ, একটা গাছের ওপর মাচা বাঁধা, ওখানে নিশ্চয়ই কোনও লোক বসে থাকবে। তার মানে, তিরাংরা তাদের গ্রামে ঢোকার মুখটা পাহারা দেয়। তিরাংদের ভাষা আমি জানি না। ওরা নাকি হিন্দি বোঝে না। আমরা এগোবার চেষ্টা করলেই যদি ওপর থেকে তীর ছুঁড়ে মারে ?”

একটা ঝোপের আড়ালে খানিকটা গুঁড়ি মেরে গিয়ে সন্তু দেখল, সামনের পাশাপাশি দুটো গাছের ডগার কাছে মাচা বাঁধা, সেই মাচাটা প্রায় একটা ঘরের মতন, সেখানে রাত্তিরে কেউ শুয়েও থাকতে পারে। মাচাটায় এমনভাবে বেড়া দেওয়া যে, এখন ওখানে কেউ রয়েছে কি না তা বোঝার উপায় নেই।

সন্তু ফিরে আসার পর কাকাবাবু বললেন, “আমি ঘোড়া ছুটিয়ে ওই ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারি। তীর ছুঁড়লেও আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু তাতে লাভ কী ? তোদের তাতে আরও বিপদ হবে !”

সন্তু বলল, “তা হলে তো মনে হচ্ছে, সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অন্ধকারে যদি যাওয়া যায়।”

জোজো আঁতকে উঠে বলল, “সন্ধে পর্যন্ত এখানে বসে থাকব, কেন অন্য কোনও দিক দিয়ে যাওয়া যায় না ?”

কাকাবাবু বললেন, “অন্য দিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকলে সেখানেও নিশ্চয়ই পাহারা থাকবে। এদিককার আর কোনও গ্রামে এরকম পাহারার ব্যবস্থা দেখিনি। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ওদের মন্দিরের মূর্তিটাকে ওরাও খুব দামি মনে করে।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, আর একটা কাজ করা যেতে পারে। তোমরা ওই ডান দিকটায় গিয়ে ঝোপের আড়ল থেকে খানিকটা শব্দ টব্দ করো। লোকটা তা হলে ওদিকেই মনোযোগ দেবে। সেই ফাঁকে আমি বাঁ দিক দিয়ে বুকে হেঁটে

হেঁটে মাচাটার কাছে এগিয়ে যাব।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এগিয়ে যাওয়ার পর কী করবি?"

সন্তু বলল, "চুপিচুপি মাচাটায় উঠে লোকটাকে ঘায়েল করব!"

জোজো বলল, "ওখানে যদি একটা জোয়ান লোক হাতে তীর-ধনুক বা ছুরি নিয়ে বসে থাকে, তুই তাকে ঘায়েল করতে পারবি? ওসব সিনেমায় হয়! অত সোজা নয়!"

সন্তু বলল, "যদি রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে যাই?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ। এরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এদের আপত্তি থাকলে গ্রামে ঢোকা আমাদের সম্ভব হবে না। আমরা জানান দিই, দেখা যাক ওরা কী করে?"

কাকাবাবু খুব জোরে চেঁচিয়ে হিন্দিতে বললেন, "আমরা বন্ধু। আমরা কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। আমরা গ্রামের সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

দু'তিনবার এরকম চিৎকারেও মাচা থেকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে আস্তে বললেন, "ওরা হিন্দি না বুঝলেও কিছু তো একটা উত্তর দেবে!"

আরও কয়েকবার চেষ্টা করা হল। ওদিকে কোনও লোকই দেখা গেল না। এত চ্যাচামেচিতে গ্রাম থেকেও দু' একজনের ছুটে আসা উচিত ছিল।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তোরা এখানে দাঁড়া। আমি ঘোড়া ছুটিয়েই এই জায়গাটা পার হয়ে যাই। মাচার তলায় গিয়ে দাঁড়াব। দেখি কেউ নেমে আসে কি না।"

কাকাবাবু রিভলভারটা একবার হাতে নিয়েও পকেটে ভরে রাখলেন। সন্তু জানে কাকাবাবু রিভলভার নিয়ে শুধু ভয় দেখান, কোনও মানুষকে তিনি কিছুতেই গুলি করতে পারেন না।

জোজো আর সন্তু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, কাকাবাবু খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাতেও কেউ তীর ছুঁড়ল না, মাচার ওপর কেউ একটু নড়াচড়াও করল না।

কাকাবাবু হেঁকে বললেন, "এখানে কেউ নেই মনে হচ্ছে। তোরা চলে আয়।"

মাথা নিচু করে সন্তু আর জোজোও দৌড় মারল। প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হচ্ছে, পিঠে এসে তীর বিঁধবে, কিন্তু হল না কিছুই।

কাকাবাবু বললেন, "যার পাহারা দেওয়ার কথা, সে বোধহয় এখন খেতে গেছে। তার বদলে অন্য কেউ ডিউটি দিতে আসেনি।"

সন্তু বলল, "ওপরটায় উঠে একবার দেখে আসব? মন্দিরটাও দেখা যেতে পারে!"

মাচায় উঠবার কোনও সিঁড়ি নেই। সন্তু গাছে চড়ায় ওস্তাদ, মোটা গাছটার গুঁড়ি ধরে তড়বড়িয়ে ওপরে উঠে গেল। মাচার মধ্যে ঢুকে পড়ে সে প্রথমেই অবাকভাবে বলল, "আরেঃ!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

"এখানেও একটা লোক অজ্ঞান হয়ে আছে।"

"অজ্ঞান !"

"হ্যাঁ। নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। মুখটা হাঁ করা। একটা কালো হাঁড়িতে সাদা সাদা কী যেন রয়েছে। বোধহয় ওই জিনিসটা খাচ্ছিল।"

"ঠিক আছে, তুই নেমে আয়।"

"কাকাবাবু, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, খানিকটা দূরে, আমার পেছন দিকে আর একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে। সেই আগে যে গ্রামটা দেখেছিলুম, সেই রকম এখানকার লোকেরাও কিছু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেলেন। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দু'চারবার তাকে ধাক্কা দিতেও সাড়া পাওয়া গেল না।

তারপর একটার পর একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। কোনও কোনও বাড়ির সামনে, কোথাও কোথাও গাছের নীচে পড়ে আছে অজ্ঞান মানুষ। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চা সবারই একই রকম অবস্থা। কোনও জাদুকর যেন এদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে !

কাকাবাবু শুধু বলতে লাগলেন, "আশ্চর্য ! আশ্চর্য !"

সন্তু বলল, "আমি ওপর থেকে মন্দিরটাও দেখতে পেয়েছি। একটা ঝরনার ধারে। আধ মাইল মতন দূর হবে।"

জোজো বলল, "চলুন, চট করে আমরা মন্দিরটা দেখে এখান থেকে সরে পড়ি। জায়গাটা কীরকম ভুতুড়ে-ভুতুড়ে লাগছে !"

সারা গ্রামে আর কোনও আওয়াজ নেই, শুধু শোনা যাচ্ছে ঝরনার জলের শব্দ। সেখানে পৌঁছতে বেশি দেরি হল না। মাটির তলা থেকে ফুঁড়ে বেরোচ্ছে জল। তার পাশেই মন্দির।

মন্দিরটা পাথর দিয়ে তৈরি। চৌকোমতন একটা ঘর। ছাদে উড়ছে অনেকগুলো সাদা রঙের পতাকা। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

একটা সাদা বেদীর ওপর রয়েছে মূর্তিটা। আড়াই ফুটের মতন উঁচু। নীল রঙের পাথরের তৈরি। মূর্তিটা কোনও পুরুষ দেবতার। পায়ে গামবুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট।

কাকাবাবু বললেন, "একটা আদিবাসী গ্রামে এরকম মূর্তি থাকা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের এক পাশে একটা সূর্য মূর্তি আছে, অনেকটা সেইরকম।"

সন্তু বলল, "তা হলে আমরা ওদের আগেই এসে পৌঁছে গেছি। ওরা বোধহয় এখনও রাস্তা খুঁজছে। ঘোড়াটা পেয়ে আমাদের খুব সুবিধে হয়েছে।"

কাকাবাবু মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। এখানেও একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বোধহয় মন্দিরের পুরোহিত। কাকাবাবু মূর্তিটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কয়েকবার টোকা দিলেন। ভেতরটা ফাঁপা। টংটং শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "এই মূর্তিটা নকল!"

সন্তু আহত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "নকল?"

জোজো বলল, "এখানে হাওয়ায় যেন কিসের গন্ধ? নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, তাই তো, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি কিসের যেন..."

বলতে বলতে সন্তুর কথা জড়িয়ে গেল। জোজো বসে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু দারুণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "শিগগির, শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ক্লোরোফর্মের গন্ধ। আমাদের ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। তিরাংরা জেগে উঠে আমাদের চোর বলবে। সন্তু, জোজো, বাইরে..."

সন্তু আর জোজো ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধ ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। মন্দিরের দরজার কাছে এসে তিনি নিজেও ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

॥ ১৮ ॥

পাহাড়ের গায়ে ছোট একটা জলাশয়, সেখানে পৌঁছে অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এবারে এখানে একটু বসা যাক। ভীমু, তোর ফ্লাস্কে আর চা আছে? খাবার টাবার কিছু আছে? খিদে পেয়ে গেছে!"

ভীমু বলল, "হ্যাঁ, আছে, স্যার। চা আছে, সন্দেশ আছে।"

লর্ড বলল, "এবারে আমাদের মুখোশ খুলে ফেলতে পারি? মাথাটা ভীষণ ভারী ভারী লাগছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "তোমাদের মুখোশ খুলে ফেলতে পারো। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। তবে আমি খুলছি না। কতরকম পাখপাখালি, পোকামাকড় থাকতে পারে। ভীমু ভাল করে দেখে নে, এখানে খরগোশ-মরগোশ কিছু আছে কি না, তা হলে দূর করে দে!"

মাধব রাও বললেন, "এখানে থাকার দরকার কী? একেবারে পাহাড় থেকে নেমে গেলে হত না? আদিবাসীগুলো যদি জেগে উঠে হঠাৎ তাড়া করে আসে?"

অংশুমান চৌধুরী হেসে বললেন, "ওরা অন্তত পৌনে চার ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকবেই, আমার ঠিক হিসেব আছে। তা ছাড়া, ওরা জেগে উঠলেই বা, আমি

আবার ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ? আমি সঙ্গে থাকলে পৃথিবীতে কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।”

মাধব রাও বললেন, “তবু যাই বলুন, আমার আর এই জায়গাটায় থাকতে ভাল লাগছে না। কাজ যখন হাসিল হয়েই গেছে, এত সহজে যে হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি, সত্যি ধন্য আপনার ক্ষমতা মিস্টার চৌধুরী। এবারে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়া উচিত না !”

অংশুমান চৌধুরী মুচকি হেসে বললেন, “আপনার কাজ হাসিল হয়েছে বটে, কিন্তু আমার কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে।”

ভীমু আর লর্ড ততক্ষণে মুখোশ খুলে ফেলেছে। লর্ড বলল, “এক কাপ চা না খেয়ে আমি নড়ছি না।”

মাধব রাও মুখোশ খুললেন, ভীমু চা ও সন্দেশ দিল সবাইকে।

আকাশে হঠাৎ কোথা থেকে যেন চলে এসেছে একদঙ্গল মেঘ। রোদের তাপ অনেকটা কম। ফিনফিনে হাওয়া বইছে, বোধহয় একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। সামনের জলাশয়টায় ফুটেছে কয়েকটা লাল রঙের শালুক। কয়েকটা ফড়িং উড়ছে সেখানে।

চা-টা খাওয়ার পর লর্ড আর মাধব রাও ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিল। মাথার ওপরে একটা বড় তেঁতুল গাছ। পাহাড়ি রাস্তায় একবার বিশ্রাম নিতে বসলেই আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, “ভীমু তুই একবার ফিরে যা গ্রামটায়। দেখে আয় রাজা রায়চৌধুরী এসে পৌঁছেছে কি না !”

ভীমুর মুখখানা পাংশু হয়ে গেল, সে রাজা রায়চৌধুরীকে যতটুকু দেখেছে, তাতেই সে আর ওই লোকটার ধারেকাছে যেতে চায় না। সে ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, “আবার ওই গ্রামে ফিরে যেতে হবে স্যার ?”

অংশুমান চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, “তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি ? কিসের ভয় ? আদিবাসীরা সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে। ওই এরিয়ার মধ্যে ঢুকলে রাজা রায়চৌধুরীও জেগে থাকতে পারবে না। তুই দেখে আয়, ওরা এসেছে কি না। মন্দিরের ভেতরটা ঢুকে দেখবি।”

ভীমু উঠে দাঁড়াতেই অংশুমান চৌধুরী আবার বললেন, “মাস্কটা পরে যা ! নইলে তুইও তো ঘুমিয়ে পড়বি !”

ভীমু এক পা দু'পা করে চলে গেল।

লর্ড বলল, “আমার এখানেই ঘুম পেয়ে গেছে। এখানেও কি আপনার ওষুধের এফেক্ট আছে নাকি ?”

“একটু-আধটু থাকতে পারে। ঘুম যদি পায়, মিনিট পনেরো ঘুমিয়ে নাও, জাগাবার ওষুধও আমার কাছে আছে।”

“আপনার কাছে সত্যি জাগাবার ওষুধও আছে ?”

"হ্যাঁ। এমনকী পাগল করে দেওয়ার ওষুধও আছে।"

"অ্যাঁ ? কী বললেন ?"

মাধব রাও কয়েকবার নাক ডেকেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, কিসের ওষুধ আছে আপনার কাছে ? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কেন ? আমি যদি আর না জাগতাম ? মিস্টার চৌধুরী, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। আমি এক্ষুনি চলে যেতে যাই ! চলুন, চলুন, আর এখানে বসে থাকবেন না।"

অংশুমান চৌধুরী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "বেশ তো, আপনি এখানে আর থাকতে চান না তো চলে যান ! আপনাকে কি আমি জোর করে ধরে রেখেছি ?"

মাধব রাও বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললেন, "আমি চলে যাব...মানে, আমি একা চলে যাব ?"

"একা না যেতে চান, লর্ডকে নিয়ে যান !"

"আপনি যাবেন না ?"

"বললুম না, আমার কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে। আমার যেতে দেরি হবে। আপনার তাড়া আছে যখন, এগিয়ে পড়ুন।"

"আমরা চলে যাব... আপনি থাকবেন...মানে...তা হলে মূর্তিটা কী হবে ?"

"মূর্তিটা আপনি নিয়ে যান ! মূর্তিটা আমার কাছে রেখে কী হবে ?"

"আমি মূর্তিটা নিয়ে যাব ?"

"মূর্তিটা পাওয়ার জন্যই তো এতদূর এসেছেন, তাই না ? মূর্তিটা না নিয়ে চলে যাবেন কেন ?"

অংশুমান চৌধুরী একটা লম্বা ব্যাগ খুললেন, তার থেকে বার করলেন একটা নীল মূর্তি। সেই মূর্তির গাটা চকচক করছে।

দু'হাতে মূর্তিটা উঁচু করে তুলে ধরে মুগ্ধভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে অংশুমান চৌধুরী বললেন, "দুর্দান্ত জিনিসটা ! এর এত দাম কেন জানেন ! এরকম নীল রঙের পাথর চট করে দেখা যায় না। এর আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, মূর্তিটার পিঠে এই যে দুটো গোল গোল গর্ত আছে দেখুন। হাওয়া ঢুকলে এখানে কখনও কখনও বাঁশির মতন শব্দ বেরোয়। এলুউন সাহেবের বইতে সে কথা লেখা আছে। তবে, এমনি ফুঁ দিলে বাজে না, ঝড়ো হাওয়া উঠলে বেজে ওঠে, সেইজন্য এরা মনে করে, স্বর্গের দেবতা এই মূর্তির মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে।"

মাধব রাও বললেন, "মূর্তিটা দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু এই মূর্তির পায়ে এরকম জুতো কেন, এখানকার আদিবাসীরা নিজেরাই জুতো পায় দেয় না, তারা এরকম একটা মূর্তি কী করে বানাল ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমার ধারণা কোনও সাহেবকে দেখেই

এখানকার কোনও শিল্পী এটা বানিয়েছিল এক সময়। তারপর আস্তে-আস্তে সেটা দেবতা হয়ে গেছে !"

মূর্তিটা মাধব রাও-এর হাতে তুলে দিয়ে অংশুমান চৌধুরী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "ব্যাপারটা কী চমৎকারভাবে মিটে গেল, বলুন তো ? আপনার বন্ধু পট্টনায়ক সাহেব এই মূর্তিটা চেয়েছিলেন, তিনি সেটা পেয়ে গেলেন। আদিবাসীদের মন্দিরে আমি অবিকল এর নকল একটা মূর্তি বসিয়ে দিয়েছি, ওরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে, ওদের মন্দিরের মূর্তি ঠিকই আছে, ওদের গ্রাম থেকে কিছুই চুরি যায়নি। সবাই মিলে কেন যে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই ভেবে অবাক হবে শুধু। ওদের মূর্তিটা হয়তো আর বাঁশির মতন বাজবে না। কিন্তু সেটা ওরা ভাববে, দেবতারা দয়া করছে না !"

মাধব রাও বললেন, "সত্যি অদ্ভুত আপনার বুদ্ধি। আমরা রাজা রায়চৌধুরীর কাছে প্রথমে শুধু শুধু গিয়েছিলাম ! ওঁকে দিয়ে এসব কিছুই হত না ! এত টাকা-পয়সা খরচ করে রাজা রায়চৌধুরীকে এতদূর টেনে আনারও কোনও মানে হল না !"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে নিয়ে আসাটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। যে টাকা-পয়সা আমি খরচ করেছি এবার সেটা উসুল করব। আপনারা এগিয়ে পড়ুন।"

লর্ড জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করব ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, আমার ঘন্টা দু'এক লাগবে। চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

লর্ড আর মাধব রাও এগিয়ে পড়বার পর অংশুমান চৌধুরী মনের আনন্দে গুনগুন করে একটা গান ধরলেন, তাঁর মুখে এখনও মুখোশ।

একটু বাদেই ভীমু ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। সে-ও মহা আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, "স্যার, স্যার, কেল্লা ফতে ! ওই রাজা নামে খোঁড়া বদমাইশটা অজ্ঞান হয়ে উলটে পড়ে আছে। আর ওর সঙ্গের বাচ্চা ছেলে দুটোও কাত ! এবারে ওদের খতম করে দেব স্যার ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "চোপ ! তোকে বলছি না, খতম-টতমের কথা একেবারে উচ্চারণ করবি না ! রাজা রায়চৌধুরী অজ্ঞান হয়ে গেছি, দেখলি ?"

"হ্যাঁ, স্যার, নিজের চোখে দেখেছি ! মন্দিরের সিঁড়িতে !"

"তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারলি না ?"

"আপনি তো ধরে আনতে বলেননি। শুধু দেখে আসতে বলেছেন।"

"মাথায় একটু বুদ্ধি খেলাতেও পারিস না ? একটা লোক অজ্ঞান হয়ে আছে, তার পা দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। চল, চল আমার সঙ্গে।"

অংশুমান চৌধুরীর লম্বা চেহারা। তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন। মন্দিরটা সেখান থেকে বেশি দূর নয়। আকাশে মেঘ কালো হয়ে এসেছে। বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই।

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর হাত দু'খানা ধরে টেনে নিয়ে এলেন খানিকটা। তারপর কাকাবাবুর দু'গালে দুই থাপ্পড় দিয়ে দেখলেন, কাকাবাবু সত্যি অজ্ঞান কি না। কাকাবাবুর চোখের একটা পলকও পড়ল না। তিনি হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ করে হেসে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, এইবার ? আমার সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে এসেছিলে ?"

ভীমু বলল, "স্যার, ওঁকে নিয়ে যাব আমি ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওকে আমি একাই টেনে নিয়ে যেতে পারব ! তুই এক কাজ কর, সেই ছেলেদুটো কোথায় ? তাদের এখানে ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের তুই নিয়ে আয় !"

"দুজনকে এক সঙ্গে নিয়ে যাব স্যার ? না, দু'বারে এসে একজন একজন করে..."

"দুটো বাচ্চা ছেলেকে তুই নিয়ে যেতে পারবি না ? তুই কী হয়েছিস ? এরকম করলে তোর চাকরি ছাড়িয়ে দেব ! কিংবা, কিংবা তোকে একেবারে অদৃশ্য করে দেব।"

"ঠিক আছে স্যার, যাচ্ছি স্যার, আপনি এগোন !"

অংশুমান চৌধুরীর তুলনায় ভীমুর গায়ের জোর বেশ কম। অসুখে ভুগে ভুগে বেচারা রোগা হয়ে গেছে। সন্তু আর জোজোকে মন্দিরের সিঁড়ি থেকে খানিকটা সরিয়ে আনতেই সে হিমশিম খেয়ে গেল, ঘাম বেরিয়ে গেল কপালে।

একসঙ্গে দু'জনকে টেনে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তা হলে উপায় ? না নিয়ে গেলে অংশুমান চৌধুরী রেগে গিয়ে যে কী করবেন তার ঠিক নেই। ওই যে বলে গেলেন অদৃশ্য করে দেওয়ার কথা। সেরকম কোনও ওষুধও ওঁর কাছে আছে কি না কে জানে !

এমন সময় মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ শব্দ শুনতে পেল। ঠিক যেন জুতোর আওয়াজ। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল ভীমু। তবে কি মন্দিরের জুতো পরা দেবতা...

তারপরেই একটা ফ-র-র-র, ফ-র-র-র শব্দে তার ভুল ভাঙল। জুতোর আওয়াজ নয়, কোনও একটা প্রাণী ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শব্দটা আসছে মন্দিরের পেছন থেকে।

ভীমু আস্তে-আস্তে সেদিকে গিয়ে দেখল, একটা ঘোড়া সেখানে একলা একলা ঘাস খেতে খুব ব্যস্ত। দেখে মনে হয়, বেশ শান্ত ঘোড়া। ভীমুর এক সময় ঘোড়ায় চড়ার শখ ছিল। আফগানিস্তানে অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে থাকার

সময় সে নিয়মিত ঘোড়ায় চেপেছে। ঘোড়া দেখলেই তার চাপতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু এখন ঘোড়ায় চাপার সময় নয়। বরং তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, ওই অজ্ঞান ছেলে দুটোকে তো ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে নেওয়া যায়! তা হলে আর বইতে হবে না!

সে আস্তে-আস্তে ঘোড়াটার পাশে গিয়ে তার গায়ে কয়েকটা চাপড় মারল। ঘোড়াটা পালাবার চেষ্টা করল না। তখন সে আরও কয়েকবার আদর করে তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে আনল মন্দিরের সামনে। সন্তু আর জোজোকে টেনে তুলে ঝুলিয়ে দিল, ঘোড়ার পিঠে। এবার তার আর কোনও পরিশ্রম নেই। নিজের বুদ্ধিতেই নিজেরই কাঁধ চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হল তার।

কয়েক পা এগিয়েই তার আবার একটা কথা মনে পড়ল। অংশুমান চৌধুরী কোনও জন্তু-জানোয়ার সহ্য করতে পারে না। ঘোড়াটাকে দেখলেই তো খেপে উঠবে!

কিন্তু সন্তু আর জোজোকে আবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাতে তার ইচ্ছে করল না। ঘোড়াটাকে অন্তত কিছুটা দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাক। আস্তে-আস্তে। তারপর যা হয় তা হবে!

॥ ১৯ ॥

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর হাত দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন জলাশয়টার ধারে। একটা পাতলা গাছের গায়ে কাকাবাবুকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে তিনি হাঁফাতে লাগলেন। কাকাবাবুর বেশ বলশালী চেহারা, তাঁকে এতটা টেনে আনতে পরিশ্রম কম হয়নি। পরিশ্রান্ত হলেও অংশুমান চৌধুরী তাঁর মুখোশ পরা মাথাটা নাড়াতে লাগলেন বারবার, তাঁর খুব আনন্দ হয়েছে, এতদিন বাদে তাঁর জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

নিজের ব্যাগ থেকে তিনি একটা শক্ত দড়ি বার করে কাকাবাবুকে খুব ভাল করে বাঁধলেন সেই গাছটার সঙ্গে। পকেট থেকে বার করে নিলেন রিভলভারটা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু অংশুমান চৌধুরী তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি উবু হয়ে বসে কাকাবাবুর দু'গালে দুটি চড় মেরে বললেন, "কী রাজা রায়চৌধুরী, এবার ?"

কাকাবাবুর যে জ্ঞান নেই, তা যেন উনি ভুলেই গেছেন! কাকাবাবুর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, চোখ দুটো যেন আঠা দিয়ে আটকানো। সাধারণ ঘুম হলে মুখখানা এরকম অজ্ঞানের মতো দেখায় না।

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে সোজা করে বিড়বিড় করে বললেন, "মাথা ভর্তি কালো চুল, অ্যাঁ ? খুব গর্ব ? এবারে বুঝবে ঠ্যালা! সারা জীবনের মতন ন্যাড়া!"

পেছনে একটা শব্দ হতেই অংশুমান চৌধুরী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভীমু এসেছিস ?"

একটু দূর থেকে ভীমু উত্তর দিল, "হ্যাঁ, স্যার !"

ভীমু ঘোড়াটাকে থামিয়েছে খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে। অংশুমান চৌধুরী মুখোশ পরে আছেন বলে ঘোড়ার গন্ধ পাবেন না ভাগ্যিস ! ঘোড়াটার পিঠ থেকে সন্তু আর জোজোকে নামিয়ে, সে ঘোড়াটার পিঠে দু'বার আদরের চাপড় মেরে বলল, "যাঃ যাঃ ! বাড়ি যাঃ !"

তারপর সে সন্তু আর জোজোকে টানতে টানতে নিয়ে এল অংশুমান চৌধুরীর কাছে।

অংশুমান চৌধুরী বলল, "ঠিক আছে। এবারে তুই একটা কাজ কর তো ভীমু ! ওই পুকুরটা থেকে খানিকটা জল এনে রাজা রায়চৌধুরীর মাথায় ঢেলে দে। ওর চুলগুলো ভাল করে ভেজাতে হবে !"

ভীমু বলল, "বৃষ্টিতেই তো মাথা ভিজে গেছে, স্যার !"

অংশুমান চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, "যা বলছি, তাই কর !"

ভীমু দু'তিনবার আঁজলা ভরে জল এনে কাকাবাবুর মাথা ভিজিয়ে দিতে লাগলেন। অংশুমান চৌধুরী নিজের ব্যাগ থেকে একটা ক্ষুর বার করলেন। বাঁ হাতের তেলোয় ক্ষুরটা ঘষতে ঘষতে মনের আনন্দে হাসতে লাগলেন, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে।

তারপর ক্ষুরটা ভীমুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দে, এবার ব্যাটার মাথাটা কামিয়ে দে ভাল করে !"

ভীমু বলল, "আমি ! স্যার, আমি তো নাপিতের কাজ জানি না ! যদি গলাটা কেটে দিতে বলেন তো..."

অংশুমান চৌধুরী প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "চোপ ; তোকে বলেছি না খুনজখমের কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবি না ! আমি যা বলব, শুধু তা-ই করবি। ভিজে চুল কামিয়ে ফেলা অতি সহজ কাজ, এর জন্য নাপিতের কাজ শিখতে হয় না !"

ভীমু ক্ষুরটা হাতে নিয়ে প্রথমেই এক পোঁচে কাকাবাবুর একদিকের ঝুলপি উড়িয়ে দিল। এমন জোরে সে ক্ষুরটা টানল যে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল কাকাবাবুর কানের গোড়ায়।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "দেখিস ব্যাটা, কানটা উড়িয়ে দিস না ! তুই কি একটু আস্তে চালাতে পারিস না। আচ্ছা দে, আমাকেই দে !"

ক্ষুরটা ফেরত নিয়ে অংশুমান চৌধুরী কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর আবার হেসে বললেন, "ভীমু, লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনেল আরও মজা হবে, তাই না ? চোখ প্যাটপ্যাট করে দেখবে যে ওর মাথার চুল শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভুরুও কামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপর ওখানে এমন একটা তেল মাখিয়ে

দেব যে জীবনেও আর ওর চুল গজাবে না !”

ব্যাগ থেকে একটা স্প্রে বোতল বার করে অংশুমান চৌধুরী বললেন, “এইবার দ্যাখ মজা। এই ওষুধ দিলে আধ মিনিটের মধ্যে জেগে উঠবে !”

ভাল করে কাকাবাবুর মুখের ওপরে সেই ওষুধ স্প্রে করে দিলেন অংশুমান চৌধুরী।

আধ মিনিট কাটবার আগেই সন্তু উঃ উঃ শব্দ করে উঠল। অংশুমান চৌধুরী পেছন ফিরে বললেন, “ওঃ হো ! ওদের কথা তো ভুলেই গেসলাম ! আমার এই জাগরণী ওষুধ এত স্ট্রং যে ওদের নাকে একটুখানি গেলে ওরাও জেগে উঠবে এক্ষুনি। ওদের হাত পা বাঁধা দরকার। নইলে ঝামেলা করতে পারে। আজকালকার বাচ্চারাও এক বিচ্ছু হয় ! তোর কাছে দড়ি আছে ?”

ভীমু বলল, “না তো স্যার ! ওদের আবার ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিন না !”

“সেইটাই তো মুশকিল রে ! একবার জাগরণ ওষুধ দিয়ে জাগালে আর সহজে ঘুম পাড়ানো যায় না। এটা বেশি স্ট্রং ! ঠিক আছে তুই এক কাজ কর, রিভলভারটা হাতে ধরে থাক। ওরা জেগে উঠলে ভয় দেখাবি।”

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে চোখ মেলে অংশুমান চৌধুরীর মুখোশ-পরা মুখটা দেখে একটু চমকে উঠে বললেন, “কী ব্যাপার ?”

অংশুমান চৌধুরী থিয়েটারি কায়দায় প্রথমে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা হাসি দিলেন। তারপর বললেন, “পরাজয় ! পরাজয় ! রাজা রায়চৌধুরী, তুমি হেরে গেছ আমার কাছে ! তুমি নীল মূর্তি উদ্ধার করতে পারোনি, তুমি আমাকে বাধা দিতে পারোনি, তুমি এখন আমার হাতে বন্দী !”

কাকাবাবু মাথাটা ঝাঁকালেন একবার। চোখ রগড়াবার কথা ভাবার পর বুঝলেন তাঁর হাত-পা বাঁধা। তিনি বললেন, “আপনি ওরকম একটা মুখোশ পরে আছেন কেন ? ওতে আপনাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।”

অংশুমান চৌধুরী বললেন, “সে আমাকে যেরকমই দেখাক, ও মুখোশ আমি খুলছি না। কার্য-উদ্ধার করেছি তো !”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, আপনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা আছে, তা স্বীকার করছি। খুব হেভি ডোজের ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে আপনি গোটা গ্রামের লোকজনদের অজ্ঞান করে ফেলেছেন। এরকম আগে দেখিনি।”

“তা হলে হার স্বীকার করলে তো, রাজা রায়চৌধুরী ? এবারে তোমার শাস্তি হবে ! আমার মাথায় চুল নেই, তোমারও চুল থাকবে না। উপরন্তু তোমার ভুরুও থাকবে না। এই দ্যাখো ক্ষুর ! মনে আছে সেবারের কথা ?”

“হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু সেবারে আমি আপনার মাথা কামিয়ে দিইনি। দিয়েছিল পাহাড়িরা।”

“কিন্তু তুমি আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলে ! তুমি বাঙালি হয়ে আর একজন

বাঙালি বৈজ্ঞানিককে হিংস্র পাহাড়িদের হাতে তুলে দিয়েছিলে !"

"আপনি সরল পাহাড়িদের ঠকাচ্ছিলেন। যারা মানুষকে ঠকায়, তারা আবার বাঙালি-অবাঙালি কি ? তাও আপনাকে আমি একবার সাবধান করে দিয়েছিলাম। আপনি গ্রাহ্য করেননি। বাধ্য হয়েই আপনার বুজরুকি আমাকে ফাঁস করে দিতে হয়েছিল। পাহাড়িরাই আপনাকে শাস্তি দিয়েছে। আপনাকে মারধোর করেনি, শুধু মাথা কামিয়ে গাধার পিঠে উলটো করে চাপিয়ে ছিল।"

"এবার তোমাকে আমি কী শাস্তি দিই, তা দ্যাখো ! রাজা রায়চৌধুরী, তোমার মাথা কামাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কান দুটোও কেটে ফেললে কেমন হয় ? তুমি দু'কান কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এখন থেকে।"

কাকাবাবুর মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি অংশুমান চৌধুরীর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তা আপনি পারবেন না !"

সন্তু আর জোজো পুরোপুরি জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভীমু তাদের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, "খবরদার, একটুও নড়াচড়া করবে না। নড়লেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব !"

জোজো কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আমি তো তোমাদের দলে। উনি আমার পিসেমশাই ! আপন পিসেমশাই !"

সন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বিশ্বাসঘাতক !"

অংশুমান চৌধুরী এদিকে কান না দিয়ে কাকাবাবুকে বললেন, "পারব না মানে ? এক্ষুনি কচাৎ কচাৎ করে যদি তোমার দুটো কান উড়িয়ে দিই, তা হলে কে আমাকে বাধা দেবে ? তুমি ? হে-হে-হে ! আমার দিকে ওরকম প্যাটপ্যাট করে তাকালে কী হবে ? তুমি আমাকে হিপনোটাইজ করবে নাকি ? তুমি কি ম্যানড্রেক ! ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। আমাকে হিপনোটাইজ করার সাধ্য নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি হিপনোটাইজ করতে জানি না, তাও বলছি, আপনি পারবেন না !"

"কে বাধা দেবে, কে আমাকে আটকাবে ? তোমার হাত-পা বেঁধে রেখেছি, তুমি তা খুলতে পারবে ভেবেছ ? তুমি কি জাদুকর হুডিনি না পি সি সরকার ?"

"আমি তাও না ! কিন্তু আপনার থেকে আমার অনেকগুলো বেশি অ্যাডভান্‌টেজ আছে। আমি মুখোশ পরে থাকি না। আমি সাধারণ জীবজন্তু দেখে ভয় পাই না। ঠিকমতন বাঁচতে গেলে চোখ মেলে সব কিছু দেখতে হয়, কান খুলে সব শব্দ শুনতে হয়, নাক দিয়ে নিশ্বাসে সবরকম গন্ধ নিতে হয়। মানুষের চোখ-কান-নাক রয়েছে তো এই জন্যই ! বাঁচবার জন্য মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে এইগুলো ব্যবহার করে !"

"তুমি যত খুশি নাক-কান-চোখ ব্যবহার করো, তবু দেখব এই মুহূর্তে কে তোমাকে রক্ষা করে। আগে ভেবেছিলুম, তোমার চুল আর ভুরু কামিয়ে দেব,

এখন মনে হচ্ছে, তোমার কান দুটো কেটে দিলে আরও মজা হবে! ইচ্ছে করলে তোমার নাকটাও একটু ছোট করে দিতে পারি।"

সন্তু ঠিক করেছে, অংশুমান চৌধুরী ক্ষুরটা দিয়ে কাকাবাবুর কান কাটতে গেলে সে ভীমুর রিভলভার অগ্রাহ্য করেই অংশুমান চৌধুরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর যা হয় দেখা যাবে। কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, কাকাবাবু সন্তুর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন, তিনি দুবার চোখের পলক ফেলে ইঙ্গিতে সন্তুকে এক্ষুনি কিছু করতে নিষেধ করলেন।

কাকাবাবুর মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নেই, ঠোঁটে হাসি মাখা। তিনি বললেন, "অংশুমানবাবু, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে আপনি শোনেননি? 'অতি দর্পে হত লঙ্কা!' আপনারও সেই অবস্থা হবে। মাধব রাও আর লর্ড-এর কী হল? তাদেরও আপনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন নাকি?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওদের কথা থাক, আগে তোমার কী অবস্থা হবে শোনো। আর বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার মাথা আর ভুরু কামিয়ে, কান দুটো কেটে এইখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে যাব। তারপর তিরাংরা তোমার যা ব্যবস্থা হয় করবে। ছেলেদুটোকে অবশ্য আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া পছন্দ করি না। মাধব রাও-দের কী হয়েছে শুনবে? ওরা তিরাংদের নীলমূর্তিটা চেয়েছিল, সেটা ওদের দিয়েছি। মূর্তিটা বহুমূল্য টারকোয়াজ পাথরের। তা ছাড়া হাওয়া ঢুকলে মূর্তিটার মধ্য থেকে বাঁশির মতন শব্দ হয়। আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট মিউজিয়াম এই মূর্তিটা পেলে এক মিলিয়ান ডলার দাম দেবে। মূর্তিটা পেয়ে মাধব রাও-রা খুশি মনে ফিরে গেছে! হাঃ হাঃ হাঃ, ওরা জানে না যে ওদের মূর্তিটাও নকল। আমি দুটো নকল মূর্তি বানিয়ে এনেছিলুম। একটা বসিয়ে দিয়েছি তিরাংদের মন্দিরে, আর একটা দিয়েছি মাধব রাওদের। আসলটা রয়েছে আমার কাছে! আগামী সপ্তাহেই আমি আমেরিকা চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার দেখছি, সত্যি বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধি যদি ভাল কাজে লাগাতেন..."

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এবারে আমার শেষ কাজটা করি। অনেক কথা হয়েছে, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।"

অংশুমান চৌধুরী ক্ষুরটা নিয়ে এগোতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, ঘোড়া!"

সন্তু পেছন ফিরে দেখল ওদের ঘোড়াটা কখন যেন ওদের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এক লাফ দিল সেদিকে। জোজো সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীমুর ওপর।

অংশুমান চৌধুরী ঘোড়াটাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। ক্ষুরটা ফেলে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ব্যাগ হাতড়ে বার করতে চেষ্টা করলেন অন্য কোনও

অস্ত্র। কিন্তু তার সময় পেলেন না। সন্তু ঘোড়াসুদ্ধ হুড়মুড় করে এসে পড়ল তাঁর ওপর। অংশুমান চৌধুরীর সব কিছু ছিটকে গেল, তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, "না, না, না, আমাকে এ ভাবে মেরো না! ক্ষমা চাইছি।"

অংশুমান চৌধুরীকে দলিত মথিত করে ঘোড়াটা চলে গেল খানিকটা দূরে, সন্তু আবার সেটার মুখ ফেরাল। জোজো ততক্ষণে কয়েকটা ঘুঁষি মেরে ভীমুকে কাবু করে ফেলেছে, সন্তু এক পলক দেখে নিয়ে আবার অংশুমান চৌধুরীর দিকেই ছোটাল ঘোড়াটা।

অংশুমান চৌধুরী কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, ঘোড়াটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন জলাশয়টার মধ্য। সেই অবস্থাতেও চেঁচিয়ে বললেন, "মরে যাব, আমি সাঁতার জানি না!"

ঘোড়ায় চেপে সন্তুর এমন বীরত্ব এসে গেছে যে সে আর ঘোড়া থেকে নামতেই চাইছে না। সে ঘোড়া দাপিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে আর চিৎকার করছে, "আমরা জিতেছি! আমরা জিতেছি! হু-র-রে, আমরা জিতেছি!"

জোজো এসে কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দিতে লাগল। তার এক হাতে ভীমুর রিভলভার। সেও বেশ সিনেমার নায়কদের মতন ভীমুর দিকে রিভলভারটা উঁচিয়ে বলল, "কোনও রকম চালাকি করবার চেষ্টা করেছ কি, একখানা মোটে গুলি, আমার টিপ কী রকম জানো না, একবার ইটালিতে তিন-তিনটে গুণ্ডাকে..."

কাকাবাবু বললেন, "ওহে, তোমরা অংশুমান চৌধুরীকে আগে জল থেকে তোলো, ভদ্রলোক সাঁতার জানেন না বললেন..."

ভীমু হাত জোড় করে বলল, "স্যার, আমি কিন্তু রিভলভার দিয়ে ইচ্ছে করে গুলি করিনি! আমি ছোট ছেলেদের মারি না, আমি ঘোড়া খুব ভালবাসি, ঘোড়ার গায়েও গুলি করতে পারি না। আমি স্যার খুন জখমের লাইনে নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি গিয়ে তোমার স্যারকে জল থেকে তোলো! উনি ডুবে যাচ্ছেন যে!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর সন্তুকে ডেকে বললেন, "এই সন্তু, ঘোড়াটার সঙ্গে আমার ক্রাচ দুটো বাঁধা আছে। ওগুলো দে!"

সন্তু এবারে কাকাবাবুর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। তার মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। সে বলল, "জোজোটাকে এক সেকেণ্ডের জন্য বিশ্বাসঘাতক মনে হয়েছিল, কিন্তু জোজোও খুব ভাল ফাইট দিয়েছে।"

জোজো বলল, "আমি ইচ্ছে করেই ওই কথা বলেছিলুম, যাতে আমাকে ওদের দলের মনে করে। ওই ভীমুর রিভলভারটা হাতানোই আমার মতলব ছিল। কী রকম একখানা স্কোয়ার কাট ওর নাকে ঝাড়লুম বল্! এক ঘুঁষিতেই

কাত ! এটা মহম্মদ আলীর টেকনিক ! কাকাবাবু, এবারে কিন্তু সন্তু আর আমিই আপনাকে বাঁচিয়েছি। আমার পিসেমশাই আর-একটু হলেই আপনার মাথায় ক্ষুর চালিয়ে দিত !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ !"

ভীমু গিয়ে অংশুমান চৌধুরীকে জল থেকে তুলে এনেছে ততক্ষণে। দুটো নাকওয়ালা মুখোশটা এখনও খোলা হয়নি। অংশুমান চৌধুরী খুঁখুঁ করে কাঁদলেন আর বললেন, "গেল, গেল, আমার সব গেল ! হতচ্ছাড়া একটা ঘোড়া, কোথা থেকে এল একটা ঘোড়া, ওফ, মরে গেলাম !"

কাকাবাবু বললেন, "অংশুমানবাবু, এবার মুখোশটা খুলে ফেলুন !"

অংশুমান চৌধুরী আর্তকণ্ঠে বললেন, "না, না, ওরে বাবা, না, না !"

"আপনি নিজে থেকে না খুললে জোর করে খুলে দেওয়া হবে ! আপনি নিজেকে বলেন বৈজ্ঞানিক, অথচ এই সরল, নিরীহ, আদিবাসীদের গ্রাম থেকে তাদের দেবতার মূর্তি চুরি করতে এসেছিলেন। এটা কি কোনও বৈজ্ঞানিকের কাজ ? আপনি আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছিলেন, আপনি কাপুরুষ। আপনি এ-দেশ থেকে দামি মূর্তি পাচার করে আমেরিকায় বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন...এই প্রত্যেকটা অপরাধের জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।"

কাকাবাবু এগিয়ে এসে একটানে খুলে ফেললেন অংশুমান চৌধুরীর মুখোশ। প্রথমেই ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে তিনি "ওরে বাবা রে ওরে বাবা রে" বলে চিৎকার করে চোখ ঢাকলেন, তারপর বললেন, "বিশ্রী দুর্গন্ধ, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব !"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঘোড়াটাকে তুই এই ভদ্রলোকের একেবারে কাছে নিয়ে আয় তো ! দেখি উনি কী রকম অজ্ঞান হয়ে যান !"

অংশুমান চৌধুরী শুধু 'ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে' বলে চ্যাচাতেই লাগলেন, কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "আর কোনও জন্তু-জানোয়ার কিংবা পোকা মাকড় নেই কাছাকাছি ? সেগুলোও ছেড়ে দিতাম ওর গায়ে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, জোজোকে যে-রকম লাল পিঁপড়ে কামড়েছিল, সেই রকম একটা পিঁপড়ের ঢিপি রয়েছে ওইখানে একটা গাছের গোড়ায় !"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি, বাঃ বাঃ, তা হলে তো খুবই ভাল !"

কাছেই একটা সন্দেশের খালি কাগজের বাক্স পড়ে আছে, সেটা দেখিয়ে সন্তুকে বললেন, "এটাতে করে বেশ কয়েক মুঠো পিঁপড়ে নিয়ে আয় তো !"

জোজো রিভলভারটা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, কাকাবাবু তাকে বললেন, "এটা আমাকে দাও ! আমি এবার অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগটা ঘেঁটে দেখি, ওতে আর কী কী সম্পত্তি আছে !"

কান্না থামিয়ে অংশুমান চৌধুরী বলে উঠলেন, "না, না, আমার ব্যাগে হাত

দেবেন না !”

হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, “চোপ ! আপনার লজ্জা করে না, একটু আগে আমাকে ‘তুমি তুমি’ করছিলেন, এখন আবার ‘আপনি’ বলতে শুরু করেছেন। আপনাকে দু’খানা থাপ্পড় মারার ইচ্ছে যে আমি কত কষ্টে দমন করছি...”

ভীমু ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর ঘোড়াটা অংশুমান চৌধুরীকে ঠেসে ধরে আছে একটা গাছের সঙ্গে। অংশুমান চৌধুরীর ‘তিড়িং তিড়িং’ নাচ আর কান্না দেখে ঘোড়াটাও বোধহয় মজা পাচ্ছে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, “ওরে ভীমু, ঘোড়াটাকে সরা ! তুই আমাকে আগে বলতে পারিসনি যে, ঘোড়াটা এদিকে আসছে ? তোর চাকরি যাবে, তোর চাকরি যাবে, তোকে আমি এমন শাস্তি দেব...”

ভীমু বলল, “আমি আর চাকরির পরোয়া করি না, স্যার ! আপনি নিজে আগে বাঁচবেন কি না দেখুন ! তারপর তো আমায় শাস্তি দেবেন !”

“দেখবি, দেখবি, আমার কাছে এখনও এমন ওষুধ আছে !”

“স্যার, উনি আপনার দিকে রিভলভার তাক করে আছেন কিন্তু !”

সন্তু কাগজের বাক্সটা নিয়ে এসে বলল, “কাকাবাবু, অনেক পিঁপড়ে এনেছি ! মাথায় ঢেলে দেব ?”

অংশুমান চৌধুরী দু’হাতে মাথা চাপা দিয়ে হাহাকার করে বলে উঠলেন, “না, না, পিঁপড়ে আমি দু’চক্ষে দেখতে পারি না ! খুদে শয়তান ! ওরে জোজো, তুই আমার আত্মীয়, তুই আমাকে বাঁচা !”

জোজো বলল, “ওই পিঁপড়ের কামড় খেয়ে আমি মরে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে, আপনার জন্যই তো ! এবার আপনি একটু পিঁপড়ের কামড় খেয়ে দেখুন ! সন্তু আমার বেস্ট বন্ধু, তার কাকাবাবুর আপনি কান কেটে দিতে যাচ্ছিলেন !”

কাকাবাবু বললেন, “দে সন্তু, পিঁপড়েগুলো ওঁর ওই ন্যাড়া মাথায় ছড়িয়ে দে !”

অংশুমান চৌধুরী যাতে বাধা দিতে না পারেন, সেইজন্য হঠাৎ ভীমুই নিজে থেকে চেপে ধরল তাঁর দু’হাত। সন্তু পুরো বাক্সটা খালি করে দিল অংশুমান চৌধুরীর মাথায়।

কাকাবাবু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “বাঃ, বেশ হয়েছে, এবার তোরা ওর নাচ দ্যাখ !”

কাকাবাবু অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। রিভলভারটা পাশে নামিয়ে রেখে, ব্যাগটার ভেতর থেকে বার করে আনলেন আসল নীল পাথরের মূর্তিটা।

নকল মূর্তির মতন আসল মূর্তিটা অত চকচকে নয়। গায়ে একটা ধুলোর আস্তরণ। কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে সেটা ঘষতে লাগলেন।

এটা চিনে-মাটির নয়, দামি কোনও পাথরের, তাতে সন্দেহ নেই। মূর্তিটা এত ভারী যে, নিরেট পাথরের বলেই মনে হয়, কিন্তু পেছন দিকে দুটো গোল গোল গর্ত। কাকাবাবু একটা গর্তে ফুঁ দিলেন, ঠিক নিটোল বাঁশির মতন শব্দ হল !

কাকাবাবু মূর্তিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। অন্তত দু'তিন শো বছরের পুরনো মনে হয়। দু'পায়ে দুটো পরিষ্কার জুতোর মতন, এইটাই আশ্চর্যের।

"হ্যান্ডস আপ !"

কাকাবাবু চমকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা ঝোপ ঠেলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে মাধব রাও আর লর্ড। মাধব রাওয়ের হাতে একটা রাইফেল।

কাকাবাবু মূর্তিটা ধরে রেখেই হাতদুটো তুললেন মাথার ওপরে। তাঁর রিভলভারটা পড়ে আছে ব্যাগটার আড়ালে, সেটা এখন আর নেওয়ার উপায় নেই।

মাধব রাও কর্কশ সুরে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, উঠে দাঁড়াও !"

লর্ড ছুটে গেল অংশুমান চৌধুরীর দিকে। সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে দু'হাত দিয়ে অংশুমান চৌধুরীর মাথা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে লাগল।

অংশুমান চৌধুরী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও ! এরা আমাকে নরক যন্ত্রণা দিয়েছে। এই ঘোড়াটাকে সরিয়ে দাও !"

লর্ড ঘোড়াটার পেটে একটা লাথি কষাতেই সেটা দৌড় লাগাল প্রাণপণে। তারপর সে অংশুমান চৌধুরীকে বলল, "ভাগ্যিস আমাদের ফিরে আসার কথা মনে হল ! আপনার দেরি হচ্ছে দেখে মনে হল, আপনার হয়তো কোনও সাহায্য দরকার। খানিকটা উঠে আসার পর আপনার কান্নার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলুম, নিশ্চয়ই আপনি বিপদে পড়েছেন।"

অংশুমান চৌধুরী কয়েকবার হেঁচকি তুলে কান্না থামিয়ে বললেন, "এবারে আমি রাজা রায়চৌধুরীকে এমন শাস্তি দেব ও জীবনে ভুলবে না ! ওর হাত দুটো বেঁধে ফ্যালো। ও ডেঞ্জারাস লোক আর এই ভীমুটা, ও পর্যন্ত বিট্রে করেছে, ওদের দলে ভিড়েছিল, ওকে আমি তিরাংদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাব !"

মাধব রাও রাইফেলটা একবার সকলের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "কেউ এক পা নড়বে না। যে চালাকির চেষ্টা করবে, সে খোঁড়া হয়ে যাবে। রাজা রায়চৌধুরী তুমি আমার সামনে এগিয়ে এসো। হাতে ওটা কী, তুমি তিরাংদের মন্দির থেকে মূর্তিটা তুলে এনেছ ? এই যে আগে তুমি খুব সাধু সেজেছিলে, ওদের মূর্তি চুরি করায় তোমার খুব আপত্তি ছিল..."

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "মাধব রাও, তুমি এককালে সিভিলিয়ান ছিলে, এখন বন্দুক তুলে লোককে ভয় দেখাচ্ছ ? আমি যদি তোমার হুকুম না

শুনি। তা হলে কি গুলি করে আমায় মেরে ফেলবে? খুন করতেও তোমার আপত্তি নেই?"

মাধব রাও চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, তোমার কাছে আমরা সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম, তুমি আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন তুমি আমাদের পদে-পদে বাধা দিচ্ছ। মিস্টার অংশুমান চৌধুরী আমাদের দারুণ সাহায্য করেছেন, তুমি তাঁকে..."

কাকাবাবু এবার হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "অংশুমান চৌধুরী তোমাদের সাহায্য করেছেন? তাই নাকি? তোমাদের একটা নকল মূর্তি দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন..."

অংশুমান চৌধুরী চেঁচিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! ওর কথায় বিশ্বাস কোরো না!"

মাধব রাও বলল, "দেখি, ওই মূর্তিটা আমাকে দাও।"

কাকাবাবু বললেন, "এই নাও।"

প্রচণ্ড জোরে তিনি মূর্তিটা ছুঁড়ে মারলেন মাধব রাওয়ের রাইফেল-ধরা হাতটার ওপর। রাইফেলটা ছিটকে পড়ে গেল খানিকটা দূরে, ঠকাস করে শব্দ হল। হাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল মাধব রাও।

লর্ড আর অংশুমান চৌধুরী, অন্যদিক থেকে সন্তু আর জোজোও গেল রাইফেলটা আগে কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। সেটার কাছে পৌঁছবার আগেই অংশুমান চৌধুরী পেছনে ফিরে সন্তু আর জোজোকে কিল আর লাথি মারতে মারতে চেঁচিয়ে বললেন, "লর্ড, লর্ড তুমি রাইফেলটা হাত করো..."

লর্ড নিচু হয়ে রাইফেলটা ধরতে যেতেই তার হাতে একটা গুলি এসে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "ওহে লর্ড, ওখান থেকে সরে না গেলে এর পরের গুলিটা তোমার মাথার খুলিতে লাগবে! সন্তু, রাইফেলটা নিয়ে আয় আমার কাছে।"

গুলির ধাক্কায় লর্ড পড়ে গেছে মাটিতে, উড়ে গেছে তার বাঁ হাতের দুটো আঙুল। অংশুমান চৌধুরী আতঙ্ক-বিহ্বল চোখে থমকে গিয়ে বললেন, "যাঃ!"

রিভলভারটা হাতে নিয়ে, ক্রাচ ছাড়াই কাকাবাবু এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে দাঁড়ালেন মাধব রাওয়ের কাছে। রাগে তাঁর মুখ থমথম করছে।

মাধব রাওয়ের চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমার দিকে যারা বন্দুক-পিস্তল তোলে, তাদের আমি কোনও না কোনও শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। তোমাকে আমি কী শাস্তি দেব? একটা হাত ভেঙে দেব মুচড়ে?"

মাধব রাও উঠে বসে মাথা হেঁট করে ফেলল। তার মাথা ভর্তি বাবরি চুল। লর্ড হাতের যন্ত্রণায় মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তারও মাথায় অনেক

চুল।

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। অংশুমান চৌধুরী, আপনি আমার মাথা কামাতে চাইছিলেন না ? আপনার নাপিত সাজার খুব ইচ্ছে ? এবার এই দু'জন লোকের মাথা ন্যাড়া করে দিন।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমি পারব না, আমি পারব না !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমার মতন আপনিও একটা পা খোঁড়া করতে চান ? আপনার সম্পর্কে আমার আর কোনও দয়া-মায়া নেই। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে যদি ক্ষুরটা হাতে না নেন...এক, দুই..."

অংশুমান চৌধুরী ছুটে গিয়ে মাটি থেকে ক্ষুরটা তুলে নিয়ে রাওয়ের মাথার সামনে গিয়ে বসলেন, তারপর বললেন, জল দিয়ে চুল ভেজাতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও দরকার নেই। শুরু করুন !"

মাধব রাও মুখ তুলে একবার শুধু অংশুমান চৌধুরীর দিকে তাকাল, তারপর বলল, "আপনারা যা খুশি করুন।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাধব রাও ন্যাড়া হয়ে গেল। ক্ষুরের খোঁচায় তার মাথার খুলির মধ্য দিয়ে একটু-একটু করে রক্ত ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে লর্ডকে ধরুন, তার আগে একটা কথা...তিরাংদের ঘুম ভাঙতে আর কতক্ষণ বাকি আছে ?"

অংশুমান চৌধুরী হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "আরও প্রায় দু'ঘন্টা।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, একটা কাজ করতে পারবি ? তিরাংদের মন্দিরে গিয়ে ওদের এই মূর্তিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারবি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দিয়ে আসব।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন ? ওটা খুবই দামি...তিরাংরা ওর মূল্য বোঝে না...ওদের মন্দিরে একটা নকল মূর্তি থাকলেও ক্ষতি নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "চুপ ! এখনও চুরি করার শখ মেটেনি ? নিজের কাজ করুন। সন্তু, তুই যা। এই আসল মূর্তিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নকলটা নিয়ে চলে আসবি !"

জোজো বলল, "চল সন্তু, আমিও তোর সঙ্গে যাই !"

লর্ড নিজের মাথার চুল বাঁচাবার জন্য মাটিতে আরও জোরে জোরে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ভীমু গিয়ে চেপে ধরল তাকে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে লর্ডের শখের চুলও ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, ঠিক হয়েছে। এবারে আপনি নিজের কান দুটো কেটে ফেলুন তো !"

অংশুমান চৌধুরী আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাঁ ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আমার কান কাটতে চাইছিলেন, এখন নিজের

কান কাটতে আপত্তি কিসের ? নিজের হাতে পারবেন না ? তা হলে ভীমুকে ক্ষুরটা দিন ।"

ভীমু সাগ্রহে বলল, "দেব স্যার, আমি ওঁর কানদুটো কেটে দেব স্যার ? এক মিনিট লাগবে !"

অংশুমান চৌধুরী এবারে সটান শুয়ে পড়ে কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললেন, "দয়া করুন, দয়া করুন ! আমার কান কাটবেন না । তা হলে আর কোনও দিন মুখ দেখাতে পারব না ।"

কাকাবাবু পা'টা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "ছিঃ ! আমি কি সত্যি-সত্যি আপনার কান কেটে দিতাম ? উঠে বসুন, এরপর একটা দরকারি কথা আছে !"

মাধব রাও, লর্ড আর অংশুমান চৌধুরীকে তিনি এক লাইন করে বসালেন । তারপর সন্তু আর জোজোকে ফিরে আসতে দেখে তিনি বললেন, "এবার আর একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে ! এই পাহাড়ের নীচে আপনাদের গাড়িটা আছে না ? সেই গাড়িটা চাই । আমরা এখান থেকে রওনা হওয়ার আধঘন্টা পরে আপনারা উঠবেন । তার আগে উঠলে আমি গুলি চালাব । আমি খোঁড়া লোক, আধঘন্টা গ্রেস তো পেতেই পারি, তাই না ? তারপরও গিয়ে যদি আপনারা আগে গাড়িটা দখল করতে পারেন, তা হলে আমাদের কিছুই বলার নেই !"

সন্তু আর জোজো ফিরে আসতেই তিনি বললেন, "রাইফেলটা, অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগ এই সব নিয়ে নে । ওরা খুনে-গুণ্ডা, ওদের হাতে কোনও রকম অস্ত্র দেওয়া ঠিক নয় । ভীমু, তুমি ফ্রি । তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো ! ঘোড়াটা পাওয়া গেলে খুব ভাল হত ।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু তিনটি ন্যাড়ামাথার দিকে তাকিয়ে বললেন, "গুড বাই !"

মহাকালের লিখন

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী! এগুলো কিসের ডিম?

সন্তুও বেশ অবাক হয়েছিল। ডাক বাংলোর কুক তাদের দু'জনের জন্য একটা প্লেটে চারটে ডিম-সেদ্ধ দিয়ে গেছে। ওরকম ডিম সন্তু কক্ষনো আগে দেখেনি। মুর্গির ডিমের চেয়েও একটু ছোট, পুরোপুরি গোল। ঠিক পিং পং বলের মতন। প্লেটে সাজানো যেন অবিকল চারটি বল, এক্ষুনি ওগুলো নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা যায়।

বিমান আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে। সে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসেছে খানিকটা দূরে।

বিমান হাসতে হাসতে বলল। কাকাবাবু, আপনি চিনতে পারলেন না?

বাংলোর কুকটি বাঙালি। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যার, এখানে হাঁসের ডিম তো পাওয়াই যায় না। মুর্গির ডিম চালান আসে, তাও মাঝে মাঝে কম পড়ে যায়। কিন্তু কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায় যথেষ্ট।

কাকাবাবু বললেন, ছি ছি ছি ছি!

বিমান বলল, খেতে কিন্তু খারাপ নয়। আপনারা খেয়ে দেখুন। আমি বলছি, ভাল লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি আমাকে কচ্ছপের ডিম চেনাচ্ছ? এক সময় কত কচ্ছপের ডিম খেয়েছি। কচ্ছপের মাংস খেয়েছি। এক-একটা কচ্ছপ মারলে তার পেটের মধ্যে চোদ্দ-পনেরোটা ডিমও পাওয়া যেত। এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। আমরা খাব না।

বিমান বলল, এক সময় খেতেন, এখন খাবেন না কেন? আপনার আর সহ্য হয় না? তা হলে সন্তু খেয়ে নিক।

কাকাবাবু বললেন, না, সন্তুও খাবে না। তোমরা জানো না, কচ্ছপ মারা নিষেধ? সারা পৃথিবীতেই কচ্ছপের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শুধু-শুধু এইভাবে কচ্ছপের ডিম

নষ্ট করার কোনও মানে হয় ?

বিমান বলল, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এগুলো তো সেদ্ধই হয়ে গেছে। এগুলো খেয়ে নিন। এগুলো থেকে তো আর বাচ্ছা বেরুবে না।

কাকাবাবু বললেন, তবুও খাওয়া উচিত নয়। তুমি যদি ভাবো, এই ডিমগুলো তো আমি নিয়ে আসিনি, আমি সেদ্ধও করিনি ; সুতরাং আমার খেতে দোষ কী ? তা হলে অন্য লোক আরও বেশি করে এই ডিম ধরবে, বাজারে এনে বিক্রি করবে। সেইজন্য একদম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ডিম নিয়ে যাও, আমরা শুধু টোস্ট আর চা খাব।

বাংলোর কুকটি বললেন, আপনি বললেন, স্যার, কচ্ছপ কমে যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। ওরা সমুদ্রে থাকে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় ওপরে উঠে আসে। মাটিতে সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। লোকেরা সেই মাটি খোঁড়া দেখলেই চিনতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, লোকেরা অমনি সেই ডিমগুলো চুরি করে আনে, তাই তো। এখন যতই কচ্ছপ থাক, এইভাবে ডিম নষ্ট হলে একদিন কচ্ছপের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে না ? পৃথিবীর কত প্রাণী এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিমান বলল, কচ্ছপ মারাও যে খুব সোজা। একবার ধরে উল্টে দিতে পারলেই হল। ওরা নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কাকাবাবু বললেন, নিরীহ প্রাণী বলেই এক সময় সাহেবরা হাজার-হাজার কচ্ছপ মেরে ফেলেছে। ভারত মহাসাগরে এমন অনেক দ্বীপ ছিল, সেখানে লক্ষ-লক্ষ কচ্ছপের বাসা ছিল। এক-একটা দ্বীপে যখন সাহেবদের জাহাজ নেমেছে, তখন খেলার ছলে তারা যত ইচ্ছে কচ্ছপ মেরেছে।

বিমান বলল, সাহেবরা তো সর্বভুক। কচ্ছপের মাংসও নিশ্চয়ই ওরা খায়।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, টারটল সুপ তো অনেকের প্রিয়। কিন্তু শুধু খাবার জন্য নয়। বললাম না, খেলার জন্যও মেরেছে ? একদিনে কি হাজার-হাজার কচ্ছপ খাওয়া যায় ? মজা করার জন্য জাহাজের খালাসীরা কচ্ছপগুলোকে ধরে ধরে উল্টে দিত। কে কটা পারে, তার প্রতিযোগিতা হত। তারপর ওরা জাহাজ নিয়ে চলে যেত। দিনের পর দিন হাজার-হাজার কচ্ছপ অসহায়ভাবে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। দৃশ্যটা ভাবো তো। তারপর তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যেত।

সন্তু বলল, ইস !

বিমান বলল, চলুন কাকাবাবু, এবার আমাদের বেরুতে হবে।

কাকাবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং রুম ছেড়ে সবাই চলে এল বাইরে। একটা ঝকঝকে নতুন জিপসি গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। উর্দিপরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

কাকাবাবু জোরে একবার শ্বাস টেনে বললেন, আঃ, এখানকার বাতাস কী পরিষ্কার ! চমৎকার টাটকা গন্ধ ! এইটুকু রাস্তা আর গাড়িতে গিয়ে কী করব। চলো হেঁটেই যাই।

বিমান বলল, হাঁটতে অসুবিধে হবে না আপনার ?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না হে, এই ক্রাচ নিয়েই আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। চলো, চলো।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। একেবারে লেখার কালির মতন ঘন নীল জল। রয়াল ব্লু। খুব কাছেই একটা দ্বীপ। সবুজ গাছপালায় এমন ভর্তি যে, এখান থেকে মনে হল, এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। এমন নিবিড় জঙ্গল সন্তু আর কোথাও দেখেনি।

সন্তু এই দ্বিতীয়বার এসেছে আন্দামানে। পোর্ট ব্লেয়ার শহরটা তার বেশ চেনা লাগছে। মনটা বেশ খুশি-খুশি লাগছে তার। এখানকার সমুদ্র অন্য রকম, দীঘা কিংবা পুরীর সঙ্গে কোনও মিল নেই। তীরের কাছে জল একটুও ঘোলা নয়, একেবারে স্বচ্ছ একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাছের ঝাঁক দেখা যায়।

মোটর লঞ্চটাও রেডি হয়ে আছে। ওপরের ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এর মালিক রূপেন মিত্র। কাকাবাবুদের দেখে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন, আসুন মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ঠিক নটার সময় স্টার্ট করব।

লঞ্চটা মাঝারি আকারের। নীচে চারখানা ক্যাবিন, অনায়াসে আটজন লোক শুতে পারে। রান্না-বান্নার ব্যবস্থাও আছে। একসঙ্গে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো যায়। রূপেনবাবুদের ঝিনুক আর মাদার অফ পার্ল-এর ব্যবসা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝিনুকের অন্ত নেই। কত রকম ঝিনুক, মাঝে মাঝে শঙ্খও উঠে আসে। মাদার অফ পার্ল দিয়ে মেয়েদের গয়নার লকেট হয়।

এবার অবশ্য এই লঞ্চে ঝিনুক তুলতে যাওয়া হচ্ছে না।

বিমান একজন বিমান-চালক। তার নামের সঙ্গে কাজের খুব মিল। সে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট, মাঝে মাঝেই তাকে আন্দামানে আসতে হয়। রূপেন মিত্তিরদের সঙ্গে তার খুব ভাব। বিমানই কাকাবাবুদের এখানে বেড়াতে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওপরের ডেকে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে, সবাই বসল সেখানে। লঞ্চটা বন্দর ছেড়ে ছুটে চলল গভীর সমুদ্রে। পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই অন্য লঞ্চ যাচ্ছে, সেগুলোতে যাত্রী ভর্তি। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ দিকে যাব ?

রূপেনবাবু বললেন, আমরা যাব রঙ্গত আয়ল্যান্ডের দিকে। পথে অবশ্য

আরও অনেক দ্বীপ পড়বে।

বিমান বলল, এখানে কত যে দ্বীপ। অনেক দ্বীপের কোনও নামই নেই। কাকাবাবু, আপনি তো জানেন, আপনি এদিকটা ভাল করে ঘুরেছেন।

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

বিমান আবার বলল, জানেন, রূপেনবাবু, একবার কাকাবাবু আর সন্তু একেবারে হিংস্র জারোয়াদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।

রূপেনবাবু বললেন, তাই নাকি? যে দ্বীপটায় জারোয়া উপজাতি থাকে, আমরা তো সেটা এড়িয়ে চলি। কাছেই যাই না। আপনি গেলেন কী করে? ওরা আপনাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে এক লম্বা গল্প। এখন সে কথা থাক। আচ্ছা রূপেনবাবু, আপনি কি নিজের চোখে মারমেড দেখেছেন?

রূপেনবাবু বললেন, না, আমি দেখিনি। আমি লঞ্চে করে এখানকার সমুদ্রে অনেক ঘুরেছি। বড় বড় তিমি দেখেছি। হাঙরের ঝাঁক তো যখন-তখন দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাইং ফিস দেখেছি। ডলফিনও দেখেছি। কিন্তু মারমেড জাতীয় কিছু কখনও আমার চোখে পড়েনি।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিমান যে বলল, আপনি দেখেছেন? মারমেড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো বিমান আমাদের এখানে টেনে আনল।

বিমান বলল, রূপেনবাবু নিজের চোখে দেখেছেন সে কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি যে, রূপেনবাবুর লোকজনেরা দেখেছে।

রূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার লঞ্চের দু'জন খালাসী নাকি দেখেছে। মাসখানেক ধরে এখানে একটা গুজব রটেছে যে, একটা মারমেড বা জলকন্যাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কোনও নির্জন দ্বীপের ধারে বালির ওপর সে বসে থাকে। মানুষের সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই চোখের নিমেষে জলে ঝাঁপ দেয় তারপর গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। রঙ্গত আর মায়াবন্দরের বেশ কয়েকজন লোকই নাকি দেখতে পেয়েছে তাকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

রূপেনবাবু বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। নিজের চোখে তো দেখিনি।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, যারা দেখেছে, তারা মারমেডটিকে কেমন দেখতে বলেছে?

রূপেনবাবু বললেন, ওপরের দিকটা একটা সুন্দরী মেয়ে, লম্বা চুল, ফর্সা রং, টানা-টানা চোখ। তার তলার দিকটা মাছের মতন। দুটো পা নেই, তার বদলে লেজ যেমন হয়।

কাকাবাবু বললেন, সবাই এই রকমই বলে। কোপেনহ্যাগেন শহরে এই

রকম একটি মারমেডের মূর্তিও আছে।

বিমান বলল, সেটা তো বিখ্যাত। আমি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মূর্তিটা তুমি দেখেছ। কিন্তু আসল মারমেড এ-পর্যন্ত কোনও মানুষ চোখে দেখেনি।

বিমান বলল, অ্যাঁ? কেউ দেখেনি? তবে যে বহুকাল ধরে এত গল্প।

কাকাবাবু বললেন, সবই গল্প। মানুষের কল্পনা। কোনও প্রমাণ নেই। মাঝে মাঝে গুজব ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ছবি তুলতে পারেনি।

সন্তু বলল, আমি ক্যামেরা এনেছি। সত্যি যদি একটা মারমেড দেখতে পাই, তা হলে পটাপট ছবি তুলব। তা হলে সেটা একটা বিরাট আবিষ্কার হবে, তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তা হবে। কিন্তু বেশি আশা করিস না। বেশি আশা করলে বেশি নিরাশ হতে হয়। সমুদ্রে ওরকম কোনও প্রাণী থাকতে পারে না।

বিমান অবিশ্বাসের সুরে বলল, থাকতে পারে না? এ কথা কী করে বললেন? সমুদ্রে এখনও কত রকম রহস্যময় প্রাণী আছে, মানুষ কি সব জানে?

কাকাবাবু বললেন, রহস্যময় প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু যে প্রাণীর ওপরের দিকটা মানুষের মতন, তার হার্ট আর লাংসও তো মানুষের মতন হবে। সে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকবে কী করে? তবে অন্য দুটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের দেখে অনেকে মানুষ বলে ভুল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, মানুষের মতন প্রাণী?

কাকাবাবু বললেন, মোটেই মানুষের মতন নয়। একেবারে জলজন্তু, একটির নাম মানাটি আর একটির নাম ডুগং। এরা বিরাট বিরাট প্রাণী। এক-একটির ওজন প্রায় এক টন। তিমি মাছ যেমন জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে নিঃশ্বাস নেয়, তেমনি মানাটি আর ডুগং-রাও প্রায়ই জলের ওপর মুখখানা ভাসিয়ে থাকে। বহুকাল ধরেই গভীর সমুদ্রে নাবিকরা এদের দেখেছে। এদের মুখের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল আছে।

একটু থেমে অনেকখানি চওড়া করে হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, মেয়েরা তো জাহাজের নাবিক হয় না। নাবিকরা সবাই পুরুষ। সেই জন্য মানুষের মুখের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন প্রাণী দেখেই নাবিকরা তাকে কোনও মেয়ে বলে মনে করে। সেই থেকেই জলকন্যার কাহিনী চালু হয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ঐ মানাটি আর ডুগংদের কেমন দেখতে?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখিনি, ছবি দেখেছি। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখে লিখেছেন যে, ওদের মুখ বিচ্ছিরি রাগী বুড়োর মতন। সাধারণ

মানুষের মুখের চেয়ে অনেকটা বড়। এদের তলার দিকটা মাছের মতন। কিন্তু এরা মাছ নয়। ম্যামাল। অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী, শিরদাঁড়া আছে।

বিমান বলল, দুর ছাই।

কাকাবাবু বললেন, আমি মারমেড দেখার আশা করিনি। তবে একটা মানাটি কিংবা ডুগং যদি দেখতে পাই, সেটাই যথেষ্ট। এদিককার সমুদ্রে সাধারণত ওদের দেখা পাওয়া যায় না।

রূপেনবাবু বললেন, আমার খালাসী দু'জন কিন্তু জোর দিয়ে বলেছে, ওরা একটা মেয়ের মতন প্রাণীকেই দেখেছে। আমাদের আজ ঠিক দেখাবে।

কাকাবাবু বললেন, ভাল কথা।

এরপর কফি এল। কফি খেতে খেতে ওরা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। নির্জন, সুন্দর সুন্দর দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউতে লাফিয়ে লাফিয়েও উঠছে। জল ছিটকে আসছে ওপরের ডেক পর্যন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, বিমান তিনজনই প্যান্ট-শার্ট-পরা। কিন্তু রূপেনবাবু বনেদী বাঙালিদের মতন পরে আছে কুঁচোনো ধুতি। আর ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি। একবার জলের ছিটেয় তার পাঞ্জাবি অনেকটা ভিজে গেল।

কাকাবাবু একটা বায়নোকুলার এনেছেন। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যরাও দেখছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে—ঐ যে—।

সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

না, জলকন্যাও নয়, মানাটি কিংবা ডুগংও নয়, এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ফ্লাইং ফিস। পার্শের মতন সাইজ দু'পাশে ডানা, মাছগুলো জল থেকে লাফিয়ে উঠে ফর ফর ফর ফর করে বেশ খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল।

কাকাবাবু বললেন, এও তো একটা বেশ ভাল জিনিস দেখলি রে সন্তু।

এর পর আরও তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না।

সমুদ্র যতই সুন্দর হোক, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। লঞ্চের ভট ভট ভট ভট শব্দটাও বিরক্তিকর। যদিও বেশ হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। গরম না লাগলেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন।

এক সময় লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল।

রূপেনবাবু নীচের একটা ক্যাবিনে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা পাল্টাতে। ওপরে এসে বললেন, আমার খালাসীরা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাছেই ওই যে দ্বীপটা দেখছেন, ওর ধারেই নাকি দু'বার দেখা গেছে মারমেডকে। এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা মিলতেও পারে। কিন্তু লঞ্চের শব্দ শুনলেই সে পালাবে। একটা নৌকো করে আমরা ওই দ্বীপটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি। দুপুরের খাবারেরও তো সময় হয়েছে। ওখানে গিয়েই আমরা খেয়ে নেব।

কাকাবাবু বললেন, চমৎকার আইডিয়া। জলকন্যা কিংবা বিরাট কোনও জলজন্তু দেখা যাক বা না যাক নতুন একটা দ্বীপে পিকনিক তো হবে। সেটাই হোক।

বিমান সভয়ে বলল, এই দ্বীপে আবার জারোয়ারা থাকে না তো?

রূপেনবাবু বললেন, না না। দেখছ না। ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশটাই তো দেখা যাচ্ছে। আন্দামানের জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক থাকে না। নির্ভয়ে ঘোরা যায়।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এই দ্বীপটার নাম কী?

রূপেনবাবু বললেন, তা তো জানি না। বোধ হয় কোনও নাম নেই। এখানকার অনেক দ্বীপ শুধু নম্বর দিয়ে চেনানো হয়।

সন্তু বলল, আমি এই দ্বীপটার নাম দিলাম মারমেড আয়ল্যান্ড।

লঞ্চের গায়েই বাঁধা রয়েছে একটা ডিঙ্গি নৌকো। সেটা ভাসানো হল জলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ছোট দ্বীপটায়।

দ্বীপটা একেবারে সুন্দর—আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়ি পাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন। বোধ হয় কখনও কখনও সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটাই ডুবিয়ে দেয়। ঘাস কিংবা ঝোপঝাড় কিছু নেই। বড় বড় গাছ আর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

তীর থেকে খানিকটা ভেতরে চলে এসে সন্তু দেখতে পেল একটা গোল মতন পাথরের ঢিবি। জুতো খুলে সন্তু তর তর করে সেটার ওপরে উঠে গেল।

তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, এই জায়গাটায় সবাই মিলে বসলে খুব ভাল হয়। এখান থেকে সব দিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবু পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ পেছল! আমি আর খোঁড়া পা নিয়ে ওপরে উঠব না।

বিমানও জুতো খুলে উঠে গেল ওপরে। ঢিবিটা একতলা সমান উঁচু। এখানে খুব বড় গাছ নেই বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিমান বলল, বাঃ, এরকম জায়গায় একটা বাড়ি বানাতে পারলে গ্র্যান্ড হত। বেশ নিজস্ব একটা দ্বীপ। তাতে একটাই বাড়ি থাকবে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে দ্বীপের চারপাশটা এবার ঘুরে আসি।

কাকাবাবু আড়ালে চলে যেতেই বিমান একটা সিগারেট ধরাল। কাকাবাবুর সামনে সে সিগারেট খায় না কক্ষনো।

ছোট নৌকোটা লঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে খাবার-দাবার আনতে। লঞ্চটা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, এখন ভাসতে ভাসতে এদিকেই যেন সরে আসছে।

সন্তু আর বিমান গল্প করছে, হঠাৎ চমকে উঠল দু'জনেই।

পাথরটা একবার কেঁপে উঠল না ? মাটি কাঁপছে ?

ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনও কথা বলবার আগেই আবার পাথরটা কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

এবার বিমান চিৎকার করে উঠল ভূমিকম্প ! ভূমিকম্প !

সন্তুও সড়াৎ করে পাথরটা থেকে গড়িয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, সাবধান ! ভূমিকম্প হচ্ছে।

সন্তুর ধারণা হল ভূমিকম্পে দ্বীপটার মাঝখানটা ফেটে দু'ভাগ হয়ে যাবে, তারপর সব সুদ্ধু ডুবে যাবে সমুদ্রে।

কাকাবাবু জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পিছিয়ে এলেন খানিকটা। সন্তু আর বিমান দু'জনেই চ্যাঁচাচ্ছে। তিনি ওদের কাছে এসে বললেন, কী হয়েছে ? কোথায় ভূমিকম্প ? আমি তো কিছু টের পেলাম না।

রূপেনবাবু এসে বললেন, আমিও তো বুঝতে পারিনি।

বিমান বলল, পাথরটা দু'বার জোরে জোরে কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্তু চোখ বড় বড় করে সাঙ্ঘাতিক বিস্ময়ে বলল, একী ! একী !

ওদের চোখের সামনে পাথরের ঢিবিটা দুলতে শুরু করেছে। আর একটু একটু এগোচ্ছে। ঠিক জীবন্ত কোনও প্রাণীর মতন।

ভয় পেয়ে সবাই ছিটকে দূরে সরে গেল।

বিমান বলল, ওরে বাপ রে, এটা কোন বিরাট জন্তু ?

রূপেনবাবু এক দৌড় মেরে জলের ধারে গিয়ে তার খালাসীদের ডেকে বলতে লাগলেন, ওরে রঘু, ওহে রতন, মানসিং, শিগগির লঞ্চটা নিয়ে এসো। প্রকাণ্ড জানোয়ার। মেরে ফেলবে। মেরে ফেলবে।

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু-একটু নড়তে লাগল শুধু। ওদের দিকে তেড়ে এল না।

কাকাবাবু সাহস করে একটু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ দিয়ে পাথরটার গায়ে একটু ঘষে দিলেন। সেটার ওপরে শ্যাওলা জমে আছে। একটুখানি খসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এটা তো মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ।

বিমান বলল, অ্যাঁ ? এত বড় কচ্ছপ ? তা কখনও হতে পারে ?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দেখি, কচ্ছপ হলে নিশ্চয়ই একটা মুখ থাকবে। মুখটা দেখলেই বোঝা যাবে।

কাকাবাবু প্রাণীটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হল না। একটা গাছের আড়াল থেকে ঝটাং করে বেরিয়ে এল তার গলা আর মুখ। হাতির শুঁড়ের মতন মোটা। ক্রিকেট বলের সাইজের দুটো চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

কাকাবাবু তবু ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—এটা কচ্ছপ। সমুদ্রে অনেক বড় বড় কচ্ছপ থাকে বটে, কিন্তু এত বড় কচ্ছপ যে হতে পারে। তা কখনও শুনিনি।

সন্তু বলল, কাকাবাবু আর এগিয়ো না।

কাকাবাবু বললেন, কচ্ছপ যখন, তখন ভয়ের কিছু নেই। এরা নিরীহ্ প্রাণী, মানুষকে তেড়ে এসে কামড়ায় না।

এর মধ্যে রূপেনবাবুর চ্যাঁচামেচি শুনে লঞ্চটা হুইশল দিতে দিতে চলে এল এদিকে। লাঠি, লোহার রড নিয়ে নেমে এল ছ'সাত জন খালাসী। হৈ-হৈ করে কাছে এসে বলল, কোন্ জানোয়ার ? কোথায় ? কোথায় ?

এত বড় একটা কচ্ছপ দেখে তাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। একজন বলল, একটা পাহাড়ের মতন কচ্ছপ ? স্বপ্ন দেখছি না তো ?

আর একজন বলল, এটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

রূপেনবাবুও এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে পোর্টব্লেয়ার নিয়ে যাব। তারপর কলকাতায় নিয়ে যা[illegible] এরকম কচ্ছপ কেউ কখনও দেখেনি। তারপর বিলেত আমেরিকায় পাঠাব। এটাকে উল্টে দাও। উল্টে পাগুলো বাঁধো।

কিন্তু এত বিরাট কচ্ছপকে উল্টে দেওয়া সহজ নাকি ? কচ্ছপটা তার মুণ্ডুটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে।

একজন বলল, সাবধান ! কচ্ছপের মুখের কাছে গেলে কামড়ে দেবে। হাত কিংবা পা কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। ওর মুখটাকে আগে আটকাতে হবে।

একজন একটা লোহার রড বাড়িয়ে দিল কচ্ছপটার মুখের কাছে। কচ্ছপটা সেটা সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরে দুটো ঝটকা মারতেই রডটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল।

রূপেনবাবু দূর থেকেই এক লাফ দিয়ে বললেন, বাপ্‌রে ! দাঁতের কী জোর !

রঘু নামের একজন খালাসী বলল, স্যার, আমি কচ্ছপ ধরার কায়দা জানি। একটা শক্ত নাইলনের দড়ি চাই।

একজন দড়ি আনতে ছুটে গেল। অন্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত বড় চেহারা নিয়েও কচ্ছপটা বোধ হয় বেশ ভীতু প্রাণী। সে দৌড়ে পালাবারও চেষ্টা করল না, কারুকে তেড়ে কামড়াতেও এল না।

রঘু নাইলনের দড়িটা পেয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল। তারপর সেটা ছুড়ে দিল কচ্ছপটার মুখের দিকে। দু'তিনবারের চেষ্টায় ফাঁসটা জড়িয়ে গেল তার গলায়। দু'জন খালাসী দু'দিক থেকে টান মারতেই সেটা আঁট হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দুটো দিয়ে।

সন্তু বলল, কচ্ছপটা বোধ হয় খুব বুড়ো।

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি, ওরা বহু দিন বাঁচে। এর বয়েস কয়েক শো বছর হলেও আশ্চর্য কিছু নেই।

রঘু বলল, এবার সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ওকে উল্টে দিতে হবে।

সবাই কাছে এসে হাত লাগাবার আগেই কচ্ছপটার পিঠটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। ওর পিঠে কিছু কিছু মাটির চাপড়া ছিল তা খসে গেল। তখন দেখা গেল তার পিঠে অনেক হিজিবিজি দাগ।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, দেখুন, দেখুন এই দাগগুলো। মনে হচ্ছে, এক জায়গায় বাংলা অ লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, ঘরের দেয়ালে জল পড়ে নোনা ধরলেও অনেক সময় এরকম মনে হয়। অ নয় রে আ, পাশের দাগটা ঠিক আকারের মতন।

বিমান রূপেনবাবুরাও ঝুঁকে এসেছেন দেখতে। বিমান বলল, তার পাশেই তো র। কেউ যেন লিখেছে আর।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে কচ্ছপটার পিঠটা খুব ভাল করে ঘষলেন। অনেক ময়লা সরে গেল। এবার ফুটে উঠল আরও অক্ষর। আর, এর একটু পরেই মা।

সন্তু বলল, তারপর এটা কী ? এ ? মা এ ?

কাকাবাবু বললেন, এ নয় তয়ে র-ফলা। মাত্র—তা হলে হল 'আর মাত্র'।

রূপেনবাবু বললেন, আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! কচ্ছপের পিঠে এরকম লিখল কে ?

কাকাবাবু গভীর বিস্ময়ে কচ্ছপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অভিভূতভাবে বললেন, প্রকৃতি লিখে দিয়েছে। কিংবা মহাকালও বলতে পারেন। প্রবাদ আছে, মহাকূর্ম অর্থাৎ বড় কোনও কচ্ছপের পিঠে মহাকাল তার ইতিহাস লিখে রাখে।

সন্তু বলল, আরও কিছু লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সবটা পড়তে পারছি। এই দ্যাখ ভাল করে। আর মাত্র দুটি। মেরো না, মেরো না, মেরো না।

সন্তু বললেন, হ্যাঁ, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রকৃতি লিখে দিয়েছে যে, পৃথিবীতে এরকম কচ্ছপ মাত্র দুটো বেঁচে আছে।

বিমান বলল, কী বলছিস প্রকৃতি কিংবা মহাকাল বাংলায় লিখবে নাকি ?

কাকাবাবু বললেন, মহাকাল কখন কোন্ ভাষায় লেখেন, তার তুমি আমি কী জানি। কথাগুলো যে লেখা রয়েছে, তা তো সত্যি। কচ্ছপটা নিজেই পিঠ ঝাঁকিয়ে তা আমাদের দেখাল।

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে খালাসীদের বললেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ওকে ছেড়ে দিন। বন্দী অবস্থায় যদি ও মরে যায়, তা হলে পৃথিবী থেকে এই কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের ধ্বংস করার কোনও অধিকার আমাদের নেই।

খালাসীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপেনবাবু বললেন, ওরে বাপ রে, বাপ। জম্মে কখনও এমন দেখিনি। ভগবান নিজে লিখে দিয়েছেন, ওকে মেরো না। ওকে বন্দী করলে আমাদের মহাপাপ হবে। ইনি সাক্ষাৎ কূর্ম অবতার। ওরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে, শিগগির ছেড়ে দে।

খালাসীরা এবার ফাঁস খুলে নিল ওর গলা থেকে। কাকাবাবু সবাইকে দূরে সরে যেতে বললেন। সকলে সার বেঁধে কচ্ছপটার পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

কচ্ছপ এবার থপ থপ করে এগোতে লাগল জলের দিকে।

রূপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, জয় বাবা কূর্ম অবতার। আমাদের দোষ নিও না।

তাঁর দেখাদেখি অন্য খালাসীরাও নমস্কার করলেন।

কচ্ছপটা জলের কাছাকাছি গিয়ে একবার মুখটা ফিরিয়ে ওদের দেখল। তারপর প্রবল আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল নীল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে।

উল্কা-রহস্য

জঙ্গলের মধ্যে এই জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। প্রায় চৌকোমতন জায়গাটাতে শুধু ঘাস হয়ে আছে, অনায়াসেই একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটা যায়। অনেক গভীর জঙ্গলের মধ্যেই হঠাৎ-হঠাৎ এরকম এক-একটা ফাঁকা জায়গা থাকে। কেন যে এখানে বড় গাছ জন্মায় না তা কে জানে!

সেই জায়গাটার এককোণে একটা গোল পাথরের ওপর বসে আছেন কাকাবাবু। প্রচণ্ড রোদ বলে তাঁর মাথায় একটা টুপি। তাঁর পা দুটো সামনের দিকে ছড়ানো, ডান হাতে আলগা করে ধরে আছেন রিভলভার।

সন্তু দাঁড়িয়ে আছে কাকাবাবুর পেছনদিকে। তার মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায় সে খুব ভয় পেয়েছে। বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও সে বেশি ভয় পায় সাপকে। সাপটা রয়েছে ফাঁকা জায়গাটার প্রায় মাঝখানে, কালো রঙের গা, প্রায় দু' হাত লম্বা, খুব আস্তে-আস্তে সেটা পাথরটার দিকেই এগোচ্ছে আর এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে মাটিতে কী যেন খুঁজছে।

সন্তু প্রায় কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কাকাবাবু, মারো! ওটাকে মারো!"

কাকাবাবু যেন সন্তুকে ভয় পাওয়াবার জন্যই মজা করে বললেন, "আর একটু কাছে আসতে দে না!"

সন্তু বলল, "যদি সড়াৎ করে দৌড়ে চলে আসে!"

কাকাবাবু বললেন, "সাপকে কখনও দৌড়তে দেখেছিস? আমি তো দেখিনি!"

সন্তু বলল, "লাফিয়ে উঠতে পারে! পারে না?"

কাকাবাবু বললেন, "তা পারে। কিন্তু সাপটা এখন হাই জাম্প দেওয়ার মেজাজে আছে বলে তো মনে হচ্ছে না! ও বোধ হয় আমাদের দেখতেই পায়নি!"

সন্তু বলল, "ওই যে, ওই যে মাথা তুলছে!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, বিষাক্ত সাপই বটে। বেশ বড় ফণা। তবে সাপ দেখলেই যে সেটাকে মেরে ফেলতে হবে তার কোনও মানে নেই। ও

বেচারারা নিরীহ প্রাণী, সাধারণত মানুষের কোনও ক্ষতি করে না।”

রিভলভারটা তুললেন কাকাবাবু। সাপটার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, “আগে সাপ দেখলেই আমার খুব ঘেন্না করত। পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে কম সাপ তো দেখিনি! যখন বয়েস কম ছিল, তখন সাপ দেখলেই মেরে ফেলতাম। এখন একটু মায়া-দয়া বেড়ে গেছে রে! এখন মনে হয়, ও যদি আমাদের ক্ষতি না করে তা হলে শুধু-শুধু মেরে কী হবে!”

সন্তু বলল, “আমরা ওইদিকে যাব কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “তুই একটু নাচতে পারবি?”

সন্তু কোনও উত্তর দিল না বলে কাকাবাবু হেসে বললেন, “সাপ তাড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায়টা জানিস না বুঝি? যখন দেরাদুনে থাকতাম, তখন আমাদের ওখানকার বাড়ির বাগানে প্রায়ই সাপ আসত। আমার এক সহকর্মী আমার সঙ্গে থাকতেন, তাঁর নাম ফজলে রব্বি। সেই রব্বিসাহেব রোজ ভোরবেলা বাগানের ফুল গাছগুলোতে জল দিতে যেতেন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে। হাতে জলের ঝারি নিয়ে তিনি নেচে-নেচে গান গাইতেন। সেইজন্যই...”

সন্তু কাকাবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, “রিভলভারটা আমায় দাও, আমি গুলি করব!”

কাকাবাবু বললেন, “আগে নাচ শুরু কর না! দ্যাখ তাতে কী ফল হয়। আমি গান গাইছি, তুই নাচবি! এক দুই তিন! ‘মম চিত্তে নিতি নিত্যে কে গো নাচে, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ!”

সন্তু বাধ্য হয়ে ধুপধাপ করে নাচ শুরু করতেই সাপটা ফণা মেলে অনেকখানি সোজা হয়ে উঠল। কাকাবাবুর থেকে তার দূরত্ব বড়জোর দশ-বারো হাত। সে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে দেখল, চিড়িক-চিড়িক করে দু'বার বেরিয়ে এল তার জিভ।

সন্তুর বুকখানা ভয়ে হিম হয়ে গেছে। সে এবার পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন, “থামলি কেন! বেশ তো হচ্ছে। আরও জোরে নাচ, আরও জোরে!”

কাকাবাবু গানটাও জোরে-জোরে গাইতে লাগলেন।

সাপটা এবার ফণাটা নামিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে উলটোদিকে চলে যেতে লাগল সরসর করে। স্পষ্ট বোঝা গেল সেটা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে।

কাকাবাবু উল্লাসের সঙ্গে বললেন, “দেখলি, নাচ আর গান দিয়ে কীরকম সাপকে জব্দ করা যায়? রব্বিসাহেব ঘুঙুর পরে নেচে-নেচে সাপ তাড়াতেন। তাঁর কাছে আমি এটা শিখেছি!”

সন্তু বলল, “আমি জানি, সাপ কানে শুনতে পায় না। মাটিতে পায়ের আওয়াজ করলে সেই ভাইব্রেশন ওরা টের পায়। কিন্তু টের পেলেই কি পালায়? অনেক সময় মানুষকে তো কামড়ে দেয়!”

কাকাবাবু বললেন, "সে একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়লে কিংবা ওদের গায়ে পা লাগলে ওরা ভয়ের চোট কামড়ে দেয়। নিজে থেকে তেড়ে গিয়ে কামড়ায় না।"

সাপটা ঘাসের মধ্যে মিশে গেলেও একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে সন্তুদের ঠিক উলটোদিকে।

সন্তু অসন্তুষ্টভাবে বলল, "তুমি ওটাকে মারলে না। ওটা তো আশপাশেই রয়ে যাবে। সন্ধের পর যদি ওর গায়ে পা লেগে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "ওটাকে মারলেই তো পৃথিবীর সব সাপ শেষ হয়ে যাবে না। এখানেও নিশ্চয়ই আরও আছে। আমাদের একটু সাবধানে পা ফেলতে হবে সন্ধের পর।"

আকাশে জ্বলজ্বল করছে সূর্য। এরই মধ্যে পশ্চিমদিক থেকে একখণ্ড মেঘ ভাসতে-ভাসতে আসছে। এখানে মেঘ অনেক নিচু দিয়ে আসে। একখানা মেঘের তলায় আর-একটা মেঘ স্পষ্ট দেখা যায়।

এই মেঘটা সূর্যকে ঢেকে দিতেই গরম অনেক কমে গেল। হাওয়া বইতে লাগল ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। একটু আগে রীতিমতন গরম ছিল, রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, আবার একটু পরেই শীতে কাঁপুনি ধরলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কাকাবাবু রিভলভারটা পকেটে ভরে মাথা থেকে টুপিটা খুললেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, "বৃষ্টি হবে নাকি রে?"

সন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আসুক বৃষ্টি। একটু না হয় ভেজা যাবে। ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ সন্তু, যেখানে সাপটা ছিল, সেখানে কতগুলো পাখি এসে বসল। প্রকৃতির এই এক মজা! একটু আগে যেখানে ছিল বিষাক্ত সাপ, এখন সেখানে কতকগুলো সুন্দর পাখি! ওগুলো কী পাখি বল তো?"

সন্তু সেগুলোর দিকে একপলক তাকিয়েই বলল, "চড়াই পাখি!"

কাকাবাবু বললেন, "তুই একদম পাখি চিনিস না। চড়াই পাখি অত ছোট হয় নাকি?"

সন্তু বলল, "বাচ্চা চড়াই ছোট হবে না? ওগুলো বাচ্চা!"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের গায়ের রংও আলাদা। ওগুলো হচ্ছে মুনিয়া। এইসব পাহাড়ি জঙ্গলে অনেক মুনিয়া পাখির ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায়।"

তারপর একটু হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, "কিংবা, তুই কি বলতে চাস, কেউ চড়াই পাখির বাচ্চাদের গায়ে রং করে ছেড়ে দিয়েছে?"

সন্তু প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। এই জঙ্গলে কে আবার চড়াই পাখির বাচ্চা ধরে-ধরে রং করবে? সন্তু সেরকম কথা ভাবতে যাবেই বা কেন?

কাকাবাবু বললেন, "এই নিয়ে একটা গল্প আছে। মুনিয়া অনেকরকম হয়। এক জাতের মুনিয়াকে বলে ক্যানারি। তারা সুন্দর শিস দেয়, গানের মতন

শোনায়। অনেকটা দোয়েল পাখির মতন। সাহেব-মেমরা খুব ক্যানারি পাখি পোষে। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে, যখন ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা জাহাজেই বেশি যাতায়াত করত, প্লেনের চল হয়নি, তখন অনেক সুন্দর বন্দরে এই ক্যানারি পাখি পাওয়া যেত। বন্দরের ঘাটে জাহাজ লাগলে স্থানীয় লোকেরা নৌকো করে এসে নানারকম জিনিস বিক্রি করত, তার মধ্যে ক্যানারি পাখিও থাকত। এডেন বন্দরে খুব ক্যানারি পাখি পাওয়া যেত।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এডেন, না আডেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবারে, আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে কিছু ভুল বলবার উপায় নেই। তোরা অনেক কিছু জানিস। হ্যাঁ, আসল উচ্চারণটা আডেন ঠিকই, বাংলায় আমরা বরাবর এডেনই বলেছি। তুই ক্যানারির গল্পটা জানিস নাকি ?"

সন্তু বলল, "না। সেটা বলো !"

কাকাবাবু বললেন, "সেই বন্দরে ক্যানারি পাখির খুব ডিমান্ড ছিল। সব বিক্রি হয়ে যেত। সেইজন্য ভেজালও চলত খুব। কেউ-কেউ চড়াই পাখির বাচ্চার গায়ে রং করে ক্যানারি পাখি বলে চালিয়ে দিত। একবার একজন লোক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে খুব দরাদরি করে খাঁচাসুদ্ধু একটা ক্যানারি পাখি কিনল। দাম ঠিক হল এক পাউন্ড। নৌকো থেকে খাঁচাটা তুলে দেওয়া হল জাহাজে। আর সাহেবটি একটা পাউন্ডের কয়েন ছুঁড়ে দিল দোকানির হাতে। তারপর জাহাজ যখন ছেড়ে দিল, সাহেব-খদ্দেরটি দোকানিকে আর ধরতে পারবে না, তখন দোকানি চেঁচিয়ে বলল, 'ও মিস্টার, দ্যাট ক্যানারি উইল নেভার সিংগ।' সাহেব খদ্দেরটিও চোখ টিপে বলল, "অ্যান্ড দ্যাট কয়েন উইল নেভার রিং !"

সন্তু হাসতে-হাসতে বলল, "খাঁচাটাই লাভ হল। নকল টাকা দিয়েছে !"

কাকাবাবু বললেন, "জাহাজে যাওয়ার সময় এইরকম অনেক মজা হত। আমিও একবার গিয়েছিলাম।"

উঠে দাঁড়িয়ে, দু' হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে কাকাবাবু বললেন, "এখানে এসে এ পর্যন্ত বেশ কয়েক ঝাঁক টিয়া, দু'রকম বুলবুলি, শালিক, কাঠঠোকরা আর ময়না দেখেছি। খুব বড় পাখি তো চোখে পড়েনি একটাও !"

সন্তু বলল, "যে পাখিগুলোর গায়ে অনেকরকম রং, ওগুলো কী পাখি ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওইগুলোই তো কাঠঠোকরা। সরু ঠোঁট। ওরা গাছের গায়ে গর্ত করে। কাঠঠোকরা আর মাছরাঙা পাখি খুব রংচঙে হয়।"

সন্তু বলল, "কাকও দেখতে পাইনি !"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গলে সাধারণত কাক দেখা যায় না। কাক থাকে মানুষের কাছাকাছি। শহরে বা গ্রামে। কিন্তু হাঁস-টাঁসের মতন বড় পাখি তো দেখলাম না একটাও। তা হলে ওই পাখিগুলো আসে কোথা থেকে ?"

সন্তু বলল, "কী জানি !"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে বললেন, "চল, জঙ্গলের মধ্যে আর একটুখানি ঘুরে দেখি। যদি বড় পাখির সন্ধান পাওয়া যায়।"

এমন সময় ফাঁকা জায়গাটার অন্য প্রান্তে একটা লোককে দেখা গেল। সেই লোকটি আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছে।

সন্তু লোকটিকে দেখেই চেঁচিয়ে বলল, "সাবধান ! সাবধান ! ওইদিকে একটা সাপ আছে !"

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু খুব একটা চমকে উঠল না। সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই নাকি ? সাপ ? কোথায় ?"

সন্তু বলল, "এই ঘাসের মধ্যে আছে। আমরা একটু আগেই দেখেছি। ওইদিকেই গেছে।"

লোকটি মুখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। তারপর কোমর বেঁকিয়ে ঝুঁকে, সাবধানে পা ফেলে-ফেলে সাপটাকে খুঁজতে লাগল।

সন্তু বলল, "বাবাঃ ! লোকটার কী সাহস !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সাহস আছে ঠিকই। কিন্তু লোকটার পায়ের দিকে দ্যাখ, হাঁটু পর্যন্ত তোলা গামবুট পরে আছে। সাপ সাধারণত পায়েই কামড়ায়, ওকে কিছু করতে পারবে না !"

লোকটি কিছুক্ষণ সাপটাকে খুঁজল, কিন্তু পেল না। সেটা নিশ্চয়ই কোনও গর্তে ঢুকে পড়েছে।

এবার সে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে সন্তুদের কাছে এসে বলল, "আপনারা সাপটাকে ভাল করে দেখেছিলেন ? বিষাক্ত সাপ ছিল ? আপনারা সাপ চেনেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বিষাক্ত সাপ। অনেকটা ফণা তুলেছিল।"

লোকটি বলল, "ইস্ ! খুব মিস্ হয়ে গেল। আর একটু আগে এলে..."

কথা থামিয়ে সে হাত জোড় করে নমস্কার করল। তারপর কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিশ্চয়ই রাজা রায়চৌধুরী ? আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম। আপনি সার্কিট হাউসে এসে উঠেছেন শুনলাম।"

কাকাবাবুও প্রতি-নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে তো চিনতে পারলাম না ?"

লোকটি বলল, "চিনবেন্ কী করে ? আমার সঙ্গে তো আপনাদের আগে আলাপ হয়নি। আমার নাম পীতাম্বর পাহাড়ী। হ্যাঁ, সত্যিই আমার পদবি পাহাড়ী। আমার বাড়ি মেদিনীপুর, সেখানে কোনও পাহাড় নেই অবশ্য, তবু আমরা পাহাড়ী। এই নামের জন্যই বোধহয় এখন আমাকে পাহাড়ে-পাহাড়ে কাটাতে হয়। আমি এখন এখানেই থাকি। সাপ ধরার ব্যবসা করি।"

সন্তু বলল, "সাপ ধরা ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ। সাপ ধরে-ধরে বিষ বের করি। সেই বিষ ভাল দামে বিক্রি হয়। ওষুধ তৈরির কাজে লাগে। কথায় আছে না, 'বিষে বিষক্ষয়!' বিষ দিয়েও ওষুধ তৈরি হয়।"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিজে সাপ ধরেন? কী করে ধরেন? খালি হাতে?"

লোকটি বলল, "আমার একটা লম্বা লোহার চিমটে আছে। সেটা দিয়ে ধরা খুব সোজা। খালি হাতেও ধরতে শিখে গেছি। মাথার পেছনদিকটা খপ করে চেপে ধরলে সাপ তো আর কিছু করতে পারে না। মাগুর মাছের মতন!"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, খালি হাতে সাপ ধরা! আপনি তো সত্যিই খুব সাহসী লোক মশাই!"

লোকটি বলল, "প্র্যাকটিস! প্র্যাকটিস!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমার কাছে যাচ্ছিলেন কেন, পীতাম্বরবাবু?"

এমন সময় ঝাঁ করে বৃষ্টি এসে গেল। বেশ বড়-বড় ফোঁটা। সবাই মিলে সরে গিয়ে দাঁড়াল একটা বড় গাছতলায়।

লোকটি বলল, "আমাকে বাবুটাবু বলবেন না। পীতাম্বর নামটাও আমার পছন্দ নয়। আমাকে শুধু অম্বর বলে ডাকবেন। আমি এখন সাপ ধরে বেড়াই বটে কিন্তু একসময় তো কলেজে-টলেজে পড়েছি। শহরেও থেকেছি। তখন আপনার নাম শুনেছি। আপনার সম্পর্কে কাগজে লেখায় পড়েছি। এই ছেলেটি নিশ্চয়ই সন্তু?"

সন্তু দু' হাত তুলে নমস্কার করল।

অম্বর সন্তুর দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, "এই রে, তোমাকে ধরেছে!"

সন্তু আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ? কী ধরেছে?"

অম্বর বলল, "যা ধরবার তাই ধরেছে! এইরকম পোশাকে কি কেউ আসামের জঙ্গলে আসে? তাও এই বর্ষাকালে!"

সন্তু ভয়ে-ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

সন্তু পরে আছে একটা নীল রঙের ফুলপ্যান্ট আর একটা হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট। পায়ে চটি। কাকাবাবু সব সময় ফুলহাতা শার্ট গায়ে দেন, পায়ে মোজা আর শু। কাকাবাবুর একটা পায়ের পাঞ্জা ভাঙা আর বিকৃত বলে তাঁর জন্য অর্ডার দিয়ে বিশেষ ধরনের জুতো বানাতে হয়।

অম্বর বলল, "পায়ে ফুলমোজা আর গামবুট পরে আসা উচিত। তুমি যে একটা পা মাঝে-মাঝে নাড়ছ, তাতেই বুঝতে পেরেছি। প্রথম-প্রথম সুড়সুড়ির মতন লাগে।"

অম্বর বসে পড়ে সন্তুর ডান পায়ের প্যান্ট অনেকখানি তুলে ফেলল। হাঁটুর

নীচে এক জায়গায় গুঁটলি মতন হয়ে আছে।

কাকাবাবু অস্ফুট গলায় বললেন, "জোঁক !"

অম্বর বলল, "সাপের হাত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু এখানে জোঁক ধরবেই ! পা বেয়ে তো ওঠেই, অনেক সময় গাছের ওপর থেকেও টুপ-টুপ করে খসে পড়ে !"

সন্তু নিচু হয়ে জোঁকটাকে টেনে তুলতে গেল, কিন্তু সেটা ইলাস্টিকের মতন লম্বা হয়ে গেল, ছাড়ানো গেল না। অম্বর বলল, "অত সহজ নয়। এখন তো দেখছ এইটুকু, তোমার রক্ত খেয়ে-দেয়ে ফুলে অ্যাত্ত বড় হয়ে যাবে !"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। শিগ্‌গির ডাকবাংলোয় চলো !"

অম্বর বলল, "ব্যস্ত হবেন না, আমার কাছে ওষুধ আছে। সব সময় সঙ্গে রাখি।"

পকেট থেকে সে একটা ছোট প্লাস্টিকের কৌটো বের করল। সেটা থেকে দু' আঙুলে খানিকটা সাদা জিনিস তুলে নিয়ে বলল, "এটা কী বলুন তো ? স্রেফ নুন। আমরা যে নুন খাই, সেই নুন। 'জোঁকের মাথায় নুন' বলে একটা কথা আছে জানেন তো ? এবার দেখুন, তাতে কী হয় !"

সে খানিকটা নুন ছিটিয়ে দিল জোঁকটার গায়ে। অমনি সেটা ছটফটিয়ে টুপ করে খসে পড়ে গেল। তারপর কিলবিল করতে লাগল মাটিতে পড়ে।

সন্তু সেটা থেঁতলে দিতে গেল চটি দিয়ে।

অম্বর বলল, "ওরকমভাবে জোঁক মারা যায় না। ওদের গা রবারের মতন। একমাত্র নুনেই জব্দ। নুন ওদের চামড়ার মধ্যে ঢুকে যায়। সন্তু ঘেন্নায় মুখখানা কুঁচকে বলল, "অদ্ভুত প্রাণী। মানুষের রক্ত খেয়ে বাঁচে !"

অম্বর বলল, "ওরা বাঘেরও রক্ত খায়। একসঙ্গে অনেকগুলো জোঁক লাগলে বাঘও কাবু হয়ে যায় !"

কাকাবাবু নিজের বুকের কাছে জামাটা ঘষতে-ঘষতে বললেন, "আমার আবার এখানটায় কী হল ? হঠাৎ চুলকোচ্ছে। আমারও জোঁক লাগল নাকি ?"

টপটপ করে জামার বোতামগুলো খুলে ফেললেন কাকাবাবু। গেঞ্জির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা পোকা বের করে আনলেন। বাচ্চা আরশোলার সাইজের।

অম্বর সেটা দেখে বলল, "এটা এমন কিছু খারাপ পোকা নয়। আর একরকম আছে। গায়ে একটু লাগলেই ঘা হয়ে যায়।

সন্তু বলল, "বাবারে বাবাঃ ! সাপ, জোঁক, বিষাক্ত পোকা, আরও কী-কী আছে এ জঙ্গলে ? বাঘ, হাতি, গণ্ডার ?"

অম্বর বলল, "বাঘ বিশেষ দেখা যায় না, তবে লেপার্ড আছে। সেগুলো এমন কিছু ভয়ের নয়। বরং ওরাই মানুষ দেখলে ভয় পায়। মাঝে-মাঝে একরকম ভাল্লুক এসে পড়ে, সেগুলো বড্ড হিংস্র। একদিন আমি গভীর

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটা ভাল্লুকের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। ঝোপের সঙ্গে মিশে থাকলে হঠাৎ ওদের দেখাই যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তারপর আপনি কী করলেন ? আপনার কাছে বন্দুক ছিল ?"

অম্বর বলল, "না। আমি বন্দুক কোথায় পাব ? হাতে শুধু একটা সাপ ধরার চিমটে। তা দিয়ে তো আর ভাল্লুকটার সঙ্গে লড়া যায় না ? ওরা প্রথমেই এক থাবা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন আমি কী করলাম জানো ? আমি হাসতে শুরু করলাম। এটা আমার ছোটবেলা থেকে স্বভাব, ভয় পেলেই কান্নার বদলে মুখ দিয়ে হাসি বেরিয়ে আসে। যত বেশি ভয় পাই, তত বেশি জোরে হি-হি করে হাসি। কীরকম শুনবে ? হি-হি-হি-হি !"

অম্বর সত্যিই ভয় পাওয়ার মতন মুখখানা কুঁচকে, প্রচণ্ড জোরে, বন কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

তাই শুনে কাকাবাবু আর সন্তুর ঠোঁটেও হাসি খেলে গেল।

অম্বর বলল, "আমার সেই হাসি শুনে ভাল্লুক বাবাজি পেছন ফিরে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে চোঁ-চোঁ দৌড়। ভাবল, এ আবার কী অদ্ভুত জন্তু রে বাবা !"

অম্বরের এই কাহিনীটা বানানো গল্প, না সত্যি, তা ঠিক বুঝতে পারল না সন্তু। তবে লোকটিকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। সব কথাই মজার সুরে বলে। মুখখানা দেখলে ভালমানুষ বলে মনে হয়।

অম্বরের লম্বা ধরনের চেহারা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। মাথা ভর্তি চুল। গালে অল্প-অল্প দাড়ি। কথা বলার সময় তার চোখ দুটো কৌতুকে জ্বলজ্বল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এই জঙ্গলে এতসব খারাপ-খারাপ জিনিস রয়েছে, তবু আপনি এখানে একা-একা ঘুরে বেড়ান ?"

অম্বর বলল, "কী করব বলো ? এটাই যে আমার কাজ। টাকাপয়সা রোজগারের জন্য মানুষকে কতরকম কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এখানে একটু ঝুঁকি আছে বটে, তবু তো আমার স্বাধীন ব্যবসা। মাথার ওপর কোনও ওপরওয়ালা নেই। কারুর হুকুম শুনতে হয় না আমাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঙালির ছেলেদের এরকম কোনও কাজ করতে দেখলে আমার আনন্দ হয়। বেশিরভাগই তো সাধারণ একটা চাকরি খোঁজে। কোনওরকমে একটা চাকরি জোটালেই ধন্য মনে করে।"

অম্বর জিজ্ঞেস করল, "আমি না হয় নিজের কাজের জন্য এখানে পড়ে আছি। আপনারা এখানে এসেছেন কেন ? বেড়াতে ? রাজা রায়চৌধুরী তো কোথাও শুধু-শুধু বেড়াতে যাওয়ার লোক নন।"

সন্তু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "অনেকটা বেড়াতেই এসেছি বলা যায়। ৯. আগে আসিনি। তা ছাড়া আর একটা উদ্দেশ্য হল পাখি দেখা।"

অম্বর মুচকি হেসে বলল, "পাখি মানে...জাটিংগা বার্ডস ? বুঝেছি। তা হলে আজ রাত্তিরে আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব !"

যেমন হঠাৎ বৃষ্টি এসেছিল, তেমনই হঠাৎ থেমে গেল। আকাশ একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। ওরা তিনজনে এগোতে লাগল ডাকবাংলোর দিকে।

॥ ২ ॥

ডাকবাংলোটা একটা টিলার ওপরে।

বারান্দায় বসলেই সামনের দিকে পাহাড়ের ঢেউ দেখা যায়। একটার পর একটা পাহাড়, সবই গভীর জঙ্গলে ঢাকা। চতুর্দিকে শুধু সবুজ। মাঝে-মাঝে মেঘ এসে সব কিছু ঢেকে দেয়, একঝাঁক বৃষ্টি হওয়ার পরই আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

পুরনো আমলের বাংলো। মস্ত বড়-বড় ঘর। প্রায় পুরো বাড়িটাকে ঘিরে বিশাল চওড়া বারান্দা।

সন্তু আর কাকাবাবুকে দেওয়া হয়েছে একটা ঘর। আর-একখানা ঘরে রয়েছেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তা ছাড়া আর কোনও লোক নেই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মুখে রবীন্দ্রনাথের মতন দাড়ি, সবই সাদা নয় অবশ্য, কাঁচাপাকা। তিনি বারান্দার এককোণে একটা চেয়ার নিয়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে থাকেন একা-একা। অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করেন না। কাকাবাবুরা দু' দিন আগে এসেছেন। এর মধ্যে বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতে শুধু নমস্কার-বিনিময় হয়েছে, আর কোনও কথা হয়নি।

জঙ্গল থেকে ফিরে কাকাবাবু আর সন্তু বারান্দাতেই বসলেন অম্বরকে নিয়ে। বেয়ারাকে বলা হল চা দিতে। অম্বর অনেক জঙ্গলের গল্প শোনাতে লাগল।

একটু বাদেই বেয়ারা চা নিয়ে এল। এখানকার বেয়ারারা খুব কেতাদুরস্ত। হেলাফেলা করে চা দেয় না। বড় ট্রের ওপর সুন্দর ছবি আঁকা পোর্সিলিনের টি-পট। কাপগুলোও বেশ ভাল দেখতে, কোনওটাই চলটা-ওটা কিংবা কানাভাঙা নয়। একটা প্লেটে আলাদা করে বিস্কুট আর কাজুবাদাম।

বেয়ারাটি জিজ্ঞেস করল, "চা আমি কাপে ঢেলে দেব, সার ?"

অম্বর বলল, "না, আমি ঢেলে দিচ্ছি, তুমি আর-একটু চিনি নিয়ে এসো। আমি চিনি বেশি খাই।"

কাপে চা ঢালতে-ঢালতে অম্বর বারান্দার কোণের বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "উনি ওখানে একা বসে আছেন কেন ?"

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটা ভাল্লুকের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। ঝোপের সঙ্গে মিশে থাকলে হঠাৎ ওদের দেখাই যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তারপর আপনি কী করলেন ? আপনার কাছে বন্দুক ছিল ?"

অম্বর বলল, "না। আমি বন্দুক কোথায় পাব ? হাতে শুধু একটা সাপ ধরার চিমটে। তা দিয়ে তো আর ভাল্লুকটার সঙ্গে লড়া যায় না ? ওরা প্রথমেই এক থাবা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন আমি কী করলাম জানো ? আমি হাসতে শুরু করলাম। এটা আমার ছোটবেলা থেকে স্বভাব, ভয় পেলেই কান্নার বদলে মুখ দিয়ে হাসি বেরিয়ে আসে। যত বেশি ভয় পাই, তত বেশি জোরে হি-হি করে হাসি। কীরকম শুনবে ? হি-হি-হি-হি !"

অম্বর সত্যিই ভয় পাওয়ার মতন মুখখানা কুঁচকে, প্রচণ্ড জোরে, বন কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

তাই শুনে কাকাবাবু আর সন্তুর ঠোঁটেও হাসি খেলে গেল।

অম্বর বলল, "আমার সেই হাসি শুনে ভাল্লুক বাবাজি পেছন ফিরে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে চোঁ-চোঁ দৌড়। ভাবল, এ আবার কী অদ্ভুত জন্তু রে বাবা !"

অম্বরের এই কাহিনীটা বানানো গল্প, না সত্যি, তা ঠিক বুঝতে পারল না সন্তু। তবে লোকটিকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। সব কথাই মজার সুরে বলে। মুখখানা দেখলে ভালমানুষ বলে মনে হয়।

অম্বরের লম্বা ধরনের চেহারা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। মাথা ভর্তি চুল। গালে অল্প-অল্প দাড়ি। কথা বলার সময় তার চোখ দুটো কৌতুকে জ্বলজ্বল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এই জঙ্গলে এতসব খারাপ-খারাপ জিনিস রয়েছে, তবু আপনি এখানে একা-একা ঘুরে বেড়ান ?"

অম্বর বলল, "কী করব বলো ? এটাই যে আমার কাজ। টাকাপয়সা রোজগারের জন্য মানুষকে কতরকম কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এখানে একটু ঝুঁকি আছে বটে, তবু তো আমার স্বাধীন ব্যবসা। মাথার ওপর কোনও ওপরওয়ালা নেই। কারুর হুকুম শুনতে হয় না আমাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঙালির ছেলেদের এরকম কোনও কাজ করতে দেখলে আমার আনন্দ হয়। বেশিরভাগই তো সাধারণ একটা চাকরি খোঁজে। কোনওরকমে একটা চাকরি জোটালেই ধন্য মনে করে।"

অম্বর জিজ্ঞেস করল, "আমি না হয় নিজের কাজের জন্য এখানে পড়ে আছি। আপনারা এখানে এসেছেন কেন ? বেড়াতে ? রাজা রায়চৌধুরী তো কোথাও শুধু-শুধু বেড়াতে যাওয়ার লোক নন।"

সন্তু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "অনেকটা বেড়াতেই এসেছি বলা যায়। আমি এদিকটা আগে আসিনি। তা ছাড়া আর একটা উদ্দেশ্য হল পাখি দেখা।"

অম্বর মুচকি হেসে বলল, "পাখি মানে...জাটিংগা বার্ডস? বুঝেছি। তা হলে আজ রাত্তিরে আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব!"

যেমন হঠাৎ বৃষ্টি এসেছিল, তেমনই হঠাৎ থেমে গেল। আকাশ একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। ওরা তিনজনে এগোতে লাগল ডাকবাংলোর দিকে।

॥ ২ ॥

ডাকবাংলোটা একটা টিলার ওপরে।

বারান্দায় বসলেই সামনের দিকে পাহাড়ের ঢেউ দেখা যায়। একটার পর একটা পাহাড়, সবই গভীর জঙ্গলে ঢাকা। চতুর্দিকে শুধু সবুজ। মাঝে-মাঝে মেঘ এসে সব কিছু ঢেকে দেয়, একঝাঁক বৃষ্টি হওয়ার পরই আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

পুরনো আমলের বাংলো। মস্ত বড়-বড় ঘর। প্রায় পুরো বাড়িটাকে ঘিরে বিশাল চওড়া বারান্দা।

সন্তু আর কাকাবাবুকে দেওয়া হয়েছে একটা ঘর। আর-একখানা ঘরে রয়েছেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তা ছাড়া আর কোনও লোক নেই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মুখে রবীন্দ্রনাথের মতন দাড়ি, সবই সাদা নয় অবশ্য, কাঁচাপাকা। তিনি বারান্দার এককোণে একটা চেয়ার নিয়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে থাকেন একা-একা। অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করেন না। কাকাবাবুরা দু' দিন আগে এসেছেন। এর মধ্যে বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতে শুধু নমস্কার-বিনিময় হয়েছে, আর কোনও কথা হয়নি।

জঙ্গল থেকে ফিরে কাকাবাবু আর সন্তু বারান্দাতেই বসলেন অম্বরকে নিয়ে। বেয়ারাকে বলা হল চা দিতে। অম্বর অনেক জঙ্গলের গল্প শোনাতে লাগল।

একটু বাদেই বেয়ারা চা নিয়ে এল। এখানকার বেয়ারারা খুব কেতাদুরস্ত। হেলাফেলা করে চা দেয় না। বড় ট্রের ওপর সুন্দর ছবি আঁকা পোর্সিলিনের টি-পট। কাপগুলোও বেশ ভাল দেখতে, কোনওটাই চলটা-ওটা কিংবা কানাভাঙা নয়। একটা প্লেটে আলাদা করে বিস্কুট আর কাজুবাদাম।

বেয়ারাটি জিজ্ঞেস করল, "চা আমি কাপে ঢেলে দেব, সার?"

অম্বর বলল, "না, আমি ঢেলে দিচ্ছি, তুমি আর-একটু চিনি নিয়ে এসো। আমি চিনি বেশি খাই।"

কাপে চা ঢালতে-ঢালতে অম্বর বারান্দার কোণের বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "উনি ওখানে একা বসে আছেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো জানি না ! উনি একা থাকতেই ভালবাসেন বোধ হয় ! দু' দিন ধরে এইরকমই তো দেখছি !"

অম্বর বলল, "এইরকম একটা সুন্দর জায়গায় বিকেলবেলা কেউ একা বসে থাকবে, এর কোনও মানে হয় ?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে অম্বর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ডেকে বলল, "নমস্কার সার ! আমার নাম পীতাম্বর পাহাড়ী ! আপনাকে তো চিনলাম না ?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন অম্বরের দিকে। তারপর বেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "আমিও আপনাকে চিনি না। চিনতেই যে হবে, তার কোনও মানে নেই !"

অম্বর একগাল হেসে বলল, "না, কোনও মানে নেই ! আমি এখানে প্রায় বছরখানেক আছি তো। ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে। এখানে যেসব সরকারি অফিসার আসেন, তাঁদেরও আমি চিনি। বর্ষার সময় এখানে কেউ বেড়াতে আসে না। তাই আমি ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি কোনও সরকারি কাজে এসেছেন।"

বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "না, আমি বেড়াতেই এসেছি !"

অম্বর বলল, "ভাল কথা। আসুন না, আলাপ-পরিচয় করা যাক। আপনি আমাদের সঙ্গে চা খাবেন ?"

বৃদ্ধ লোকটি একবার কাকাবাবুদের টেবিলের দিকে তাকালেন। একটু দোনামনা করলেন মনে হল। তারপর বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ ! এক কাপ চা খেলে অবশ্য মন্দ হয় না !"

তিনি উঠে এলেন কাকাবাবুদের টেবিলের দিকে।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধ লোকটির জন্য একটি চেয়ার টেনে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করা হল।"

বৃদ্ধটি চেয়ারে বসে বললেন, "না, না, তা নয়। আপনাদের তো দেখছি দু' দিন ধরে। আসল ব্যাপার কী জানেন, আমি নিজে থেকে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। এইটা আমার দোষ। সারা জীবন যে-চাকরি করেছি, তাতে তো লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার বিশেষ সুযোগ ছিল না। এখন রিটায়ার করেছি বটে, তবু সেই স্বভাবটা রয়ে গেছে।"

বৃদ্ধের হাতে একটা চায়ের কাপ তুলে দিয়ে অম্বর জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী কাজ করতেন ?"

বৃদ্ধটি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে একটা মুগার চাদর; এক হাতে একটা রুপো-বাঁধানো বেতের লাঠি।

চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে বড় একটা চুমুক দিলেন তিনি। তারপর মুখ তুলে বললেন, "আমি হাইকোর্টের জজ ছিলাম।"

অম্বর হি-হি-হি-হি করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু বেশ রাগ-রাগ চোখ করে অম্বরের দিকে তাকালেন। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথার ওপরে হেসে ওঠা অত্যন্ত অসভ্যতা।

অম্বর হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাইকোর্টের জজ হলে বুঝি লোকজনের সঙ্গে মেশা যায় না?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, "না!"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো বটেই। বিচারকদের কত লোককে শাস্তি দিতে হয়। সেই লোকদের সঙ্গে যদি রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যায়, তারা অপমান করতে পারে, মেরেও বসতে পারে।"

বিচারক বললেন, "যতদিন চাকরি করেছি, তখন সব সময় আমার সঙ্গে পুলিশ থাকত। দু' বছর আগে রিটায়ার করেছি। এখন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমার বউ ছেলেমেয়ে কেউ নেই। তাই একা-একা থাকি।"

অম্বর বলল, "এখন আপনি রিটায়ার করেছেন বটে। কিন্তু ধরুন আপনি যাদের শাস্তি দিয়েছেন, জেল খাটিয়েছেন, ভুল করেও তো কেউ-কেউ শাস্তি পায়, সেরকম কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়? সে যদি প্রতিশোধ নিতে চায়?"

বিচারক কোনও উত্তর না দিয়ে অম্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এই সময় একটা জিপ এসে থামল বাংলোর সামনে।

তার থেকে দু'জন লোক নেমে "গুড ইভনিং, গুড ইভনিং" বলতে-বলতে উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে। দু'জনেই সুট পরা, এবং মুখে ইংরেজি বললেও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতজোড় করে আছে।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের চা খাওয়া শেষ। আপনারা চা খাবেন? দিতে বলব?"

লোক দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তাদের একজন বলল, "না, না, দরকার নেই। আমরা এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু অন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। লোক দুটির নাম কুমার সিং আর ভুবন দাস। দু'জনেরই বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।

জজসাহেব নিজের নাম বললেন, "পি কে দত্ত।" উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই কাজের কথা বলবেন। আমি এবার যাই।"

কাকাবাবু যদিও বললেন যে, "না, না, কাজের কথা কিছু নেই", তবু জজসাহেব আর বসলেন না। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে হেঁটে গিয়ে এঁদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, পাহাড়ের দিকে মুখ করে বসলেন।

অম্বর জিজ্ঞেস করল, "আপনারা পাখি দেখতে কখন যাচ্ছেন?"

কুমার সিং বলল, "আর একটু পরেই। সন্ধে নামবার ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে। বৃষ্টি হলে তো কিছু দেখা যাবে না। মেঘ জমছে, বেশি রাত্তিরের দিকে আবার বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।"

অম্বর বলল, "আমার কয়েকটা টর্চের ব্যাটারি কিনতে হবে। আমি একটু বাজারের দিকটা ঘুরে তারপর আপনাদের সঙ্গে ওখানে যোগ দেব। ব্যাপারটা আমারও দেখা হয়নি।"

কথাটা কুমার সিং-এর তেমন পছন্দ হল না। সে বলল, "ওখানে খুব বেশি ভিড় হলে মুশকিল হবে!"

অম্বর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এখানেই থাকি। আমি তো ইচ্ছেমতন যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি, তাই না?"

তারপর সে বলল, "চলি কাকাবাবু! চলি সন্তু, একটু পরে দেখা হবে!"

অম্বর বেরিয়ে যেতেই ভুবন দাস জিজ্ঞেস করল, "লোকটা এখানেই থাকে বলল। আগে তো দেখিনি। কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজই আলাপ হল আমাদের সঙ্গে। ও বলল, ও সাপ ধরার ব্যবসা করে।"

ভুবন দাস বলল, "সাপ ধরার ব্যবসা মানে? সাপুড়ে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না। সাপ ধরে সাপের বিষ বের করে। সেই বিষ বিক্রি হয়।"

কুমার সিং বলল, "সাপের বিষ বের করা সোজা নাকি? সাপুড়েরা ছাড়া অন্য কেউ পারে না। এখানে একটা লোক সাপ ধরে বেড়াচ্ছে, অথচ আমরা সে-খবর আগে শুনিনি, এ কি হতে পারে?"

ভুবন দাস বলল, "আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ও একা-একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, এ-কথা ঠিক। ওর পকেটে সব সময় নুন থাকে।"

কুমার সিং আর ভুবন দাস দু'জনেই বেশ অবাক হয়ে গেল। একজন জিজ্ঞেস করল, "নুন? তার মানে? পকেটে নুন রাখে কেন?"

কাকাবাবু একপলক সন্তুর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর হাসতে শুরু করলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "তার আমি কী জানি! ও নুন রাখে, আমাদের দেখাল।"

ভুবন দাস বলল, "নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলব আছে!"

প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমি একটু তৈরি হয়ে নিই বেরোবার আগে? ওখানে কতক্ষণ লাগবে তা তো জানি না, আমরা কি রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিয়ে যাব, না, ফিরে এসে খাব?"

কুমার সিং বলল, "না, না, আমরা এখানে বারণ করে দিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। আপনাদের জন্য বাইরে এক জায়গায় খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাকে সার একটু কষ্ট করে তখন খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। সবটা গাড়ি যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "সে ঠিক আছে। আজ তো পাহাড়ের অনেকটা নীচে

নেমে গিয়ে জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম। খুব একটা অসুবিধে হয়নি।"

কাকাবাবু নিজের ঘরে চলে গেলেন। কুমার সিং আর ভুবন দাস এবার দুটো সিগারেট ধরাল। ওরা কাকাবাবুকে খুব সমীহ করে। ওঁর সামনে সিগারেট খায় না।

কুমার সিং সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে, মিঃ সন্তু ?"

সন্তু বলল, "খুব ভাল। জায়গাটা দারুণ !"

"খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো এখানে ?"

"অসুবিধে ? বড্ড বেশি-বেশি খাচ্ছি। এখানকার রান্না চমৎকার। আজ দুপুরে মাছ আর মাংস দু'রকম হয়েছিল।"

"আমাদের বলা আছে। যখন যা ইচ্ছে হয় চাইবেন। কোনওরকম লজ্জা করবেন না মিঃ সন্তু। গাড়ির দরকার হলেও খবর দেবেন বেয়ারাকে, গাড়ি এসে যাবে।"

"পাহাড়ে এসে আমার পায়ে হেঁটে ঘুরতেই ভাল লাগে।"

"মিঃ রায়চৌধুরীর তো একটা পা খারাপ, ওঁর কষ্ট হবে।"

এরা সন্তুকে 'আপনি আপনি' বলে আর মিঃ সন্তু বলে ডাকে, এতে সন্তুর একটু হাসি পায়। কিন্তু সে আপত্তি করেনি। এরা প্রথম থেকেই যত্ন করছে খুব।

কুমার সিং-এর মুখে মস্তবড় গোঁফ, কিন্তু দাড়ি নেই। চেহারা দেখলে মনে হয় মিলিটারির লোক। এ শিখ নয়, মাথায় পাগড়ি নেই, বাংলা বলে ভালই, তবে উচ্চারণে কিছুটা টান আছে। ভুবন দাসের ছোটখাটো চেহারা, দেখে বাঙালি বলেই মনে হয়, তবে এরও বাংলা উচ্চারণ একটু অন্যরকম। বোধ হয় অনেকদিন এখানে থাকতে-থাকতে উচ্চারণটা বদলে গেছে।

এরা দু'জনেই এই হাফলঙে কাঠের ব্যবসা করে।

একটু বাদে সন্তুও ঘরে গিয়ে জামা-প্যান্ট বদলে এল। সন্ধের পর বেশ শীত পড়ে, গরম জামা সঙ্গে রাখা দরকার।

প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, তবে এখনও পুরোপুরি অন্ধকার নামেনি।

কাকাবাবু একটা ওভারকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যেতে হবে। শীতের মধ্যে আমার বারবার চা-তেষ্টা পায়।"

বেয়ারাকে বলা হল চা বানিয়ে দিতে।

ততক্ষণ ওরা বাংলোর সামনের বাগানে এসে দাঁড়াল। আকাশের একদিকে বেশ জমাট মেঘ। শেষ সূর্যের আলোতে সামনের একটা পাহাড়ের চূড়া একেবারে লাল হয়ে আছে।

কাকাবাবু কুমার সিং-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তো কাঠের ব্যবসা করেন, এজন্য কি আপনাদের জঙ্গলে যেতে হয় ? নাকি অন্য লোকজন যায়, আপনারা শহরে বসে ব্যবসাটা চালান।"

কুমার সিং বলল, "না, না, আমাদের দু'জনকেই রেগুলার জঙ্গলে যেতে হয়। গাছ চিনিয়ে দিতে হয়। অনেক সময় রাত্তিরেও জঙ্গলে থেকে যাই।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথায় থাকেন ? জঙ্গলের মধ্যে আপনাদের ঘরটর করা আছে ?"

কুমার সিং বলল, "না, সেরকম কিছু নেই। গাড়িতেই শুয়ে থাকি। ট্রাকের ওপর বিছানা পেতে দিব্যি ঘুমনো যায়।"

সন্তু বলল, "বাঃ, বেশ তো ! আমারও ইচ্ছে করে ওইরকমভাবে জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাতে।"

কুমার সিং বলল, "এখানে বেশ কিছুদিন থাকুন। একদিন নিয়ে যাব আমাদের সঙ্গে, মিঃ সন্তু। তবে জঙ্গলে কিন্তু মাঝে-মাঝে বাঘ আসে, ভয় পাবেন না তো ?"

সন্তু বলল, "আপনারা দেখেছেন বাঘ ?"

কুমার সিং বলল, "অনেকবার। আমাদের সঙ্গে অবশ্য বন্দুক থাকে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাঘ, মানে লেপার্ড ?"

কুমার সিং বলল, "না, না, লেপার্ডের মতন ছোট জানোয়ার নয়, আসল বাঘ। টাইগার। এখানকার জঙ্গলে অনেক টাইগার আছে। আপনারা আজ দুপুরবেলা খালি হাতে জঙ্গলে গিয়ে ভাল করেননি।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলে ভাল্লুক-টাল্লুকও আছে নাকি ?"

কুমার সিং বলল, "ভাল্লুক ? না, না, এদিকে ভাল্লুক দেখতে পাওয়া যায় না। ভাল্লুক খুব আছে অরুণাচলের জঙ্গলে। এখানে নেই।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

জজসাহেব এখনও ঠায় বসে আছেন বারান্দার একটা চেয়ারে। একটুও নড়ছেন না। ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন।

কাকাবাবু কুমার সিং-কে বললেন, "বিচারকমশাইকে ডাকব নাকি আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ?"

ভুবন দাস বলল, "থাক না, কী দরকার। বেশি ভিড় বাড়লে হয়তো কিছুই দেখা যাবে না।"

সন্তু বলল, "উনি কোথাও যেতে চান বলেও তো মনে হয় না।"

এর মধ্যে চা এসে গেল, সবাই উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাংলোটা টিলার ওপর। এখান থেকে যেতে হবে জাটিংগা, নেমে যেতে হবে নীচের দিকে। বর্ষার জন্য রাস্তা তেমন ভাল নয়। জিপটা লাফাচ্ছে অনবরত। অন্ধকারও নেমে এসেছে।

পাহাড় ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগল গাড়ি। এক সময় আসল রাস্তাটা ছেড়ে একটা সরু রাস্তা ধরল। সে রাস্তাটাও ঢালু, তাই জিপের স্টার্ট বন্ধ করে দেওয়া

হলেও গড়িয়ে-গড়িয়ে নামতে লাগল, শুধু জ্বালা রইল হেড লাইট।

কুমার সিং ফিসফিস করে বলল, "যাতে গাড়ির আওয়াজ না হয় সেইজন্য স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছি। এর পর সার, কেউ আর জোরে-জোরে কথা বলবেন না!"

একটা ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা গেল তখুনি। হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল সামনে-সামনে একটা সাইকেল যাচ্ছে। তাতে বসে আছে পীতাম্বর পাহাড়ী।

জিপটাকে জায়গা দেওয়ার জন্য সাইকেলটা থামল। তারপর অম্বর হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, "এই যে, কাকাবাবু, সন্তু, আমি এসে গেছি!"

কুমার সিং বলল, "এই রে, লোকটা খুব জ্বালাবে দেখছি!"

আর একটু যাওয়ার পর জিপটাকে থামিয়ে দেওয়া হল একটা গাছের নীচে। ভুবন দাস নিজে আগে নেমে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, সাবধানে নামবেন। এই জায়গাটা এবড়ো-খেবড়ো, আমার হাত ধরুন।"

কাকাবাবু একটা টর্চ জ্বেলে বললেন, "না, ঠিক আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।"

ভুবন দাস বলল, "আপনাকে তো দু' হাতে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হবে, আমি আলো দেখাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসুন।"

খুব যত্ন করে সে কাকাবাবুকে জিপ থেকে নামিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

মিনিট-পাঁচেক হাঁটার পর ওরা পৌঁছল একটা সমতল জায়গায়। চারপাশে গাছপালা থাকলেও মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা। সেখানে কেউ একটা মশাল জ্বেলে মাটিতে পুঁতে রেখেছে। মনে হয়, কেরোসিন তেলে ডোবানো কাঠ ও ন্যাকড়া-ট্যাকড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে মশালটা, বেশ জোর আলো, ধোঁয়াও বেরোচ্ছে গল-গল করে।

মশালটাকে ঠিক মাঝখানে রেখে, বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে দু' দিকে মাটির ওপর বসে আছে তিন-চারজন মানুষ। তাদের মধ্যে একজন সাহেব।

কাকাবাবু এক জায়গায় বসে পড়লেন। কাছেই সাহেবটি। তার বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি না, মাথার চুল লালচে রঙের। এখন বাতাসে বেশ শীত-শীত ভাব, তবু সে একটা পাতলা গেঞ্জি ও জিন্‌স-এর প্যান্ট পরে আছে।

কাকাবাবুকে দেখে সে হাতজোড় করে নমস্কার করল, তারপর ইংরেজিতে বলল, "আমার নাম কার্ল জরগেন, আমি হাইডেলবার্গ শহর থেকে আসছি।"

কাকাবাবু হাসিমুখে ছেলেটির মুখের দিকে তাকালেন। ছেলেটির চোখের রং নীল। মুখখানা শান্ত ধরনের। সে জাতে জার্মান, বেশ রোগা-পাতলা চেহারা। চোখের দৃষ্টিতে খানিকটা লাজুক-লাজুক ভাব।

কাকাবাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সেই অতদূর জার্মানি থেকে এসেছ? এই জায়গাটার নাম তো বাইরের বেশি লোক জানে না। তুমি

কী করে জানলে যে, এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে ?”

কার্ল আস্তে-আস্তে বলল, “এই জাটিংগার পাখিদের কথা আমি প্রথম পড়ি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায়। তারপর আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাতেও কিছু খবর বেরিয়েছে। পাখিদের জীবনযাত্রা ও ব্যবহার সম্পর্কে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে। এটাই আমার গবেষণার বিষয়। সেইজন্যই আমি এখানে সত্যিই কী ঘটে তা দেখতে এসেছি।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি তা হলে একজন অরনিথোলজিস্ট ? এখানে উঠেছ কোথায় ?”

কার্ল বলল, “রেলস্টেশনের পাশে একটা হোটেলে। আটদিন ধরে আমি এখানে আছি।”

কুমার সিং বলল, “স্টেশনের কাছে তো কোনও হোটেল নেই! মানে, ছোটখাটো আছে বোধ হয়, কিন্তু বিদেশিদের থাকার মতন...”

কাকাবাবু বললেন, “এরা অনেক কষ্ট করেও থাকতে পারে। আচ্ছা কার্ল, তোমার মুখ থেকেই শুনি, তুমি এখানে কী দেখেছ এ পর্যন্ত ? আমরা পরশু এসে পৌঁছেছি, কিন্তু সেদিন খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই এখানে আর আসিনি। কাল সন্ধে থেকেই বৃষ্টি পড়ল, এরা সবাই বলল, বৃষ্টির দিনে কিছু দেখা যায় না। তুমি কি একদিনও কিছু দেখেছ ?”

কার্ল বলল, “আমি এখানে প্রত্যেকদিন এসে বসে থাকি। বৃষ্টি না থাকলেও এক-একদিন কিছুই ঘটে না। শুধু একদিনই সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখেছিলাম !”

কাকাবাবু বললেন, “কী সেই আশ্চর্য ব্যাপার ?”

কার্ল হেসে বলল, “আজ বৃষ্টি নেই। একটু পরে হয়তো আপনি নিজেই সেটা দেখতে পাবেন।”

মশালটা এখনও দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আর-একজন কে যেন একটু দূরে আর-একটা মশাল পুঁতে দিল। কাকাবাবুরা বসে আছেন সেই মশাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে, অন্ধকারে তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। কাকাবাবু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে চুমুক দিতে লাগলেন।

কথা বলছে না কেউ। কেটে গেল পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট।

অম্বর হঠাৎ বলে উঠল, “এ যে দেখছি ধৈর্যের পরীক্ষা !”

কুমার সিং বলল, “চুপ, চুপ !”

অম্বর তাকে গ্রাহ্য না করে বলল, “আকাশে কোনও পাখি দেখা যাচ্ছে না। কাছাকাছি কোনও বড় গাছও নেই।”

কাকাবাবু তার দিকে চেয়ে শুধু দু' বার মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তিনিও এখন কোনও কথা বলতে চান না।

অম্বর চুপ করে থাকার পাত্র নয়। সে এবার সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "রাত্তিরে কি কোনও পাখি ওড়ে ?"

সন্তু ফিসফিস করে বলল, "প্যাঁচা, বাদুড়, বুনো হাঁস।"

ঠিক তক্ষুনি ঝটাপট-ঝটাপট ও ধপাস করে শব্দ হল।

কোনও মশালের ঠিক ওপরে নয়, একটু দূরে একটা পাখি এসে পড়েছে ! ছোটখাটো পাখি নয়, প্রায় হাঁসের মতন। পাখিটা পড়েছিল মুখ থুবড়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

কিন্তু পাখিটাকে ভাল করে দেখার আগেই পেছনের অন্ধকার থেকে দু-তিনজন লোক ছুটে এল। তাদের হাতে লাঠি। তাদের একজন পাখিটাকে জাপটে ধরেই আবার দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

কার্ল দারুণ বিরক্তভাবে বলল, "ওঃ গড ! আবার সেই ব্যাপার !"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কী হল ? ওই লোকগুলো এল কোথা থেকে ?"

কার্ল বলল, "এই লোকগুলো লুকিয়ে থাকে। আমাদের ভাল করে দেখতেই দেয় না। ওরা পাখিগুলো ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে মাংস খায়। মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এটা আটকাতে পারেন না ?"

কাকাবাবু তাকালেন কুমার সিং-এর দিকে।

কুমার সিং বলল, "গ্রামের লোকদের আমরা আটকাব কী করে ? পাখি তো কারও সম্পত্তি নয়। যে আগে ধরতে পারবে তার !"

কার্ল বলল, "আগুনের কাছাকাছি এসে পাখিগুলো কী করে সেটা আমি দেখতে চাই। এরা কিছুতেই দেখতে দেবে না !"

অম্বর বলল, "সত্যিই তা হলে পাখি পড়ে এখানে ? আমি আগে বিশ্বাস করিনি। এখানকার লোকেরা পাখি শিকার করে খায়। ওরা ছাড়বে কেন ?"

আবার একটা পাখি এসে পড়ল। এবার প্রায় মশালের ওপরে। কিন্তু পাখিটা কঁক করে একটা শব্দ করে আগুন থেকে দূরে সরে গেল। একবার লাফাবার চেষ্টা করেও পারল না।

এবারও অন্ধকার থেকে ছুটে এল কয়েকটা লোক। একজন পাখিটাকে ধবরার আগেই অন্য একজন পাখিটার গায়ে একটা লাঠির ঘা মেরে কী যেন বলে উঠল চেঁচিয়ে। অর্থাৎ, সে পাখিটাকে আগে ছুঁয়ে দিয়েছে। এটার ওপর তারই অধিকার।

কার্ল আবার বলে উঠল, আমাদের দেশ হলে এই লোকগুলোকে পুলিশ দিয়ে আটকে রাখা যেত। এরা পাখিগুলোকে ধরে-ধরে খেয়ে ফেললে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হবে কী করে ?

অম্বর বলল, "আমারই তো একটা ধরতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে, এই পাখির মাংস বেশ টেস্টফুল হবে !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অন্য সময় এই ধরনের পাখি এখানে দেখতে পাওয়া যায় না ?"

অম্বর বলল, "না, আমি দেখিনি।"

কার্ল বলল, "পাখিগুলো কোথা থেকে আসে, তা কেউ বলতে পারে না। রাত্রে মশাল জ্বাললে এখানে এসে ধপ-ধপ করে পড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "এরা আগুন দেখে আত্মহত্যা করতে আসে ?"

কার্ল বলল, "আগুন দেখলে অনেক পোকা আসে। কিন্তু পাখিরা মরতে আসে, এমন শোনা যায়নি। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, শুধু এই জায়গাটাতে আগুন জ্বাললেই পাখিগুলো আসে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে গিয়ে আগুন জ্বালুন, একটাও পাখি পড়বে না !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক এক জায়গাটাতেই আলো দেখে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, নাকি ?"

কার্ল বলল, "শুধু এই জায়গার আলো ওদের চোখ ধাঁধাবে কেন ? অন্য জায়গায় আলো জ্বললে তো ওদের কোনও অসুবিধে হয় না। ছোটখাটো পাখিও নয়, বড় পাখি, অনেকটা উঁচু দিয়ে উড়তে পারে, ওরা ইচ্ছে করে আগুনের কাছে আসবে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রকৃতির মধ্যে যে কতরকম বিস্ময়ই আছে ! এখনও আমরা অনেক রহস্যই বুঝতে পারি না। মেক্সিকোর উপসাগরে একসময় হাজার-হাজার তিমি মাছ ডাঙায় উঠে আত্মহত্যা করতে এসেছিল। একসঙ্গে অত তিমি মাছের আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়েছিল কেন, কে জানে !"

কার্ল বলল, "সমুদ্র দিয়ে আজকাল সব সময় বড়-বড় পেট্রোলের ট্যাঙ্কার যায়। সেইসব জাহাজ থেকে অনেক সময় পেট্রোল জলে পড়ে যায়। সমুদ্রের জলে পেট্রোল ভাসলে শুধু তিমি মাছ নয়, সবরকম জলজ প্রাণীর খুব কষ্ট হয়। তারা নিশ্বাসের অক্সিজেন পায় না। মানুষের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই বোধ হয় তিমি মাছেরা প্রতিবাদ জানাতে চায়।"

আবার শূন্যে ডানা ঝটপট-ঝটপট শব্দ হল। আর-একটা পাখি পড়ছে। সেটা মাটি ছোঁয়ার আগেই কার্ল বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল। লুফে নিল পাখিটাকে।

অন্ধকার থেকে তিন-চারজন লোকও ছুটে এসেছে। তারা লাঠি দিয়ে পাখিটাকে মারবার চেষ্টা করল। কার্ল ততক্ষণে পাখিটা তার জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দু' হাত দিয়ে আড়াল করেছে। একটা লাঠির ঘা পড়ল তার পিঠে।

কার্ল লোকগুলোকে বলল, "আমায় মারছ কেন ভাই ? আমার মাংস তো তোমরা পুড়িয়ে খেতে পারবে না।"

কার্ল দৌড়ে চলে এল কাকাবাবুর কাছে, লোকগুলোও তাড়া করে এল তাকে।

কার্ল ব্যাকুলভাবে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমাকে হেল্‌প করুন।"

কাকাবাবু সেই পাহাড়ি লোকদের ভাষা জানেন না। তিনি কুমার সিংকে বললেন, "আপনি এদের বলুন, এই সাহেব এই পাখিটাকে আগে ধরেছে। এটার ওপর সাহেবেরই অধিকার। ওটা কেড়ে নিতে চাইছে কেন? তা হলে কিন্তু আমিও বাধা দেব।"

কুমার সিং লোকগুলোকে ধমকে তাড়িয়ে দিল।

এদিকটায় অন্ধকার বলেই পাখিটা দারুণ ছটফট করছে।

কার্ল কাকাবাবুকে বলল, "আপনি এই পাখিটাকে জোরে চেপে ধরুন তো।"

কাকাবাবুর হাতে পাখিটা দিয়ে সে পকেট হাতড়াতে লাগল। সন্তু আর কুমার সিং দু'খানা টর্চ জ্বালল, তবু পাখিটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, সে এমনই ছটফট করছে।

কার্ল পকেট থেকে একটা ছোট্ট তামার চাকতি বের করল, তাতে রাবার ব্যান্ড লাগানো। সে পাখিটার একটা পা ধরে তাতে চাকতি আটকে দিল। তারপর কাকাবাবুর হাত থেকে পাখিটা নিয়ে সে পেছনদিকে খানিকটা ছুটে গিয়ে তাকে জোরে ছুঁড়ে উড়িয়ে দিল আকাশে।

নিজের জায়গায় আবার ফিরে এসে কার্ল কাকাবাবুকে বলল, "আমি দেখতে চাই এই পাখিটাই আবার ফিরে আসে কি না!"

কাকাবাবু বললেন, "এটা একটা ভাল এক্সপেরিমেন্ট।"

অম্বর বলল, "এর পরের পাখিটাকে আমি ধরব। এখানকার লোকের কি বিশ্বাস জানেন? একদিন এখানে একটা সোনার পাখি পড়বে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সোনার পাখি?"

অম্বর বলল, "গ্রামের আদিবাসীরা সেই কথা বলাবলি করে। এখানে তো এই জাতের পাখি নেই। এগুলো আকাশ থেকে পড়ে। আকাশ থেকেই যখন পড়ছে তখন একদিন না একদিন স্বর্গ থেকে একটা সোনার পাখিও নেমে আসবে নিশ্চয়ই!"

কুমার সিং নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বলল, "হুঁ। যতসব বাজে কথা!"

অম্বর তবু ইয়ার্কির সুরে বলল, "কে বলতে পারে, হয়তো এর পরেরটাই সোনার পাখি হবে!"

কিন্তু অম্বরের আশা পূর্ণ হল না।

হঠাৎ ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। প্রায় হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি যাকে বলে। কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনেই রেইন কোট এনেছে, গায়ে দিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

কার্ল বলল, "আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, আর আশা নেই। জাটিংগা-র পাখিরা একটু বৃষ্টি হলে আর আসে না।

কাকাবাবু বললেন, "বৃষ্টিতে মশালের আগুন দেখা যায় না।"

বৃষ্টির ফোঁটা মশালের আগুনের ওপর পড়ছে আর ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছে। একটুক্ষণের মধ্যেই দুটো মশালই নিভে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

কার্ল বলল, "আগের দিন গ্রামের লোকদের সামনে আমি পাখি ধরতে সাহস করিনি। আজ আপনারা ছিলেন বলেই আমি এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারলাম। কাল দেখতে হবে ওই পাখিটা ফিরে আসে কি না। আপনারা কাল আসবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই আসব!"

কুমার সিং বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল আমরা সবাই আবার আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "ক্যামেরায় ছবি তুললে হত। সন্তু, তুই ক্যামেরাটা আনতে ভুলে গেছিস আজ।"

সন্তু লজ্জা পেয়ে বলল, "একদম মনেই পড়েনি।"

কুমার সিং বলল, "আমি মনে করিয়ে দেব। আমারও ক্যামেরা আছে।"

তারপর কুমার সিং কাকাবাবুকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, "সার, আজ তো আর এখানে বসে থেকে লাভ নেই। চলুন, এবারে আমরা খেতে যাই। খানিকটা দূরে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, যাওয়া যাক। আচ্ছা, ওই জার্মান ছেলেটিকে সঙ্গে নিতে পারি না? ওকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। ওর কাছ থেকে এই পাখিদের বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানা যেত।"

কুমার সিং বলল, "সেটা আমাদের মালিক ঠিক পছন্দ করবেন না।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মালিক? মালিক আবার কে?"

কুমার সিং একটু থতমত খেয়ে বলল, "মালিক মানে আমাদের এক বন্ধু। তার নাম মালিক। এখানকার একজন বড় ব্যবসায়ী। সে আপনাকে আর মিস্টার সন্তুকে নেমন্তন্ন করেছে নিজের বাড়িতে। সেখানে অন্য লোক নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া এই জার্মান সাহেবের সঙ্গে তো আপনার কালকে দেখা হবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে চলুন।"

কাকাবাবু কার্লের কাছে বিদায় নিলেন। অম্বরকে কিছু বলার আগেই সে বলল, "আপনারা এখন কোথায় যাচ্ছেন? আমি যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে?"

কুমার সিং বলল, "আমরা অনেক দূরে যাব। আমাদের নেমন্তন্ন আছে।"

কাকাবাবুরা এসে আবার জিপে উঠলেন। এবারে জিপটা উঠতে লাগল ওপরের দিকে। খাড়া রাস্তা। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। চতুর্দিকে অন্ধকার। জঙ্গল থেকে একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ আসছে।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কীরকম দেখলি? কিছু বুঝতে

পারলি ?”

সন্তু বলল, “রাত্তিরবেলা অত বড়-বড় পাখি আকাশ থেকে পড়ছে, এটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তুমি কিছু কারণ খুঁজে পেলে ?”

কাকাবাবু বললেন, “আরও কয়েকটা দিন দেখতে হবে। এখনও কিছু ধরা যাচ্ছে না।”

মিনিট পনেরো চলার পর জিপটা থামল। কুমার সিং বলল, “আর গাড়ি যাবে না। এখান থেকে একটু হাঁটতে হবে। বেশি না, মিনিট পাঁচেক। আমাদের বন্ধুর বাড়িটা একটা পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। গেলে দেখবেন খুব সুন্দর লাগবে।”

কাকাবাবুরা গাড়ি থেকে নামলেন। ভুবন দাস টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। গাড়ির ড্রাইভারও এবার আসছে সঙ্গে। কাকাবাবু একবার হোঁচট খেতেই কুমার সিং তাঁকে ধরে ফেলে বলল, “ইস, লাগল নাকি ? কাকাবাবু বললেন, “না, কিছু হয়নি !”

ভুবন দাস বলল, “ডান পাশটা সাবধান। ওদিকে খাদ। আপনি সার, বাঁ দিক ঘেঁষে চলুন।”

সন্তুর হাতেও একটা টর্চ। সে ডান দিকে আলো ফেলে বলল, “ওরে বাবা, বেশ গভীর খাদ, তলা দেখা যাচ্ছে না।”

কুমার সিং বলল, “হ্যাঁ। এই খাদটা খুব গভীর।”

একপাশে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে খাদ, মাঝখানে সরু পথ। এদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। খানিকক্ষণ হাঁটার পর মনে হল, ওপর থেকে কোনও বড় জন্তু বা পাথর গড়িয়ে পড়ল নীচের রাস্তায়। ধুপ করে আওয়াজ হল।

কাকাবাবু বললেন, “ওটা কী ?”

কুমার সিং বলল, “ও কিছু না। ব্যস, আর যেতে হবে না। এইখানেই !”

কুমার সিং পেছন ফিরে কাকাবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াল। ভুবন দাসের টর্চের আলোয় দেখা গেল কুমার সিং-এর হাতে একটা রিভলভার চকচক করছে !

ভুবন দাস কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, “কুমার, এখন থাক।”

কুমার সিং কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল, “শাট আপ ! রায়চৌধুরী, এবার তোমার খেলা শেষ !”

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে বললেন, “এ কী ব্যাপার ? আমার সঙ্গে মজা করছেন নাকি ? আমার দিকে ওরকম রিভলভার খেলাচ্ছলেও তুলতে নেই। আমি পছন্দ করি না।”

কুমার সিং অন্য হাতে কাকাবাবুর মুখে একটা ঘুঁসি চালাতে কাকাবাবু সেই উদ্যত মুষ্টিটাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করেও পারলেন না।

পেছন থেকে কে যেন হ্যাঁচকা টানে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো কেড়ে নিল।

কাকাবাবু টাল সামলাতে পারলেন না। হাত দুটো ব্যবহার করার আগেই কেউ তাঁর হাত দুটো পেছনে মুড়ে নিয়ে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একজন একটা গামছাজাতীয় জিনিস দিয়ে বেঁধে ফেলল তাঁর মুখ। কাকাবাবু কোনওরকম বাধা দেওয়ার সুযোগই পেলেন না।

কুমার সিং কাকাবাবুর কোমরে খুব জোরে একটা লাথি কষিয়ে বলল, "যা, এবার পাতালে যা !"

কাকাবাবু ছিটকে পড়ে গেলেন খাদের দিকে।

॥ ৩ ॥

ব্যাপারটা এতই তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, কাকাবাবু প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলেন না।

কুমার সিং-রা সবাই মিলে দু'দিন ধরে দারুণ যত্ন করছে, খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে, অনেক জায়গা দেখাচ্ছে, তাদের সঙ্গে শত্রুতার কোনও প্রশ্নই নেই। তবু হঠাৎ তারা এরকম ব্যবহার করবে, সেরকম কোনও সন্দেহই হয়নি।

কাকাবাবু শুধু বুঝতে পারলেন, তিনি একটা খাদে গড়িয়ে পড়ছেন। তাঁর হাত বাঁধা, মুখ বাঁধা !

একটু আগেই টর্চের আলোয় দেখা গেছে যে, খাদটা খুব গভীর। এত উঁচু থেকে পড়লে বাঁচার কোনও আশাই নেই।

কাকাবাবু ভাবলেন, তা হলে কি এবার সত্যি মরতে হবে ?

এর আগে কতবার, কতরকম বিপদে পড়তে হয়েছে। সাঙ্ঘাতিক বুদ্ধিমান শত্রুদের মুখোমুখি পড়েও কাকাবাবুর কখনও মৃত্যুভয় হয়নি। তাঁর এমনই প্রবল আত্মবিশ্বাস যে, সব সময়েই মনে করেন, কোনও না কোনও উপায়ে বেঁচে যাবেনই। একদিন-না-একদিন সব মানুষকেই মরতে হয়। কিন্তু অন্য লোকের ইচ্ছেয় তিনি কিছুতেই মরতে রাজি নন।

কিন্তু এখানে এটা কী হল ? কোনও কথা নেই বার্তা নেই, লোকগুলো তাঁকে ঠেলে ফেলে দিল ? আগে থেকে বিপদের একটুও আঁচ পাননি তিনি !

কাকাবাবু গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছেন। কোনও পাথরের খাঁজ কিংবা গাছের ডাল যে ধরে ফেলবেন, তারও উপায় নেই। তাঁর হাত দুটো পেছনদিকে বাঁধা।

কুমার সিং আর ভুবন দাসকে আগে কখনও দেখেননি কাকাবাবু। লোক দুটো অতি-সাধারণ, দুর্ধর্ষ বদ লোক হওয়ার যোগ্যতাও এদের নেই, শুধু-শুধু তাঁকে ওরা মারতে চাইল কেন ?

এক জায়গায় কিসে যেন খুব জোরে কাকাবাবুর মাথা ঠুকে গেল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। এবার বুঝি জ্ঞান চলে যাবে।

কাকাবাবু ভাবলেন, জীবনে কি কিছু ভাল কাজ করিনি ? দু-চারজন মানুষের কি উপকার করিনি আমি ? তবু এরকম অকারণে প্রাণ দিতে হবে ?

এর পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ঠিক কতক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরল তা তিনি বুঝতে পারলেন না। চোখ খোলার পর প্রথমেই তিনি ভাবলেন, সন্তু ? সন্তু কোথায় ? তার কী হল ?

তারপর তিনি বোঝবার চেষ্টা করলেন, কোথায় এসে পড়েছেন, হাত-পা কিছু ভেঙেছে কি না।

চতুর্দিকে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাথার মধ্যে এখন ঝিমঝম করছে বটে, কিন্তু শরীরে আর কোথাও ব্যথা নেই। শীতের ভয়ে আজ একটা বেশ মোটা ওভারকোট গায়ে দিয়ে বেরিয়েছিলেন, তাই শরীরে চোট লাগতে পারেনি। একটা মস্তবড় গামছা দিয়ে ওরা মুখটা বেঁধেছে, তার গিঁটটা পেছনদিকে, তার জন্যও মাথাটা বেঁচে গেছে।

যাক, তা হলে এ-যাত্রাতেও মরতে হল না। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে কাকাবাবু ভাবলেন, হুঁ, এবারে সত্যিই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কোথায় এসে পড়া গেল ? পিঠের কাছটা নরম-নরম। কাকাবাবু অনুভব করলেন, তিনি যেন একটা দোলনায় শুয়ে আছেন। সেটা তাঁর শরীরের চাপে একটু-একটু নিচু হচ্ছে। তাঁর মুখে লাগছে লতাপাতার স্পর্শ।

এক সময় দোলনাটা ছিঁড়ে গেল। কাকাবাবু আবার পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগলেন।

কিন্তু এবারে বেশি নীচে পড়েননি, জায়গাটাও খাড়া নয়, ঢালু। বেশি জোরে গড়াচ্ছেন না। পা দিয়ে মাটিতে চাপ দিতে-দিতে নিজেই থেমে যেতে পারলেন।

এবারে কোনওরকমে উঠে বসে তিনি ভাবলেন, লোকগুলো মহাবোকা ! মেরে ফেলতেই যখন চেয়েছিল, তখন জায়গাটা ভাল করে দেখে নিতে পারেনি ? আসামে বেশি বৃষ্টি হয় বলে এখানকার সব জঙ্গলেই লতা-গুল্ম আর আগাছায় ভর্তি, কঠিন পাথর দেখাই যায় না, ঢাকা পড়ে থাকে। এই খাদটাও পুরো খাড়া নয়। এক জায়গায় ঢালু হয়ে গেছে। এরকম জায়গায় পড়লেও বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই। ওরা ঠিকমতো জায়গা বাছেনি।

সন্তুকে ওরা কী করল ? ধরে রেখেছে ?

কাকাবাবু বেশি নড়তে-চড়তে সাহস করলেন না। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, আবার কোথাও খাদ আছে কি না কে জানে ! এ পর্যন্ত যখন বাঁচা গেছে, তখন দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করাই ভাল।

হঠাৎ তাঁর দুপুরবেলার সাপটার কথা মনে পড়ে গেল। সেপ্টেম্বর মাস, বর্ষা এখনও শেষ হয়নি, এই সময় সব সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে কোনও সাপের গায়ে পা দিলে আবার এক বিপদ হবে। সবচেয়ে ভাল উপায়

একেবারে চুপ করে বসে থাকা। কিংবা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া। নড়াচড়া না করলে সাপ কামড়াবে না। ঘুমন্ত লোকের গায়ের ওপর দিয়ে বিষাক্ত সাপ চলে গেছে, তবু কামড়ায়নি, এমন শোনা গেছে অনেকবার।

কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম আসবার আশা নেই।

তিনি একাগ্র হয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন, কুমার সিং, ভুবন দাস কিংবা এখানকার অন্য কোনও লোককে আগে দেখেছেন কি না। না দেখেননি, এই জায়গাতেও তিনি আসেননি। এদের সঙ্গে শত্রুতা থাকার কোনও কারণ নেই। এরা কি তবে ভাড়াটে গুণ্ডা ?

শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন কাকাবাবু। বারবার ভাবছেন সন্তুর কথা। যখন তাঁকে কুমার সিং ঠেলে ফেলে দেয়, তখন সন্তু একটু পেছনে পড়েছিল। সন্তু কি ব্যাপারটা দেখেছে ? যদি দেখে থাকে, তা হলে সেই সময়ে সাহায্য করার বদলে সন্তু যদি পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যায় তা হলে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দু'জনে একসঙ্গে মরা কিংবা ধরা পড়ার কোনও মানে হয় না।

আবার বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিতে ভিজতেই হবে, কোনও উপায় নেই।

কাকাবাবুর একটা গাধার কথা মনে পড়ল।

একবার হাজারিবাগে একটা ডাকবাংলোয় থাকার সময় কাকাবাবু জানলা দিয়ে একটা গাধাকে দেখেছিলেন। কোনও ধোপার গাধা হবে, দড়ি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। দারুণ বৃষ্টি পড়ছিল, প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলল সেই বৃষ্টি, সেই গাধাটাকে কেউ খুলে দেয়নি। সেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে, আর মাঝে-মাঝে করুণ সুরে ডাকছে। কাকাবাবু একবার ভেবেছিলেন, তিনি ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গাধাটাকে খুলে দেবেন। তারপর মনে হয়েছিল, তিনি খুলে দিলে গাধাটা যদি পালিয়ে যায় ? ধোপা এসে চ্যাঁচামেচি করলে কী বলবেন ?

কাকাবাবুর মনে হল, তাঁর অবস্থাও সেই গাধাটার মতন।

এত জোর বৃষ্টি হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়ছে। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে মাঝে-মাঝে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। বোধ হয় গড়িয়ে পড়ছে পাথর। এর মধ্যে একটা মাথায় এসে পড়লেই সর্বনাশ !

একসময় বৃষ্টিও থামল, ভোরের আলোও ফুটল।

এত বৃষ্টিতে ভিজে কাকাবাবুর ঠাণ্ডা লেগে গেছে খুব। তিনি হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করে কয়েকবার হাঁচলেন। ওভারকোটটা ভিজে এমন ভারী হয়ে গেছে, যেন মনে হচ্ছে গায়ের ওপর একটা বর্ম চাপানো।

আর একবার হ্যাঁচ্চো করতেই তিনি তার একটা প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। বৃষ্টির জন্যই বোধ হয় তাঁর মুখের বাঁধনটা একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, হ্যাঁচ্চোর

চোটে তা একেবারেই খুলে গেল।

আবার তিনি পর-পর দু'বার হ্যাঁচ্চো করলেন, এবার তিনবার প্রতিধ্বনি হল।

কাকাবাবুর খটকা লাগল। প্রতিধ্বনি বেশি হচ্ছে কেন? এ কী অদ্ভুত জায়গা!

আবার তাঁর নাক শুল-শুল করছে, হ্যাঁচ্চো করতে যাবেন, তার আগেই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন।

তা হলে তো এটা প্রতিধ্বনি নয়, কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে।

আলো ফুটতেই নানারকম পাখি ডাকতে শুরু করেছে। কাকাবাবুর মাথার কাছে ভোঁ-ভোঁ করছে একটা ভোমরা।

এখানে বড় গাছ বিশেষ নেই, ঝোপঝাড়-আগাছাতেই ভর্তি। কাকাবাবু যেখানে শুয়ে ছিলেন, তার পাশেই বেশ বড় গর্ত একটা। অন্ধকারে হাঁটতে গেলে ওটার মধ্যে পড়লে নির্ঘাত পা ভাঙত। পাহাড়ের নানা জায়গা থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে সেই গর্তটায় পড়ছে, কলকল শব্দ হচ্ছে।

কাকাবাবু একটা গাছে পিঠ দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ওভারকোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু হাত যে বাঁধা! তবু ভাগ্যিস ওরা পা বাঁধেনি।

একটু দূরে আর-একবার হ্যাঁচ্চো শুনে তিনি সেদিকে সাবধানে এগোলেন। একেই তাঁর একটা পা অকেজো, তার ওপর হাত দুটোও বাঁধা, ঢালু জায়গায় হাঁটতে গেলে যে-কোনও মুহূর্তে তাঁর পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তিনি এক-একটা গাছ দেখে-দেখে সেই পর্যন্ত গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাল সামলে নিচ্ছেন।

একটু পরে দেখতে পেলেন, এক জায়গায় ঝোপের মধ্যে একটা হলদে রঙের রেন কোটের অংশ। দেখেই চিনলেন ওটা সন্তুর।

তিনি দু'বার সন্তুর নাম ধরে ডেকেও কোনও সাড়া পেলেন না।

এবারে তিনি প্রায় একপায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সন্তুর পাশে।

হাত খোলা নেই তাই মাথা দিয়ে কয়েকবার ধাক্কা দিলেন সন্তুর পিঠে। সঙ্গে-সঙ্গে বলতে লাগলেন, "সন্তু, সন্তু, আর ভয় নেই। আমি এসে গেছি!"

তবু সন্তু সাড়া দিল না। একটু নড়লচড়লও না।

কাকাবাবুর একবার বুক কেঁপে উঠলেও পরক্ষণেই ভাবলেন, ও তো হেঁচেছে কয়েকবার। তা হলে অজ্ঞান হয়ে আছে।

তিনি কোনওক্রমে সন্তুকে চিত করিয়ে দিয়ে দেখলেন, ওর নিশ্বাস পড়ছে। ওর মুখের একটা পাশে রক্ত লেগে আছে। সন্তুর হাতও বাঁধা নয়, মুখও বাঁধা নয়।

কাকাবাবু একটা বড় নিশ্বাস ফেললেন। যাক, সন্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে, সে বেঁচে আছে। ওর জ্ঞান না ফিরলে এখান থেকে যাওয়া যাবে না। সবচেয়ে আগে তাঁর হাতের বাঁধনটা খোলা দরকার। যদি নাইলন না হয়, সাধারণ দড়ি দিয়ে বেঁধে থাকে, তা হলে কোনও ধারালো পাথরে কিছুক্ষণ ঘষলেই কেটে যাবে।

সেরকম কোনও পাথর চোখে পড়ল না। ঢালু জায়গা, এখান দিয়ে অবিরাম বৃষ্টির জল গড়ায়, তাই সব পাথরই মসৃণ। কাকাবাবু একটা গাছ বেছে নিয়ে তার কাছে গিয়ে উলটো হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সেই গাছের গায়ে ঘষতে লাগলেন হাতের বাঁধন।

সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে গাছটা নরম হয়ে আছে। দড়ির ঘষায় গাছের চোকলাবাকলা খসে পড়ছে, দড়ির কিছু হচ্ছে না। দড়িটা যদি নাইলনের হয়, তা হলে সারাদিন ধরে ঘষলেও কোনও লাভ হবে না।

অজ্ঞান অবস্থাতেই সন্তু আর-একবার হেঁচে উঠল।

হাতের ঘষাটা থামিয়ে কাকাবাবু সন্তুর দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোয়ালটা কঠিন হয়ে গেল। তিনি মনে-মনে বললেন, বেঁচে যখন গেছি, তখন এখান থেকেও উদ্ধার পাবই ঠিক। তারপর কুমার সিং আর ভুবন দাসের টুঁটি চেপে ধরতে হবে। পৃথিবীর কোনও প্রান্তেই গিয়ে ওরা লুকোতে পারবে না।

আরও কয়েকবার দড়ির বাঁধনটা ঘষে-ঘষে কাটার চেষ্টা করে কাকাবাবু হাল ছেড়ে দিলেন। দড়িটা নিশ্চয়ই নাইলনের, গাছে ঘষে কোনও লাভ হবে না। সন্তুর হাত-পা বাঁধা নেই, সন্তু জেগে উঠলেই তাঁর বাঁধনটা খুলে দিতে পারবে।

কাকাবাবু কাছে গিয়ে সন্তুকে ধাক্কা দিলেন। সন্তু চোখ মেলছে না। এটা ঘুম হতেই পারে না, সন্তুর ঘুম এত গাঢ় নয়। সন্তু অজ্ঞান হয়ে আছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে অজ্ঞান? খুব বেশি চোট লেগেছে ওর? থুতনির কাছে একটা জায়গায় অনেকখানি কেটেছে, সেখান থেকে এখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। তবে ওই ক্ষত'র জন্য তো অজ্ঞান হয়ে থাকার কথা নয়।

হাত-বাঁধা অবস্থায় কাকাবাবুর এখন আর কিছুই করার সাধ্য নেই। তিনি কাছে বসে রইলেন, আর মাঝে-মাঝে সন্তুর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

এইরকমভাবে কেটে গেল আরও এক ঘন্টা।

আস্তে-আস্তে রোদ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে আর জঙ্গলে।

ভিজে ওভারকোটটা গা যেন কামড়ে ধরে আছে। কাকাবাবু শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন। মাঝে-মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ঘুম এসে যাচ্ছে, জ্বরও এসেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে জেগে থাকতেই হবে।

পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার পরেও বেঁচে গেছেন বটে, কিন্তু জবজবে ভিজে পোশাক পরে এমনভাবে বসে থাকলে ঠাণ্ডা লেগেই মরতে হবে।

আরও অনেকটা সময় কেটে গেল, তবু সন্তুর জ্ঞান ফিরল না।

হঠাৎ খানিকটা দূরে কিসের যেন একটা শব্দ শোনা গেল।

এতক্ষণ পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও আওয়াজ পাওয়া যায়নি জঙ্গলে। কোনও জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়নি। এখন যেন মনে হচ্ছে বড় কোনও জানোয়ার জঙ্গলের লতা-পাতা-ডাল ঠেলে-ঠেলে আসছে এদিকেই।

বাঘ কিংবা ভাল্লুক হতে পারে না, তারা চলার সময় শব্দ করে না। হাতি হতে পারে। আসামের জঙ্গলে প্রচুর হাতি আছে। তারা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে চলে আসে। হাতিরা তাড়া করে এসে মানুষ মারে না সাধারণত, তাদের চলার পথ থেকে দূরে সরে থাকলেই হল। কিন্তু হাতিরা যদি এখান থেকেই যেতে চায়? তা হলে তাদের পায়ের চাপেই চ্যাপটা হয়ে যেতে হবে!

সন্তুকে কাকাবাবু সরাবেন কীভাবে? কোন দিকেই বা সরাবার চেষ্টা করবেন?

এবার যেন মানুষের গলার গুনগুন আওয়াজ পাওয়া গেল!

কোনও মানুষ এদিকে আসছে বুঝতে পেরে কাকাবাবুর প্রথমে খুব ভরসা জাগল। এবার সাহায্য পাওয়া যাবে।

পরের মুহূর্তেই মনে হল, যদি কুমার সিং-রা আসে? ওরা হয়তো দেখতে আসছে, কাকাবাবু আর সন্তু সত্যি-সত্যি মরেছে কি না!

ওরা কাকাবাবুর রিভলভারটা কেড়ে নেয়নি, সেটা এখনও রয়ে গেছে কোটের পকেটে। কিন্তু হাত বাঁধা, সেটা ব্যবহার করার কোনও উপায় নেই। অসহায় রাগে কাকাবাবু ছটফট করতে লাগলেন। তবু এই অবস্থাতে, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "যদি কুমার সিং আসে, তাকে সাঙ্ঘাতিক শাস্তি দিতেই হবে।"

এবার লোকটিকে দেখা গেল। পীতাম্বর পাহাড়ী!

তার হাতে একটা লম্বা চিমটে, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গামবুট, মাথায় টুপি। সে গুনগুন করে গান গাইছে। কাকাবাবু তাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন না। চুপ করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

অম্বর এদিকেই আসছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর চিমটে দিয়ে বাড়ি মারছে ঝোপঝাড়ে। তারপর হঠাৎ কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ দুটো গোল-গোল করে বলল, "এ কী, এ কী, এ কী! কাকাবাবু! এত সকালে জঙ্গলে? পাহাড়ের এত নীচে? বেড়াতে এসেছেন বুঝি? আপনার তো বেড়াবার খুব শখ!"

তারপর সন্তুর দিকে চোখ পড়তেই সে আবার বলল, "ও কী? সন্তু ওভাবে শুয়ে আছে কেন? অ্যাকসিডেন্ট? কী করে হল? কোথা থেকে পড়ে গেল?"

কাকাবাবু এবার গম্ভীরভাবে বললেন, "অম্বরবাবু, আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দেবেন প্লিজ?"

অম্বর প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "অ্যাঁ? আপনার হাত বাঁধা? কে এমন

করল ? নিশ্চয়ই কুমার সিং ? **লোকটা** ভাল না, প্রথম দেখেই আমি বুঝেছিলাম ! কাল রাত্তিরে আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। ওই লোকটা যেতে দিল না ! কখন থেকে এইরকম হাত বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন ? ঠিক কী হয়েছিল খুলে বলুন তো !”

কাকাবাবু বললেন, “আপনি আগে আমার হাত দুটো খুলে দিন !”

অম্বর কাকাবাবুর পাশে বসে পড়ে বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে-করতে বলল, “ওরে বাবা, এ যে নাইলনের দড়ি। খুব শক্ত করে গিঁট বেঁধেছে। জলে ভিজে আরও শক্ত হয়ে গেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার ওভারকোটের ভেতরের পকেটে দেখুন একটা ছুরি আছে।”

অম্বর বলল, “ছুরি তো আমার কাছেও আছে। জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরি, সবসময় কাছে একটা বড় ছুরি রাখি। কিন্তু নাইলনের দড়ি ছুরি দিয়েও সহজে কাটা যায় না। হাত দিয়েই গিঁটটা খুলতে হবে। আপনি আমাকে অম্বরবাবু বলছেন কেন ? অম্বর আর তুমি বলে ডাকবেন। আপনার সম্পর্কে কত লেখা পড়েছি। এবার আপনার একটা অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে আমিও ঢুকে পড়লাম, ভাবতেই আমার দারুণ মজা লাগছে। এবারে বইটার নাম কী হবে ? ‘দস্যুর কবলে কাকাবাবু’ ! তার মধ্যে আমিও একটা ক্যারেকটার। পীতাম্বর পাহাড়ী ! না, না, আমার নামটা শুধু অম্বরই রাখবেন। পাহাড়ী পদবিটা অবশ্য রাখতে হবে, নইলে আমার বন্ধুরা বিশ্বাস করবে না !”

একটানা কথা বলতে-বলতে এক সময় সে বলল, “এই যে গিঁটটা খুলেছে।”

কাকাবাবু হাত দুটো সামনে আনতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেললেন। সারারাত ধরে হাত দুটো পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা ছিল বলে কাঁধের কাছে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা হয়ে গেছে।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে হাত দুটো সামনে-পেছনে করলেন কয়েকবার। তারপর খুলে ফেললেন ওভারকোটটা।

ঝুঁকে পড়ে সন্তুকে দু’ হাতে তুলে ধরে ব্যাকুলভাবে ডাকলেন, “সন্তু ! সন্তু !”

অম্বর বলল, “অন্য গল্পে থাকে, সন্তু অনেক কায়দা করে আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচায়। এখানে সন্তু এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছে কেন ? ওর তো হাত-পা বাঁধা নয়। এই যে সন্তুবাবু, উঠুন !”

কাকাবাবু এবার ধমকের সুরে বললেন, “আপনি এটাকে মজার ব্যাপার ভাবছেন ? গল্প ভাবছেন ! এটা জীবন মরণের প্রশ্ন। সন্তু অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছে। সাঙ্ঘাতিক কোনও আঘাত না লাগলে ও অজ্ঞান হয়ে থাকত না। ওকে এক্ষুনি ওপরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি

সন্তুকে কোলে করে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি রাস্তাটা দেখিয়ে দিন!"
ধমক খেয়ে খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে অম্বর বলল, "আপনি কোলে করে সন্তুকে নিয়ে উঠবেন! অসম্ভব! আপনারা অনেক নীচে নেমে এসেছেন। এখান থেকে হাফলঙ শহর অনেক উঁচু। কোনও সিঁড়িও নেই। আপনার একাই তো উঠতে কষ্ট হবে খুব। আপনার ক্রাচ দুটো কোথায়?"
কাকাবাবু বললেন, "অসম্ভব বলে কিছু নেই। যেতেই হবে। সন্তুকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখাতেই হবে!"
অম্বর বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি।"
কোমর থেকে একটা ভোজালি বের করে সে একটা গাছের ডাল কাটল। তারপর সেটার পাতা-টাতা ছেঁটে লাঠির মতন বানিয়ে কাকাবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "আপনি এটা নিয়ে আস্তে-আস্তে আসুন, কাকাবাবু! সন্তুকে আমার কাছে দিন। এভাবেও পুরোটা ওঠা যাবে না। কাছেই পাহাড়িদের একটা ছোট গ্রাম দেখে এসেছি। ওখান থেকে ঘোড়া জোগাড় করতে হবে।"
সন্তু তো আর ছোটখাটো ছেলে নয়, সে কলেজে পড়ে, চেহারাটাও বড় হয়েছে বেশ। তাকে কোলে নিয়ে পাহাড়ি পথে ওঠা সহজ কথা নয়। অম্বর সন্তুকে কাঁধে নিয়ে চলল, একটু বাদেই হাঁপাতে লাগল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল পাহাড়িদের বসতিটা। সন্তুকে নামিয়ে অম্বর ছুটে গিয়ে দুটো ঘোড়া জোগাড় করে আনল। সঙ্গে একজন লোক। কাকাবাবু একটা ঘোড়ায় চাপলেন, অন্য ঘোড়াটিতে অম্বর বসল সন্তুকে নিয়ে। পাহাড়ি লোকটি হেঁটে-হেঁটে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।
এক সময় ওরা পৌঁছে গেল ডাকবাংলোর সামনে।
দাড়িওয়ালা প্রৌঢ় বিচারকটি বসে আছেন বাংলোর বারান্দায়। এখন আর তিনি উদাসীন ভাব করলেন না। ওদের দেখে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার মিঃ রায়চৌধুরী, আপনারা সারারাত কোথায় ছিলেন? এ কী চেহারা! আপনার ভাইপোটিরই বা কী হয়েছে?"
কাকাবাবু বললেন, "একটা অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।"
অম্বর বলল, "অ্যাকসিডেন্ট না ছাই! গুরুতর ব্যাপার। কাকাবাবুর হাত বাঁধা ছিল!"
বিচারক আঁতকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ? হাত বাঁধা? সে কী? ভোরবেলাতেই একজন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। তিনি বললেন, একজন মিস্টার সিং ডায়েরি করে গেছে যে, কলকাতার দু'জন লোক পা পিছলে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে!"
কাকাবাবু এসব কথা কিছুই এখন শুনতে চান না।
তিনি অম্বরকে বললেন, "শিগগির একজন ডাক্তার ডেকে আনো প্লিজ!"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি," বলে অম্বর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ডাকবাংলোর একজন বেয়ারাকে সামনে দেখে কাকাবাবু বললেন, "তাড়াতাড়ি গরম জল নিয়ে এসো !"

বেয়ারাটি ধরাধরি করে সন্তুকে ঘরের মধ্যে এনে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর দৌড়ে গরম জল আনতে চলে গেল।

কাকাবাবু সন্তুর ভিজে সোয়েটার আর জামাটা খুলে ফেললেন। তারপর দু'খানা কম্বল চাপা দিলেন ওর গায়ে। অজ্ঞান অবস্থাতেও সন্তুর শরীরটা শীতে কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

কাকাবাবু সন্তুর মাথার চুলে আঙুল দিয়ে খুঁজতে লাগলেন, কোনও গভীর ক্ষত আছে কি না। সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। মুখের কাটা জায়গা থেকে এখন রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে।

বেয়ারা চটপট গরম জল আনতেই তিনি তাতে তোয়ালে ভিজিয়ে সন্তুর সারা গা ঘষে দিতে লাগলেন। গরম জলের ছোঁয়ায় সন্তু উঁ-উঁ শব্দ করতে লাগল।

অম্বর ছেলেটি সত্যিই খুব করিৎকর্মা। কিছুক্ষণের মধ্যে সে একজন ডাক্তারকে প্রায় ধরেই নিয়ে এল।

ডাক্তারটি সন্তুর মাথার কাছে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো !"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে গেছে।"

তিনি অম্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন, এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই।

বিচারকও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আর কিছু বললেন না।

ডাক্তার সন্তুকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কাকাবাবু পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার ডাক্তারের হাত কাকাবাবুর গায়ে লেগে গেল। তিনি চমকে উঠে বললেন, "সাঙ্ঘাতিক গরম ! আপনারও তো খুব জ্বর হয়েছে দেখছি !"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "আমাকে নিয়ে এখন ভাবতে হবে না। আপনি ওকে ভাল করে দেখুন !"

কাকাবাবু সন্তুর সোয়েটার আর জামা-গেঞ্জি খুলে ফেলেছিলেন, প্যান্টটা খোলেননি। ডাক্তারবাবু প্যান্টটাও টেনে খুলে ফেলার পর দেখা গেল সন্তুর বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপরটা একটা টেনিস বলের মতো ফুলে আছে।

কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, "এ কী !"

ডাক্তার বললেন, "এই হাঁটুতেই তো সবচেয়ে বড় ইনজুরি দেখছি ! আর কোথাও তেমন কিছু নেই। মাথাতেও আঘাত লাগেনি, বমিটমি করেনি !"

তিনি সন্তুর সেই হাঁটুতে একটু টিপে দেখতে যেতেই সন্তু ছটফটিয়ে উঠল।

ডাক্তার এবার তাঁর ব্যাগ খুলে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বের করলেন। সন্তুকে একটা ইঞ্জেকশান দেওয়ার পর তিনি বললেন, "এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই

ভাল। ও আসলে যন্ত্রণার চোটে অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান ফিরে এলে আরও কষ্ট পাবে। আমার মনে হচ্ছে, ওর হাঁটুর মালাইচাকি গুঁড়িয়ে গেছে!

কাকাবাবু বিবর্ণ মুখে ফিসফিসিয়ে বললেন, "মালাইচাকি গুঁড়িয়ে গেছে ?"

ডাক্তার বললেন, "এক্ষুনি এক্স-রে করা দরকার। এখানে একটাই মেশিন ছিল, তাও খারাপ হয়ে গেছে। ওর পা-টা সারাজীবনের মতন জখম হয়ে গেল। বোধ হয় ওর হাঁটুর কাছ থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। এখানে ওর ঠিকমতন চিকিৎসা করানো যাবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে শিলচর কিংবা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত।"

কাকাবাবু পাগলের মতন চিৎকার করে উঠলেন, "আমি এক্ষুনি ওকে শিলচর নিয়ে যাব ! ট্রেন ক'টায় ? গাড়ি ! একটা গাড়ি চাই !"

অম্বর আর বিচারক কাকাবাবুকে জোর করে টেনে সন্তুর বিছানার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

বিচারক বললেন, "শান্ত হোন ! মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এমনভাবে ভেঙে পড়লে আরও মুশকিল হবে !"

কাকাবাবুর দু' চোখ জলে ভরে গেল। তিনি অসহায়ভাবে বললেন, "সন্তু ! সন্তু খোঁড়া হয়ে যাবে ? আমার মতন ? আমি এক্ষুনি ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই ! একটা গাড়ি, যত টাকা লাগে লাগুক, একটা গাড়ি..."

বিচারক বললেন, "আমি আজই শিলচর ফিরছি। আমার জন্য একটা গাড়ি আসছে এক ঘন্টার মধ্যে। সেই গাড়িতেই আমরা চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "এক ঘন্টা ? আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে চাই না। ট্রেন যাবে না এখন ?"

অম্বর বলল, "সার, জজসাহেব ভাল কথাই বলেছেন। অন্য একটা গাড়ি ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যাবে। দুপুরের আগে ট্রেন নেই। ট্রেনে ছ-সাত ঘন্টা সময় তো লাগবেই। গাড়িতে শিলচর পৌঁছনো যায় চার ঘন্টায়। জজসাহেবের গাড়িতে গেলেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন।"

সেটাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। রাস্তায় সন্তুকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য দু-একটা ওষুধ দিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন। অম্বর চটপট গুছিয়ে দিল সব জিনিসপত্র।

বেয়ারা ব্রেকফাস্ট আনলেও কাকাবাবু কোনও খাবার খেলেন না। শুধু গরম কফি খেলেন দু' কাপ। প্রচণ্ড জ্বরে তাঁর শরীর ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

গাড়ির প্রতীক্ষায় তাঁরা বসে রইলেন বারান্দায়।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু মনে করবেন না, সব ব্যাপারটা জানতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। আপনার মুখ আর হাত বাঁধা ছিল। তার মানে, আপনাকে কেউ খাদে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ?"

কাকাবাবু মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়লেন।

বিচারক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ভাইপোটিকেও ফেলে দিয়েছিল ?"

অম্বর বলল, "নিশ্চয়ই তাই। সন্তুকেও কাছেই অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে।

বিচারক বললেন, "আপনার মতন একজন ভদ্রলোক, এখানে পাখি দেখতে এসেছেন, কারও সঙ্গে ঝগড়া হয়নি, তবু হঠাৎ আপনাকে মেরে ফেলতে চাইবে কেন ? আগে থেকে কি এখানকার কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল ?"

কাকাবাবু এবার দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

অম্বর আবার বলল, "ইনি হচ্ছেন রাজা রায়চৌধুরী। বহু রহস্যের সমাধান করেছেন। কত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছেন। এঁর শত্রু থাকবে না ? আপনি যেমন কাল বললেন, জজ হিসেবে আপনি অনেক চোর-ডাকাতকে শাস্তি দিয়েছেন, সেইজন্য আপনার ওপর অনেকের রাগ আছে। ইনি তো চোর-ডাকাতদের চেয়েও বড়-বড় রাঘববোয়ালদের শাস্তি দিয়েছেন। এঁর ওপর অনেকেই প্রতিহিংসা নিতে চাইবে।"

বিচারক বললেন, "এঁর সেই পরিচয়টা আমার জানা ছিল না। তবে তো খুব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। কুমার সিং, ভুবন দাসও কি সেই দলের ? ভোরবেলা একজন পুলিশ এসে বলে গেল, কুমার সিং জানিয়েছে যে, আপনাদের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ওরা অনেক খোঁজাখুজি করেও আপনাকে পায়নি। গুয়াহাটিতে খুব জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় ওরা হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সেইজন্যই পুলিশকে ঘটনাটা জানিয়ে গেল।"

অম্বর বলল, "ওরাই তো ঠেলে ফেলে দিয়েছে। রাত্তিরবেলা নেমন্তন্ন খাওয়াবার নাম করে নিয়ে গেল।"

বিচারক বললেন, "ওদের দু'জনকে কি আপনি আগে চিনতেন মিঃ রায়চৌধুরী ? আপনি যে এখানে আসবেন, তা কি ওরা আগে থেকে জানত ?"

কাকাবাবু এবার আস্তে-আস্তে বললেন, "না, ওদের আমি চিনি না। তবে ওরা জানত যে আমি আসছি। ওরাই আমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছে। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, এই সময় আমার আসামের এই জায়গায় আসবার কথাই ছিল না। আমি গোপালপুরে ছুটি কাটাতে যাব ঠিক ছিল। অনেকদিন সমুদ্রের ধারে থাকিনি। গোপালপুর-অন-সি-তে আমাদের দু'জনের জন্য হোটেলও বুক করা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগে কলকাতায় একটা পার্কে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে জাটিংগার পাখিদের কথা বললেন।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ভদ্রলোক কি ভুবন দাস কিংবা কুমার সিং ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। অন্য একজন মাঝবয়েসী লোক। আমি রোজ

ভোরে পার্কে বেড়াতে যাই। একটা বেঞ্চে বসি। এক ভদ্রলোক সেই বেঞ্চে আমার পাশে বসলেন। তাঁর হাতে একটা পত্রিকা। সেই পত্রিকায় জাটিংগার পাখিদের ছবিটবি দিয়ে একটা লেখা ছিল। ভদ্রলোক নিজে থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করে সেই পত্রিকাটি দেখিয়ে বললেন, 'আপনি জাটিংগার এই আকাশ থেকে পাখি পড়ার রহস্য সম্পর্কে কিছু জানেন ?'

"আমি বলেছিলাম, 'ও সম্পর্কে শুনেছি বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু জানি না।'

"সেইদিন ওই পর্যন্তই কথা হল। পরদিন সকালে সেই ভদ্রলোক আবার এলেন, ওই পাখির কথা তুলে বললেন, 'আপনি তো কত রহস্য ভেদ করেন, একবার এই পাখির রহস্য ভেদ করে আসুন না !'

"আমি বললাম, 'গুণ্ডা-বদমাশের চেয়ে পাখিদের রহস্য দেখতেই আমার ভাল লাগবে ঠিকই। পরে একসময় দেখতে যাব। এবার আমি গোপালপুরে যাচ্ছি।'

"তিনি বললেন, 'গোপালপুর তো যে-কোনও বছরই যেতে পারেন। জাটিংগার পাখি কবে শেষ হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। এবারেই দেখে আসুন না ! হাফলঙে আমার এক আত্মীয় কাঠের ব্যবসা করে। সে আপনার থাকার জায়গা, ঘোরাঘুরির সব ব্যবস্থা করে দেবে। কোনও অসুবিধে হবে না।'

"আমি তখন বললাম, 'ঠিক আছে, গোপালপুর থেকে ঘুরে আসি, তারপর যাব।'

"তিনি বললেন, 'কালকেই আমাদের একটা গাড়ি কলকাতা থেকে সোজা হাফলঙ যাচ্ছে। একজন মাত্র যাত্রী থাকবে। আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। এতখানি পাহাড়ি রাস্তা বেড়াতে-বেড়াতে যাবেন, দেখবেন খুব ভাল লাগবে। গাড়িতে আসা হবে শুনে আমার লোভ হল। আসামের এদিকে আগে আসিনি। সন্তুও নেচে উঠল, তাই গোপালপুরের বদলে আমরা এখানে চলে এলাম।'"

অম্বর বলল, "স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনাকে ভুলিয়েভালিয়ে এখানে টেনে এনেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কুমার সিং-রা প্রথম থেকেই তো আমাদের খুব খাতির করছিল। জায়গাটাও খুব সুন্দর।"

বিচারক বললেন, "তা হলে কলকাতার পার্কের ওই লোকটারই রাগ আপনার ওপর। কোনও কারণে সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। সেইজন্যই আমি অচেনা লোকের সঙ্গে বেশি কথা বলি না।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই লোকটিকেও আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয়নি।"

বিচারক বললেন, "একেই বলে নিয়তি ! আপনি যদি এখানে না এসে গোপালপুর যেতেন, তা হলে এসব দুর্ভোগ কিছুই হত না। আপনার ভাইপো'র

পা-টাও নষ্ট হত না ! তবু ভাগ্যিস প্রাণে বেঁচে গেছেন ? গোপালপুর-অন-সি জায়গাটা খুব ভাল, তাই না ? আমি কখনও যাইনি ।”

কাকাবাবু আর কোনও কথা বললেন না । গুম হয়ে বসে রইলেন ।

একটু পরেই গাড়িটা এসে গেল । সন্তুকে এনে শুইয়ে দেওয়া হল পেছনের সিটে । কাকাবাবু তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসলেন । ইঞ্জেকশানের প্রভাবে সন্তু এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই ।

অম্বর বলল, “সার, আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে ? যদি কোনও কাজে লাগতে পারি ?”

কাকাবাবু তার হাতটা ধরে বললেন, “না, তার আর দরকার নেই । উত্তেজনার মাথায় তোমাকে অনেক বকাবকি করেছি । কিন্তু তুমি আমাদের খুব উপকার করেছ । তোমার আছে কৃতজ্ঞ ।”

অম্বর বলল, “ওসব কী বলছেন, সার । এমন কিছুই করিনি । চিন্তা করবেন না, সন্তু ভাল হয়ে উঠবে । আবার দেখা হবে ।”

কাকাবাবু বললেন, “আশা করি আবার দেখা হবে ।”

গাড়িটা পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগল । বেশ কিছুটা নেমে আসার পর দেখা গেল কার্ল জরগেন নামে জার্মান ছেলেটি কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে হেঁটে-হেঁটে আসছে । সে হাত তুলে গাড়িটা থামাল ।

কাকাবাবু জানলা দিয়ে বললেন, “তুমি লিফ্‌ট চাও ? তোমাকে কোথাও নামিয়ে দিতে হবে ?”

ছেলেটি হেসে বলল, “না, আমি হেঁটে-হেঁটে ঘুরতেই ভালবাসি । পাখি খুঁজতে বেরিয়েছি । কিন্তু আপনি কি ফিরে যাচ্ছেন নাকি ? আজ সন্ধেবেলা আসবেন না ?”

কাকাবাবু বললেন, “একটা খুব জরুরি কারণে আজ চলে যেতে হচ্ছে । সন্ধেবেলা আসব না । তবে, এখানে পরে আবার কখনও ফিরে আসব ।”

দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, নিশ্চিত ফিরে আসব । কুমার সিং আর ভুবন দাস এখন পালিয়েছে বটে । কিন্তু যেখানেই লুকিয়ে থাক, আমার হাত থেকে ওরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না । ওদের শাস্তি দিতেই হবে ।”

॥ ৪ ॥

আগাগোড়া জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ, ছোট-ছোট পাহাড় ঘুরে-ঘুরে এগিয়ে চলল গাড়িটা । পাশে-পাশে দেখা যায় জাটিংগা নদী । বর্ষার জলে একেবারে ভর্তি, স্রোতও খুব । মনে হয় যেন নদীটা মাঝে-মাঝে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছে ।

নদীর ধারে-ধারে রেল লাইন। উলটো দিকের একটা ট্রেন যাচ্ছে। ছোট ট্রেন, দূর থেকে খেলনার মতন মনে হয়। পাহাড়ের মাঝে-মাঝে টানেল, ট্রেনটা এক-একবার ঢুকে যায় অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। গাড়ি অবশ্য বাইরে দিয়েই যায়।

জজসাহেব বসেছেন সামনের সিটে। মাঝে-মাঝে পেছনে তাকিয়ে দেখছেন সন্তুকে। গাড়িতে উঠেই তিনি বলেছেন যে, শিলচরে তাঁর চেনা একজন ডাক্তার আছেন। খুব ভাল ডাক্তার। তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন, দরকার হলে অপারেশানও করতে পারবেন।

একবার গাড়িতে খুব জোর ঝাঁকুনি লাগতেই সন্তু চোখ মেলে চাইল।

কাকাবাবু অমনি মুখ ঝুঁকিয়ে বললেন, "সন্তু, খুব ব্যথা করছে ?

সন্তু কোনও কথা না বলে কয়েক মিনিট চেয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "হ্যাঁ, ব্যথা আছে। খুব বেশি না। কাকাবাবু, তোমার কিছু হয়নি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমার কিছু হয়নি !"

সন্তু খুব একটা নিশ্চিন্ত ভাব করে বলল, "ও ! তোমার কিছু হয়নি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি আর-একটু ঘুমোই ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ঘুমো ঘুমো !"

গাড়ির ড্রাইভারটি বেশ দক্ষ। রাস্তা অনেক জায়গায় বেশ খারাপ হলেও চার ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে দিল শিলচর শহরে।

ব্রিজের ওপর এক জায়গায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে, সেখানেই দেরি হতে লাগল খানিকক্ষণ। কাকাবাবু অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

পাশ থেকে একজন মোটর সাইকেল আরোহী হঠাৎ বলে উঠল, "আরে, কাকাবাবু ! আপনি এদিকে কবে এলেন ?"

যুবকটিকে দেখে কাকাবাবুর মুখখানাতে স্বস্তি ফুটে উঠল। এর নাম প্রবীর চৌধুরী। কাকাবাবুর এক বন্ধুর ছেলে, ডাক্তার।

কাকাবাবু বললেন, "প্রবীর ? তুমি এখানে কী করছ ?"

প্রবীর বলল, "আমি তো এখানকার এক চা-বাগানে ডাক্তারি করছি দু' বছর ধরে। আপনি জানতেন না ? আমি মাঝে-মাঝে শিলচর শহরে আসি কিছু কেনাকাটা করবার জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "খুব ভাল হল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। শোনো প্রবীর, সন্তুর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, একটা পা ভেঙে গেছে বোধ হয়। এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।"

প্রবীর বলল, "তাই নাকি ? আমার বন্ধুর নার্সিং হোম আছে। চলুন, সেখানে গিয়ে আমি দেখছি। আমার বন্ধুটিও দেখবে।"

জজসাহেব বললেন, "না, না, তার দরকার নেই। আমার চেনা ডক্টর ভার্গব এখানকার খুব নামকরা ডাক্তার। আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আর কোনও

অসুবিধে হবে না।"

এর মধ্যে ট্রাফিক জ্যাম ছেড়ে গেল, গাড়িটা আবার স্টার্ট দিল। প্রবীরের মোটর বাইক আড়ালে পড়ে গেল একটা ট্রাকের।

মিনিট-দশেক পর গাড়িটা থামল একটা বড় বাড়ির সামনে। সেটা একটা নার্সিং হোম বলে মনে হয়।

জজসাহেব প্রথমে নিজে নেমে গিয়ে লোক ডেকে আনলেন। সন্তুকে নিয়ে শোওয়ানো হল একটা ঘরে। তারপর জজসাহেব বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। ডক্টর ভার্গব ওপরে আছেন। আমি তাঁকে ডেকে আনছি। উনি ব্যস্ত থাকলেও আমি অনুরোধ করলে এক্ষুনি আসবেন।"

সন্তুর এখন ঘুম ভেঙে গেছে। সে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, কোনও কথা বলছে না। মাঝে-মাঝে শুধু যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে তার মুখ। কাকাবাবু হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার কপালে।

মিনিট-পাঁচেক বাদেই বিচারকের সঙ্গে নেমে এলেন ডাক্তার ভার্গব। বেশ বলশালী চেহারা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাথায় টাক, গায়ের রং খুব ফর্সা।

তিনি সন্তুর মাথা, বুক, পেট আর পা পরীক্ষা করলেন খুব মনোযোগ দিয়ে। সন্তুকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন কোথায় কতটা লাগছে। সন্তুর নাম, কোন কলেজে পড়ে, কী পড়তে ভাল লাগে, এরকম নানা কথাও জানতে চাইলেন।

তারপর কাকাবাবুকে বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ দিন, এ ছেলেটি বেঁচে গেছে। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। মাথায় তেমন চোট লাগেনি, কথাবার্তা পরিষ্কার বলছে। কয়েকটা এক্স-রে করতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আর পা-টার অবস্থা?"

ডাক্তার ভার্গব একটু সরে এসে বললেন, "পায়ের অবস্থাটাই বেশ খারাপ। মনে হচ্ছে অপারেশান করে বাদ দিতে হবে। প্রাণটাই বেঁচে গেছে, সেই তুলনায় একটা পা যাওয়া আর এমন কী ক্ষতি? তবে এক্ষুনি নয়, দিন-দশেক দেখা দরকার। যদি অপারেশান না করে পা-টা রাখা যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "দিন-দশেক? তা হলে আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।"

ডাক্তার ভার্গব বললেন, "এই অবস্থায় ওকে নাড়াচাড়া করা আরও বিপজ্জনক। এই যে এতখানি রাস্তা এনেছেন; গাড়ির ঝাঁকুনিতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। অন্তত চার-পাঁচদিন একদম চুপচাপ শুইয়ে রেখে দেখা যাক।"

এই সময় পাশ থেকে একজন বলল, "কাকাবাবু একটা কথা বলব?"

কাকাবাবু চমকে গিয়ে দেখলেন ডাক্তার প্রবীর চৌধুরী কখন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে।

প্রবীর ডাক্তার ভার্গবকে বলল, "নমস্কার সার। আমি একজন জুনিয়ার ডাক্তার। তবে আমার বন্ধু ডাক্তার ভূপেন বড়ঠাকুর এখানে অনেকদিন

প্র্যাকটিস করছেন, তাঁকে চেনেন নিশ্চয়ই। ওঁর নিজের বাড়িতেই নার্সিং হোম, সেখানে যদি সন্তুকে নিয়ে রাখা যায়, তা হলে কাকাবাবুও কাছে থাকতে পারবেন।"

ডাক্তার ভার্গব বললেন, "এখানেও কাছেই হোটেল আছে, সেখানে ওঁর থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

জজসাহেব বললেন, "না, না, এখান থেকে আর সরানো ঠিক হবে না। ছেলেটির আরও ক্ষতি হয়ে যাবে।"

প্রবীর বলল, "ভূপেন বড়ঠাকুরের চেম্বার কাছেই। নিয়ে যাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান আছে। ওখানে নিয়ে গেলে আমরা সবাই মিলে চব্বিশ ঘন্টা ওর কাছে থাকতে পারি।

এবার সন্তু বলে উঠল, "আমি প্রবীরদার সঙ্গে যাব!"

ভার্গব ডাক্তার দু' কাঁধ কাঁপিয়ে বললেন, "পেশেন্ট নিজে যদি থাকতে না চায়, তা হলে আমি জোর করে তো ধরে রাখতে চাই না! নিয়ে যান তা হলে!"

প্রবীর সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু জজসাহেবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন। ভার্গব ডাক্তারকেও বললেন, "আপনি ভালভাবে ওকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

ভার্গব ডাক্তারকে টাকা দিতে চাইলেন কাকাবাবু, কিন্তু তিনি নিলেন না।

সন্তুকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে আসা হল ভূপেন বড়ঠাকুরের চেম্বারে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুকে এক্স-রে করার ঘরে নিয়ে গেলেন।

প্রবীর বলল, "জানেন কাকাবাবু, যখনই শুনলাম, সন্তুকে ভার্গব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখনই আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। ডাক্তার হিসেবে ভার্গব খারাপ নন, কিন্তু উনি রুগিদের বেশিদিন ধরে রাখেন। যে রুগিকে চার-পাঁচদিনে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাকেও উনি দশ-বারোদিন আটকে রাখেন। তা ছাড়া সন্তুর পা ভেঙে গেছে, উনি তো হাড়ের ডাক্তার নন। ভূপেন ডাক্তারের একজন সহকর্মী আছেন, ডাক্তার ইউসুফ, তাঁকে বলা যেতে পারে হাড়ের অসুখের জাদুকর।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তোর কী হয়েছিল মনে আছে? তোকে ওরা ঠেলে ফেলে দেওয়ার আগে তুই কিছু বুঝতে পেরেছিলি?"

সন্তু বলল, "আমায় কেউ ঠেলে ফেলে দেয়নি তো!"

প্রবীর অবাক হয়ে বলল, "তা মানে? আপনাদের কে ঠেলে ফেলে দেবে?"

কাকাবাবু বললেন, "দু'জন লোক। আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল, তারপর একটা খাদের পাশে...তোমাকে সব ঘটনাটা পরে বলব। সন্তু, তুই কী বললি? তোকে কেউ ফেলে দেয়নি?"

সন্তু বলল, "না। হঠাৎ ওখানে দেখলাম, পাহাড়ের ওপর থেকে হুড়মুড় করে দু-তিনজন লোক নেমে এল। ওরা ওখানে লুকিয়ে ছিল। আমি পেছন ফিরে তাদের দেখতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। তার মধ্যে ওরা তোমার হাত বেঁধে ফেলেছে। আমি দেখলুম, কুমার সিং তোমাকে লাথি মেরে খাদে ফেলে দিল। তারপর ওরা আমাকেও ধরতে গেল। সামনে আর পেছনদিকে, দু'দিকেই ওরা। একজন আমার একটা হাত ধরেও ফেলেছিল, আমি এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই খাদের মধ্যে লাফ দিলাম!"

কাকাবাবু একটা ভয়ের শব্দ করে বললেন, "অ্যাঁ! বলিস কী? তুই ইচ্ছে করে ওই গভীর খাদে লাফিয়ে পড়লি?"

সন্তু ফ্যাকাসেভাবে হেসে বলল, "হ্যাঁ।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন এরকম কাণ্ড করলি সন্তু? ওরা হয়তো তোকে মারত না?"

সন্তু বলল, "তা বলে ওদের হাতে ধরা দেব? ওরা তোমাকে খাদে ফেলে দিয়েছে, আমি নিজের চোখে দেখলাম, তখন আমার একটাই কথা মনে হয়েছিল। তোমার ভাগ্যে যা ঘটবে, আমারও তাই হবে!"

প্রবীর বলল, "তুই কী সাঙ্ঘাতিক ছেলে রে সন্তু! ইচ্ছে করে খাদে লাফিয়েছিস? লোকগুলো কে? তাদের পুলিশ ধরেনি?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব কথা অন্য কাউকে এখন বলার দরকার নেই।"

অ্যাম্বুলেন্সটা শিলচর শহর ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ির সামনে থামল। বেশ পরিষ্কার, সাজানো-গোছানো বাগানও রয়েছে সামনে, দেখলে নার্সিং হোম বলে মনেই হয় না।

ডাক্তার বড়ঠাকুরকে ডেকে প্রবীর তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

তিনি তাঁর এক সহকারীকে ডেকে সন্তুকে পাঠিয়ে দিলেন এক্স-রে করার জায়গায়। তারপর কাকাবাবুর দিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ছবি আমি কাগজে দেখেছি। কিন্তু এখন তো আপনাকেই খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

প্রবীর কাকাবাবুর কপালে হাত দিয়ে বলল, "বেশ জ্বর!"

কাকাবাবু বললেন, "ও এমন কিছু না। বেশি বৃষ্টিতে ভিজেছি। সন্তুর পা-টা আপনি ভাল করে দেখুন। যদি ওর একটা পা সত্যিই বাদ দিতে হয়..."

হঠাৎ কাকাবাবুর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। হু-হু করে জল এসে গেল দু' চোখে। বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে তিনি উঠছিলেন, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে!

দুই ডাক্তার ধরাধরি করে কাকাবাবুকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল একটা বিছানায়।

প্রবীর ফিসফিস করে বলল, "কারা যেন কাকাবাবুকে হাফলঙ পাহাড়ে হঠাৎ

ঠেলে একটা খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। উনি যে বেঁচে গেছেন, সেটাই একটা চরম আশ্চর্য ব্যাপার। ওঁর নিশ্চয়ই কোথাও খুব চোট লেগেছে, তারপর সারারাত বৃষ্টিতে ভিজেছেন। কিন্তু সন্তুর জন্য এমনই চিন্তিত যে নিজের চিকিৎসার কথা একবারও ভাবেননি।"

ডাক্তার বড়ঠাকুর বললেন, "ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার। আজ রাতটা ভাল করে ঘুমোলেই অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবেন।"

প্রবীর বলল, "সে উনি ঘুমোবেন না। একটু বাদে জ্ঞান ফিরলেই আবার সন্তুর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।"

কাকাবাবুকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ওরা দু'জনে চলে গেল সন্তুর দেখাশোনা করতে।

পরদিন সকালে চোখ মেলেই কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

সে-ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে প্রবীর।

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সন্তু কোথায় ? সন্তু কেমন আছে ?"

প্রবীর বলল, "সন্তু ভাল আছে। আপনার শরীর কেমন ?"

কাকাবাবু বললেন, 'আমি ঠিক আছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ? কাল বিকেল থেকে ? আমি এক্ষুনি সন্তুকে দেখতে চাই !"

প্রবীর বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য একজোড়া ক্রাচ আনছি। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে আপনার অসুবিধে হবে।"

প্রবীর ক্রাচ আনতে গেল, তার মধ্যে কাকাবাবু খাট থেকে নেমে এসে দরজার কাছে এলেন। তাঁর জ্বরটা এখনও পুরো ছাড়েনি। ঠাণ্ডা লেগে মাথাটা ভারী হয়ে আছে, তবু শরীর সুস্থ মনে হচ্ছে অনেকটা।

প্রবীর ক্রাচ নিয়ে ফিরে এসে বলল, "ভাল খবর আছে। এক্স-রে করে দেখা গেছে সন্তুর হাঁটুর মালাইচাকি মোটেই গুঁড়িয়ে যায়নি। ডক্টর ভার্গব ওটা কী করে বললেন, কে জানে ! অত তাড়াতাড়ি তো এক্স-রে হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর পা তা হলে ঠিক হয়ে যাবে ?"

প্রবীর বলল, "মালাইচাকি গুঁড়িয়ে যায়নি। তবে সরে গেছে। অপারেশান করতে হতে পারে। কিন্তু পা কেটে বাদ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।"

কাকাবাবু প্রবীরের কাঁধ ধরে বললেন, "প্রবীর, আজ সকালে তুমি আমায় সত্যিকারের ভাল খবর শোনালে !"

প্রবীর হেসে বলল, "এর পর হয়তো আরও একটা ভাল খবর শুনবেন !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ? কী ?"

প্রবীর বলল, "আর-একটু অপেক্ষা করুন।"

সন্তুর ক্যাবিনে এসে দেখলেন, বিছানায় আধ-শোওয়া হয়ে সন্তু টোস্ট আর ওমলেট খাচ্ছে। দু'জন ডাক্তার বসে আছেন তার কাছে।

ডাক্তার বড়ঠাকুর ছাড়া অন্য ডাক্তারটির দিকে ইঙ্গিত করে প্রবীর বলল,

"কাকাবাবু, আপনাকে যে একজন হাড়ের ডাক্তারের কথা বলেছিলাম, ইনিই সেই ডাক্তার ইউসুফ। ইনি এক-এক সময় আশ্চর্য কাণ্ড করে ফেলেন।"

ইউসুফ ডাক্তার মাঝ-বয়েসী, সাদা রঙের কোট পরা, মুখখানা ভালমানুষ ধরনের। তিনি কাকাবাবুর দিকে হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আশ্চর্য কাণ্ড কিছু না। হাড় যদি না ভাঙে, শুধু এদিক-ওদিক সরে যায়, তা হলে অনেক সময় অপারেশান ছাড়া ঠিক করে দেওয়া যায়। আমি সেই চেষ্টাই একবার করব। আগে ওর খাওয়া হয়ে যাক।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হয়ে গেছে। আর খাব না!"

ইউসুফ ডাক্তার বললেন, "একটু ব্যথা লাগবে। সহ্য করতে পারবে তো?"

সন্তু দু'বার মাথা নাড়ল।

সন্তুর যে-পায়ে চোট লেগেছে, সেই পায়ের প্যান্ট ঊরু পর্যন্ত কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। হাঁটুর কাছে অনেকটা ফোলা।

সন্তুর পা-টা লম্বা করে দিয়ে ইউসুফ ডাক্তার হাত বুলোতে লাগলেন।

সন্তু মাঝে-মাঝে ব্যথায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। দুরুদুরু করছে কাকাবাবুর বুকের ভেতর। তিনি ভাবছেন, উলটোপালটা কিছু করতে গিয়ে আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে কি না।

ডাক্তার বড়ঠাকুর ঠোঁটে একটা আঙুল দিয়ে সবাইকে একেবারে চুপ করে থাকতে বললেন। ইউসুফ ডাক্তার হাত বুলোচ্ছেন, মাথাটা ঝুঁকে গেছে, বিড়বিড় করে নিজের মনে কী যেন বলছেন তিনি।

সবাই তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। কাকাবাবু চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছেন না!

হঠাৎ ইউসুফ ডাক্তার পা-টা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলেন। সন্তু বিকট চিৎকার করে উঠল। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে সে বলি দেওয়া ছাগলের মতন ছটফট করতে-করতে বলতে লাগল, "আঃ, আঃ, মরে গেলুম! মরে গেলুম!"

কাকাবাবু আর্তভাবে বললেন, "কী হল? ছেলেটাকে মেরে ফেললে? অ্যাঁ, মেরে ফেললে?"

ডাক্তার বড়ঠাকুর কাকাবাবুকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাগের চোটে কাকাবাবু রিভলভারটা খোঁজার জন্য পকেটে হাত দিলেন।

ইউসুফ ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, "ঠিক হয়ে গেছে। আর অপারেশান করার দরকার হবে না।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কী হল? তুমি যে বললে ব্যথা পেলেও সহ্য করতে পারবে? খুব বেশি লেগেছে?"

তারপর তিনি জোর করে সন্তুকে বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন মেঝেতে।

সন্তুর চিৎকার থেমে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। সে বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করে

বলল, "দাঁড়াতে পারছি ? অ্যাঁ ? আমি আবার দাঁড়াতে পারছি ?"

ইউসুফ ডাক্তার বললেন, "শুধু দাঁড়ানো নয়, তুমি হাঁটবে। চলো, আমার সঙ্গে বাগানে। আর কোনও অসুবিধে হবে না। হাঁটুর ফোলাটা আস্তে-আস্তে কমে যাবে।"

প্রবীর বলল, "মিরাক্‌ল ! মিরাক্‌ল !"

কাকাবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সত্যিই তো দেখছি মিরাক্‌ল। ডাক্তার ভার্গব বলেছিলেন, ওর পা কেটে বাদ দিতে হবে !"

ডাক্তার বড়ঠাকুর বললেন, "কাকাবাবু, আপনি মাথার ঠিক রাখতে পারেননি ! আর-একটু হলে আপনি ইউসুফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিলেন। তাই আপনাকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম।"

কাকাবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আমার মাথার ঠিক ছিল না। জীবনে আমি অনেক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এবারের মতন ভয় পাইনি কোনওবার। আমি খোঁড়া মানুষ, সন্তু আমার অন্ধের যষ্টি। আমি খোঁড়া, সন্তুও যদি সারাজীবনের মতন খোঁড়া হয়ে যেত...তা হলে...তা হলে...আমার দাদা-বউদির কাছে মুখ দেখাতাম কী করে ? তা হলে আমি আত্মহত্যা করতাম।"

তারপর তিনি ইউসুফ ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনি যে আমার কতখানি উপকার করলেন, তা আমি বোঝাতে পারব না। কী করে যে আপনার ঋণ শোধ করব, তা জানি না !"

ইউসুফ ডাক্তার বললেন, "না, না, আমি আর বেশি কী করেছি ? খানিকটা ভাগ্যের ব্যাপার আছে। মালাইচাকিটা ভাঙেনি ! ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে আমি কিছু করতে পারতাম না।"

প্রবীর বলল, "কাকাবাবু, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না ? ভাগ্যিস ব্রিজের ওপর আমার মোটর বাইকটা আপনাদের গাড়ির পাশাপাশি এল, তাই আপনাদের আমি দেখতে পেলাম। না হলে, ডাক্তার ভার্গবের ওখানে আপনাদের কতদিন পড়ে থাকতে হত তার ঠিক নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে ওরকমভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটাও খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। একেই বলে বোধ হয় নিয়তি। তোমাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা শুধু সন্তুকে বাঁচাওনি,আমাকেও বাঁচিয়েছ !"

প্রবীর বলল, "তা হলে আজ খুব ভাল করে খাওয়াদাওয়া হোক ! এবার আপনাদের খুব জোর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, খাওয়াদাওয়া হোক। খরচ কিন্তু আমি দেব।"

তারপর তিনি একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, "আমাকে এখন কিছু খেতে দিতে পারো ? হঠাৎ টের পাচ্ছি, খুব খিদে পেয়েছে। পরশু রাত্তির থেকে তো কিছু খাইনি।"

"কাকাবাবু, আপনাকে যে একজন হাড়ের ডাক্তারের কথা বলেছিলাম, ইনিই সেই ডাক্তার ইউসুফ। ইনি এক-এক সময় আশ্চর্য কাণ্ড করে ফেলেন।"

ইউসুফ ডাক্তার মাঝ-বয়েসী, সাদা রঙের কোট পরা, মুখখানা ভালমানুষ ধরনের। তিনি কাকাবাবুর দিকে হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আশ্চর্য কাণ্ড কিছু না। হাড় যদি না ভাঙে, শুধু এদিক-ওদিক সরে যায়, তা হলে অনেক সময় অপারেশান ছাড়া ঠিক করে দেওয়া যায়। আমি সেই চেষ্টাই একবার করব। আগে ওর খাওয়া হয়ে যাক।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হয়ে গেছে। আর খাব না!"

ইউসুফ ডাক্তার বললেন, "একটু ব্যথা লাগবে। সহ্য করতে পারবে তো?"

সন্তু দু'বার মাথা নাড়ল।

সন্তুর যে-পায়ে চোট লেগেছে, সেই পায়ের প্যান্ট ঊরু পর্যন্ত কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। হাঁটুর কাছে অনেকটা ফোলা।

সন্তুর পা-টা লম্বা করে দিয়ে ইউসুফ ডাক্তার হাত বুলোতে লাগলেন।

সন্তু মাঝে-মাঝে ব্যথায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। দুরুদুরু করছে কাকাবাবুর বুকের ভেতর। তিনি ভাবছেন, উলটোপালটা কিছু করতে গিয়ে আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে কি না।

ডাক্তার বড়ঠাকুর ঠোঁটে একটা আঙুল দিয়ে সবাইকে একেবারে চুপ করে থাকতে বললেন। ইউসুফ ডাক্তার হাত বুলোচ্ছেন, মাথাটা ঝুঁকে গেছে, বিড়বিড় করে নিজের মনে কী যেন বলছেন তিনি।

সবাই তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। কাকাবাবু চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছেন না!

হঠাৎ ইউসুফ ডাক্তার পা-টা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলেন। সন্তু বিকট চিৎকার করে উঠল। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে সে বলি দেওয়া ছাগলের মতন ছটফট করতে-করতে বলতে লাগল, "আঃ, আঃ, মরে গেলুম! মরে গেলুম!"

কাকাবাবু আর্তভাবে বললেন, "কী হল? ছেলেটাকে মেরে ফেললে? অ্যাঁ, মেরে ফেললে?"

ডাক্তার বড়ঠাকুর কাকাবাবুকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাগের চোটে কাকাবাবু রিভলভারটা খোঁজার জন্য পকেটে হাত দিলেন।

ইউসুফ ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, "ঠিক হয়ে গেছে। আর অপারেশান করার দরকার হবে না।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কী হল? তুমি যে বললে ব্যথা পেলেও সহ্য করতে পারবে? খুব বেশি লেগেছে?"

তারপর তিনি জোর করে সন্তুকে বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন মেঝেতে।

সন্তুর চিৎকার থেমে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। সে বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করে

বলল, "দাঁড়াতে পারছি ? অ্যাঁ ? আমি আবার দাঁড়াতে পারছি ?"

ইউসুফ ডাক্তার বললেন, "শুধু দাঁড়ানো নয়, তুমি হাঁটবে। চলো, আমার সঙ্গে বাগানে। আর কোনও অসুবিধে হবে না। হাঁটুর ফোলাটা আস্তে-আস্তে কমে যাবে।"

প্রবীর বলল, "মিরাক্‌ল ! মিরাক্‌ল !"

কাকাবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সত্যিই তো দেখছি মিরাক্‌ল। ডাক্তার ভার্গব বলেছিলেন, ওর পা কেটে বাদ দিতে হবে !"

ডাক্তার বড়ঠাকুর বললেন, "কাকাবাবু, আপনি মাথার ঠিক রাখতে পারেননি ! আর-একটু হলে আপনি ইউসুফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিলেন। তাই আপনাকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম।"

কাকাবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আমার মাথার ঠিক ছিল না। জীবনে আমি অনেক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এবারের মতন ভয় পাইনি কোনওবার। আমি খোঁড়া মানুষ, সন্তু আমার অন্ধের যষ্টি। আমি খোঁড়া, সন্তুও যদি সারাজীবনের মতন খোঁড়া হয়ে যেত...তা হলে...তা হলে...আমার দাদা-বউদির কাছে মুখ দেখাতাম কী করে ? তা হলে আমি আত্মহত্যা করতাম।"

তারপর তিনি ইউসুফ ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনি যে আমার কতখানি উপকার করলেন, তা আমি বোঝাতে পারব না। কী করে যে আপনার ঋণ শোধ করব, তা জানি না !"

ইউসুফ ডাক্তার বললেন, "না, না, আমি আর বেশি কী করেছি ? খানিকটা ভাগ্যের ব্যাপার আছে। মালাইচাকিটা ভাঙেনি ! ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে আমি কিছু করতে পারতাম না।"

প্রবীর বলল, "কাকাবাবু, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না ? ভাগ্যিস ব্রিজের ওপর আমার মোটর বাইকটা আপনাদের গাড়ির পাশাপাশি এল, তাই আপনাদের আমি দেখতে পেলাম। না হলে, ডাক্তার ভার্গবের ওখানে আপনাদের কতদিন পড়ে থাকতে হত তার ঠিক নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে ওরকমভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটাও খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। একেই বলে বোধ হয় নিয়তি। তোমাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা শুধু সন্তুকে বাঁচাওনি,আমাকেও বাঁচিয়েছ !"

প্রবীর বলল, "তা হলে আজ খুব ভাল করে খাওয়াদাওয়া হোক ! এবার আপনাদের খুব জোর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, খাওয়াদাওয়া হোক। খরচ কিন্তু আমি দেব।"

তারপর তিনি একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, "আমাকে এখন কিছু খেতে দিতে পারো ? হঠাৎ টের পাচ্ছি, খুব খিদে পেয়েছে। পরশু রাত্তির থেকে তো কিছু খাইনি।"

ডাক্তার বড়ঠাকুর বললেন, "অ্যাঁ ? পরশু থেকে কিছু খাননি ? কাল আপনাকে কিছু খেতে দেওয়ার কথা আমাদের মনেই পড়েনি !"

কাকাবাবু বললেন, "পরশু তো ওরা নেমন্তন্ন খাওয়াবে বলে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু খাওয়াবার বদলে দিল ধাক্কা !"

ডাক্তার বড়ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কারা ? আপনাদের খুন করে ওদের লাভ কী হত ?"

কাকাবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা এখনও জানি না। তবে জানতে পারব ঠিকই। যাদের জন্য সন্তু খোঁড়া হয়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে, তাদের সবক'টাকে আমি খোঁড়া করে ছাড়ব !"

॥ ৫ ॥

পরদিনই কাকাবাবু কলকাতার প্লেনের টিকিট কাটলেন।

সন্তু একবার জিজ্ঞেস করল, "আমরা হাফলঙ ফিরে যাব না ?"

কাকাবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "না। কলকাতায় গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর কী করব ভেবে দেখা যাবে।"

শিলচর বিমানবন্দরটি শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা। ডাক্তার বড়ঠাকুর আর প্রবীর গাড়ি করে পৌঁছে দিতে এল। প্রবীর অনেকবার অনুরোধ করেছিল, তাদের চা-বাগানে কয়েকদিন থেকে যাওয়ার জন্য। কাকাবাবু রাজি হননি।

প্লেনটা ঠিক সময়েই এসেছে। দুই ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাকাবাবু আর সন্তু এগিয়ে গেল সিকিউরিটির দিকে। সন্তু এখন মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই হাঁটছে, শুধু তার একটা কানে খুব ব্যথা। কানেও যে চোট লেগেছিল, সেটা পায়ের ব্যথার সময় তেমন টেরই পায়নি।

প্লেন ছাড়ার পর কাকাবাবু একটা খবরের কাগজ চেয়ে নিলেন। বেশ কয়েকদিন খবরের কাগজের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ছিল না।

সন্তু বসেছে জানলার ধারে। আজ আকাশ মেঘলা, কিছুই দেখার নেই, তবু সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। বাংলা কাগজ শেষ করে তিনি একটা ইংরেজি কাগজ চাইলেন। তাড়াতাড়ি পাতা উলটে-উলটে কোনও একটা খবর খুঁজতে লাগলেন, সেই খবরটা পড়ে তিনিই সামনের সিটের ভদ্রলোকের কাছ থেকে আর-একটা ইংরেজি কাগজ চেয়ে নিয়ে প্রথম পাতায় চোখ রেখে চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

সন্তু একবার একটা কাগজ নিয়ে খেলার খবরগুলো দেখে নিল ভাল করে। অন্য কোনও খবর পড়তে তার ইচ্ছে হল না।

এক ঘন্টার মধ্যে প্লেন পৌঁছে গেল দমদম।

বাইরে বেরিয়ে এসে কাকাবাবু বললেন, "একটা ট্যাক্সি ধরে দিলে তুই বাড়ি চলে যেতে পারবি তো?"

সন্তু চমকে গিয়ে বলল, "আমি একা যাব! তুমি যাবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "না। আমার একটা কাজ আছে।"

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "এয়ারপোর্টে কাজ আছে?"

কাকাবাবু একটু আমতা-আমতা করে বললেন, "না, ঠিক এয়ারপোর্টে কাজ নেই। আমাকে আজই ভুবনেশ্বর যেতে হবে।"

সন্তু আরও অবাক হয়ে বলল, "ভুবনেশ্বর? কেন?"

কাকাবাবু এবার খানিকটা রেগে গিয়ে বললেন, "তোকে সব কথা বলতে হবে নাকি? ভুবনেশ্বরে যাব, আমার ইচ্ছে হয়েছে!"

সন্তু বলল, "তা হলে আমি যাব না কেন? আমরা তো হাফলঙে আট-দশদিন থাকব, বলে এসেছিলাম বাড়িতে। মোটে তিন-চারদিন পরেই ফিরে এলাম। এখনও অন্য জায়গায় ঘুরে আসতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোর শরীর ভাল নয়। তোকে এখন কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হবে।"

সন্তু বলল, "তোমারও তো শরীর খারাপ। আমি বেশ ভাল আছি। তুমি ভুবনেশ্বর গেলে আমি যাবই!"

কাকাবাবু চোখ গরম করে বললেন, "দ্যাখ সন্তু, তোকে একটা স্পষ্ট কথা বলি। এবার থেকে আমার সঙ্গে তোকে আর কোথাও নিয়ে যাব না ঠিক করেছি!"

সন্তু কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞেস করল, "কেন? আমি কিছু দোষ করেছি?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই দোষ করেছিস। তোকে আর কোনওদিন আমার সঙ্গে নেব না!"

কাকাবাবুর রাগ থেকেও সন্তু ঠিক ভয় পেল না। হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বলল, "আমি একা কিছুতেই বাড়ি যাব না। আমি এখানেই থাকব।"

কাকাবাবু সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

এয়ারপোর্ট থেকে অনবরত লোকজন বেরোচ্ছে আর ঢুকছে। বাইরে বেশ রোদ। গরম। এখানে আকাশে মেঘ নেই, অথচ শিলচরের আকাশে ছিল জমাট মেঘ। বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা ছিল।

কাকাবাবু একটা ফাঁকা জায়গার দিকে সরে গেলেন। সন্তুও কাছে এসে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোকে আমি সঙ্গে নিতে পারি। কিন্তু তার আগে তোকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুই ইচ্ছে করে খাদে লাফ দিয়েছিলি

কেন ? পাগল ছাড়া এরকম কেউ করে ?”

সন্তু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে আবার বললেন, “ওরকম আর কখনও করবি না। এবারে আমরা দু'জনেই অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছি। আমাকে আচমকা ঠেলে দিয়েছিল। তোকে তো না ফেলে দিতেও পারত। হয়তো দু-একদিন ধরে রেখে দিয়ে পরে ছেড়ে দিত। সব সময় বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হয়। আমাকে যদি মেরেও ফেলে, তবু তুই পালিয়ে গিয়ে কিংবা যে-কোনও উপায়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবি। না বাঁচলে তো কিছুই করা যায় না। বেঁচে থাকলে তবু আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারবি। বদমাশ লোকগুলোকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবি! আমার বয়েস হয়েছে, আমি এখন মরলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তোকে বেঁচে থাকতেই হবে।”

সন্তু চুপ করে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, “কী, মনে থাকবে তো ? আর কোনওদিন ইচ্ছে করে ঝাঁপ দিবি না!”

সন্তু দু' দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “নাছোড়বান্দা ছেলে, চল তা হলে। কিন্তু কেন এখন ভুবনেশ্বর যাচ্ছি তা জিজ্ঞেস করা চলবে না।”

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে চেনেন কাকাবাবু। তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই দুটো টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেল। দু' ঘন্টা বাদেই ভুবনেশ্বরের প্লেন।

ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করলেন কাকাবাবু। শহরের দিকে গেলেন না। গাড়ি ছুটল বেরহামপুরের দিকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল সন্তু। এবার সে আপন মনে বলল, “বুঝেছি!”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী বুঝেছিস।”

সন্তু বলল, “ভুবনেশ্বরে তোমার কোনও কাজ নেই। আমাদের গোপালপুর-অন-সি যাওয়ার কথা ছিল, তুমি সেখানেই যাচ্ছ।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক ধরেছিস তো! আসলে এবারে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ক'টা দিন কাটাব ঠিক করেছিলাম, হঠাৎ চলে যেতে হল পাহাড়ে। সমুদ্র মনটাকে টানছে। তাই ভাবলাম, যাই একবার, সমুদ্র-দর্শন করে আসি।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “ভুবনেশ্বর থেকে পুরী অনেক কাছে। সেখানে গেলে না কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “পুরীতে বড্ড ভিড় হয়। গোপালপুরে আমরা একটা বাংলো বুক করেছিলাম মনে আছে ? তাড়াহুড়োতে সেটা ক্যানসেল করানো হয়নি। সেখানে গেলে বোধ হয় জায়গা পাওয়া যাবে। শোন, সেখানে গিয়ে শুধু খাবি আর শুয়ে থাকবি। সম্পূর্ণ বিশ্রাম।”

সন্তু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, “আর তুমি ?”

কাকাবাবু বললেন, “আমিও বিশ্রাম নিতেই যাচ্ছি। কেউ তো আমাদের

ওখানে যেতে বলেনি, কেউ কোনও কাজের ভারও দেয়নি। শুধু সমুদ্র দেখব আর শুয়ে-শুয়ে বই পড়ব!"

ওরা গোপালপুরে পৌঁছে গেল সন্ধের ঠিক একটু আগে।

এখানে কয়েকটা হোটেল আছে। কিছু-কিছু ফাঁকা বাড়িও রয়েছে, লোকেরা সেই বাড়ি ভাড়া করে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য থেকে যায়।

কাকাবাবু গাড়িটা থামালেন একটা বাংলোর সামনে। এটা সরকারি বাংলো, কাকাবাবুর নামে এখনও রিজার্ভেশান রয়েছে, জায়গা পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।

জিনিসপত্র নামাবার পর পেছনদিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। সকালবেলায় ছিল পাহাড় অঞ্চলে। এখন সামনে বিশাল সমুদ্র। লাল রঙের সূর্য আধখানা ডুবেছে জলে, সামনে লাল রঙের ঢেউ, আকাশে কতরকম ছবি।

অনেকদিন সমুদ্র দ্যাখেনি সন্তু। তার এত ভাল লাগছে যে, সে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না।

সন্তু সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। একটু বাদে কাকাবাবু এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

দু'জনেই একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কাকাবাবু বললেন, "সমুদ্রের দিগন্তে সূর্যাস্ত, দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায়, তাই না রে? কোনও পাহাড়ের ওপরে উঠে দাঁড়ালেও দেখা যায় কতখানি নীল আকাশ, আর চোখ যতদূর যায় শুধু সবুজ। কী চমৎকার আমাদের এই পৃথিবী। তবু মানুষ এখানে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে পারে না। লোভ করে, হিংসে করে, খুনোখুনি করে!"

সন্তু চুপ করে রইল।

কাকাবাবু আপনমনে আবৃত্তি করলেন :

কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর?

হঠাৎ থেমে গিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার লেখা বল তো?"

সন্তু টপ করে বলে দিল, "মাইকেল মধুসূদন। মেঘনাদবধ কাব্য!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর পারবার উপায় নেই। তারা এত কিছু জানে! আমাদের সময়কার ছাত্রছাত্রীরা এত সহজে বলতে পারত না। তোদের বুঝি মেঘনাদবধ পাঠ্য ছিল?"

সন্তু বলল, "না। আমি এমনিই পড়েছি। অনেক শক্ত-শক্ত কথা আছে,

তবু পড়তে বেশ ভাল লাগে। রত্নাকর মানে যে সমুদ্র, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু প্রচেতঃ মানেও যে সমুদ্র, সেটা আমাকে ডিকশনারি দেখে জানতে হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সমুদ্র নয়, বরুণ দেবতা। কথাটা আসলে প্রচেতস কিংবা প্রচেতা, তাই না ?"

সন্তু বলল, "অত আমি জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, সূর্য ডুবে গেল। শোন, আমরা এখন বেরুব। এখানকার ম্যানেজার বলল, বাংলোতে আর কোনও লোক নেই। আজ রাত্তিরে ওরা খাবার দিতে পারবে না। বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হবে। কাল থেকে এখানেই সব পাওয়া যাবে।"

সন্তু বলল, "এক্ষুনি খেতে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "সারাদিনে দু'বার প্লেন পালটাতে হয়েছে। তারপর গাড়িতে এতখানি রাস্তা। অনেক ধকল গেছে। আজ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব। দুপুরে তো ভাল করে খাওয়া হয়নি।"

জামা-প্যান্ট না বদলেই বেরিয়ে পড়ল সন্তু।

রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ওরা দু'জনে হাঁটতে লাগল জলের ধার দিয়ে। সন্তু জুতো খুলে ফেলে প্যান্ট গুটিয়ে পা ভেজাতে লাগল। নরম বালিতে ক্রাচ দিয়ে হাঁটতে কাকাবাবুর একটু অসুবিধে হয়, কাকাবাবু তাই একটু দূরে রয়েছেন। সূর্য ডুবে গেলেও বিশেষ অন্ধকার হয়নি। এরই মধ্যে জ্যোৎস্না হয়েছে খানিকটা। ঢেউগুলো অবিরাম এসে ভেঙে পড়ছে তীরে।

মাঝে-মাঝে দু-একটা জেলে-নৌকো টেনে তোলা আছে পারের ওপর। ভোরবেলা জেলেরা এইসব নৌকো ভাসিয়ে মাছ ধরতে যায়। সন্তু একটা নৌকোয় লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল, তার সেই হাঁটুতে এখনও খানিকটা ব্যথা আছে।

একটা ভোঁ-ভোঁ শব্দ শুনে সন্তু জলের দিকে তাকাল। বড়-বড় ঢেউগুলো যেখানে ভাঙছে, তার থেকেও খানিকটা দূরে একটা স্পিড বোট যাচ্ছে মনে হল। সন্তু থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেটাকে।

ঢেউয়ের ওপর লাফাতে-লাফাতে স্পিড বোটটা যেন এদিকেই আসছে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্পিড বোটটা তীরের কাছে এসে থামল। সেখানে প্রায় একহাঁটু জল। বোট থেকে একজন লোক নেমে জল ঠেলে এগোতে লাগল, বোটটা আবার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সমুদ্রে।

প্যান্ট-কোট পরা লোকটির মুখভর্তি দাড়ি। এক হাতে টর্চ। সেই টর্চের আলো ফেলে তিনি চারপাশটা দেখলেন। সন্তু দাঁড়িয়ে আছে একটা নৌকোয় হেলান দিয়ে, তার মুখে আলো পড়ল।

তার আগেই সন্তু সেই লোকটাকে চিনতে পেরেছে। হাফলঙের

ডাকবাংলোর সেই জজসাহেব !

দু'জনেই দু'জনকে দেখে খুব অবাক হয়েছে।

বিচারকই প্রথম বললেন, "আরে, তুমি এখানে ? কী আশ্চর্য ? কী আশ্চর্য !"

দূর থেকে গলার আওয়াজ শুনে কাকাবাবু ডাকলেন, "সন্তু ? সন্তু ?"

এবার বিচারক আর সন্তু দু'জনেই এগিয়ে গেল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু কিছু বলার আগেই বিচারক উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, "এ তো দারুণ আনন্দের ব্যাপার। আপনার ভাইপোর পা ঠিক হয়ে গেছে ? আপনাদের এখানে দেখতে পাব, ভাবতেই পারিনি ! হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হঠাৎ এখানে ?"

বিচারক বললেন, "আমার তো কিছুই করার নেই। ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। আপনার মুখে সেদিন গোপালপুর-অন-সি-র নাম শুনলাম। তাই ভাবলাম, সে-জায়গাটা কখনও দেখিনি, যাই ঘুরে আসি। আপনারাও যে এখানে আসবেন, তা কল্পনাও করিনি। আগে জানলে একসঙ্গে আসা যেত !"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর পা সেরে গেল। তাই আমরা এখানে এসেছি বিশ্রাম নিতে।"

বিচারক বললেন, "ভাল, ভাল, খুব ভাল ! আছেন তো কয়েকদিন। দেখা হবে। এখন যাই হোটেলে। একটা স্পিড বোটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জলের ছিটে লেগে জামা-টামা সব ভিজে গেছে। এক্ষুনি পালটাতে হবে। বুড়ো হয়েছি তো। ঠাণ্ডা লেগে গেলেই মুশকিল।"

বিচারক কাকাবাবুর সঙ্গে করমর্দন করলেন। সন্তুর পিঠ একবার চাপড়ে দিয়ে বললেন, "ব্রেভ ইয়াংম্যান ! পরে দেখা হবে, চলি !"

টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে তিনি চলে গেলেন রাস্তার দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "রিটায়ার্ড জজ। সময় কাটে না। তাই নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। ভদ্রলোকের বউ, ছেলেমেয়ে কেউ নেই !"

সন্তু বলল, "হাফলঙে উনি বাংলো ছেড়ে একটুও বেরুতেন না। সবসময় বারান্দায় বসে থাকতেন। আর এখানে এসেই স্পিড বোটে চেপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বেশ সাহস আছে !"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ-কেউ পাহাড়ে ভয় পায়, কিন্তু জল ভালবাসে। আবার এর উলটোটাও আছে। পাহাড় আর সমুদ্রের মধ্যে তোর কোনটা বেশি ভাল লাগে রে সন্তু ?"

সন্তু বলল, "দুটোই !"

কাছাকাছি একটা হোটেলে খাওয়ার জন্য ঢুকে পড়ল দু'জনে। বর্ষাকাল বলেই বোধ হয় টুরিস্ট বেশি নেই। সমুদ্রের ধারও ফাঁকা। হোটেলেও ভিড় দেখা গেল না।

মাংস নেই, শুধু দু-তিন রকমের মাছ। এখানে মাছ শস্তা। বেশ ভাল

চিংড়িমাছ ভাজা, ডাল আর অন্য একটা মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়া হয়ে গেল।

মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। হোটেল থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমার কিন্তু এর মধ্যেই খুব ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। চল, আজ রাতটা ভাল করে ঘুমোব!"

সন্তু বলল, "আমার এত তাড়াতাড়ি ঘুম পাবে না। আমি বেশি রাত্তিরে আর-একবার সমুদ্রের ধারে যাব। ঢেউয়ের আওয়াজ শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "থাকব তো কয়েকদিন। কাল রাত্তিরে যাস!"

এবার আর হেঁটে ফেরা নয়। একটা সাইকেল রিকশা নেওয়া হল। বাতাসে মাছ-মাছ গন্ধ। হাফলঙের হাওয়া আর এখানকার হাওয়ায় কত তফাত। জাটিংগাতে ঠিক এই সময় ফাঁকা জায়গাটায় মশালের সামনে আকাশ থেকে ধুপ-ধুপ করে কয়েকটা পাখি পড়েছিল।

উলটো দিক থেকে আর একটি সাইকেল রিকশা আসছে। তাতে বসে আছেন একজন লোক। মাথায় বড়-বড় চুল, কাঁধে একটা ঝোলা। পায়ের কাছে একটা সুটকেস।

রিকশাটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সন্তু একঝলক রিকশার যাত্রীটির মুখ দেখতে পেল। দারুণ চমকে সে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। সেই সাপুড়ে যুবক, পীতাম্বর পাহাড়ী!

সে সন্তুদের দেখতে পায়নি, রিকশাটা পেরিয়ে চলে গেল।

কাকাবাবু ঠিক লক্ষ করেছেন। তিনি খানিকটা মজার ভঙ্গিতে বললেন, "কী ব্যাপার, পাহাড় থেকে লোকেরা সমুদ্রের ধারে চলে আসছে? হাফলঙের দু'জনকে দেখা গেল এরই মধ্যে!"

বিচারককে দেখার চেয়েও পীতাম্বর পাহাড়ীকে দেখে সন্তু খুব বেশি অবাক হয়ে গেছে। রিটায়ার্ড জজের হাতে কোনও কাজ নেই, অনেক পয়সা-কড়ি আছে, তিনি যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারেন। কিন্তু যে-লোকটা জীবিকার জন্য বনে-জঙ্গলে সাপ ধরে বেড়ায়, সে কেন হঠাৎ এই সমুদ্রের ধারে আসবে?

কাকাবাবু বললেন, "এই পীতাম্বর, মানে অম্বর, খাদের তলা থেকে তোকে আর আমাকে উদ্ধার করেছে। অনেক সাহায্য করেছে। ওর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, ও সেই সাতসকালে খাদের অত নীচে গেল কেন? শুধু সাপ ধরার জন্য? নাকি ও জানত যে, আমাদের ওখানে পাওয়া যাবে?"

সন্তু চমকে বলল, "অ্যাঁ?"

কাকাবাবু বললেন, "সাপটাপ খুব একটা খুঁজছিল বলে তো মনে হয় না। বন-জঙ্গল ভেদ করে সোজা যেন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হল।"

সন্তু বলল, "ও জানত যে, আমাদের কোথায় ফেলে দেওয়া হবে? কী করে

জানবে ? কুমার সিং-দের সঙ্গে তো ওর ভাব ছিল না। কুমার সিং প্রথম থেকেই ওকে পছন্দ করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা অভিনয় হতে পারে। আমাদের সামনে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, ওরা দু'জনে দু'জনকে সহ্য করতে পারছে না।"

সন্তু বলল, "ও যদি কুমার সিং-দের দলেরই লোক হবে, তা হলে আবার আমাদের উদ্ধার করতে গেল কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা একটা শক্ত প্রশ্ন বটে। এর উত্তরটা খুঁজে বের করতে হবে। ওর সাপ ধরার কথাটা সত্যি কি না, সেটাও জানা দরকার। খুব ভাল ট্রেইনিং না থাকলে এমনি-এমনি জঙ্গলে গিয়ে বিষাক্ত সাপ ধরা চাট্টিখানি কথা নাকি ?"

সন্তু বলল, "ও জোঁকের ভয়ে জঙ্গলে ঘোরার সময় পকেটে নুন রাখে। কিন্তু কুমার সিং আর ভুবন দাসরা তো সেরকম কিছু বলল না। ওরা জোঁকের কথা জানেই না মনে হল। কিংবা যারা জঙ্গলে রোজ ঘোরে, তারা বোধ হয় জোঁকের ভয় পায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই জঙ্গলে জোঁক আছে এটা ঠিক। নুন দিয়ে খুব সহজে জোঁক মারা যায় এটাও ঠিক। অম্বর বলেছিল, ওখানকার জঙ্গলে বড়-বড় বাঘ নেই, লেপার্ড আছে আর ভাল্লুক আছে। কুমার সিং-রা বলল, ওখানে লেপার্ড নেই, ভাল্লুক একেবারেই নেই। বড়-বড় বাঘ আর হাতি আছে। তা বলে কারা ঠিক কথা বলছে ?"

সন্তু বলল, "অম্বরের ভাল্লুকের গল্পটা বানানো মনে হয়েছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "কুমার সিং-এর জঙ্গলের মধ্যে লরিতে শুয়ে থাকা আর বাঘ এসে পড়ার গল্পটা তোর বানানো মনে হয়নি ? ওদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলে তো মনে হয় না !"

সন্তু বলল, "আমার মাথায় যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে ! তা হলে ওরা সবাই কি সত্যিই এক দলের ?"

কাকাবাবু জোরে হেসে উঠে বললেন, "তোকে আর এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ রাত্তিরে টেনে এক ঘুম দে।"

সাইকেল রিকশাটা থামল বাংলোর সামনে।

ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল পুরোদস্তুর পোশাক পরা দু'জন পুলিশ বসে আছে সেখানে।

কাকাবাবুকে দেখেই একজন উঠে দাঁড়াল। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আপনিই মিঃ রাজা রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

পুলিশ জিজ্ঞেস করল, "আপনার নামে এই বাংলোর ঘর পাঁচদিন আগে বুক করা ছিল ? আপনি তখন আসেননি কেন ?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিছু একটা অসুবিধে ছিল। তাই আসিনি। কেন, না-আসাটা অপরাধ নাকি?"

পুলিশটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছেলেটি কি আপনার ভাই?"

সন্তুর চেহারা এখন বেশ বড়সড় হয়েছে। কাকাবাবুর শরীরে এখনও বয়েসের ছাপ পড়েনি। তাঁর চওড়া বুক ও হাতের মাস্‌ল দেখলেই বোঝা যায় তিনি একজন বেশ শক্তিশালী পুরুষ। অনেকেই আজকাল সন্তুকে তাঁর ভাইপো ভাবে না, মনে করে ওরা দুই ভাই।

অন্য পুলিশটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাদের দু'জনকে একবার থানায় যেতে হবে। এস. পি. সাহেব একবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "থানায়? তা যেতে পারি। আমি যাব। এই ছেলেটি আমার ভাইপো। ওর শরীর ভাল নয়, ও যাবে না।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমিও যাব।"

একজন পুলিশ বলল, "আপনারা দু'জনেই গেলে ভাল হয়।"

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, "না, ও যাবে না। আপনারা কি আমাদের অ্যারেস্ট করতে এসেছেন নাকি? ওয়ারেন্ট আছে?"

অন্য পুলিশটি বলল, "না, না, সেরকম কিছু নয়। ঠিক আছে, আপনি একলাই চলুন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি নিজেও যেতে রাজি হতে না পারতাম। আপনাদের বলতাম, আপনাদের এস. পি.-কে এখানে ডেকে আনতে। তিনি কী জানতে চান, এখানে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু সেটা বলছি না, কারণ আমি নিজেই একবার থানায় যেতাম। কাল সকালে আমার কয়েকটা খবর নেওয়ার আছে।"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই ঘরে যা, সন্তু। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি।

॥ ৬ ॥

ঠিক এক ঘন্টা বাদেই ফিরে এলেন কাকাবাবু।

সন্তু ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়ছে। দরজাটা ভেজানো। দরজার বাইরে শোনা গেল তিন-চারজন লোকের গলার আওয়াজ। তারা খাতির করা সুরে বলছে, "আপনার কোনও অসুবিধে হবে না, সার। আমাদের একজন লোক সব সময় এখানে থাকবে। আপনার জন্য গাড়ি রেডি থাকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার কিছু লাগবে না এখন। গুড নাইট।"

সন্তু প্রথমে পুলিশ দেখে একটু চমকে উঠেছিল। পরে সে কাকাবাবুর সঙ্গে থানায় যেতে চেয়েছিল এই মজাটাই দেখার জন্য। যে পুলিশ দু'জন এসেছিল, তারা কাকাবাবুকে চেনে না। কিন্তু থানায় গেলে এস. পি. কিংবা বড় অফিসাররা কাকাবাবুর পরিচয় পেলেই তাঁদের ব্যবহার বদলে ফেলবেন।

কাকাবাবু ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি বন্ধ করে দিতেই সন্তু বলল, "আমি দুটো জিনিস জেনে গেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? তুই কী-কী জেনেছিস শুনি ?"

সন্তু বলল, "আমরা গোপালপুরে না এসে আসামের হাফলঙে চলে গিয়েছিলাম। পার্কে একটা লোক তোমাকে পাখির রহস্যের কথা বলে তোমার মন ভুলিয়ে দিয়েছিল। আসলে লোকটির মতলব ছিল তোমাকে এই সময় গোপালপুরে আসতে না দেওয়া।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা ঠিক ধরেছিস। আমি যে পাখি ভালবাসি, তাও খবর রেখেছে লোকটা। অন্য কোনও রহস্যের কথা বললে কিংবা আমাকে কোনও তদন্তের ভার দিতে চাইলে আমি কিছুতেই যেতে চাইতাম না। জাটিংগা-র পাখিদের কথা বলল, আরও বলল, পরের দিনই একটা গাড়ি যাচ্ছে, আসামে, তাই চলে গেলাম।"

সন্তু বলল, "ঠিক সেই সময় আমাদের এই বাংলোর পাশের ঘরে আর একজন ভদ্রলোক থাকতেন। সেই ভদ্রলোককে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। যারা এই কাজটা করেছে তারা তোমাকে ভয় পায়। তুমি এখানে উপস্থিত থাকলে তারা সেই ভদ্রলোককে চুরি করতে পারত না, সেই জন্য তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কাকাবাবু বললেন, "তুই এটা জানলি কী করে ? আগেরটা তবু আন্দাজ করা যায়।"

সন্তু বলল, "এই বাংলোর একজন বেয়ারা আমাদের ঘরে এসেছিল জল দিতে। তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে পড়ল। সেই-বলল, আমাদের পাশের ঘর থেকে একজন লোক রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। তখনই আমি দুই আর দুইয়ে চার করে নিলাম। লোকটি যেদিন নিরুদ্দেশ হল সেইদিন আমাদের থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আসামে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নয়,আসামে আমাদের' মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের পাশের ঘরে কে ছিল জানিস ? রঘুবীর পদ্মনাভন ! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্গালোরে এক সময় আমরা পাশাপাশি থাকতাম। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই পদ্মনাভনকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের মধ্যে ওর সব জিনিসপত্র পড়ে আছে, এমনকী টেবিলের ওপর ওর ডায়েরির খাতাটাও খোলা, কিন্তু সে নেই। খবরের কাগজে দু-তিনদিন ধরে এসব খবর বেরুচ্ছে, কিন্তু আমরা কিছু জানতে পারিনি। শিলচর থেকে প্লেনে

আসবার সময় কাগজ পড়েই আমি বুঝতে পারলাম, কেন আসামে টেনে নিয়ে খাদের মধ্যে আমাদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি আর পদ্মনাভন একই সময় পাশাপাশি ঘরে থাকলে দু'জনে আড্ডা দিতাম। তা হলে কি আর কেউ তাকে ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারত ?"

সন্তু বলল, "কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিককে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কার কী লাভ হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকের অনেকরকম মতলব থাকতে পারে। পদ্মনাভন খুব নামকরা বৈজ্ঞানিক, প্রতিভাবান। কিন্তু খানিকটা উদ্ধত আর অহঙ্কারী ধরনের। কড়া-কড়া কথা বলে। দুঃসাহসী। এই ধরনের মানুষের শত্রু থাকা স্বাভাবিক।"

সন্তু বলল, "যারা এই কাণ্ডটা করেছে, বোঝাই যাচ্ছে, তারা বেশ একটা বড় দল। তা হলে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এরা কি বিদেশি স্পাই ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে-ব্যাপারটা এখনও ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা দরজা-জানলা ভাল করে বন্ধ করে শুতে হবে, সন্তু। আমাদের ওপর আবার আক্রমণ হতে পারে। যদিও পুলিশ নজর রাখছে বাড়িটার ওপর, তা হলেও নিজেদের সাবধান থাকা দরকার। পদ্মনাভন উধাও হওয়ার পর পুলিশ আর কারুকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না এখন। আমাদের আগে থেকে রিজার্ভেশান ছিল বলে ঢুকে পড়েছি।"

সন্তু বলল, "পুলিশ তাই প্রথমে আমাদের সন্দেহ করেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের বড়-বড় কর্তারা সব এখন এখানে এসেছে। ডি. আই. জি. পট্টনায়ক আমাকে খুব ভাল চেনে। সন্তু, তুই কিন্তু একা-একা একদম বাইরে বেরুবি না।"

সন্তু ঘাড় নেড়ে আবার বলল, "একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। বেয়ারাটি বলছিল, এখানে নাকি কিছুদিন আগে আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়েছিল। তার সঙ্গে পদ্মনাভনের উধাও হওয়ার সম্পর্ক আছে ? তারা খসে পড়ার ব্যাপারটা আবার কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাই তো আসল ব্যাপার !"

কাকাবাবু গায়ের শার্ট আর জুতো-মোজা খুলে ফেললেন। ব্যাগ থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি আর তোয়ালে বের করে বললেন, "দাঁড়া, বাথরুম থেকে আসছি। তারপর শুয়ে-শুয়ে বাকিটা আলোচনা করা যাবে। তুই ততক্ষণ সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দে। পুলিশের ধারণা, পদ্মনাভনকে যারা চুরি করেছে, তারা এখনও এখানেই রয়ে গেছে।"

সন্তু সব বন্ধ করে দিল। তার মনে পড়ল, সে টিনটিনের একটা অ্যাডভেঞ্চার গল্প পড়েছিল, সেটার নাম শুটিং স্টার। আকাশ থেকে বিরাট একটা জিনিস খসে পড়েছিল। তারপর বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে টিনটিন গিয়েছিল

সেটা দেখতে। কিন্তু সেটা একেবারে আজগুবি গল্প। গ্রিনল্যান্ডের কাছে সমুদ্রে পড়েও সেটার খানিকটা পাহাড়ের মতন উঁচু হয়েছিল। সেটা এমনই জিনিস যে, তার ওপরে একটা আপেলের বীজ ফেললে সঙ্গে-সঙ্গে আপেল গাছ হয়ে যায়, একটুক্ষণের মধ্যেই তাতে অসংখ্য আপেল জন্মায়। একটা ছোট্ট মাকড়সা হয়ে যায় বিরাট জানোয়ার। এরকম কখনও হতে পারে ?

একটু বাদে কাকাবাবু তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আকাশ থেকে কখনও কোনও তারা পৃথিবীতে খসে পড়তে পারে ? বেয়ারাটা নিশ্চয়ই বাজে কথা বলেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা যেগুলোকে তারা বলি, সেগুলো পৃথিবীতে খসে পড়ে না ঠিকই। সেরকম একটা তারা এসে ধাক্কা মারলে সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর বারোটা বেজে যাবে। তবে আকাশ থেকে কিছু-কিছু জিনিস পৃথিবীতে খসে পড়ে, এটা তো ঠিক ! যেমন দেখলি না জাটিংগা-র পাখিগুলো ? অম্বরের ধারণা, একদিন একটা সোনার পাখিও পড়বে !"

কাকাবাবু হেসে ফেলতেই সন্তু বলল, "ওগুলো নিশ্চয়ই আকাশ থেকে খসে পড়ে না। অন্য কোনও জায়গা থেকে উড়ে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, পাখির কথা থাক। আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হয়, তা তো মানবি ? শিলাবৃষ্টি বললে সাধারণত বৃষ্টির সময় বরফের টুকরো পড়ার কথা বোঝায়, কিন্তু কখনও-কখনও পাথরের টুকরোও পড়ে।"

সন্তু বলল, "সে তো জানি। মিটিওর।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক হল না, মিটিওর আর মিটিওরাইট, এই দু' ভাগে ওদের ভাগ করা যায়। বাংলায় ওদের আলাদা নাম নেই। সবগুলোকেই বলে উল্কা। এই উল্কাগুলো হচ্ছে ছোট-বড় নানা ধরনের পাথর কিংবা ধাতুর টুকরো, যেগুলো আকাশে ঘুরে বেড়ায়। রাত্তিরবেলা অনেক সময় দেখা যায় আকাশে একটা আলোর রেখার মতন একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যাচ্ছে, তখন ছুটন্ত তারার মতনই মনে হয়। অনেকগুলো আবার নীচের দিকেও নেমে আসে।...

"এত জোরে এই উল্কাগুলো ছোটে, কত জোরে জানিস, প্রতি সেকেন্ড ষাট, সত্তর, আশি কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে, পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে ঘষা লাগলেই ওরা আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে, তাতেই গলে-পুড়ে ছাই কিংবা ধোঁয়া হয়ে যায়। সব আমরা চোখেও দেখতে পাই না। প্রতিদিন নাকি কয়েক কোটি উল্কা এরকম পৃথিবীর হাওয়াতে এসে ছাই হয়। বৃষ্টির সঙ্গে ধুলোবালি হয়ে মেশে। কিন্তু কোনও-কোনওটা বেশ বড় টুকরো হলে পৃথিবীতে পড়ে। সেগুলোকে বলে মিটিওরাইট।"

সন্তু বলল, "তা হলে সত্যি-সত্যি আকাশ থেকে কিছু পৃথিবীতে খসে পড়ে ?"

কাকাবাবু বললেন, "পড়ে তো বটেই। হঠাৎ দুম করে একটা মিটিওরাইট

এসে পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়। মাঝে-মাঝে পড়েছে একরম। এ-পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যেটাকে পাওয়া গেছে, সেটার ওজন ৬০ টন ! কত বিশাল বুঝতে পারছিস ? কোনও একটা মিটিং-এর ওপর পড়লে শত-শত লোক মারা যেত। সেটা অবশ্য পড়েছিল আফ্রিকার জঙ্গলে। আমেরিকার আরিজোনাতেও এরকম একটা মিটিওরাইট বা উল্কা বহুকাল ধরে পড়ে আছে। অনেক সময় মাঠের মধ্যে কিংবা পাহাড়ের খাঁজে দেখা যায় একটা পুকুর কিংবা ছোটখাটো হ্রদ। কেউ সেগুলো বানায়নি। খুব সম্ভবত আকাশ থেকে উল্কা পড়ে সেসব জায়গায় গভীর গর্ত হয়ে গিয়েছিল, তারপর বৃষ্টির জলে ভরে গেছে। এই শতাব্দীতেই সাইবেরিয়াতে একটা মস্তবড় উল্কা পড়ে বহু গাছপালা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানেও সেইরকম একটা মিটিওরাইট পড়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেইরকমই তো শোনা যাচ্ছে। অনেক লোক দেখেছে যে, আকাশ থেকে জ্বলন্ত তারা ছুটে আসছে, সেটা শেষ পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল না। ঝপাং করে সমুদ্রের জলে পড়ল।"

কাকাবাবু নিজের খাটে শুয়ে পড়ে গায়ের চাদরটা টেনে দিলেন।

সন্তুর এক্ষুনি শুতে ইচ্ছে করছে না। কাকাবাবুকেও সে কখনও এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে দ্যাখেনি। এমনিতে তাঁর অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়া অভ্যেস। তা হলে নিশ্চয়ই এখনও কাকাবাবুর জ্বর আছে।

কাছে এসে সে কাকাবাবুর কপালে হাত দিয়ে দেখল বেশ গরম।

সে বলল, "কাকাবাবু, তোমার তো বেশ জ্বর। তুমি কোনও ওষুধ খাবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আর দরকার নেই। আমি বুঝতে পারছি, একটু একটু করে কমছে। এবার আপনি সেরে যাবে। তুই এক কাজ কর, পকেট থেকে রিভলভারটা এনে দে, বালিশের নীচে রাখব। তারপর আলো নিভিয়ে দে।"

পাশাপাশি দুটো খাট। মাথার দিকে জানলা। সব দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের জলের ঝাপটার শব্দ। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। বোধ হয় ঝড় উঠেছে।

ঘর অন্ধকার করে দেওয়ার পর সন্তু শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, কাকাবাবু, এই উল্কাগুলো কী দিয়ে তৈরি হয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "পাথর। কিংবা লোহা। কখনও-কখনও একটু দস্তাও মিশে থাকে। ওগুলো তো পৃথিবীর মতন গ্রহ-ট্রহরই টুকরো। এমনিতে ওগুলোর কোনও দাম নেই।"

"তা হলে ওই একটা উল্কাপাতের সঙ্গে পদ্মনাভনের অদৃশ্য হওয়ার সম্পর্ক কী ?"

"অনেকের ধারণা, ওই উল্কার টুকরোগুলোর মধ্যে সোনা কিংবা প্লাটিনামের মতন কোনও দামি ধাতু থাকতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, কেউ-কেউ মনে করে, ওর মধ্যে এমন একটা কোনও ধাতু পাওয়া যেতে পারে, যা এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। পৃথিবীর কেউ সেরকম ধাতুর কথা জানে না। যদি সত্যিই সেরকম কোনও ধাতু বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়ে, তা হলে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবেন !"

"ও, এই ব্যাপার। কিন্তু এখানকার উল্কাটা তো সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে ?"

"হ্যাঁ, ডুবেই গিয়েছিল। উল্কাটা যখন পড়ে, তখন পদ্মনাভন এখানে ছিল না। সে এসেছিল ভুবনেশ্বরে একটা সেমিনারে বক্তৃতা দিতে। উল্কাটা পড়ার তিনদিন বাদে এখানকার একটা জেলের জালে একটা পাথর ওঠে। গোপালপুরের কাছে সমুদ্র খুব গভীর নয়। এক-এক জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত কোমরজল। মাছ ধরতে গিয়ে একজন জেলে একটা অদ্ভুত ধরনের পাথর পেয়ে গেল। সেটা একটা ফুটবলের ঠিক আদ্ধেকটার মতন। ফুটবলের মতন একটা গোল পাথরকে যদি আধখানা করে কাটা যায়, তার একটা টুকরো যেমন হয়।"

"সমুদ্রে তো নানারকম পাথর পাওয়া যায়। কী করে বোঝা গেল যে, সেটা একটা উল্কার টুকরো ?"

"তুই ঠিক ধরেছিস। সেটা উল্কার টুকরো হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে সেটাকে দেখলে নাকি মনে হয়, সেটাকে সদ্য ভাঙা হয়েছে। আকাশ থেকে ওইরকম একটা গোল পাথর পড়তে-পড়তে ছোট হয়েছে। শেষ মুহূর্তে দু'টুকরো হয়ে একটা টুকরো পড়েছে গভীর সমুদ্রে, অন্যটা কাছাকাছি। মাছ-ধরা জেলেটি ওইরকম একটা টুকরো পাওয়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দ্বিতীয় টুকরোটা পায়নি।"

"জেলেটা কী করে বুঝল, সেটা কোনও দামি জিনিস ?"

"সাধারণ উল্কার টুকরো হলেও সেটা এমন কিছু দামি হত না। কিন্তু সেই জিনিসটার ওপরের দিকটা নাকি সাধারণ পাথরের মতন, কিন্তু ভেতরের দিকটা গাঢ় সবুজ আর খুব ঝকঝকে উজ্জ্বল। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করে।"

"সবুজ পাথর ? তা হলে নিশ্চয়ই পান্না !"

"পান্না ? তুই কী করে জানলি যে, পান্না সবুজ হয় ?"

"রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে। 'আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনী উঠলো রাঙা হয়ে।' এই লাইন দুটো মুখস্থ রাখলেই জানা যায় যে, পান্না হয় সুবজ আর চুনী হয় লাল।"

"বাঃ, বেশ তো। এটা আমার জানা ছিল না। সবুজ পাথরটা পান্না হতে পারে, আবার অনেক সাধারণ পাথরও সবুজ হয়। তবে আলো পড়লে যদি

সত্যিই জ্বলজ্বল করে, তা হলে সেটা পান্না ছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে। জেলেটার কাছে সেই পাথর দেখে এখানকার অনেক টুরিস্ট সেটা কিনতে চাইল। ঘর সাজাবার জন্য। কেউ পঞ্চাশ টাকা, কেউ একশো টাকা দাম দিতে চায়। জেলেটা দাম হাঁকল এক হাজার টাকা! অত টাকা কেউ দিতে চায় না। তবু দর উঠতে লাগল। পাঁচশো, সাতশো পর্যন্ত। তারপর এক বড়লোক মাড়োয়ারি বলল, সে এক হাজার টাকাই দেবে। জেলেটা তখন আরও দাম বাড়াল। সে বলল, এক হাজার টাকাতেও সে দেবে না। তার আড়াই হাজার টাকা চাই।"

"পদ্মনাভন তখন কোথায়?"

"সে তখনও ভুবনেশ্বরে। এখানে একজন জেলে একটা অদ্ভুত পাথর পেয়েছে যেটা উল্কার টুকরো হতে পারে, এই খবর কয়েকটা কাগজে ছাপা হয়েছিল। সেই খবর পদ্মনাভনের নজরে পড়ে। তখন সে কারুকে কিছু না জানিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে আসে। পাথরটার দাম এর মধ্যে আরও বেড়ে গেছে। পদ্মনাভন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পাথরটা কিনে নিল।"

"এতসব খবর কি তুমি আগে জানতে, কাকাবাবু?"

"কিছু না। কলকাতার কাগজে কিছু বেরোয়নি। আজই পুলিশের কাছে সব শুনলাম। পুলিশও জেনেছে পরে। একটা জেলে যে একটা অন্যরকম পাথর পেয়েছে, তা নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছে, সে-ব্যাপারেও পুলিশ মাথা ঘামায়নি। পদ্মনাভন এসেই টপ করে অত দাম দিয়ে পাথরটা কিনে নেওয়ার পর অনেকে জানতে চাইল লোকটি কে? তার পরিচয়টাও বেরিয়ে গেল। যখন লোকে শুনল যে, একজন অতবড় বৈজ্ঞানিক ছুটে এসে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনেছে, তখন সকলেরই কৌতূহল বেড়ে গেল। তা হলে আকাশ থেকে নিশ্চয়ই দারুণ কিছু একটা মাটিতে নেমে এসেছে!"

"জাটিংগার সেই সোনার পাখির মতন? এটা বেশ মজা না, আমরা আসামে গিয়েছিলাম আকাশ থেকে পড়া পাখি দেখতে, আর সমুদ্রের ধারে এসেও শোনা যাচ্ছে আকাশ থেকে পড়া এক পাথরের কথা!"

"তাই তো দেখছি রে!"

"তারপর কী হল?"

"পদ্মনাভন পাথরটা কেনার পর তা নিয়ে নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল। সত্যি-মিথ্যে অনেক কাহিনী ছাপা হতে লাগল এখানকার কাগজে। বোম্বের 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' কাগজেও 'উল্কাপাথরে নতুন ধাতু?' এইরকম একটা খবর বেরুল। এতদিনে টনক নড়ল এখানকার পুলিশের। আকাশ থেকে সত্যিই যদি কোনও সোনার পাখি কিংবা দামি পাথর খসে পড়ে, তবে তার মালিক হবে গভর্নমেন্ট। মাটির তলা থেকে কিছু পাওয়া গেলেও একই নিয়ম। পুলিশ এসে পদ্মনাভনকে বলল সেই পাথরটা থানায় জমা দিতে। কিন্তু ছোটখাটো

পুলিশ অফিসারকে পদ্মনাভন পাত্তা দেবে কেন ? সে যেমন খামখেয়ালি, তেমনই বদমেজাজি। পুলিশদের ধমক দিয়ে সে বলল, সে নিজেই সরকারের লোক। তার কাছে পাথরটা থাকা মানেই গভর্নমেন্টের কাছে থাকা। কথাটা মিথ্যে নয়। সে ব্যাঙ্গালোরের একটা সরকারি বিজ্ঞান সংস্থার হেড। ধমক খেয়ে পুলিশ চলে গেল বটে, কিন্তু এই বাংলোর সামনে পাহারা বসাল। পদ্মনাভনও অদ্ভুত কাণ্ড করল, সে পাথরটা নিয়ে ব্যাঙ্গালোর ফিরে গেল না, এখানেই রয়ে গেল সাতদিন। সব সময় দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকত। তাতে লোকের কৌতূহল বাড়তে লাগল আরও।"

"ঠিক সেই সময়টায় আমাদের এখানে আসবার কথা ছিল ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা চলে গেলাম আসাম। এর মধ্যে পদ্মনাভন একদিন উধাও। বাইরে পুলিশ পাহারা ছিল। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে কেউ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।"

"পাথরটাও নেই ?"

"সেটা তো থাকবেই না।"

"আচ্ছা কাকাবাবু, এমন হতে পারে না ? পাথরটা যদি সত্যিই মহা মূল্যবান হয়, তা হলে পদ্মনাভন অন্যদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নিজের জিনিসপত্র সব ফেলে শুধু পাথরটা নিয়ে নিজেই চলে গেছেন ?"

"সেরকমও হতে পারে হয়তো। পদ্মনাভন বিচিত্র ধরনের মানুষ। তবে, পদ্মনাভনের জুতো, চটি সবই পড়ে আছে। সে খালি পায়ে গেছে। আমি পদ্মনাভনকে যতটা চিনি, তাতে সে খালি পায়ে কোথাও যাবে, এমন মনে হয় না।"

"কিন্তু যারা পাথরটা চুরি করতে চায়, তারা পদ্মনাভনকে শুধু-শুধু এতদিন আটকে রাখবে কেন ?"

"যারা আমাদের পাহাড়ের খাদে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, তারাই যদি এই ব্যাপারটায় জড়িত থাকে তবে পদ্মনাভনকে খুন করা তাদের পক্ষে কিছুই না। কিন্তু পদ্মনাভনের ডেড বডি পাওয়া যায়নি। আমার ধারণা, পদ্মনাভনকে এখনও আটকেই রাখা হয়েছে। আর তাকে আটকে রাখার একটাই কারণ থাকতে পারে।"

"কী সেটা, কী ?"

"থাক, সে-সম্পর্কে আমি এখন কিছু আলোচনা করতে চাই না। এখন ঘুমো তো !"

"এত তাড়াতাড়ি আমার ঘুম আসছে না, কাকাবাবু।"

"তা হলেও চোখ বুজে থাক। একটু বাদে ঘুম এসে যাবে। শোন, সন্তু, আমরা এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছি। এখানে একটা উল্কা খসে পড়েছে কিংবা পড়েনি, কিংবা পদ্মনাভন কেন উধাও হয়ে গেল, তা নিয়ে আমাদের বেশি মাথা

ঘামাবার তো দরকার নেই ! কেউ আমাদের সেই দায়িত্ব কি দিয়েছে ? আমরা এসেছি শরীর ভাল করতে।"

আর কোনও কথা না বলে সন্তু আপনমনে একটু হাসল।

এখানে এতসব রহস্যময় কাণ্ডকারখানা ঘটেছে, তা নিয়ে কাকাবাবু মাথা ঘামাবেন না, তা কখনও হতে পারে ? কেউ দায়িত্ব দিক বা না দিক কাকাবাবু এর শেষ না দেখে ছাড়বেন না। কাকাবাবুর স্বভাব সে ভালই জানে।

কাকাবাবু পাশ ফিরে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন মনে হল।

সন্তু এপাশ-ওপাশ ছটফট করল খানিকক্ষণ। সমুদ্র আর বাতাসের গর্জন বেশ বেড়েছে। সন্তুর খুব ইচ্ছে করছে, দরজা খুলে বারান্দায় যেতে। কিংবা একেবারে জলের ধারে গিয়ে বসতে। রাত্তিরবেলার সমুদ্রের একটা আলাদা রূপ আছে।

কিন্তু কাকাবাবুর পাতলা ঘুম। দরজা খুললেই তিনি টের পেয়ে যাবেন। আজ সকালেই দমদম এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর কাছে কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করেছে। আজই উলটোপালটা কিছু করলে কাকাবাবুর কাছে খুব বকুনি খেতে হবে !

একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার কিছুক্ষণ পর তার ঘুম ভাঙল বিকট কোনও শব্দে। গুলির আওয়াজ। পরপর দু'বার।

কাকাবাবু সন্তুর আগেই উঠে পড়ে আলো জ্বেলেছেন। রিভলভারটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "তোকে উঠতে হবে না সন্তু, আমি দেখছি !"

সন্তু তবু তড়াক করে নেমে পড়ল খাট থেকে।

বাইরে এবার গোলমাল শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে বাংলোর একজন বেয়ারার গলা চেনা যায়। কাকাবাবু দরজাটা খুলে ফেললেন।

বাংলোর বাইরে চৌকিদার, বেয়ারা ও দু'জন পুলিশ একসঙ্গে চ্যাঁচামেচি করে কী যেন বলছে। কাকাবাবু কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে ? কে গুলি ছুঁড়ল ?"

একজন পুলিশ কাকাবাবুকে স্যালুট করে বলল, "সার, চোর এসেছিল। আপনাদের পাশের ঘরের জানলা ভেঙে ঢুকেছিল। তারপর যখন পালাচ্ছে, তখন আমরা ঠিক দেখে ফেলেছি।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল ?"

পুলিশটি বলল, "হ্যাঁ সার। দেখুন না, জানলা ভাঙা। ভেতরের অনেক কিছু ওলোটপালট করেছে।"

সন্তু বলল, "আহা, কী পাহারা দেওয়ার ছিরি ! চোর যখন জানলা ভেঙে ঢুকল, তখন পুলিশ টেরও পায়নি। চোর যখন বেরিয়ে আসছে, তখন

দেখেছে !"

পুলিশটি আবার বলল, "দু'জন ছিল। একজনের পায়ে বোধ হয় গুলিও লেগেছে। কিন্তু ধরা গেল না। ওরা মোটর বাইক এনেছিল। আপনারা ভেতরে যান, সার, কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা রাত জেগে পাহারা দেব।"

পাশের ঘরটি পদ্মনাভনের ঘর।

কাকাবাবু বললেন, "আমি ঘরটা একবার দেখব।"

সে-ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল, খোলা হল। ভেতরটা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। টেবিলের সবক'টা ড্রয়ার ওলটানো, জামা-কাপড়গুলো মেঝেতে ছড়ানো। কার্পেটের একটা দিক খানিকটা গুটিয়ে গেছে।

কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সবদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখলেন খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, "যাক, কোনও কিছুতে হাত দেওয়ার দরকার নেই। কাল সকালে ডি. আই. জি. সাহেব এসে দেখবেন।"

তারপর তিনি নিচু গলায় বললেন, "মনে হচ্ছে, আমার থিয়োরিটাই ঠিক।"

॥ ৭ ॥

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে সন্তু আর কাকাবাবু গেলেন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে।

আকাশ খানিকটা মেঘলা। বেলাভূমিতে খুব বেশি লোক নেই। কিছু ছেলেমেয়ে স্নান করতে নেমেছে। দূরে-দূরে দেখা যাচ্ছে খেলনা নৌকোর মতন ভাসছে জেলে ডিঙি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পায়ের ব্যথাটা কেমন রে, সন্তু? স্নান করতে নামবি নাকি?"

সন্তু বলল, "বাঃ, সমুদ্রের ধারে এসে চান করব না? পায়ের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে। হাঁটুর ফোলাটাও নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ইউসুফ-ডাক্তার সত্যিই মিরাক্‌ল করেছেন দেখছি। আমিও স্নান করব। তবে এখন নয়, দুপুরবেলা। এখন কিছুক্ষণ সমুদ্রের টাটকা হাওয়া খাওয়া যাক। এর মতন ভাল জিনিস আর হয় না। পৃথিবীতে টাটকা বাতাস খুব কমে যাচ্ছে দিন দিন।"

জলের খুব কাছাকাছি গিয়ে দু'জনে বসল বালির ওপর। কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পাশে রেখে বাবু হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

সন্তু বালি দিয়ে একটা দুর্গ বানাতে লাগল, বাচ্চা বয়েসে সে মা-বাবার সঙ্গে পুরী বেড়াতে এসেছিল। তখন সে প্রায় সারাদিন সমুদ্রের ধারে বসে বালি দিয়ে

কতরকম ঘর-বাড়ি, পাহাড়, দুর্গ বানাত। মনে পড়ছে সেই কথা।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ এক সময় সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, উল্কা পাথরটার মধ্যে সত্যি-সত্যি নতুন কোনও ধাতু আছে কি না, সেটা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা না করে কি বোঝা যাবে ? পদ্মনাভন বাংলোর ঘরে বসে খালি চোখে দেখে বুঝতে পারতেন ? ওঁর ঘরে তো কোনও যন্ত্রপাতি নেই।"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে সন্তুর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

তারপর ধমকের সুরে বললেন, "দিলি তো আমার ধ্যান ভাঙিয়ে ? তোর মাথায় বুঝি শুধু ওইসব ঘুরছে ? বলেছি না, এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই !"

সন্তু হাসল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "সমুদ্রের ধারে বসে তোর কোনও কবিতা মনে পড়ছে না ? সমুদ্র সম্পর্কে একটা কবিতা শোনা তো !"

সন্তু একটুক্ষণ ভেবে বলল, "ঠিক মনে পড়ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আয়, দু'জনে মিলে একটা বানানো যাক। আমি একটা লাইন বলছি, তুই পরের লাইনটা বসিয়ে দিবি।"

একটুখানি চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন :

আকাশের নীল রং মিশে গেছে সাগরে

সন্তু প্রায় কিছু চিন্তা না করেই বলল :

ঝিনুক কুড়োতে যাব জাগো সব জাগো রে !

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ মিলিয়েছিস তো। আচ্ছা, এর পর কী হতে পারে ? ঢেউগুলো, ঢেউগুলো নিয়ে কিছু একটা...

বড়-বড় ঢেউগুলি পাহাড়ের মতো প্রায়

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলল :

তিমিমাছ লাফ দিয়ে যেন পিলে চমকায় !

কাকাবাবু হেসে বললেন, "খুব সোজা মিল পেয়ে যাচ্ছিস, তাই না ? দাঁড়া, এবার একটা শক্ত দিচ্ছি।"

ভুরু কুঁচকে মিনিটখানেক চিন্তা করার পর কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এটার সঙ্গে মিলিয়ে দে তো দেখি :

মেঘ ডাকে গুরু-গুরু কাঁপে সারা অম্বর"

সন্তু এবার কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই পেছন থেকে কে যেন বলল, "এই তো স্বয়ং অম্বর এখানে হাজির।"

কাকাবাবু ও সন্তু একসঙ্গে পেছনদিকে মুখ ফেরাল। পাঞ্জাবি ও পাজামা পরা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে, একগাল হেসে দাঁড়িয়ে আছে পীতাম্বর পাহাড়ী !

দু' হাত তুলে সে বলল, "**নমস্কার, কাকাবাবু,** দেখুন, আমি এখানেও এসে গেছি ! বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন, তাই না ? নিশ্চয়ই আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন !"

কাকাবাবু যে আগেই জানতেন ওর আসবার কথা, তা প্রকাশ করলেন না। হেসে বললেন, "আরে, পীতাম্বর, কী খবর ? হঠাৎ তুমি এখানে ?"

সে বলল, "পীতাম্বর না সার, শুধু অম্বর বলুন। আপনারা চলে আসার পর আমার মন কেমন করতে লাগল। ভাবলুম, কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসি। কথায় আছে না, 'উঠল বাই তো কটক যাই !' তাই দেখুন কটক না হোক গোপালপুর এসে গেছি !"

বালির ওপর ধপাস করে বসে পড়ে সন্তুর কাঁধে চাপড় মেরে সে আবার বলল, "কী খবর, সন্তুবাবু ? পা একেবারে ফিট হয়ে গেছে ?"

প্রথম দিন জঙ্গলের মধ্যে সাপ-ধরা পীতাম্বর পাহাড়ীকে দেখে সন্তুর বেশ ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেই লোকটির হঠাৎ গোপালপুর চলে আসা সত্যি বেশ সন্দেহজনক।

সন্তু খানিকটা আড়ষ্টভাবে বলল, "হ্যাঁ, ভাল হয়ে গেছে। আপনি ভাল আছেন ?"

অম্বর বলল, "আমি ফার্স্ট ক্লাস আছি। আমি কক্ষনো খারাপ থাকি না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানেও সাপ ধরতে এলে নাকি ? সমুদ্রের ধারে বিষাক্ত সাপ পাওয়া যায় বলে তো শুনিনি !"

অম্বর বলল, "না, না, এখানে সাপ ধরতে আসিনি। এসেছি বেড়াতে। টাকা রোজগারের জন্য বনে-জঙ্গলে সাপ ধরে বেড়াই, তা বলে কি আমাদেরও মাঝে-মাঝে ছুটি নিতে ইচ্ছে হয় না ? কুঁজোরও তো চিৎ হয়ে শুতে সাধ জাগে মাঝে-মাঝে !"

শেষের কথাটা সন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি, তার মুখ দেখেই সেটা ধরা যায়। তার দিকে চেয়ে অম্বর বলল, "কুঁজো মানে বুঝলে ? জলের কুঁজো নয়, যে-লোকের পিঠে কুঁজ আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে হাঞ্চ ব্যাক।"

সন্তু বলল, "আসামের জঙ্গলটাই তো একটা বেড়াবার জায়গা। সেখান থেকেও লোকে অন্য জায়গায় বেড়াতে যায়।"

অম্বর বলল, "পাহাড় আর জঙ্গল দেখতে-দেখতে একঘেয়ে হয়ে গেলে, তখন সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া আমার কেন যেন ধারণা হয়েছিল, এখানে এলে আপনাদের দেখতে পাব। দেখুন, কেমন মিলে গেল !"

সন্তু বলল, "এ জায়গাটা খুব ভাল।"

অম্বর বলল, "কাল রাত্তিরে হোটেলে এসেই শুনলাম, এখানে একজন বৈজ্ঞানিক রহস্যময়ভাবে উধাও হয়েছে। তোমরা সেই গেস্ট হাউসেই আছ। কাকাবাবু যখন এসে পড়েছেন, তখন নিশ্চয়ই রহস্যের সমাধান হবে। আমি

তোমাদের কোনও কাজে লাগতে পারি ? কাকাবাবু, আপনার একটা অ্যাডভেঞ্চারে আমি সঙ্গে থাকতে চাই। আমি কিছুদিন বক্সিং শিখেছিলাম।"

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "আমরা এখানে ওসব কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না। দু'জনেরই শরীর ভাল না, এখানে বিশ্রাম নেব শুধু।"

একটা মোটরবোট গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে ছুটে গেল সামনে দিয়ে। জেলে নৌকোগুলোর পাশ দিয়ে সেটা বেশ সুন্দরভাবে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। জলে যারা সাঁতার কাটতে নেমেছে, তাদের মধ্যে দু'জন চলে গেছে অনেকটা দূরে। আগে মনে হচ্ছিল সেখানে খুব গভীর জল, কিন্তু লোক দুটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে তাদের মোটে বুক-জল। আবার বড় ঢেউ উঠতেই তারা সামনে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে গেল।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, অম্বর, সেদিন ভোরবেলা গাছের নীচে তুমি যখন আমায় দেখতে পেলে, তখন আমার হাত বাঁধা ছিল। মুখটাও কি বাঁধা ছিল ?"

অম্বর অবাক হয়ে বলল, "না তো !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মুখের বাঁধনটা নিজে-নিজেই খুলে গিয়েছিল। তুমি আসবার আগেই। তোমাকে কি আমি বলেছিলাম যে, আমার মুখটাও বাঁধা ছিল আগে ?"

অম্বর বলল, "না, তাও বলেননি। এই প্রথম শুনলাম। ফেলে দেওয়ার সময় আপনার মুখটাও ওরা বেঁধে দিয়েছিল বুঝি ? সন্তুর বাঁধেনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুকে তো ওরা ধরবার আগে নিজেই লাফ দিয়েছে ! যাকগে, থাক ওসব কথা।"

অম্বর বলল, "হঠাৎ এ-কথাটা জিজ্ঞেস করলেন কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনিই মনে পড়ল।"

অম্বর জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আপনাদের কলকাতার বাড়ির ঠিকানাটা বলবেন ? কলকাতায় গেলে দেখা করব। দাঁড়ান, লিখে নিচ্ছি।"

নিজের পকেট ও কাঁধের ঝোলাটা হাতড়েও সে কলম খুঁজে পেল না। কাকাবাবু নিজের বুকপকেট থেকে কলমটা দিয়ে বললেন, "এটাতে লিখে নাও !"

ঠিকানা লেখার পর ফেরত দেওয়ার জন্য সে বাড়িয়ে দিতেই কাকাবাবু বললেন, "ওটা তোমার কাছেই থাক। তোমার কলম নেই।"

অম্বর বলল, "না, না, আমার আছে। হোটেলে ফেলে এসেছি। আপনার কলম নেব কেন ? এত দামি কলম।"

কাকাবাবু বললেন, "এমন কিছু দামি নয়। তুমি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছ। তোমাকে এই সামান্য একটা জিনিস আমি দিতে চাই।"

অম্বর বলল, "আমি এমন কিছুই করিনি। হঠাৎ সেখানে গিয়ে

পড়েছিলাম। এ তো সবাই করে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এই কলমটা নিলে আমি খুশি হব।"

অম্বর বলল, "তা হলে ঠিক আছে, নিচ্ছি! আপনার ব্যবহার করা কলম। এটার দাম আমার কাছে অনেক!"

কাকাবাবু আবার সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালেন।

অম্বর সন্তুকে বলল, "তোমরা ছড়া মেলাবার খেলা খেলছিলে। আমার সঙ্গে খেলবে? আমিও খেলতে পারি। অম্বরের সঙ্গে কী মিলবে জানো? শম্বর!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তার মানে কী?"

অম্বর বলল, "একরকমের বড় হরিণ, দ্যাখোনি কখনও? মাথায় ডালপালার মতন শিং। মেঘে কালো অম্বর, ভয়ে কাঁপে শম্বর! ঠিক হল না? তোমার নাম তো সন্তু। তার সঙ্গে মিল দিতে পারো অধিকন্তু!"

কাকাবাবু উঠে পড়ে বললেন, "দশটার সময় আমার কাছে একজন দেখা করতে আসবে। বাংলোয় ফিরবি নাকি রে, সন্তু?"

কাকাবাবুর গলার আওয়াজ শুনেই সন্তু বুঝতে পারল, তিনি সন্তুকে সঙ্গে নিয়েই ফিরতে চান। সন্তু বলল, "হ্যাঁ, আমারও একটা কাজ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "চলি, অম্বর। তুমি বোসো তা হলে।"

অম্বর যেন এখানে বেশ অনেকক্ষণ ধরে জমিয়ে গল্প করার মেজাজ নিয়ে এসেছিল, কাকাবাবুরা হঠাৎ বিদায় নিতে চাইছেন দেখে সে বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

বাংলোর দিকে ফিরতে-ফিরতে কাকাবাবু নিচু গলায় বললেন, "অম্বর ছেলেটা হয়তো খারাপ নয়। কিন্তু ওকে দেখলেই আমার আসামের সেই ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে আর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। কথা নেই বার্তা নেই, আমাদের খাদের মধ্যে ফেলে দিল?"

সন্তু বলল, "এরকম আগে কখনও হয়নি। কিন্তু ওই অম্বর পাহাড়ী বাইচান্স সেই সময় খাদের নীচে হাজির হয়েছিল বলেই তো মনে হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোর তাই মনে হচ্ছে? এই ছেলেটা ওই বদমাশের দলের কেউ নয়।"

সন্তু বলল, "ওদের দলের হলে আর আমাদের বাঁচাবে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে যে, দেখতে এসেছিল আমরা সত্যি মরে গেছি কি না। যখন দেখল মরিনি, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল, তখন ও আমাদের সাহায্য করে নিজে ভাল সাজবার চেষ্টা করল।"

সন্তু বলল, "ইচ্ছে করলে তখনও অম্বর আমাদের মারতে পারত। আমি অজ্ঞান আর তোমার হাত বাঁধা ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "খুব সাঙ্ঘাতিক ক্রিমিনাল না হলে দিনের আলোয়

মারতে পারে না। ও বোধ হয় তেমন পাকা নয়। আর-একটা জিনিস লক্ষ কর, যারা আমাদের ফেলে দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ও এখন আর কোনও কথাই বলছে না। আমরা চলে আসার পর তাদের আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল কি না, সে-বিষয়েও উচ্চবাচ্য করল না একবারও।"

ডাকবাংলোর পেছনদিকেও একটা গেট আছে। সেখান দিয়ে ঢুকে এসে কাকাবাবু আবার বললেন, "আমি এখানেও বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। পদ্মনাভনকে যারা ধরে নিয়ে গেছে, তারাই কি সত্যি আমাদের আসামে পাঠিয়েছিল ? তা হলে তারা এখানেও তো আমাদের আর-একবার মারবার চেষ্টা করতে পারে। সাবধানে থাকতে হবে কিন্তু।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার পর দেখা গেল দু'জন মিস্ত্রি পদ্মনাভনের ঘরের ভাঙা জানলাটা সারাচ্ছে। কাকাবাবু ঘরটায় একবার উঁকি দিলেন।

বেরিয়ে এসে কাকাবাবু বললেন, "তখন তুই একটা ভাল প্রশ্ন করেছিস, সন্তু। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পাথরটা কেনার পরেও পদ্মনাভন গোপালপুরের এই বাংলোয় এতদিন থেকে গেল কেন ? তার মতন বৈজ্ঞানিকের তো উচিত ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনও ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পাথরটা পরীক্ষা করে দেখা। অবশ্য পদ্মনাভন খামখেয়ালি, পাগলাটে ধরনের লোক।"

সন্তুর কাছে চাবি, সে নিজেদের ঘরের দরজা খুলল। কাকাবাবু একজন বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে বললেন কফি দিতে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "দশটার সময় কে আসবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ আসবে না। কফিটা খেয়ে আমি একবার বেরুব। একবার থানায় যেতে হবে। আমার কয়েকটা ফোন করার দরকার। থানা থেকেই সুবিধে। তুই ঘরে থাক, আমি ঘুরে আসছি।"

সন্তু বলল, "আমি শুধু-শুধু এখানে বসে থেকে কী করব ? আমিও তোমার সঙ্গে যাই থানায় !"

কাকাবাবু বললেন, "তোর যাওয়ার দরকার নেই তো কিছু। তুই এখানে বিশ্রাম নে। বাইরে বেরোস না।"

সন্তু এবার অধৈর্য হয়ে বলল, "আমার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়ে গেছে। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেও আমি ঘরের মধ্যে বসে থাকব নাকি ?"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর নরমভাবে বললেন, "আমি এবার ভয় পেয়ে গেছি রে, সন্তু। হ্যাঁ, আমি রাজা রায়চৌধুরী, আমিও ভয় পাচ্ছি। তোকে একা-একা সমুদ্রের ধারে যেতে দিতে আমার সাহস হচ্ছে না। যারা আমাদের পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, তারা এখানেও আমাদের মারবার চেষ্টা করতে পারে। আমাকে একবার থানায় যেতে হচ্ছে। সেখানে ডি. আই. জি. ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর কয়েকজন সরকারি অফিসার আসবেন। সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখায়

না। তুই এখন ঘরের মধ্যেই থাক। আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ বাইরে যাবি না। তবে, তোকে একটা কাজ দিয়ে যাচ্ছি। তুই পদ্মনাভনের ঘরটার দিকে নজর রাখবি। আমার ধারণা, চোরেরা ওখানে আবার ফিরে আসবে। দিনের বেলাতেও আসতে পারে।"

কফি খেয়ে নিয়ে কাকাবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

সন্তু শুয়ে পড়ল বিছানায়। তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

সে একটা বই পড়বার চেষ্টা করল। ভাল লাগল না। একটু পরে সে বাইরের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। আকাশ কালো হয়ে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি নামল। একটু পরেই বেশ জোর বৃষ্টি শুরু হল। সব লোকও হুড়োহুড়ি করে পালিয়ে গেল, বেলাভূমি একেবারে ফাঁকা।

যাক, এই সময় সমুদ্রের ধারে বেড়ানো যেত না। বাংলোতে ফিরে আসতেই হত। বারান্দায় বসেই সমুদ্র দেখা যেতে পারে।

বৃষ্টির মধ্যেই একটা জিপগাড়ি চলে গেল বালির ওপর দিয়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন দাড়িওয়ালা জজসাহেব। ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হলে সন্তু হাত তুলবে ভাবল। কিন্তু জজসাহেব এদিকে তাকালেনই না। জজসাহেব কোন হোটেলে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করা হয়নি।

বৃষ্টি চলতে লাগল অনেকক্ষণ।

সময় কাটাবার জন্য ডাকবাংলোর একজন বেয়ারাকে ডেকে খানিকক্ষণ গল্প করল সন্তু। উল্কাপাত আর পদ্মনাভনের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা আবার শুনল, কিন্তু নতুন কিছু জানা গেল না।

দুপুরবেলা একজন লোক একটা চিঠি নিয়ে এল কাকাবাবুর কাছ থেকে। কাকাবাবু লিখেছেন :

'সন্তু, আমার ফিরতে খানিকটা দেরি হবে। তুই আমার জন্য অপেক্ষা করিস না। খেয়ে নে। সরকারি অফিসাররা ওঁদের সঙ্গে আমাকে লাঞ্চ খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। তা ছাড়াও কলকাতা থেকে একটা টেলিফোন আসার জন্য আমাকে বসে থাকতে হবে। তুই বাংলোতেই থাকিস, কেউ ডাকলে তার সঙ্গে বাইরে যাবি না।'

চিঠিটা পেয়ে সন্তু ভাবল, তা হলে কি সমুদ্রে স্নান করতেও যাওয়া হবে না? গোপালপুরে এসে বাথরুমে স্নান?

বৃষ্টি অবশ্য এখনও থামেনি। এখানে বোধ হয় বৃষ্টির মধ্যে কেউ স্নান করতে যায় না। সন্তু ঠিক করল, যাই-ই হোক না কেন, কাল সকালেই সে দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রে নামবে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে সন্তু একটা বই নিয়ে বসে রইল ইজি চেয়ারে। মাঝখানের দরজাটা খোলা। একটা সরু বারান্দার ওপাশেই পদ্মনাভনের ঘর। মিস্তিরিরা চলে গেছে, সেই ঘর এখন তালাবন্ধ। সন্তু মাঝে-মাঝে সেই ঘরটার

দিকে তাকাচ্ছে। কাকাবাবু নজর রাখতে বলেছেন।

ওই ঘরে এখনও চোরেরা আসতে পারে। তার মানে, পদ্মনাভনের পাথরটা এখনও পাওয়া যায়নি। সেইজন্যই কাকাবাবু ধরে নিয়েছেন যে, পদ্মনাভন বেঁচে আছেন। যারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে, তারা পদ্মনাভনকে খুন করবে না। তা হলে তো পাথরটা পাওয়াই যাবে না।

এক সময় খানিকটা ঝিমুনি এসে গিয়েছিল সন্তুর। দরজায় খটখট শব্দ হতে আবার জেগে উঠল। বেয়ারা আর-একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। এটা কাকাবাবুর চিঠি নয়। এটা লিখেছে অম্বর।

'সন্তু, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল খানিকক্ষণ গল্প করার। কিন্তু বাংলোর সামনে একজন পুলিশ আমাকে ভেতরে যেতে দিল না। তোমার সঙ্গেও দেখা করতে দেবে না। কী ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। আমি 'রিপোজ' হোটেলে আছি, রুম নং ১০। যদি ইচ্ছে হয়, চলে আসতে পারো। এই হোটেলে খুব ভাল পাঁপড় ভাজা ও ফিশ ফ্রাই পাওয়া যায়।

ইতি—অম্বর

চিঠিটা পড়ে সন্তুর বেশ রাগ হল। কী ব্যাপার, সে কি এই বাংলোতে বন্দী নাকি ? অম্বরকে ভেতরে আসতে দিলে কী ক্ষতি ছিল। সে যদি অন্য দলের লোকও হয় তা হলে সে কি দিনের বেলা সন্তুকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে ? অত সোজা নাকি ?

তার একবার ইচ্ছে হল, এক্ষুনি রিপোজ হোটেলে চলে যেতে। ঘরের মধ্যে বসে থাকতে আর একটুও ভাল লাগছে না। বৃষ্টিও থেমে গেছে।

জুতো পরতে গিয়েও সন্তু পা সরিয়ে নিল। কাকাবাবু বারণ করেছেন, আজকের দিনটা সে মেনে চলবে। এরকম ভাবে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়াও ভাল।

কাকাবাবু ফিরলেন বিকেল পাঁচটার সময়।

জামা খুলতে-খুলতে বললেন, "দু-একটা খবর শুনে সব কিছু যেন গুলিয়ে গেল রে, সন্তু ! বছর-তিনেক আগে পদ্মনাভনকে আর-একবার কারা যেন জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। উটকামণ্ডের কাছে। সন্ধেবেলা মাঝরাস্তায় জোর করে গাড়ি থামিয়ে কারা যেন টেনে-হিঁচড়ে তাকে অন্য গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল। এই সময় একটা মিলিটারি কনভয় এসে পড়ে। তখন আততায়ীরা পদ্মনাভনের মাথায় একটা আঘাত করে তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। আঘাতটা খুব গুরুতর হয়নি, পদ্মনাভন বেঁচে গেছে সে যাত্রায়। আরও একবার বোম্বে এয়ারপোর্টের বাইরে, বেশ গভীর রাত্তিরে কেউ ছুরি মেরেছিল তাকে। সেবারেও ছুরিটা লেগেছিল তার বুকের ডান দিকে, সেই অবস্থাতেও পদ্মনাভন লোকটাকে জাপ্‌টে ধরার চেষ্টা করেও পারেনি। তার

মানে বুঝতে পারছিস, পদ্মনাভনের অনেক শত্রু আছে।"

সন্তু বলল, "অর্থাৎ এবারে যারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, তারা যে উল্কা পাথরটার জন্যই পদ্মনাভনকে চুরি করেছে, তার কোনও মানে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক তাই।"

সন্তু বলল, "আগে দু'বার ওঁকে মারবার চেষ্টা হয়েছে, তবু উনি একা-একা ঘুরে বেড়ান ?"

কাকাবাবু বললেন, "বৈজ্ঞানিকরা সাধারণত নিরীহ আর ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ হয়। কিন্তু পদ্মনাভন যেমন দুঃসাহসী, তেমনই বেপরোয়া। সঙ্গে কোনও পাহারাদার নিয়ে ঘোরার মানুষই তো নয়। পুলিশের কাছেও সাহায্য চায় না। লোকটা খুব দুর্মুখও বটে, ছোটখাটো দোষের জন্য তার সহকারীদের এমন খারাপভাবে বকুনি দেয় যে, অনেকে তার অধীনে কাজ করতেই চায় না। এত দোষ থাকলেও পদ্মনাভন খুবই প্রতিভাবান, কোনও একদিন বিজ্ঞানে সে নোবেল প্রাইজ পেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।"

সন্তু বলল, "যদি উল্কা-পাথরটাই আসল ব্যাপার না হয়, তা হলে যারা ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে, তারা আর গোপালপুরে থাকবে কেন ? অন্য জায়গায় চলে যাবে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তুই তো ঠিক লাইনেই ভাবতে পারিস দেখছি। তা হলে তো আমি এবার পুরোপুরি রিটায়ার করলেই পারি। পাথরটা হাতাবার মতলব না থাকলে, অন্য কোনও কারণে যদি পদ্মনাভনকে গুম করে থাকে কেউ, তা হলে সে আর এখানে বসে থাকবে কেন ? পদ্মনাভনের হাত-মুখ বেঁধে একটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত কিছু নয়। তা হলে আর তাকে এখানে খোঁজাখুঁজি করার কোনও মানে হয় না। তবে, আর-একটা প্রশ্ন আসে। পদ্মনাভনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার ঘরে দু'বার হামলা হয়েছে। জানলা ভেঙে লোক ঢুকে সারা ঘর তছনছ করছে। কী খুঁজছে তারা ? পাথরটা নিশ্চয়ই ? আর তো কোনও মূল্যবান জিনিস এখানে থাকার কথা নয়।"

সন্তু বলল, "দুপুরবেলা শুয়ে-শুয়ে আমি আর-একটা কথা ভেবেছি। এই যে চোরেরা পদ্মনাভনের ঘরে আসছে, এটা পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যও তো হতে পারে ? মনে করো, যারা পদ্মনাভনকে চুরি করেছে, তারা উল্কা-পাথরটাও পেয়েছে। তারপর সেই জিনিসটা আর পদ্মনাভনকে নিয়ে তারা চলে গেল অনেকদূরে। এখানে দুটো লোককে ঠিক করে গেছে, যারা মাঝে-মাঝে এই ঘরের মধ্যে এসে হামলা করে যাবে। তাতে সবাই ভাববে, ওরা জিনিসটা খুঁজে পায়নি। এই সুযোগে ওরা অনেকদূরে চলে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, "তোর মতন এতটা বুদ্ধি কি ওদের আছে ? যদি সেরকমই হয়, তা হলে ওদের বেশিদূর যেতেও হবে না। পাশের রাজ্য হচ্ছে অন্ধ্র। সেখানে পালিয়ে গেলে এ-রাজ্যের পুলিশ আর খোঁজখবর করবে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাকে ফোন করতে গিয়েছিলে ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "পাঞ্জাবে !"

তারপর কিছু না বলে চলে গেলেন বাথরুমে। সন্তু ভেবেই পেলেন না, কাকাবাবু হঠাৎ কেন পাঞ্জাবে ফোন করতে গেলেন। এখান থেকে কতদূর পাঞ্জাব !

একজন বেয়ারা এসে বিকেলের চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝম করে। আজ আর সমুদ্রের ধারে কেউ বেড়াতে পারবে না।

কাকাবাবু বেরিয়ে আসার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আমাকে কি এখানে পুলিশের পাহারায় থাকতে হবে ? অম্বরবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, পুলিশ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এটা কী ব্যাপার।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বাইরের পুলিশটি আমাকে সে-কথা বলল বটে। আসলে কী হয়েছিল জানিস, ওই অম্বর বাইরের গেট দিয়ে সোজা ভেতরে আসতে চাইলে বোধ হয় বাধা দিত না। কিন্তু অম্বর বাড়ির পাশ দিয়ে পেছনদিকে আসছিল, পদ্মনাভনের ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল। তাইতেই পুলিশের সন্দেহ হয়। তখন পুলিশটি গিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করে। তারপর পুলিশের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। অম্বর নিজেই তখন চিঠি লিখে চলে গেছে।"

সন্তু অবাক হয়ে বলল, "জানলার কাছে উঁকি মারছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "আরও ব্যাপার আছে। আমি যখন এখান থেকে বেরুই, তখন অম্বর একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি থানার জানলা থেকেও অম্বরকে দেখেছি। ডি. আই. জি. সাহেবের বাড়ি গেলাম, সেখান থেকে বেরোবার পর দেখি অম্বর রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে গেল। অম্বর আমাকে ফলো করছে নাকি ? এ তো মজার ব্যাপার।"

চা শেষ করে কাকাবাবু বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আপনমনে বললেন, "বিচটা একেবারে ফাঁকা। বৃষ্টিতে আর কেউ বেড়াতে বেরোতে পারছে না। আমরাই বা এখন কোথায় যাব। সন্তু, তুই বরং বাড়িতে চিঠি লেখ। কিংবা বই পড়।"

তারপর ভেতরে এসে বললেন, "আমার শরীরটা ভাল লাগছে না রে ! জ্বরটা ছেড়ে গেলেও মাথায় খুব ব্যথা। ভেতরে-ভেতরে ঠাণ্ডা লেগে আছে।

সন্তু বলল, "তা হলে তো কলকাতায় ফিরে গেলেই হয়। তুমি কোনও ওষুধ খাচ্ছ না। পদ্মনাভনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের যদি মাথা ঘামাবার দরকার না থাকে, তা হলে আমাদের কলকাতায় ফিরে যাওয়াই তো ভাল।

কাকাবাবু বললেন, "কালকের দিনটা দেখা যাক। তার মধ্যেও শরীরটা ভাল না হলে কলকাতায় চলে যাব।"

এর পর দু'জনেই দু'খানা বই নিয়ে বসল।

এক ঘন্টা পরে একজন পুলিশ এসে কাকাবাবুকে একটা চিঠি দিল। চিঠি পড়ে কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে।"

তারপর সন্তুকে বললেন, "আজও আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ব। মনে হচ্ছে যেন আবার জ্বর আসছে।"

কাকাবাবু আটটার মধ্যে খাবার দিয়ে দিতে বললেন। সন্তুকেও খেয়ে নিতে হল। তারপর কাকাবাবু পোশাক বদলে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বুকের ওপর একটা বই।

এক সময় তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে গেল বইখানা। একটু-একটু নাক ডাকতে লাগল।

শিলিং-এর মাঝখানে একটা মোটে জোরালো আলো। ঘরে একটা টেবিল ল্যাম্প আছে বটে কিন্তু সেটা খারাপ। সন্তু মুশকিলে পড়ে গেল। আলো জ্বেলে রাখলে কাকাবাবুর ঘুমের অসুবিধে হবে। কিন্তু সন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘুমোবে কী করে?

কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে দু-একবার ছটফট করতেই সন্তু নিভিয়ে দিল আলো। অন্ধকার হয়ে গেলেই যেন বাইরের শব্দ বেড়ে যায়। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে শুনতে লাগল বাইরের বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের শব্দ আর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ।

সেই শব্দ শুনতে-শুনতে, আর অন্ধকারের মধ্যে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে-করতে এক সময় সন্তুরও চোখ জড়িয়ে এল।

আজও সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল মাঝ রাত্তিরে। আজ কোনও হইচই কিংবা গুলির শব্দ হয়নি। কোনও শব্দই নেই। তবু ঘুম ভাঙল কেন সন্তু প্রথমে বুঝতে পারল না।

তারপর তার মনে হল, মাথার কাছে একটা জানলা খোলা, সেখান দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। সন্তু গায়ে কোনও চাদর-টাদর দেয়নি, তাই শীত করছে তার। জানলাটা খুলে গেল কী করে? কিংবা জানলাটা কি শোবার আগে সে বন্ধ করেছিল? ঠিক মনে পড়ছে না। হঠাৎ জেগে উঠলে আগের কথা মনে আসতে অনেকটা সময় লাগে।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, জানলা বন্ধ করতেই হবে।

সন্তু উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘও কেটে গিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে এর মধ্যে। সমুদ্র যেন এগিয়ে এসেছে খানিকটা কাছে।

হঠাৎ সন্তু পেছন ফিরে তাকাল। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। কাকাবাবুর বিছানাটা ফাঁকা। কাকাবাবু নেই।

॥ ৮ ॥

সন্তু আলো জ্বেলেই দৌড়ে গেল বাথরুমের দিকে। বাথরুমের দরজা খোলা। বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ, তবু সন্তু সেই দরজা খুলে একবার দেখল, সেখানেও কেউ নেই।

কাকাবাবুকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, এটা সন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না। ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন নেই। সেরকম কিছু হলে সন্তুর ঘুম ভাঙত না, তা কি হয়। কাকাবাবুর ক্রাচ জোড়া নেই, জুতো নেই। বালিশের তলায় হাত দিয়ে সন্তু দেখল, রিভলভারটাও নেই।

কাকাবাবু নিজেই কোথাও বেরিয়েছেন এত রাত্রে! সন্তুকে ডাকেননি।

সন্তুর প্রথমে খুব অভিমান হল। এরকম আগে কখনও হয়নি। সন্তুকে বাদ দিয়ে কোথাও যাননি কাকাবাবু। এবার তিনি সন্তুকে অনেক কিছুই বলছেন না। পাঞ্জাবে কাকে টেলিফোন করলেন?

সন্তুর হাঁটুতে অত্যন্ত চোট লেগেছিল বলেই কাকাবাবু এবার বেশ ঘাবড়ে গেছেন। সন্তুর বিশ্রাম নেওয়া দরকার বলেই তিনি নিজের অসুখের ভান করে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কাকাবাবু বলেছিলেন, "এখানে তাঁদের বিপদের আশঙ্কা আছে, অথচ তিনি এই রাত্তিরে বেরিয়ে গেলেন একা-একা?"

ঘরের অন্য দরজাটাও বন্ধ। ইয়েল লক, বাইরে বেরিয়ে টেনে দিলেই আবার বন্ধ হয়ে যায়। কাকাবাবু খুব সাবধানে আওয়াজ না করে বেরিয়ে পড়েছেন। সন্তু জামাজুতো পরে নিল, চাবিটা পকেটে নিয়ে বাইরে এসে দেখল, বাংলোর সব ক'টা বারান্দায় আলো জ্বলছে। কোথাও কেউ জেগে নেই। গেটের কাছে একটা টুলে বসে ঘুমে ঢুলছে একজন পুলিশ কনস্টেবল।

কাকাবাবু কোথায় যেতে পারেন, তা সন্তু আন্দাজ করতে পারল না। কোথায় সে কাকাবাবুকে খুঁজতে যাবে?

অভিমানটা যেন বাষ্পের মতন গলা ঠেলে ওপর উঠতে চাইছে। কাকাবাবু তাকে কিচ্ছু না বলে বেরিয়ে গেলেন?

এখন সন্তু একা-একা ঘরে শুয়ে থাকবে নাকি? অসম্ভব!

সামনে দিয়ে বেরুতে গেলে হয়তো পুলিশটি জেগে উঠবে। সন্তু ফিরে এল নিজের ঘরে।

বারান্দার রেলিং টপকে বাগানে নেমে পেছনদিকের গেটটা খুলল নিঃশব্দে। তারপর খুব সাবধানে চারদিকটা দেখে নিল। কোথাও কেউ নেই। বেলাভূমিতেও জনমানবের চিহ্ন নেই। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলেও হাওয়া বইছে খুব জোরে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সন্তু প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেল। ঢেউয়ের মাথায়

পর পর কতকগুলো মালা ভেসে আসছে। জ্বলজ্বল করছে মালাগুলো। এত মালা আসছে কোথা থেকে ?

তারপর সন্তুর মনে পড়ল, ওগুলো আসলে ফসফরাস। ঢেউয়ের সাদা ফেনায় ফসফরাস মিশে থাকে, দিনের আলোয় দেখা যায় না, অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনেকদিন সমুদ্রের ধারে আসেনি সন্তু, তাই তার মনে ছিল না।

ব্যাখ্যাটা জানার পরেও মনে হয় সমুদ্রের বুকে ভাসছে শত-শত আলোর মালা। একেবারে তীরের কাছে এসে সেগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। সেই অপূর্ব দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

সন্তু চলে এল একেবারে জলের রেখার সামনে।

আজও অনেক জেলে ডিঙি তোলা আছে পাড়ের ওপর। সেগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সন্তু খানিকটা দূরে একটা আলো দেখতে পেল।

চতুর্দিকে অন্ধকারের মধ্যে আলোর বিন্দু। কৌতূহলী হয়ে সন্তু নৌকোগুলোর আড়ালে-আড়ালে এগোল সেই দিকে।

খানিকটা কাছে যাওয়ার পর সন্তু বুঝতে পারল, জলে একটা মোটর বোট ভাসছে, আলো জ্বলছে তার ভেতরে।

ডাকবাংলোর বেয়ারার সঙ্গে গল্প করতে-করতে সন্তু শুনেছিল, এখানে এখন খুব ভাল চিংড়ি মাছ উঠছে বলে বড়-বড় মাছের ব্যবসায়ীরা এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের মোটর বোট আছে। তিন-চারখানা মোটর বোট এখানে ঘোরাঘুরি করে। সমুদ্রের বুকে অনেকখানি বেড়াবার জন্য সেই বোট ভাড়াও পাওয়া যায়। সে-কথা শুনেই সন্তুর খুব ইচ্ছে হয়েছিল একবার বোটে করে সমুদ্রের বুকে বেড়াবার।

পাশাপাশি দু'খানা বোট রয়েছে, তার মধ্যে আলো জ্বলছে একটাতে।

আরও কাছে গিয়ে সন্তু শুনতে পেল কারা যেন কথা বলছে একটার ভেতরে। কী বলছে শোনা যাচ্ছে না।

চটপট জুতো খুলে হাতে নিয়ে, প্যান্ট গুটিয়ে সন্তু জলের মধ্যে নেমে পড়ল। ঢেউ-এর শব্দের জন্য জলের মধ্যে তার পায়ের শব্দ কেউ শুনতে পাবে না। বোটের সামনের দিকের ক্যাবিনে আলো জ্বলছে। সন্তু চলে এল তার কছে। খুব সন্তর্পণে কাচের জানলার একপাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, দু'জন লোক ভাত খাচ্ছে মুখোমুখি বসে। তাদের মধ্যে একজন লোককে সন্তু আগে কোথাও দেখেছে।

মুখের মাত্র একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে সন্তু, তাই ঠিক বুঝতে পারল না লোকটাকে কোথায় দেখেছে সে। এখানেই, না অন্য কোথাও, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে ঠিকই। গোপালপুরে এসে বেশি লোকের সঙ্গে সন্তুর দেখাই হয়নি! তা হলে ?

একটা বড় ঢেউ এসে ধাক্কা মারতেই বোটটা বেশ দুলে উঠল, সন্তুও পড়ে

যাচ্ছিল প্রায়। প্যান্ট ভিজে গেল অনেকটা। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

বোটের গা ধরে-ধরে ফিরে আসতে-আসতে সন্তুর মনে হল, ভেতরে গিয়ে লোকটার মুখ একবার দেখে এলে হয় না ?

পরক্ষণেই তার আবার মনে হল, এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যদি সে ধরা পড়ে যায় ? কাকাবাবু কিছু জানতে পারবেন না। কাকাবাবু অনেকবার করে বারণ করেছেন তাকে বাইরে যেতে।

হয়তো এটা একটা সাধারণ মাছধরা বোট। ভেতরের লোকটাকে সন্তু কলকাতায় কোথাও দেখে থাকতে পারে। তবু লোকটাকে ভাল করে না দেখে তার কিছুতেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনের মধ্যে অস্বস্তি থেকে যাবে।

ওই দুটো লোক ছাড়া বোটে আর কেউ নেই মনে হচ্ছে। ওরা ভাত খাওয়ায় ব্যস্ত। সন্তু টপ করে একবার উঠে ভেতরে গিয়ে ভাল করে দেখে আসতে পারে ধরা পড়তে যাবে কেন ?

আর দ্বিধা না করে সন্তু খুব আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে উঠে পড়ল বোটের ওপর। না দাঁড়িয়ে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল সিঁড়ির দিকে। এটা মোটর বোট আর লঞ্চের মাঝামাঝি। ওপরের ডেকে কিছু নেই, নীচে শুধু একটা ক্যাবিন।

সমুদ্রের ঢেউ কখনও থামে না, অনবরত ঢেউয়ের গর্জনে ওপর থেকে নীচের লোক দুটোর কথাবার্তা শোনার কোনও উপায় নেই। সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে-টিপে নামল সন্তু। ক্যাবিনের দরজাটা খোলা। লোক দুটো এখনও খাচ্ছে।

একজন লোক সন্তুর অচেনা। বাকি লোকটাকে সন্তুর চিনতে কোনও অসুবিধে হল না। আসামে জাটিংগার পাখি দেখতে যাওয়ার সময় সন্ধেবেলা যে জিপটায় চেপে গিয়েছিল সন্তুরা, সেই জিপের ড্রাইভার।

আসামে তাদের খাদের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গোপালপুরের পদ্মনাভনের উধাও হওয়ার সম্পর্ক সত্যি তা হলে আছে ? আর কোনও সন্দেহ রইল না ! সন্তু লাফ দেওয়ার আগে এই লোকটা তাকে ধরতে এসেছিল। এই লোকটা এখানেও এসেছে।

এক্ষুনি গিয়ে কাকাবাবুকে খবরটা দেওয়া দরকার। পুলিশ এই লোকটাকে ধরতে পারলেই সব খবর বেরিয়ে যাবে। সন্তু একা এখানে কিছু করতে পারবে না।

সন্তুর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে আসা উচিত, তবু সে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা কী কথা বলছে, তা না শুনে কিছুতেই সে ফিরে যেতে চাইছে না।

ওদের মধ্যে একজন বলল, "আজ হাওয়ার খুব জোর। এর মধ্যে বোট চালানো খুব রিস্কি।"

অন্য লোকটি বলল, "সারাদিন ধরে ঝড়বৃষ্টি আর ভাল লাগে না। এখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। আজ আর কি কোথাও যেতে হবে?"

ড্রাইভারটি বলল, "এখনও বুঝতে পারছি না। আমিও ভাবছি শুয়ে পড়ব। এখানে দু'জনের জায়গা হয়ে যাবে।"

অন্য লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হয়ে যাবে কোনওরকমে।"

অতি সাধারণ কথাবার্তা। এটা সাধারণ মাছধরা বোটও হতে পারে। আসামের ড্রাইভারটা এখানে এসে কাজ নিয়েছে? তা হলেও ওই লোকটা যে সন্তুকে মারতে গিয়েছিল, তাতে তো সন্দেহ নেই। ওকে পুলিশে ধরাতেই হবে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

সন্তু পেছন ফিরতেই শুনতে পেল ড্রাইভারটি বলছে, "শুনছি তো আজকের বেশি আর থাকতে হবে না। কাল পদ্মনাভনকে সরিয়ে দেবে।"

পদ্মনাভন! এরা জানে পদ্মনাভন কোথায় আছে। পুলিশ কিংবা কাকাবাবু যা জানতে পারেননি, সন্তু বাইচান্স তা জেনে ফেলেছে।

সন্তু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। ডেকের ওপর মুখ বাড়িয়েই আবার নিচু করে নিল মাথা। সর্বনাশ! দু'জন লোক টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে একেবারে বোটের কাছে এসে গেছে।

একজন আলো ফেলল ডেকের ওপর। অন্যজন চেঁচিয়ে ডাকল, "বাঘা! বাঘা!"

নীচের ক্যাবিন থেকে একজন উত্তর দিল, "যাই!"

চোখের পলকে রেলিং ধরে গড়িয়ে নেমে এসে সন্তু চলে গেল সিঁড়ির নীচে। সে জায়গাটা ঘন অন্ধকার, কিসের যেন বস্তা রাখা হয়েছে কয়েকটা। আর-একটু হলেই সন্তু ধরা পড়ে যেত। তার বুকটা ধড়ফড় করছে। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। এখান থেকে যে-কোনও উপায়ে পালাতেই হবে। কাকাবাবুকে খবরটা দিতে না পারলে ব্যর্থ হয়ে যাবে সব কিছু।

অন্য লোক দুটো উঠে এসেছে বোটের উপর। সন্তুর নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করল। আর এক মিনিট সময় পেলে সে নেমে পড়ার সময় পেয়ে যেত। ড্রাইভারটিকে চিনতে পারার পরই তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

এঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ শুরু হল। বোটটা এবার স্টার্ট দেবে। সন্তু ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু সে যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারও উপায় নেই। একবার সে উঁকি মেরে দেখল সিঁড়ির ঠিক ওপরেই একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মোটর বোটটা ছুটতে শুরু করল।

এত রাত্রে কি এরা মাছ ধরতে যাচ্ছে? বোটটায় সন্তু মাছধরা জাল দেখতে পায়নি। ভেতরে মাছ-মাছ গন্ধও পায়নি। এরা কোথায় যাচ্ছে কে জানে?

একটুও নড়াচড়া না করে সন্তু নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধরা পড়লে আর

বাঁচার উপায় থাকবে না। কুমার সিং-এর ড্রাইভার তাকে ঠিক চিনতে পারবে। যারা পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেয়, তারা এখানে তাকে মেরে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দিতে দ্বিধা করবে না। তার দেহটাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনওদিন। হাঙর-টাঙরেরা খেয়ে ফেলবে। কাকাবাবু জানতেই পারবেন না, সন্তু কোথায় গেল!

মোটর বোটটা তীব্র বেগে ছুটছে। আর লাফাচ্ছে অনবরত। মাঝে-মাঝে জলের ঝাপটা চলে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। ভিজে যাচ্ছে সন্তুর সারা গা, ওপরে লোকগুলো কী যেন কথা বলছে, শোনা যাচ্ছে না কিছুই।

কতক্ষণ ধরে বোটটা চলছে তা বুঝতে পারছে না সন্তু। মনে হচ্ছে যেন ঘন্টার পর ঘন্টা। হয়তো অতটা নয়, তবু একভাবে একটুও নড়াচড়া না করে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তার এক-একটা মিনিটকেই এক ঘন্টা বলে মনে হচ্ছে। হাঁটুর কাছটা চুলকোচ্ছে, কিন্তু নিচু হতেও সাহস করছে না সন্তু।

কেউ একজন নামছে সিঁড়ি দিয়ে। পাতলা কাঠের সিঁড়ি, মাঝখানে ফাঁক-ফাঁক। সিঁড়ির পেছনে জায়গাও খুব কম। লোকটার পা সন্তুর গায়ে লেগে যেতে পারে। সন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক আওয়াজটা কি শোনা যাবে।

এই সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পেছন ফিরে নামতে হয়, আর ওঠবার সময় সামনের দিকে ফিরে। এবার হয়তো লোকটা সন্তুকে দেখতে পাবে না, কিন্তু ওঠবার সময়?

ধরা পড়ে গেলে সন্তু কী দিয়ে লড়াই করবে? হাতের নখ আর দাঁত ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র নেই তার কাছে। এদের হাতে মরার চেয়ে যে-কোনও উপায়ে সে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করবে। তারপর যা হয় হোক। কিন্তু এরা চারজন।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজটা থেমে গেল। সমুদ্রের বুকে এতদূর এসে এরা থামছে কোথায়? এখানে কোনও দ্বীপ আছে? গোপালপুরের কাছাকাছি কোনও দ্বীপের কথা সন্তু শোনেনি।

যে-লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছিল, সে আবার দুপদাপ করে ওপরে উঠে গেল। সে একটু ভাল করে তাকালেই সন্তুকে দেখতে পেয়ে যেত। কিন্তু সে কিছুই সন্দেহ করেনি।

বোটটা একেবারে থেমে গেছে। কয়েকজন নামছে মনে হল। সন্তু তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে। সবাই নেমে যাচ্ছে কি না আগে বোঝা দরকার।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে ক্যাবিনের মধ্যে ঢুকে গেল। ওপরে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। এবার একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

সন্তু টপ করে সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওপরের ডেকে উঁকি

মারল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সন্তু এক দৌড়ে সামনের দিকে চলে এসে একটা লাফ মারতে গিয়েও থেমে গেল।

মোটর বোটটা জলে ভাসছে বটে, কিন্তু একটু দূরেই তীর দেখা যাচ্ছে। সন্তু জলের মধ্যে লাফ দিলে ঝপাং করে শব্দ হবে। ক্যাবিনের ভেতরের লোকটা সেই শব্দ শুনে ফেলতে পারে। অন্য লোকগুলো নেমে চলে গেছে, তাদের আর দেখা যাচ্ছে না।

সন্তু লাফ না দিয়ে বোটটার একদিক ধরে ঝুলে পড়ে খুব আস্তে জলে নামল। তারপর একটু হেঁটে ডাঙায় পৌঁছেই একটা দৌড় লাগাল।

মুক্তি ! মুক্তি ! ওরা তাকে ধরতে পারেনি। আর কেউ তাকে ধরতে পারবে না।

এই জায়গাটা গোপালপুর থেকে যতই দূরে হোক, দিনের আলো ফুটলে সন্তু ঠিকই ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পাবে। রাত্তিরটা তাকে লুকিয়ে কাটাতে হবে। যতদূর সম্ভব সরে যেতে হবে এই লঞ্চ থেকে।

এখানকার আকাশে মেঘ বিশেষ নেই। খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটেছে। জায়গাটা ঠিক কী রকম, তা সন্তু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল।

এটা কোনও দ্বীপ কিনা তা বোঝা গেল না। বেলাভূমির বেশ কাছেই পর পর সার দেওয়া অনেকগুলো বাড়ি। পঞ্চাশ-ষাটটা তো হবেই। একটু কাছে গিয়ে সন্তু যে ক'টা বাড়ি দেখতে পেল, সবগুলো ভাঙা। কোনওটার দেওয়াল ধসে গেছে, কোনওটার ছাদ নেই, কোনও বাড়িতেই মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

গোপালপুরেও এরকম কিছু ভাঙা বাড়ি দেখেছে সন্তু। যারা সমুদ্রের খুব কাছে বাড়ি বানিয়েছিল, কোনও একদিন সমুদ্র প্রবল উত্তাল হয়ে এগিয়ে এসে ঢেউয়ের ধাক্কায় তাদের বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। এখানেও বোধ হয় এক সময় গোপালপুরের মতন একটা শহর গজিয়ে উঠেছিল, সমুদ্র হঠাৎ একদিন এগিয়ে এসে দিয়েছে সব লণ্ডভণ্ড করে। সমুদ্র তার সীমানার ওপর হস্তক্ষেপ সহ্য করে না।

এর যে-কোনও একটা ভাঙা বাড়িতে সন্তু রাতটা কাটিয়ে দিতে পারে। রাত্তিরে আর কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করাটা ঠিক হবে না। কাল সকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাকাবাবুকে খবরটা দিতে হবে।

একটা ভাঙা বাড়িতে ইট-ফিট সরিয়ে সন্তু সবেমাত্র বসেছে, এই সময় দেখতে পেল একজন লোক আবার বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বোটটার দিকে। লোকটা বোটের ওপর উঠে গেল। এক মিনিট বাদেই কিছু একটা জিনিস নিয়ে নেমে এল আবার।

চাঁদের আলো লোকটার মুখে পড়েছে। সন্তুর চিনতে কোনও কষ্ট হল না। কুমার সিং !

এই লোকটা কাকাবাবুকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। সন্তুর কাছে যদি এখন রিভলভার থাকত তা হলে সে ঠিক লোকটাকে গুলি করত।

এরা সবাই এখানে আড্ডা গেড়েছে। এতগুলো বাড়ির মধ্যে কোনটাতে ওরা লুকিয়ে আছে তা জানা দরকার। পুলিশ ডেকে এনে একটা-একটা করে বাড়ি খুঁজে দেখতে গেলে ওরা তার মধ্যে পালাবে।

সন্তু বেরিয়ে এসে কুমার সিংকে অনুসরণ করতে লাগল।

মাঝে-মাঝে সে পেছনদিকটাও দেখে নিচ্ছে। কিছুতেই সে ধরা দেবে না। চিহ্নগুলোও মনে রাখছে ভাল করে।

এটা একটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর। শুধু যে সামনের দিকের বাড়িগুলোই ভেঙেছে তা নয়, পেছনদিকেও সব বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে খুব সম্ভবত সমুদ্রের ঢেউ এখানেও বাড়িগুলোর ওপরে এসে পড়ে। তাই কেউ আর সারাবার চেষ্টা করেনি। গোটা শহরটাই পরিত্যক্ত।

কুমার সিং অনেকগুলো বাড়ির পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বাড়িটার দরজা বলে কিছু নেই। পুরো দোতলাটাই ভেঙে পড়েছে সামনের দিকে। এক সময় বেশ বড় বাড়ি ছিল বোঝা যায়। হোটেল-টোটেলও হতে পারে।

সন্তু চলে গেল পেছনদিকে।

ভেতরের কোনও একটা ঘর বোধ হয় আস্ত আছে, সেখান থেকে একটা আলোর শিখা আসছে।

বাড়িটা চেনা হয়ে গেল, এখন সন্তুর ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওই ঘরটার মধ্যে কে-কে রয়েছে তা দেখার দারুণ কৌতূহল কিছুতেই দমন করতে পারল না সন্তু। এখানে চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গেছে, অন্ধকারে কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

সন্তু একটু-একটু করে এগিয়ে গেল ভেতরে।

যে ঘরে আলো জ্বলছে সে ঘর থেকে কিছু কথাবার্তাও ভেসে আসছে।

এ বাড়ির দোতলাটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও ওপরে ওঠার সিঁড়িটা রয়ে গেছে। সন্তু পা টিপে-টিপে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। তারপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। ঘরের ছাদটায় একটা ফুটবলের মতন গোল গর্ত হয়ে আছে। সেখান দিয়ে ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়।

একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে একজন লম্বা মতন লোক। হাত-পা বাঁধা, মুখে দশ-বারো দিনের দাড়ি, মাথার চুল উসকো-খুসকো। এই তা হলে পদ্মনাভন! কাকাবাবুর আগে সন্তুই পদ্মনাভনের হদিস পেয়ে গেল।

পদ্মনাভনের সামনে টুলের ওপর বসে আছে একজন লোক। তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না সন্তু। সেই লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুমার সিং।

সেই লোকটি হিন্দিতে কুমার সিংকে জিজ্ঞেস করল, "রাও এল না?"

কুমার সিং বলল, "উনি মোটর বোটে এলেন না। গাড়িতে আসছেন।"

লোকটি বিরক্তভাবে বলল, "কেন, বোটে এল না কেন? জায়গা তো ছিল!"

কুমার সিং বলল, "আজ খুব হাওয়া দিচ্ছে। সমুদ্র খুব রাফ। তাই উনি বোটে আসতে ভয় পেলেন। সেইজন্য গাড়িতে আসবেন।"

লোকটি বলল, "রাও একটা ভিতুর ডিম। গাড়িতে আসবে তো এত দেরি করছে কেন? আজ রাতেই এখান থেকে হায়দরাবাদ চলে যাব। জায়গাটা খুব হট হয়ে উঠছে।"

তারপর লোকটি পদ্মনাভনের দিকে ফিরে বলল, "শুনলে তো? আজ রাতেই আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। যথেষ্ট হয়েছে। দিনের পর দিন কাজ নষ্ট।"

পদ্মনাভন কোনও কথা বললেন না।

লোকটি আবার বলল, "পাথরটা কোথায় আছে বলবে? না মরবে?"

পদ্মনাভন বললেন, "পাথরটা নেই, এ-কথা কতবার বলব! আমার কাছেও নেই। তোমরা আমার ঘর খুঁজে দেখেছ, সেখানেও নেই।"

লোকটি বলল, "কোথাও বালির মধ্যে পুঁতে রাখতে পারো। সেই জায়গাটা বলে দাও, তোমাকে ছেড়ে দেব। পাথরটা চাই, তোমাকে মারতে চাই না।"

পদ্মনাভন বললেন, "আমি কি তোমার মতন বোকা যে, এই কথা বিশ্বাস করব? পাথরটা পেলেও তুমি আমাকে মারবে তা জানি। পাথরটা তুমি পাবে না। সেটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি। ওটা ঝুটো পাথর।"

লোকটি বলল, "পাঁচ হাজার টাকায় কিনে তুমি পাথরটা নষ্ট করে ফেলেছ? কী করে নষ্ট করলে? সেটা আমাকে দেখাও।"

পদ্মনাভন এবার বেশ তেজের সঙ্গে বললেন, "ওরে গাধা, আমি কি তোর মতন মিথ্যে কথা বলি? বলছি নষ্ট করে ফেলেছি, সত্যি নষ্ট করেছি। ওটা তুই কিছুতেই পাবি না।"

কুমার সিং বন্দী পদ্মনাভনকে এক লাথি মেরে বলল, "আমাদের মালিককে তুই গাধা বলছিস। তোকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব!"

পদ্মনাভন বললেন, "যেভাবেই আমাকে মারো, পাথরটা পাবে না!"

সেই লোকটি বলল, "কীভাবে মারব, বলে দিচ্ছি। এখন তোমার শরীরে ইঞ্জেকশান দিয়ে চারগুণ ঘুমের ওষুধ ভরে দেব। তুমি আরামসে ঘুমোবে। তারপর তোমাকে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দিয়ে আসব। ঘুমোতে-ঘুমোতেই তুমি মরে যাবে জলে ডুবে। জলের প্রাণীরা যদি তোমার শরীরটা খেয়ে না-ও ফেলে, ভাসতে-ভাসতে তীরে এসে লাগে, তা হলেও খুনের কোনও চিহ্ন থাকবে না। হাত-পা বাঁধাও থাকবে না। পুলিশ ভাববে, তুমি নিজেই সমুদ্রে ডুবে গেছ। অ্যাকসিডেন্ট। আমরা গোপালপুরের দিকে না গিয়ে এখান

থেকেই চলে যাব।"

পদ্মনাভন বললেন, "এটা তো বেশ ভাল ব্যবস্থা। আমার কোনও কষ্ট হবে না। রাজীব, তোর এই গুণ্ডাটাকে বারণ কর আমাকে লাথি মারতে।"

লোকটি বলল, "যতই সাহসের বড়াই করো, আজ তোমার শেষ রাত।"

তারপর সে কুমার সিংকে জিজ্ঞেস করল, "ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আনতে মাধব রাও এত দেরি করছে কেন ?"

কুমার সিং বলল, "সিরিঞ্জ আমিই এনেছি, সার।"

লোকটি বলল, "তা হলে কাজ সেরে ফেলা যাক। আমি ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একে বোটে করে সমুদ্রের অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দাও। কই দেখি সিরিঞ্জ আর অ্যামপিউল।"

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। এরা সত্যি-সত্যি পদ্মনাভনকে মেরে ফেলবে ? কোনওরকমে আটকানো যায় না ?

ওদের কথা থেমে গেছে। ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিল নাকি ?

উত্তেজনা দমন করতে না পেরে সন্তু গর্তটার মধ্যে মুখ বাড়াবার চেষ্টা করতেই একটা কাণ্ড হল।

সেই গর্তের পাশটা ফেটে গিয়ে ছাদের খানিকটা অংশ সন্তুকে নিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নীচে। পড়তে-পড়তেও সন্তু একটা রড ধরে ঝুলবার চেষ্টা করল, পারল না।

পড়ার পর বেশি চোট না লাগলেও উঠে দাঁড়াবার সময় পেল না সন্তু, কুমার সিং দৌড়ে এসে তার টুঁটি চেপে ধরল।

রাজীব নামের লোকটি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ আবার কে ? ছাদে উঠে বসে ছিল ?"

কুমার সিং বলল, "এই বিচ্ছুটা রাজা রায়চৌধুরীর সঙ্গে ছিল। ওর ভাইপো হয়।"

রাজীব বেশ ভয় পেয়ে বলল, "মাই গড ! তা হলে সে লোকটাও এসে পড়েছে নিশ্চয়ই। সে লোকটা তো জাদুকর। কিছুতেই মরে না।"

কুমার সিং বলল, "না, রাজা রায়চৌধুরী কী করে আসবে ? তাকে আমি দেখেছি, রাত বারোটার সময় সি ফ্রন্ট হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। নিজের চোখে দেখেছি। সে আমায় দেখতে পায়নি। এই ছেলেটা নিশ্চয়ই আমাদের বোটের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল।"

রাজীব গর্জন করে উঠল, "অপদার্থের দল। মোটর বোটে কেউ লুকিয়ে থাকে কি না, তা ভাল করে দেখে নিতে পারো না ? এখন এ ছেলেটাকে নিয়ে কী করা যায় ?"

কুমার সিং বলল, "পাহাড়ের খাদে পড়ে গিয়েও মরেনি। আর চান্স নেওয়া উচিত নয়। সার, এর গলা মুচড়ে শেষ করে দেব ?"

রাজীব বলল, "না, না, আমি এখানে খুনের কোনও চিহ্ন রাখতে চাই না। একেও ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশান করে দিলেই হয়। তারপর জলে ফেলে দেব। দু'জনকে এক জায়গায় ফেলবে না। অন্তত চার-পাঁচ মাইল দূরে।"

সন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। কুমার সিং তার দু'হাত মুচড়ে পেছনে নিয়ে এসে এক হাতে তার গলাটা টিপে রেখেছে। কুমার সিং-এর সঙ্গে জোরে সে পারবে না, তার নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে।

কুমার সিং-এর ড্রাইভার এর মধ্যে এক কলসি জল নিয়ে এল।

রাজীব বলল, "আমাকে গেলাসে জল দে তো, তারপর কাজ শেষ করে ফেলব।"

জল খেয়ে নিয়ে রাজীব সিরিঞ্জে ওষুধ ভরল।

পদ্মনাভন সন্তুর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "ধন্যবাদ; যুবক। তুমি আকাশ থেকে খসে পড়লে, তার ফলে আমি অন্তত পাঁচ মিনিট বেশি বেঁচে গেলাম। না হলে আগেই এরা আমাকে শেষ করে দিত।"

তারপর রাজীবের দিকে ফিরে বললেন, "রাজীব শর্মা, তুমি এক সময় বিজ্ঞানী ছিলে, এখন মানুষ খুন করতে যাচ্ছ? তুমি এত নীচে নেমে যাবে? পুলিশ তোমাকে ধরতে না পারলেও তুমি নিজে তো জানবে তুমি খুনি। সারা জীবন পাপী থেকে যাবে।"

রাজীব বলল, "এখন নিজের প্রাণের ভয়ে ওসব বড়-বড় কথা বলছ। একদিন ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, মনে নেই?"

পদ্মনাভন বললেন, "তুমি পর পর কয়েকটা কাজে ভুল করেছিলে, তারপরেও আমার মুখে-মুখে তর্ক করেছ, তাই তোমাকে বকেছি। তোমাকে তো তাড়িয়ে দিইনি। তুমি নিজেই চলে গেলে।"

রাজীব বলল, "তুমি আমাকে টিকতে দাওনি। তুমি স্বার্থপর। তুমি কক্ষনো চাওনি যে, অন্য কারুর সুনাম হোক। শুধু নিজে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলে।"

পদ্মনাভন বললেন, "কাজে ভুল করলে নাম করবে কী করে? সে যাই হোক, ইনস্টিটিউট ছেড়ে চলে গিয়ে তোমার ক্ষতি কিছু হয়নি। তুমি ব্যবসা করে এর মধ্যেই বিরাট বড়লোক হয়েছ শুনেছি। তবু আমার ওপর এত রাগ?"

কুমার সিং বলল, "সার, এইসব কথা বলে লোকটা দেরি করিয়ে দিচ্ছে।"

রাজীব বলল, "ঠিক বলেছ। ওর কোনও চালাকি আর শুনছি না। ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিচ্ছি। বাঘা, ওকে চেপে ধরে থাক তো।"

পদ্মনাভন বললেন, "ঠিক আছে। আমাকে মারতে চাও যখন, মারো। কিন্তু এই ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। অতটুকু ছেলে, ওর জীবনের আরও কতখানি বাকি আছে। ওকে মেরো না!"

রাজীব বলল, "ছেড়ে দেব ! আর বেরিয়ে গিয়ে ও সব বলে দেবে না ?"

পদ্মনাভন বললেন, "তোমাদের ও চেনে না। তোমরা পালিয়ে গেলে ও যাকে যাই বলুক, তাতে তোমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। ওকে ছেড়ে দাও, আমি পাথরটার সন্ধান তোমাদের বলে দিচ্ছি।"

সন্তু চমকে পদ্মনাভনের দিকে তাকাল। উল্কা-পাথরটা তা হলে নষ্ট হয়নি ! সেটা এখনও লুকোনো আছে।"

রাজীব বলল, "পাথরটা আমাকে দেবে ? কোথায় আছে সেটা ?"

পদ্মনাভন বললেন, "আমার ঘরের কার্পেটের তলায় ভাল করে খুঁজে দেখো !"

রাজীব শর্মা এবার হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, "পদ্মনাভন, তুমি আমাদের অত মূর্খ ভেবেছ ? তোমার ঘর অনেকবার খুঁজে দেখা হয়েছে। কার্পেটের তলায় অতবড় একটা পাথর থাকবে ?"

বাঘা এসে পদ্মনাভনের দু' হাত চেপে ধরল। সিরিঞ্জটা উঁচু করে তুলল রাজীব শর্মা।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা গুলির শব্দ হল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রাজীব শর্মা।

তারপর হাত-বাঁধা একটা লোককে কেউ ঠেলে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে। তার পেছনে রিভলভার হাতে কাকাবাবু।

হাত বাঁধা লোকটাকে দেখে চমকে উঠল সন্তু। দাড়িওয়ালা জজসাহেব !

কাকাবাবু রিভলভারটা সকলের দিকে ঘুরিয়ে তীব্র গলায় বললেন, "কেউ একটু নড়লেই সোজা গুলি চালাব। কোনওরকম দয়া-মায়া করব না। তোমরা সবাই অমানুষ !"

কুমার সিং সন্তুকে ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। রাজীব শর্মার হাতে গুলি লেগেছে, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

কাকাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বললেন, "পদ্মনাভন, তুমি বিপদ নিয়ে খেলা করার অভ্যেসটা এখনও ছাড়লে না ? এ যে সাঙ্ঘাতিক খেলা।"

পদ্মনাভন বললেন, "রায়চৌধুরী ? তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়লে ? এবারেও তা হলে বেঁচে গেলাম ? এই রাস্কেলগুলোর হাতে আমার একটুও মরতে ইচ্ছে করছিল না। এই জায়গাটার সন্ধান পেলে কী করে ?

মাটিতে পড়ে থাকা জজসাহেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই মাধব রাও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল !"

সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু ! সাবধান !"

কুমার সিং কাকাবাবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একটা লোহার রড দিয়ে মারতে গেল। সন্তু লাফিয়ে উঠেও তাকে ধরতে পারল না। কাকাবাবু ঘুরে দাঁড়াবার আগেই কুমার সিং লোহার রড দিয়ে মারল কাকাবাবুর হাতে। রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল ঘরের এককোণে।

কুমার সিং চেঁচিয়ে বলল, "বাঘা, ওটা ধর ধর।"

এই সময় নাটকের মতন একটা কাণ্ড হল। বাইরে থেকে আর-একজন লোক লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। বাঘাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে রিভলভারটা তুলে নিল সে।

পীতাম্বর পাহাড়ী ওরফে অম্বর! তার কাঁধে পরিচিত ঝোলা।

অম্বর রিভলভারটা নাচাতে-নাচাতে বলল, "সাবধান! সাবধান! আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট! কেউ বেগড়বাঁই করলেই গুলি মারব! কাকাবাবু আর সন্তু ছাড়া আর যাকে-তাকে গুলি মারব!"

তার হাতটা এমন থরথর করে কাঁপছে দেখেই বোঝা যায় সে জীবনে কখনও রিভলভার ধরেনি। তবু সে সেটা নিয়ে লাফাচ্ছে আর বলছে, "সাবধান! সাবধান।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াবার সময় ক্রাচ দুটো ফেলে দিলেন। তারপর অম্বরকে আদেশের সুরে বললেন, "অম্বর, তুমি ওটা সন্তুর হাতে দিয়ে দাও!"

কাঁপা-কাঁপা হাতে সন্তুকে দিতে গিয়ে অম্বর রিভলভারটা মাটিতে ফেলে দিল। আবার ঘরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল একটা হুটোপুটি। সন্তু পা দিয়ে রিভলভারটা সরিয়ে দিল অনেক দূরে।

কুমার সিং লোহার রডটা তুলে এবার সরাসরি মারতে গেল কাকাবাবুর মাথায়।

কাকাবাবু সোজা তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটো হাত তুললেন মাথার ওপর। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা, কিন্তু তাঁর দু' হাতে কতখানি জোর, তা অন্য লোকে বুঝতে পারে না। রাগে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে গেছে।

কুমার সিং খুব জোরে মারলেও কাকাবাবু রডটা ধরে ফেললেন। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেটা। তারপর কুমার সিং-এর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন।

ধোপারা যেমনভাবে কাপড় কাচে, সেইভাবে কাকাবাবু কুমার সিংকে শূন্যে তুলে এক আছাড় মারলেন। প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হল। মনে হল, যেন কুমার সিং-এর মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

কাকাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আমার দিকে রিভলভার তুলেছিলে, আমাকে লাথি মেরে খাদে ফেলে দিয়েছিলে, আবার আমার হাতে মেরেছ, তোমাকে আমি এমন শাস্তি দেব—"

অম্বর বাঘাকে দুটো ঘুসিতে কাত করে চলে এসেছে কাকাবাবুর পাশে। কাকাবাবু রাগের চোটে আবার কুমার সিংকে শূন্যে তুলে আছাড় মারতে গেলেন।

এবার অম্বর কাকাবাবুর কাঁধ চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, কী করছেন? ও যে মরে যাবে! ছেড়ে দিন, ওকে এবার আমার

হাতে ছেড়ে দিন, আমি ওকে কী শাস্তি দিই দেখুন !"

কাকাবাবু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সত্যিই তো, আর-একবার আছাড় দিলে লোকটা শেষ হয়ে যাবে। তিনি কুমার সিংকে আস্তে নামিয়ে দিলেন মাটিতে।

কুমার সিং-এর মাথা ফেটে চৌচির হয়নি, কিন্তু লেগেছে প্রচণ্ড। একদিকের মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। ভয়ে মুখখানা চুপসে গেছে তার। সে ভেবেছে, কাকাবাবুর বুঝি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কিছুতেই তাঁকে মারা যায় না।

কাঁধের ঝোলাটা থেকে একটা ছোট্ট বেতের বাক্স বের করল অম্বর। তার ঢাকনা খুলতে-খুলতে সে বলল, "আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ! এবার তোমার কী অবস্থা করি দ্যাখো ! অন্য লোককে মারতে তোমার হাত কাঁপে না, তাই না ?"

বেতের বাক্সটা থেকে ফস করে একটা সাপ বের করে সে ছুঁড়ে দিল কুমার সিং-এর গায়ে। সে বিকট চিৎকার করে উঠল। বলতে লাগল, বাঁচাও ! বাঁচাও !

সাপটা বেশ বড়। ফণা তুলে ফোঁস-ফোঁস করতে-করতে সেটা জড়িয়ে ধরল কুমার সিংকে।

অন্য সবাই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল।

সন্তু ফ্যাকাসে মুখে বলল, "এ কী করলেন ? ওকে সাপে কামড়ে দেবে ?"

অম্বর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ওটার বিষ দাঁত নেই। আমি ভেঙে রেখেছি। এই সাপটা আমি সব সময় সঙ্গে রাখি লোককে ভয় দেখাবার জন্য।"

॥ ৯ ॥

পদ্মনাভন ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত দুটো ছুঁড়তে-ছুঁড়তে বললেন, "ওফ্, সারা গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।"

ভাঙা বাড়িগুলোর বাইরে ফাঁকা জায়গায় বালির ওপর বসেছেন কাকাবাবু। সন্তু আর অম্বর তাঁর দু'পাশে। এখন জ্যোৎস্না অনেক স্পষ্ট। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় দুলছে অনেক ফসফরাসের মালা। ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে ওদের খুব কাছে এসে, মালাগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে জোনাকির মতন।

পদ্মনাভন আবার বললেন, "এবার ভেবেছিলাম আর আশা নেই। আর কয়েক মিনিট দেরি হলেই ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়ে আমাদের সমুদ্রে ফেলে দিত। তুমি একেবারে ঠিক সময়ে কী করে এলে, রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু বললেন, "আর-একটু আগে আসতে পারতাম। কিন্তু পুলিশের

সঙ্গে তর্ক করতে খানিকটা সময় চলে গেল। এমন সব অদ্ভুত নিয়মকানুন ওদের। এই জায়গাটা ওড়িশার বাইরে, অন্ধ্রপ্রদেশে। আমি ওড়িশার গোপালপুর থেকে একটা পুলিশের গাড়ি আর তিনজন পুলিশ সঙ্গে এনেছি। তারা এদিকে এসে বলে যে, অন্ধ্রের পুলিশকে আগে খবর দেওয়া দরকার। আমি বললাম, 'পরে খবর দেবে!' ওরা বলল, 'আগে খবর না দিলে সেটা বেআইনি হবে।' বুঝে দ্যাখো ব্যাপার!' খবর দিতে-দিতে যদি আসামি পালিয়ে যায়? কিংবা আরও সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে যায়! তখন আমি পুলিশদের বললাম, 'ঠিক আছে, তোমরা অন্ধ্রের পুলিশদের খবর দাও, ততক্ষণ আমি একাই এগোচ্ছি।"

দূরে দাঁড়িয়ে আছে দু'খানা পুলিশের জিপ। রাজীব শর্মা আর তার দলবলকে বেঁধে পুলিশরা একখানা গাড়িতে ভরছে। কুমার সিং-এর গা থেকে সাপটাকে তুলে এনে অম্বর আবার সেটাকে রেখে দিয়েছে বেতের বাক্সটাতে।

পদ্মনাভন জিজ্ঞেস করলেন, "মাধব রাও-কে তুমি কোথায় পেলে? মাধব রাও যে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে, সেটা আমি জানতাম না! ছি ছি ছি, ওর মতন লোকও খুনিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই মাধব রাও এক রিটায়ার্ড জজ সেজে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার চোখে ধুলো দিতে পারেনি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি ওঁকে কী করে সন্দেহ করলে? আমার তো সব সময়েই মনে হয়েছে, উনি নিরীহ ভালমানুষ!"

অম্বর বলল, "আমিও তো তাই ভেবেছি।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "রিটায়ার্ড জজ পি. কে. দত্ত আর পীতাম্বর পাহাড়ী—এই দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আসামে। আবার তিনদিন পরেই এই দু'জনকে দেখা গেল গোপালপুরে। এটা সন্দেহজনক নয়? মনে হয় না, এই দু'জনেই এক দলের?"

অম্বর প্রায় ব্যথা পাওয়ার সুরে বলল, "সে কী, কাকাবাবু? আমাকে সন্দেহ করেছিলেন? আমি তো আপনার ভক্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "তবু, একটি বাঙালির ছেলে আসামের জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ ধরে বেড়াচ্ছে, এটা বিশ্বাস করা শক্ত নয়?"

অম্বর বলল, "এখন দেখলেন তো, আমার সঙ্গে সবসময় একটা সাপ থাকে? বন্দুক-পিস্তলের চেয়েও এটা বেশি কাজে লাগে! এখানে এলাম আপনাদের দেখা পাওয়ার জন্য, আর আপনারা আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে লাগলেন। আমি ঠিক করেছিলুম, আপনাদের একটা অ্যাডভেঞ্চারে আমি সঙ্গী হব। দেখলেন তো, ঠিক হয়ে গেলুম! আমি আপনাকে সব সময় ফলো করেছি। ফলো করতে-করতে এখানে পৌঁছে গেছি!"

কাকাবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, অম্বর। থ্যাঙ্ক ইউ! তোমাকে সন্দেহ-করাটা

আমার ভুল হয়েছে। রিটায়ার্ড বিচারকমশাইকে কখন সন্দেহ করলাম জানো ? তার একটা কথায় আমার খটকা লেগেছিল। শিলচরে ও ডাক্তার ভার্গবের কাছে বলল, "পাহাড়ের খাদে আমাকে আর সন্তুকে হাত আর মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। সন্তুর হাত-মুখ বাঁধা ছিলই না। আমার যে মুখ বাঁধা ছিল, সেটা ও জানল কী করে ? অম্বর আসবার আগেই আমার মুখের বাঁধন খুলে গিয়েছিল। আমি অম্বরকে কিছু বলিনি, অম্বরও জজসাহেবকে কিছু বলেনি। তা হলে ? আমাদের যে হাত-মুখ বেঁধেই ফেলে দেওয়া হবে, সেই প্ল্যানটাই ও জানত আগে থেকে ? তা ছাড়া, শিলচরে গিয়ে ও ডাক্তার ভার্গবের কাছে থাকার জন্য আমাদের জোর করছিল। ওখানে আমাদের আটকে রাখাই ছিল ওর মতলব।"

পদ্মনাভন বললেন, "মাধব রাও রিটায়ার্ড জজ না ছাই। ও তো একজন জুনিয়ার সায়েন্টিস্ট !"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও আমি জানলাম এখানে এসে। জজসাহেবরা রিটায়ার করলেও লোকে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। কেউ তাদের ক্রিমিন্যাল বলে সন্দেহ করে না। পুলিশও খাতির করে তাদের। সেইজন্য বুদ্ধি করে ও রিটায়ার্ড জজ সেজেছিল। দত্ত পদবীটা বাঙালিদের হয়, অসমিয়াদের হয়, পাঞ্জাবিদেরও হয়।"

অম্বর ফস করে বলল, "ঠিক বলেছেন। ফিল্মস্টার ছিল সুনীল দত্ত, সে তো পাঞ্জাবি !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কলকাতায় ফোন করে হাইকোর্টের সমস্ত জজদের একটা লিস্ট চাইলাম। তখন জানা গেল যে, পি. কে. দত্ত নামে কোনও জজ এদিকে নেই। পাঞ্জাবে একজন ছিলেন, সদ্য রিটায়ার করেছেন। তখন ফোন করলাম পাঞ্জাবের অমৃতসরে। সেখান থেকে খবর পেলাম, রিটায়ার্ড জজ পি. কে. দত্ত অত্যন্ত অসুস্থ, তিনি আছেন হাসপাতালে। তখন সব ফাঁস হয়ে গেল।"

পদ্মনাভন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওর পিছু-পিছু এখানে চলে এলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তা জানা যাচ্ছে না। তখন আমি ঠিক করলাম এই নকল জজসাহেবটা যদি ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকে, তা হলে ও কোনও-না-কোনও সময়ে তোমার কাছে যাবেই। সুতরাং ওকে ফলো করলে তোমার হদিস পাওয়া যেতে পারে। আজ রাত্তিরে ও একটা গাড়ি নিয়ে বেরোতেই আমি কয়েকটা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ওর পিছু ধাওয়া করলাম। রাস্তা দারুণ খারাপ, গাড়ি চলেছে খুব আস্তে-আস্তে, তাই আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়েছে, যাতে ও টের না পায় !"

অম্বর হেসে বলল, "ভাগ্যিস রাস্তা খারাপ ছিল ! তাই আমি সাইকেলে আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক এসে পড়েছি। কাকাবাবু, আপনি নকল জজকে

ফলো করেছেন, সে টের পায়নি। আর আমিও যে আপনাকে ফলো করছি, তা আপনিও টের পাননি!"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি, তোমার এলেম আছে।"

পদ্মনাভন বললেন, "মাধব রাও এই খুনিদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল! দ্যাখো রায়চৌধুরী, রাজীব শর্মার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল, সে দোষ করেছিল বলে তাকে আমি গালাগালি দিয়েছিলাম, এজন্য আমার ওপর তার রাগ আছে। এর আগেও সে দু-একবার আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে! কিন্তু মাধব রাও! আমি কখনও তার কোনও ক্ষতি করিনি। এক সময় সে আমার সঙ্গে কাজ করেছে, তারপর নিজেই ছেড়ে চলে গেছে। বিশ্বাস করো, আমি ওর সঙ্গে কোনওদিন খারাপ ব্যবহার করিনি! তবু আমার ওপর ওর অসম্ভব হিংসে ছিল। আমার খ্যাতি হচ্ছে, ওর কেন ততটা হচ্ছে না। শুধু এই হিংসেতেই মানুষ এমন পাগল হয়ে যায়? আমাকে খুন করতেও ওর আপত্তি নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু তোমাকে কেন? ও তো সন্তু আর আমাকেও খুন করতে চেয়েছিল। রাজীব শর্মার সঙ্গে ও হাত মিলিয়েছে। তারপর রাজীব ভার নিয়েছে তোমাকে সরাবার, আর মাধব রাও ভার নিয়েছে আসামে আমাদের সরিয়ে দেওয়ার। লোকটা কিন্তু এমনিতে খুব ভিতু। এখানে গাড়ি থেকে নামবার পর যেই আমি ওর মাথার পেছনে রিভলভার ঠেকালাম, ও ভয় পেয়ে হাউমাউ করে উঠল। স্বীকার করে ফেলল সব। আবার বলে কী, আমাকে আর সন্তুকে একেবারে খুন করার ইচ্ছে ওর ছিল না। সেইজন্য হাফলঙের পাহাড়ে এমন একটা খাদের ধারে নিয়ে আমাদের ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল, যেখানে অনেক ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা আছে। যাতে আমরা মরে না গিয়ে আহত হয়ে বেশ কিছুদিন শুয়ে থাকব, তাতেই ওর কাজ হয়ে যাবে!"

পদ্মনাভন বললেন, "রাস্কেল! পাহাড় থেকে ঠেলে দিলে কে আহত হবে, আর কে মরবে, তার কি কোনও ঠিক আছে? পড়ার সময়েই তো অনেকে হার্ট ফেইল করে মরে যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা পদ্মনাভন, একটা ব্যাপার আমি এখনও বুঝিনি। জেলের কাছ থেকে উল্কা-পাথরটা কেনার পরও তুমি গোপালপুরের বাংলোয় অতদিন রয়ে গেলে কেন? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল না? শুধু-শুধু কেন বসে রইলে?"

পদ্মনাভন বললেন, "তোমার জন্য!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আমার জন্য? তার মানে?"

পদ্মনাভন বললেন, "ডাকবাংলোতে এসেই জানলাম, পাশের ঘরটা তোমার নামে বুক হয়ে আছে! তখনই আমি ঠিক করলাম, বাঃ চমৎকার! রায়চৌধুরী এসে পড়লে আমার আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তাই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম তোমার জন্য। কিন্তু তুমি এলেই না! আমি বাংলোর লোকদের

বলে রেখেছিলাম, ওই ঘর যেন আর কাউকে দেওয়া না হয় !"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই আমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে আসামে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তোমার সমস্যাটা কী ছিল ?"

পদ্মনাভন বললেন, "পাথরটা আমি কেনার পরেই রাজীব শর্মাকে দেখতে পেলাম ! রাজীবের এমনই দুর্ভাগ্য, ও আমার ঠিক এক ঘন্টা পরে পৌঁছেছে। না হলে আমার থেকেও বেশি দাম দিয়ে ও পাথরটা কিনে নিত। আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পাথরটা কেনার পর সবাই ভাবল, ওটা খুবই দামি জিনিস।"

কাকাবাবু বললেন, "খুব স্বাভাবিক। তোমার মতন একজন বৈজ্ঞানিক অত টাকা দিয়ে তো একটা পাথর কিনবে না ! সবাই ভাববে, নিশ্চয়ই ওর মধ্যে অন্য কিছু আছে।"

পদ্মনাভন বললেন, "রাজীব শর্মা ওটা পাওয়ার জন্য খেপে গেল। আমার কাছে অন্য লোক পাঠাল, দশ হাজার টাকা দিয়ে ওটা কিনতে চেয়ে। আমি রাজি হইনি। রাজীব আমার পুরনো শত্রু। ব্যবসা করে এখন অনেক টাকা হয়েছে ওর, হাতে অনেক দলবল আছে। পাথরটা নিয়ে আমি গোপালপুর থেকে বেরোবার চেষ্টা করলেই ও জোর করে কেড়ে নেবে। আমাকে মেরে দিতেও পারে। এর আগে ও আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছে !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি পুলিশের সাহায্য নিলে না কেন ?"

পদ্মনাভন বললেন, "আমি পুলিশের ওপর ভরসা করি না। পুলিশের চেয়েও তোমার ক্ষমতার ওপর আমার বিশ্বাস অনেক বেশি। দ্যাখো, আমি ভুল করিনি। শেষ পর্যন্ত তুমিই তো এসে আমাকে বাঁচালে !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পাথরটার শেষ পর্যন্ত কী হল ? লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলে ?"

পদ্মনাভন মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ। কার্পেটের নীচে।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কার্পেটের নীচে ?"

কয়েক পলক পদ্মনাভনের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "ও, বুঝেছি !"

সন্তু ব্যস্তভাবে বলল, "কী হল ? কী হল ? আমি বুঝতে পারছি না তো ! অতবড় একটা পাথর কার্পেটের নীচে কী করে লুকনো যাবে ? কার্পেটটা উঁচু হয়ে থাকবে না ? তা ছাড়া ওরা কার্পেট নিশ্চয়ই উলটে দেখেছে !"

পদ্মনাভন বললেন, "শোনো ইয়াংম্যান। আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমি ওদের বলেছিলাম, পাথরটা নেই। এই তিনটেই সত্যি। তবু ওরা বোঝেনি !"

অম্বর বলল, "যা বাবা ! এ যে একটা ধাঁধা !"

কাকাবাবু বললেন, "একটু বুদ্ধি খাটালে ধাঁধারও উত্তর পাওয়া যায়। সবারই বুদ্ধি থাকে। কিন্তু সবাই সেটা ব্যবহার করতে জানে না। কার্পেটের নীচে কী থাকে ? ধুলো ! পদ্মনাভন ওই উল্কা-পাথরটাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে কার্পেটের

নীচে রেখে দিয়েছে। তাই কেউ বুঝতে পারেনি!"

পদ্মনাভন বললেন, "পাথরটার এমনিতে তো কোনও দাম নেই আমার কাছে। উল্কা-পাথরের মধ্যে নতুন কোনও মেটাল পাওয়া যায় কিনা, তাই নিয়ে সারা পৃথিবীতে গবেষণা হয়। এই পাথরটা একটু অন্যরকম দেখতে, ভেতরটা সবুজ, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। এটার মধ্যে যদি এমন কোনও মেটাল পাওয়া যায়, যা পৃথিবীতে নেই, তা হলেই এক বিরাট ব্যাপার হবে, সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। সেইজন্য আমি ঘরে বসেই কয়েকটা পরীক্ষা করলাম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "যন্ত্রপাতি পেলেন কোথায়?"

পদ্মনাভন বললেন, "এর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি লাগে না। প্রথমে আমি একটা ছোট ছুরি দিয়ে চেঁছে দেখলাম, কেন ওটা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। পাথরটা বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের জলে ডুবে ছিল। ওর গায়ে ফসফরাস লেগে গেছে। তোমরা সবাই জানো, অন্ধকারে ফসফরাস জ্বলজলে হয়ে যায়। ছুরি দিয়ে চাঁছতেই সেটা উঠে গেল। এবার দেখা দরকার, সেটা শুধুই পাথর, না তার মধ্যে কোনও ধাতু মিশে আছে। তাই একটা হাতুড়ি দিয়ে আমি সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলাম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তাতে জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল না?"

পদ্মনাভন বললেন, "পাথর হিসেবে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ধাতু থাকলে গুঁড়ো করলেও ক্ষতি নেই। লোহার গুঁড়োকে আবার লোহার পিণ্ড করা যায় না? গুঁড়ো করার সুবিধে এই, আমার সুটকেসের মধ্যে ধুলো হিসেবে ছড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যেতে পারব, কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এরপর ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখব।"

কাকাবাবু বললেন, "পদ্মনাভন, তোমার দোষ এই, তুমি সব সময় বিপদের ঝুঁকি নিতে ভালবাস। আমার মতে, প্রথম দিনই পুলিশের সাহায্য নিয়ে তোমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।"

পদ্মনাভন বললেন, "বিপদকে এড়াতে চাইলেই কি আর বিপদ এড়ানো যায়? তুমি বলতে চাও, এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত পুলিশ আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত? মাঝখানে পাহারাদার পুলিশ ঘুমিয়ে থাকত, আর রাজীব শর্মার ভাড়াটে গুণ্ডারা গুলি করে আমায় মেরে পাথরটা নিয়ে পালাত! তবে রায়চৌধুরী, একটা কথা বলে রাখছি। যদি এই পাথরটা থেকে সত্যিই বড় কিছু আবিষ্কার করা যায়, তা হলে তোমার নামটাও তার সঙ্গে যুক্ত হবে। আমি যদি মরে যেতাম, তা হলে তো কিছুই হত না। কার্পেটের তলায় ধুলোর কথাও কেউ জানত না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, না, আমার নামটাম দরকার নেই। আমার কথা লোকে যত কম জানে, ততই ভাল। এমনিতেই আমার শত্রুর অভাব নেই!"

অম্বর বলল, "কাকাবাবু, এর পর থেকে অন্য অ্যাডভেঞ্চারেও আমাকে সঙ্গে

নেবেন তো ?”

“কাকাবাবু বললেন, “আর আমি কোনও অ্যাডভেঞ্চার-ট্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি না। এর পর আবার আমরা আসামে যাব। সেখানে অম্বর তোমার সাপধরা দেখব। তা ছাড়া জাটিংগা-পাখির রহস্যটা ভেদ করতে হবে না ? কী বল, সন্তু ?”

সন্তু মাথা নাড়ল।

পদ্মনাভন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “পাখির রহস্য ? সেটা কী ব্যাপার ?”

কাকাবাবু বললেন, “সে একটা অন্য গল্প। তোমাকে পরে বলব। এখন চলো, গোপালপুরে ফেরা যাক।”

রাজীব শর্মার মোটর বোটের চালককে আগেই বন্দী করা হয়েছে। গাড়ির রাস্তা খুব খারাপ বলে কাকাবাবু ঠিক করে রেখেছিলেন, মোটর বোটেই ফিরবেন। কাকাবাবুই চালাতে জানেন।

তীরের কাছে সাদা রঙের বোটটা একটা রাজহংসীর মতন দুলে-দুলে ভাসছে। সবাই মিলে উঠল সেই বোটে। কাকাবাবু এঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে অম্বর বলল, “সন্তু, আমি যদি একটা গান ধরি, তোমার আপত্তি আছে ? আমি নিজে গান বানাই, নিজেই সুর দিই। শুনবে ?”

ঢেউয়ের গর্জন ছাপিয়েও চিৎকার করে সে গাইতে লাগল :

গোপালপুরে উল্কা পড়ল একখানা
তাই নিয়ে ভাই কত কাণ্ড-কারখানা...

একটি লাল লঙ্কা

কাকাবাবু বললেন, "অসম্ভব! তোমার এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি এ-প্রসঙ্গ আর আমার কাছে বোলো না, অন্য কথা বলো!"

অরিজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কাকাবাবু, আমার যে আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "হ্যাঁ, উপায় আছে। তুমি এক্ষুনি চান করে নাও, তারপর ভাল করে খাওদাও, তারপর একটা লম্বা ঘুম দাও!"

অরিজিৎ আবার বলল, "কাকাবাবু, তুমি বুঝতে পারছ না..."

কাকাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার আর বোঝার দরকার নেই।"

তারপর তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

সন্তু একটু আগেই ব্যাডমিন্টন খেলে ফিরেছে। কাকাবাবুর ঘরে একবার উঁকি মেরে ওপরের ঘরে চলে গেছে। কাকাবাবুর ডাক শুনে নীচে নেমে এল তরতর করে। মা-বাবা বেড়াতে গেছেন পুরী, বাড়িতে আর বিশেষ লোকজন নেই।

কাকাবাবুর ঘরে একজন ভদ্রলোককে দেখতে পেল সন্তু, মুখটা চেনা-চেনা। খুব সম্ভবত মধ্যপ্রদেশে কোথাও দেখা হয়েছিল। কিন্তু এখন তার মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মাথার চুল ধুলোবালি-মাখা, তার গায়ের প্যান্টশার্ট দোমড়ানো-মোচড়ানো, কেমন যেন পাগল-পাগল চেহারা।

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎকে চিনতে পারছিস তো, সন্তু? অরিজিৎ সিকদার। সেই একবার বস্তার জেলার নারানপুরে এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুর মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক একজন বটানিস্ট। সারা ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বিচিত্র সব গাছ খুঁজে বেড়ান। সেবারে তিনি বস্তার জেলার জঙ্গলে বুনো চা-গাছ খুঁজছিলেন। অনেক জঙ্গলেই নাকি একরকম বুনো চা-গাছ আছে, চাষ করতে হয় না। নিজে-নিজেই জন্মায়, আগে কেউ তার সন্ধান রাখত না।

কিন্তু সেবারে তো ভদ্রলোককে খুব শান্ত আর ভদ্র মনে হয়েছিল, হঠাৎ তাঁর এইরকম চেহারা হল কী করে ?

কাকাবাবু আবার বললেন, "দিল্লিতে আমার সঙ্গে কাজ করত সত্যেন, এই অরিজিৎ তার ভাইপো। ওকে অনেক ছোট বয়েস থেকে দেখছি, তখন থেকেই ও আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকে। অরিজিৎ আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবে, বুঝলি। ওর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বল রঘুকে, আর চান করার জন্য ওকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে।"

অরিজিতের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে আর তো কোনও পোশাক নেই। তুমি আমারই একটা পাজামা, পাঞ্জাবি পরে নাও আজ।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে একবার কাকাবাবু আর একবার সন্তুর দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তার এক হাতে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো।

কাকাবাবু আলমারি খুলে পাজামা, পাঞ্জাবি বার করলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "অরিজিৎ, তোমার ওই কৌটোটা আমার কাছে রেখে যাও।"

অরিজিৎ হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে বলল, "না, এটা আমার কাছেই থাকবে !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি চান করতে যাচ্ছ, ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি ? ওটা আমার কাছেই থাক।"

অরিজিৎ কৌটোটা পেছন দিকে লুকিয়ে প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলল, "না ! এটা আমি কাউকে দিতে পারব না !"

তার চোখ দুটো এমন জ্বলছে যে, সেদিকে তাকালে গা ছমছম করে।

কাকাবাবু অবশ্য বিচলিত হলেন না। তিনি অরিজিতের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, "দাও, দাও ওটা আমাকে।"

কাকাবাবুর ওইরকম গলার আওয়াজ শুনে অনেক বাঘা-বাঘা বদমাশকেও ঘাবড়ে যেতে দেখেছে সন্তু। অরিজিৎ আর কিছু বলতে পারল না। কৌটোটা সে তুলে দিল কাকাবাবুর হাতে। তার হাতটা কাঁপছে।

কৌটোটার মধ্যে কী আছে, তা দেখার দারুণ কৌতূহল হল সন্তুর, কিন্তু কাকাবাবু সেটা খুলেও দেখলেন না। রেখে দিলেন জামা-কাপড়ের আলমারিতে। তারপর এমনভাবে পিছন ফিরে একটা বই হাতে তুললেন যাতে তাঁর সঙ্গে আর কোনও কথা বলা না চলে।

সন্তু অরিজিৎকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল দোতলার বাথরুমটা। একটা নতুন সাবান আর তোয়ালে এনে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনি দাড়ি কামাবেন ? কাকাবাবুর কাছ থেকে ব্লেড এনে দেব ?"

অরিজিৎ রুক্ষভাবে বলল, "না, দরকার নেই !"

অরিজিৎ স্নান করল প্রায় এক ঘন্টা ধরে।

এর মধ্যে সন্তু দু-তিনবার কাকাবাবুর ঘরে উঁকি মেরেছে, যদি কৌটোটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। কাকাবাবু একমনে বই পড়েই চলেছেন। এই সময় তাঁকে বিরক্ত করা সম্ভব নয়।

ঠিক আটটার সময় খাবার দিয়ে দেওয়া হল। কাকাবাবু রাত্তিরে রুটি খান। সন্তু ভাত ভালবাসে। রঘু ভাত আর রুটি দু'রকমই বেশি করে বানিয়েছে, তার সঙ্গে ডাল, বেগুনের ভর্তা আর মুরগির মাংস।

খাবার টেবিলে বসার পর কাকাবাবু অরিজিৎকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রুটি খাবে, না ভাত ?"

অরিজিৎ বলল, "ভাত ! না, রুটি। থাক, ভাতই খাব। কিংবা, রুটি কি বেশি আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি দুটোই খাও।"

কাকাবাবু রুটি খান ঠিক তিনখানা। অরিজিৎ খেল আটখানা রুটি। তারপর সে ভাত নিল। সন্তু যতটা ভাত খায়, অরিজিৎ নিল তার তিন গুণ। রঘু তাকে ভাত দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে, সে না বলছে না।

সে এমনভাবে খাচ্ছে, যেন বহুদিন খেতে পায়নি। কিন্তু কয়েকদিন উপোস করলেও কি মানুষ একসঙ্গে বেশি খেতে পারে ? অরিজিতের রোগা-পাতলা চেহারা। এরকম চেহারার কোনও লোককে সন্তু কখনও এতখানি খেতে দ্যাখেনি।

সবটা ভাত শেষ করার পর অরিজিৎ আরও দু'টুকরো মাংস আর একটু ঝোল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর রুটি নেই ?"

আর-একখানা মোটে রুটি বাকি ছিল, রঘু সেটাই দিয়ে দিল।

কাকাবাবু এঁটো হাতে চুপ করে বসে অরিজিতের খাওয়া দেখলেন। তারপর বললেন, "এইবার গিয়ে একটা ঘুম দাও। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দিল্লিতে টেলিফোনে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাও ?"

অরিজিৎ দু'দিকে শুধু মাথা নাড়ল।

হাত ধোয়ার পর অরিজিৎ কাকাবাবুর ঘরে এসে বলল, "এবার আমার কৌটোটা দিন, ওটা আমার ঘরে রাখব।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা আমার কাছে থাকলে অসুবিধের কী আছে ?"

অরিজিৎ বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না, ওটা কোনওক্রমে নষ্ট হয়ে গেলে মহা ক্ষতি হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে থাকলে নষ্ট হবে কেন ? আমি গগন বোসের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি, কাল সকাল এগারোটায় জিনিসটা সায়েন্স কলেজে নিয়ে যাব।"

অরিজিৎ উত্তেজিতভাবে বলল, "সায়েন্স কলেজে ? ওরা কিছু বুঝবে না।

ওটা সুইডেনে পাঠাতে হবে। সেখানে এই ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, সুইডেনে পাঠাবারই ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আজ রাত্তিরে আমার কাছে রাখতে তোমার এত আপত্তি কেন ?"

"ওটা আমার জিনিস ! আমি ছাড়া কেউ এর সন্ধান জানে না !"

"ওটা তোমার জিনিস, তা মানছি ! কিন্তু আমাকে যদি তোমার এতই অবিশ্বাস, তা হলে ওটা নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছ কেন ! আর এসেই যখন পড়েছ, তখন তোমাকে আমি মোটেই পাগলামির প্রশ্রয় দিতে পারি না। জিনিসটা আমার কাছেই থাকবে।"

সন্তু আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কৌটোটার মধ্যে কী আছে ?"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অরিজিৎকে বললেন, "আচ্ছা, একটুখানি বসে যাও। তোমার ঘটনাটা সন্তুকে বলো। বারবার নিজের মুখে বললে এক সময় নিজেই তুমি বুঝতে পারবে যে, সবটাই বানানো। তোমার কল্পনা। হয়তো এরকম একটা ব্যাপার কখনও স্বপ্নে দেখেছ, তারপর সেটাকেই সত্যি বলে ধরে বসে আছ। এরকম কিন্তু বাস্তবে হতে পারে না।"

অরিজিৎ একটা চেয়ারে বসে পড়ে মুখ গোঁজ করে বলল, "ও ছোট ছেলে, ও এসবের কী বুঝবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা কম নয়। তুমি যে-অঞ্চলটার কথা বলছ, সন্তুও সেখানে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সন্তু, সেই যে সেবারে আমরা নেপাল থেকে এভারেস্টের রুট ধরে গিয়েছিলাম, মনে নেই ? সেই একটা অতি-মানবের দাঁতের খোঁজে ?"

সন্তু বলল, "সে-ঘটনা কখনও ভোলা যায় ? উঃ, কী শীত ছিল, তারপর সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে..."

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিতের ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি তোকে বলে দিচ্ছি। অরিজিৎ তো বনে-জঙ্গলে নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত গাছপালা খুঁজে বেড়ায় ? এবারে সরকার থেকে ওকে পাঠানো হয়েছিল নেপালে। বারো-তেরো হাজার ফিট উঁচুতেও কিছু-কিছু গাছ জন্মায়। সেখানে নাকি কোথাও-কোথাও একরকম স্ট্রবেরি গাছ দেখতে পেয়েছে কেউ-কেউ। অত ঠাণ্ডায় স্ট্রবেরি গাছ কী করে বেঁচে থাকে সেটাই ওর গবেষণার বিষয়। কী তাই তো ?"

অরিজিৎ ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎ যে-জায়গাটা বেছে নিয়েছিল, সেখানে দু-একটা গ্রাম আছে, সেখানে ইয়েতিরা এসে মাঝে-মাঝে উপদ্রব করে বলে

গুজব আছে।"

সন্তু হাসতে-হাসতে বলল, "তুমি একটু আগে যে-অভিযানের কথা বললে, সেবারে আমরা বেশ কয়েকটা ইয়েতি দেখেছিলুম, তাই না ?"

কাকাবাবুও এবার একটু মুচকি হেসে ফেললেন।

অরিজিৎ বলল, "তোমরা ইয়েতি দেখেছিলে ? সত্যি ?"

সন্তু বলল, "এমন মেক-আপ দিয়েছিল যে, আসল না নকল, তা বোঝাই যায়নি অনেকক্ষণ।"

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল, "মেক-আপ দিয়েছিল মানে ? সেজেছিল ? কারা ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে অনেক লম্বা গল্প। সেটা পরে শুনে নিও। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইয়েতি বলে খুব সম্ভবত কোনও প্রাণী নেই।"

অরিজিৎ জোর দিয়ে বলল, "আলবাত আছে !"

"তুমি বললেই তো হবে না। এ পর্যন্ত কেউ কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। কত লোকই তো বলেছে যে, ইয়েতি দেখেছে নিজের চোখে, কিন্তু কেউ একটা ছবি তুলতে পেরেছে ?"

"ইয়েতির পায়ের ছাপ অনেকেই দেখেছে। মস্ত বড় পায়ের ছাপের ছবিও তোলা হয়েছে।"

"বরফের ওপর পায়ের ছাপ, সেটা আবার প্রমাণ নাকি ? মানুষের পায়ের ছাপও বরফের ওপর কিছুক্ষণ বাদে অন্যরকম হয়ে যায়।"

"তবু আমি বলছি, ইয়েতি আছে !"

"না নেই ! আমি নেপালে অন্তত তিন-চারজনের মুখে শুনেছি, তারা ইয়েতি দেখেছে। কিন্তু তাদের একটু জেরা করতেই তারা উলটো-পালটা বলতে শুরু করেছে। কেউ বলে গেরিলার মতন দেখতে, কেউ বলে ভাল্লুকের মতন। আবার কেউ বলে, দশ হাত লম্বা মানুষের মতন। তাদের দু-একজনের সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল, তবু ছবি তুলতে পারেনি, তার কারণ নাকি ইয়েতিকে একপলক দেখার পরই অদৃশ্য হয়ে গেছে। যত্ত সব গাঁজাখুরি কথা ! আসলে বরফের ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলে ক্লান্ত হয়ে অনেকে চোখে ভুল দেখে। মরুভূমিতে যেমন মানুষ মরীচিকা দেখে।"

"কাকাবাবু, আসল ব্যাপারটা কিন্তু আপনিই ঠিক বলেছিলেন।"

"তার মানে ?"

"ইয়েতিরা অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"অরিজিৎ, এবার ঘুমোতে যাও ! আবার কাল সকালে কথা হবে !"

"আমার কথাটা ভাল করে শুনুন, কাকাবাবু। আমিও তো বিজ্ঞান পড়েছি, কোনও প্রমাণ না পেলে একেবারে গাঁজাখুরি কথা আমি মেনে নেব কেন ? নেপালের অন্তত দুটো পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে, ইয়েতিদের হঠাৎ-হঠাৎ

অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে। আমি নিজেও তার প্রমাণ পেয়েছি। এইজন্যই ইয়েতির ছবি তোলা যায় না। মানুষের চোখের সামনে পড়ে গেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায় !"

"পুঁথিতে যা কিছু লেখা থাকে, তাই-ই সত্যি নয়।"

"বললাম যে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। এমনকী আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "অরিজিৎ বলতে চায়, হিমালয়ের কোনও একটা জায়গায় নাকি এক রকমের ফল পাওয়া যায়, যা খেলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ইয়েতিরা নাকি সেই ফল খায়। আমাদের অরিজিৎ সেই ফলের সন্ধান পেয়েছে। এমনকী নিজে সেই ফল খেয়েই দেখেছে !"

অরিজিৎ ব্যাকুলভাবে বলল, "আপনি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব রূপকথার মতো গল্প, শুনতেই ভাল। কিন্তু বিশ্বাস করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শোনো, জল জিনিসটা গরম হলে বাষ্প হয়, তারপর সেই বাষ্প উড়ে যায়। এমনকী অনেক ধাতুকেও প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে বাষ্প করা যায়, আবার ঠাণ্ডা হলে সেই ধাতু বা জল ফিরে আসে। কিন্তু কোনও জীবন্ত প্রাণীকে বেশি গরমে রাখলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সেই ছাইটাকে ঠাণ্ডা করলে কিন্তু সেই প্রাণীটাকে ফেরত পাওয়া যাবে না। কোনও জীবন্ত প্রাণী, এমনকী একটা পিঁপড়েকেও অদৃশ্য করে আর ফিরিয়ে আনা অসম্ভব !"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "কিন্তু কাকাবাবু, বৈজ্ঞানিকরা টাইম-মেশিনে কি মানুষকে অদৃশ্য করতে পারবে না ? স্টার-ওয়র্স ফিলমে যে দেখি, একটা যন্ত্রের মধ্যে দাঁড়ালে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্য জায়গায় ফিরে আসছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওসবও এ-যুগের রূপকথা। আগেকার গল্পে যেমন রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আকাশে উড়ে যেত, এখনকার গল্পেও তেমনি নায়করা স্পেস-শিপে চেপে অন্য গ্রহে যায়, এমনকী এই গ্যালাক্সি পেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে আসে। এসব রূপকথা ছাড়া কিছুই না।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যদি আপনার চোখের সামনে করে দেখাতে পারি ? আমাকে কৌটোটা একবার দিন !"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই সে ছুটে গিয়ে জামাকাপড়ের আলমারিটা খুলে কৌটোটা বার করে এনে বলল, "আমি নিজে দু'বার এক্সপেরিমেন্ট করেছি। দু'বারই সাকসেসফুল।"

কৌটোটা খুলে সে সন্তুকে দেখাল।

ভেতরের জিনিসটা দেখে সন্তু খানিকটা নিরাশ হয়ে গেল। এটা তো একটা লঙ্কা। বেশ বড়সড় টাবাটোবা গোলগাল লাল লঙ্কা!

অরিজিৎ যেন তার মনের কথাটাই বুঝতে পেরে বলল, "এটা লঙ্কা বলে মনে হচ্ছে তো? কিন্তু এটা এক ধরনের স্ট্রবেরি। এটা ঝাল নয় মোটেই, বরং টক-মিষ্টি। কাকাবাবু শুনলে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তোমাকে বলছি সন্তু, একেবারে সত্যি কথা বলছি! পাহাড়ে স্ট্রবেরি খুঁজতে-খুঁজতে, ঝোপঝাড়ে যেখানে যে ফল দেখতাম, অমনি আমি তা খেয়ে স্বাদ নিতাম। কোনও বিষাক্ত ফল খেয়ে ফেলারও ঝুঁকি ছিল অবশ্য। একদিন আমি এই ফল একটা খেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলুম!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ!"

সন্তু বলল, "সত্যি বলছেন?"

অরিজিৎ বলল, "দেড়দিন সেই অবস্থায় ছিলুম। সিংবোচি গ্রামে এসে ঘুরেছি, লোকজনের মধ্যে, কিন্তু কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম খুব। পরে ওইরকম আর একটা ফল খেয়ে নেবার পর আবার সব ঠিক হয়ে গেল।"

সন্তু একবার কাকাবাবু আর একবার অরিজিতের দিকে তাকাল। তারপর কৌটোটা হাতে তুলে নিল।

অরিজিৎ বলল, "দারুণ ভাল লাগে সেই সময়টা। কোনও খিদেতেষ্টা থাকে না। দারুণ হালকা লাগে শরীরটা, মানে, শরীরটা অন্য কেউ দেখতে না পেলেও সেটা তো থাকেই। মনটা খুব ফুরফুর করে। যেখানে ইচ্ছে চলে যাওয়া যায়। কতরকম মজা হয়।"

কাকাবাবু বিদ্রূপের সুরে বললেন, "ইয়েতির গায়ে তো পোশাক থাকে না। মানুষের গায়ে যে প্যান্ট-জামা-জুতো থাকে, সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে যায়?"

অরিজিৎ বলল, "দেখবেন? দেখবেন? এক্ষুনি দেখাব? আমি টপ করে ফলটা খেয়ে নেব, তারপর এক মিনিটের মধ্যেই আপনাদের চোখের সামনেই মিলিয়ে যাব! ওটা দাও তো, সন্তু!"

অরিজিৎ হাত বাড়াতেই কাকাবাবু প্রায় গর্জন করে উঠে বললেন, "না! কোনও দরকার নেই!"

অরিজিৎ এবার হেসে বলল, "কাকাবাবু, আপনি ভয় পাচ্ছেন? আপনি অবিশ্বাস করবেন, আবার ভয়ও পাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম অচেনা ফল খাবার দরকার নেই!"

অরিজিৎ বলল, "দারুণ ভাল লাগে। দেখলেই খেতে ইচ্ছে হয়। আমি মাত্র তিনটে পেয়েছিলুম, যদি আরও খুঁজে বার করা যায়, তা হলে একটা বিরাট আবিষ্কার হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, কৌটোটা আলমারিতে রেখে দে! এবার তোমরা

শুতে যাও। আর কোনও কথা নয়! যাও! আমার ঘুম পেয়েছে।"

সন্তু অনিচ্ছার সঙ্গেও কৌটোটা রেখে দিল যথাস্থানে। কাকাবাবু এমনভাবে চেয়ে আছেন যে, বেরিয়ে যেতেই হল দুজনকে।

অরিজিৎ সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "সন্তু, আমি কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাইনি। সত্যি ওই ফলটার অদ্ভুত গুণ আছে। ওটা খেলে মানুষ অদৃশ্য হতে পারে। কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না!"

অরিজিৎকে তার ঘর দেখিয়ে দেবার পর সে শুয়ে পড়ল। সে সত্যিই খুব ক্লান্ত, একটু বাদেই তার নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

সন্তু উঠে গেল তিনতলায়। বড় হবার পর সে এই ছাদের ঘরটা নিজের জন্য পেয়েছে। এখানে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করতে পারে। মাঝে-মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দ্যাখে।

একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেও তার মন বসল না পড়ায়। অরিজিতের কথাগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

ছেলেবেলা থেকেই সন্তু অদৃশ্য হবার স্বপ্ন দেখেছে। অদৃশ্য হতে পারলে সত্যি একটা মজার ব্যাপার হয়। তাকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ সে সবাইকে দেখতে পাবে!

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'অদৃশ্য মানুষ' নামে একটা বই পড়ে সন্তুর এক সময় মনে হয়েছিল, সত্যিই ওইরকম একজন অদৃশ্য মানুষ আছে। কিন্তু কাকাবাবু বললেন, "বিজ্ঞানের দিক থেকেও নাকি অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব।" অথচ অরিজিতের কথা শুনে মনে হয় না যে, সে আগাগোড়াই মিথ্যে কথা বলছে।

খাওয়ার সময় অরিজিৎ অতগুলো খাবার খেল। সে বলল, "অদৃশ্য হলে নাকি খিদে-তেষ্টাও পায় না। অদৃশ্য অবস্থা থেকে আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলে তখন একসঙ্গে দু-তিন দিনের খিদে পায়!"

বই পড়াতেও মন নেই, ঘুমও আসছে না। বিছনায় শুয়ে ছটফট করছে সন্তু। ঘড়িতে দেখল রাত দেড়টা বাজে!

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সন্তু। মনে হয় সারা কলকাতাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

পা টিপে-টিপে দোতলায় নেমে এল সে। অরিজিতের প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকছে। কাকাবাবুরও নাক ডাকার বেশ শব্দ হয়। সারা বাড়িতে এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

কাকাবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। কাকাবাবুর এই এক স্বভাব, প্রায়ই আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়েন। মা, বাবা কিংবা সন্তু কেউ একজন পরে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে যায়। আজ বাড়িতে মা-বাবাও নেই।

সন্তু কাকাবাবুর ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলল। কাকাবাবু টের পেলেন না।

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সন্তু, তার খুব লোভ হচ্ছে। ফলটা খেয়ে দেখলে কী হয়? কাকাবাবু রাগ করবেন? অরিজিৎ বলেছিল, অদৃশ্য হলেও সেই অবস্থায় দেড় দিনের বেশি থাকা যায় না। দেড় দিন পরেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে! কাকাবাবু অরিজিতের কথায় বিশ্বাস করেননি, সন্তুর কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন।

আলমারি খুলে সন্তু কৌটোটা বার করল। কাঠের আলমারির পাল্লায় ক্যাঁচ করে সামান্য শব্দ হলেও কাকাবাবু জাগলেন না। সন্তু টপ করে আলো নিভিয়ে, দরজা ভেজিয়ে দৌড়ে উঠে এল ছাদে।

যা থাকে কপালে, খেয়েই দেখা যাক!

সন্তু ঝাল খেতে পারে না বেশি! ফলটাকে লঙ্কার মতন দেখতে একেবারে টকটকে লাল। যদি এটা লঙ্কা হয়, তা হলে দারুণ ঝাল হবে। সন্তু প্রথমে একটা ছোট্ট কামড় দিল। না, ঝাল নয়, একটু মিষ্টি মিষ্টিই। খানিকটা পিপারমেন্টের মতন। খেতে ভাল লাগছে।

পুরো ফলটাই খেয়ে ফেলল সন্তু, কিন্তু কিছুই তো হল না। তা হলে কি অরিজিৎ একদম বাজে কথা বলেছে? ওঃহো, আজ তো ১লা এপ্রিল! অরিজিৎ কাকাবাবু আর সন্তুকে এপ্রিল ফুল করেছে নির্ঘাত!

একটা কিসের শব্দ হতেই সন্তু ঘুরে তাকাল।

ছাদের পাঁচিলে কার যেন একটা কালো রঙের মাথা। ওটা কি কোনও মানুষ, না জন্তু?

সন্তু দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই মাথাটা যেন বোঁবোঁ করে ঘুরতে লাগল, কানে ভোঁভোঁ শব্দ হল, সে ঝুপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

॥ ২ ॥

সদ্য বরফ গলতে শুরু করেছে বলে পাথর এখানে সাঙ্ঘাতিক পিছল। কাকাবাবু প্রতিবার ক্রাচ তুলছেন আর ফেলছেন দারুণ সাবধানে। তবু এক-একবার হড়কে যাচ্ছে।

অরিজিৎ করুণ মুখ করে বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে আর যেতে হবে না। এরপর ওপরটায় গিয়ে আমিই খুঁজে দেখছি।"

কাকাবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। এখন ঘড়ি অনুযায়ী দুপুর সাড়ে তিনটে, কিন্তু এর মধ্যেই যেন সন্ধে হয়ে এসেছে। আকাশের এক দিকটা লাল।

এই ঠাণ্ডাতেও কাকাবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুতে তাকে দু-তিনজন বার-বার অক্সিজেন সঙ্গে নেবার কথা

বলেছিল, কাকাবাবু তাতে কর্ণপাত করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, আজকাল তো অক্সিজেন ছাড়াই কেউ-কেউ এভারেস্টেও ওঠার চেষ্টা করছে, সুতরাং এই বারো-তেরো হাজার ফিটে কী আর কষ্ট হবে! কাকাবাবু নিজেও এর চেয়ে উঁচুতে উঠেছেন আগে, কিন্তু এবারে তাঁর হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন বাতাস কমে গেছে এদিকে।

অরিজিৎ আবার বলল, "কাকাবাবু, আপনি এখানে বসেই বিশ্রাম নিন বরং। আমি ওপর দিকটা দেখে আসছি। আগেরবার এখানেই পেয়েছিলুম।"

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, "না, আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই! তুমি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছ, এইটুকু আর বাকি থাকে কেন?"

অরিজিৎ বললেন, "আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আগেরবার এই জায়গাতেই পেয়েছি ওই ফল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য।"

চতুর্দিকে সাদা বরফের টোপর-পরা পাহাড়ের চূড়া। মাঝে-মাঝে ঘাসের চাপড়া ছাড়া বড় গাছ আর এদিকে নেই। এদিককার শেষ গ্রাম নাংপো থেকে ওরা বেরিয়েছে সকাল ছ'টায়। সারা দিনে একবারও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি।"

এই নিয়ে তিন দিন কেটে গেল এই অঞ্চলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও দেখা যায়নি সেই লাল লঙ্কার মতন ফলের গাছ।

দু'জন মাত্র শেরপাকে সঙ্গে আনা হয়েছে। আং শেরিং আর ছোটা দাজু। কাকাবাবু তাঁর পুরনো বন্ধু মিংমাকে খোঁজ করেও পাননি, সে চলে গেছে অন্য কোনও অভিযাত্রীদের সঙ্গে।

আং শেরিং আর ছোটা দাজু দারুণ তেজী আর শক্তিশালী, কিন্তু তারা এই কাস্তের মতন পাহাড়টায় কিছুতেই উঠতে চায় না। তাদের ধারণা, এই পাহাড়টায় অপদেবতা আছে! খানিকটা নীচে তারা থেমে গেছে!

শোঁশোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করে দিল। অরিজিৎ আরও কাচুমাচুভাবে বলল, "কাকাবাবু, আজকে আর থাক, আবার কাল চেষ্টা করা যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এতখানি উঠেছি যখন, এ-পাহাড়টা আজ দেখা শেষ করতেই হবে! চলো, আর দেরি করে লাভ কী?"

"অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছু দেখা যাবে না!"

"আমার কাছে টর্চ আছে। তুমি জানো না অরিজিৎ, সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে আমি আজকাল কোথাও যাই না! এবার সন্তুর জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে!"

"কাকাবাবু, সন্তু যে এরকম একটা কাণ্ড করবে, আমি ভাবতেই পারিনি!"

"আলমারিটায় তালা না দিয়ে আমি ভুল করেছি। আসলে আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিনি, গুরুত্বও দিইনি! এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!"

সেই রাতের পর থেকে সন্তুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছাদের ওপর পড়ে ছিল কৌটোটা, তার মধ্যে লাল লঙ্কার মতন ফলটাও নেই। অরিজিৎ তো দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। তার ধারণা, সন্তু সেই ফলটা খেয়ে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

কাকাবাবু সন্তুর ঘর এবং ছাদের প্রায় প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখেছেন। সন্তুর হঠাৎ চলে যাওয়ার কোনও চিহ্নই নেই। সে পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে ছিল, তার চটি-জোড়া পর্যন্ত রয়ে গেছে, বিছানার ওপর একটা বই আধ-খোলা। সন্তু কোনও কারণে হঠাৎ কোথাও চলে গেলে নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে চিঠি লিখে রেখে যেত কিংবা কিছু একটা চিহ্ন রেখে যেত। সেরকম কিছুই নেই।

তবে, সন্তু যে এই লাল ফলটা চুপিচুপি খেয়েছে, তাও তো ঠিক। সে সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল?

অরিজিৎ এখন বলছে যে, অদৃশ্য মানুষদের নাকি কথা বলারও ক্ষমতা থাকে না। কিংবা তাদের কথা কেউ শুনতে পায় না। সে নিজে যেবার অদৃশ্য হয়েছিল, সেবার গ্রামের মানুষদের কাঁধে হাত দিয়ে ডেকেছিল, তাও তারা বুঝতে পারেনি কিছুই। অদৃশ্য মানুষের ছোঁয়াও টের পাওয়া যায় না।

এইসব কথা শুনেই রাগে কাকাবাবুর গা জ্বলে গেছে!

দু'দিন অপেক্ষা করেও সন্তুর কোনও খোঁজ না পেয়ে কাকাবাবু উতলা হয়ে উঠেছিলেন। তা হলে কি অরিজিতের কথাই ঠিক? সন্তু একেবারে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল! তখন তিনি জেদ ধরলেন, তিনি নিজে ওই ফল একটা খেয়ে দেখবেন! সন্তু একটা ফল খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এরকম একটা অদ্ভুত কথা তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক-বন্ধুদের কিংবা পুলিশ-বন্ধুদেরও বলতে পারেনি! তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবতেন, কাকাবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে!

পরের দিনই টিকিট কেটে কাঠমাণ্ডু। তারপর গাড়িতে অনেকটা পথ আসার পর শুরু হয়েছে পায়ে হাঁটা।

আং শেরিং আর ছোটা দাজুকে প্রথমে আসল উদ্দেশ্যটা বলা হয়নি। কাকাবাবু বলেছিলেন তিনি সিলভার লেপার্ডদের ছবি তুলতে চান। পৃথিবীতে শুধু এই অঞ্চলটাতেই রুপোলি নেকড়েদের কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডুতেও তিনি এই কথা বলেই অভিযানের অনুমতি জোগাড় করে এনেছিলেন।

এই কাস্তের মতন পাহাড়টার কাছে এসে আং শেরিং বলেছিল, "সাহেব, এখানে তো সিলভার লেপার্ড পাবেন না! এখানে অপদেবতারা আসে, এখানে অন্য কোনও জন্তু-জানোয়ার থাকে না। সিলভার লেপার্ড খুঁজতে গেলে আরও হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে হবে।"

তখন কাকাবাবু অন্য কিছু বলতে বাধ্য হলেন। তিনি সরাসরি ইয়েতির

প্রসঙ্গ না তুলে বলেছিলেন, "আমি একটা লাল লঙ্কার মতন ফল খুঁজছি, যা অনেক ওষুধ হিসেবে কাজে লাগে !"

সেই কথা শুনেই আং শেরিং আর ছোটা দাজু একসঙ্গে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, "বিষফল ! বিষফল !"

কাকাবাবু অনেক কষ্টে তাদের কাছ থেকে আরও খবর জেনেছিলেন। ছোটা দাজুর বয়েস কম, সে কখনও ওই ফল দ্যাখেইনি। পাহাড়ে ওই ফল খুব কমই দেখা যায়। আং শেরিং বলেছিল, সে ওই ফল দুবার মাত্র দেখেছে। তেরো হাজার ফিটের কাছাকাছি উচ্চতায় ওই ফলের গাছ জন্মায় পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে। সেই ফল প্রথমে থাকে কালো, তারপর লাল হবার আগেই কারা যেন তুলে নেয়। ওরকম লাল ফল খুব কমই দেখা যায়। সকলেরই ধারণা, ওই লাল লঙ্কার মতন ফলগুলো অপদেবতাদের খুব প্রিয় খাদ্য।

আং শেরিং আরও একটা রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছিল। তাদের গ্রামের দুটি ছেলে একবার এই কাস্তে-পাহাড়ের (এরা বলে সরু চাঁদের পাহাড়) ওপরে গিয়ে ওইরকম দুটো বেশ লাল ফল দেখে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর তাদের চেহারা বদলাতে শুরু করে, তাদের সারা গায়ে বড়-বড় রোম গজিয়ে ওঠে, চেহারাটা হয়ে যায় বাঁদরের মতন, তারা লাফাতে-লাফাতে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে ওরা সবাই ওইরকম লাল ফল কখনও দেখতে পেলেও হাত দিতে সাহস করে না।

এই ঘটনা শুনে অরিজিৎ গোল-গোল চোখে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়েছিল। তবু কাকাবাবুর বিশ্বাস হয়নি। ওই ফল নিজে খেয়ে দেখার ইচ্ছে তাঁর মনে আরও জোরালো হয়েছিল।

আং শেরিংরা আর আসতে চায়নি, তবু কাকাবাবু চূড়া পর্যন্ত উঠে দেখতে চান।

আকাশের রং ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, এরপর নীচে নামতে আরও বেশি অসুবিধে হবে। তবু কাকাবাবু আস্তে-আস্তে ক্রাচ ফেলে ওপরে উঠছেন।

একটু পরে অরিজিৎ বলল, "কাকাবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়েছে ! ওই যে পাশের পাহাড়টা দেখুন। এখান থেকে ওটাকেও ঠিক কাস্তের মতন মনে হচ্ছে। পাশাপাশি দুটো ঠিক একই রকমের পাহাড়। আমার মনে হচ্ছে, আমি ওই পাশের পাহাড়টাতেই ফলগুলো পেয়েছিলুম।"

কাকাবাবু থেমে কয়েকবার জোরে-জোরে নিশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, "তোমার আর কিছু ভুল হয়নি তো ? তুমি ওই লাল ফল নিজে কি সত্যি খেয়েছিলে ?"

অরিজিৎ বলল, "নিশ্চয়ই। আপনার কাছে কি আমি মিথ্যে কথা বলব ? তা ছাড়া এরকম একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা না হলে আপনার কাছে আমি এত দূর থেকে ছুটে যাবই বা কেন !"

কাকাবাবুর এক দিকের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা, অন্য দিকে কাঁধে রাইফেল। তিনি দুটোই নামিয়ে রাখলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট ফ্লাস্ক বার করে এক ঢোঁক গরম চা খেলেন।

হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে একটা ক্রাচ তুলে তিনি বললেন, "ওটা কী দ্যাখো তো অরিজিৎ!"

একটা অতিকায় কচ্ছপের মতন দেখতে পাথরের খাঁজে টমাটো গাছের মতন একটা গাছ উঁকি মারছে। তাতে ফলে আছে ক্যাপসিকামের মতন একটা লাল লঙ্কা!

সেদিকে তাকিয়ে অরিজিতের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। সে কোনওক্রমে বলল, "এই তো, এই তো!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কথায় এইটুকু বিশ্বাস করা গেল যে, এত উঁচু পাহাড়েও ওইরকম লঙ্কার মতন ফল দেখা যায়। বেশ ভাল কথা। এবার ওটাকে ছিঁড়ে আনো। আমি খেয়ে দেখব!"

অরিজিৎ আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না! কাকাবাবু, আপনি খাবেন না। সন্তুর জন্য নিয়ে চলুন!"

•

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই একটু দূরে খুব জোরে একটা হা-হা-হা শব্দ হল। কোনও জন্তু যেন খুব যন্ত্রণায় কাঁদছে!

কাকাবাবু ফ্লাস্কটা পকেটে ঢুকিয়ে রাইফেলটা তুলে নিলেন।

অরিজিৎ বলল, "কাকাবাবু, চলুন, পালাই! কে যেন আসছে!"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "ওই ফলটা না নিয়ে আমি যাব না। যে আসে আসুক!"

অরিজিৎ কাকাবাবুর হাত ধরে টানতে যেতেই কাকাবাবু এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর লাল ফলটা ছিঁড়ে নেবার জন্য একটু এগোতেই দেখলেন, মাত্র আট-দশ ফিট দূরে একটা প্রাণীর মুখ। সেটা ভাল্লুক কিংবা শিম্পাজির হতে পারে, কোনও ক্রমেই মানুষের নয়।

কাকাবাবুর প্রথম মনে হল, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার। কিন্তু রাইফেল নামিয়ে রেখে ক্যামেরাটা তুলে নিতে দেরি হয়ে যাবে। জন্তুটার চোখ দুটো অসম্ভব হিংস্র, সে এক পা, এক পা করে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবু ছবি তোলার বদলে রাইফেল উঁচিয়ে জন্তুটাকে গুলি করতে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অরিজিৎ কাকাবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "কাকাবাবু, গুলি করবেন না। ও আমাদের সন্তু! ও সন্তু!"

লোড-করা রাইফেলে ঝাঁকুনি লেগে গুলি বেরিয়ে গেল। তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। সেই লোমশ প্রাণীটা ভয় পাবার বদলে

আরও সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দু'জনের ওপর !

অরিজিতের কথা শুনেই কাকাবাবু দ্বিতীয়বার গুলি করতে পারলেন না। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু ? তুই কি সন্তু ?"

লোমশ প্রাণীটা কাকাবাবুকে এক ধাক্কা মারল। অরিজিৎকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে। সে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল।

জন্তুটার ধাক্কায় কাকাবাবুও গড়িয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু এক জায়গায় থেমে যাবার পর বুঝলেন, তাঁর নিজের হাত-পা ভাঙেনি। কিন্তু অরিজিৎ তখনও গড়াচ্ছে।

তিনি চিৎকার করে বললেন, "আং শেরিং, ছোটা দাজু, ওকে ধরো !"

খানিকবাদে ছোটা দাজুর সাহায্য নিয়ে কাকাবাবু নীচে নেমে এলেন। আং শেরিং অরিজিৎকে কোলে নিয়ে বসে আছে। অরিজিতের জ্ঞান নেই, তার মাথা কেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, খুব সম্ভবত একটা হাতের হাড়ও ভেঙে গেছে। জামা-টামা রক্তে মাখামাখি !

আং শেরিং শান্ত গলায় কাকাবাবুকে বলল, "সাহেব, তোমাদের বলেছিলুম না, ওই অপদেবতার পাহাড়ে উঠো না ! এক্ষুনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে না গেলে এই সাহেবটা বাঁচবে না !"

পরের দিনই কাকাবাবু অরিজিৎকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন কাঠমাণ্ডুতে। কাকাবাবুর নিজেরও যে একটা হাত মচকে গেছে আর ডান দিকের কানের পেছনে অনেকটা জায়গা থেঁতলে গেছে, সে-কথা কাউকে বললেন না। অরিজিৎকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে তিনি সেখানেই বসে রইলেন সারা রাত। ভোরবেলা অরিজিতের জ্ঞান ফিরেছে, আর তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই শুনে কাকাবাবু ফিরে গেলেন হোটেলে।

সারা রাত জাগলেও সকালবেলা ঘুমোবার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবু ভাল করে স্নান করে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। তিনি কোনওদিন হার স্বীকার করেন না। তিনি মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছেন এর মধ্যে যে, আবার তিনি ওই কাস্তে-পাহাড়ে ফিরে যাবেন। ওই লাল লঙ্কার মতন একটা ফল তাঁর চাই-ই চাই ! ওই ফল খাওয়ার পরের ফলাফল তিনি নিজে না বুঝলে সন্তুকে কিছুতেই খুঁজে বার করা যাবে না !

সবে মাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করেছেন, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। হাসপাতাল থেকে কোনও খবর এসেছে ভেবে তিনি রিসিভারটা তুলেতেই অন্য দিকের গলার আওয়াজ শুনে আনন্দে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। "সন্তু !"

সন্তু বলল, "উফ, কাকাবাবু, এতক্ষণে তোমাকে পাওয়া গেল। আমি কাল দুপুর থেকে কাঠমাণ্ডুর সব হোটেলে তোমাকে খুঁজছি !"

কাকাবাবু উত্তেজনা দমন করে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই কোথা থেকে কথা বলছিস ?"

সন্তু বলল, "কলকাতা থেকে। আমাদের বাড়ি থেকে!"

"আমাদের বাড়ি থেকে! তুই তা হলে অদৃশ্য হয়ে যাসনি?"

"হা-হা-হা, কী যে বলো! তুমিই না বলেছিলে, মানুষের পক্ষে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব।"

"তা তো বটেই! কিন্তু তোকে আমরা খুঁজে পাইনি কেন? তুই কোথায় গিয়েছিলি? তুই লাল লঙ্কাটা খেয়েছিলি না?"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমি ভেবেছিলুম, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব। কিন্তু, ওটা স্ট্রবেরিও নয়, লঙ্কাও নয়, ওটা একটা বিষাক্ত ফল। ওটা খেলে মাথা ঘুরে যায়, কান ভোঁভোঁ করে, তারপর মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। অদৃশ্য-টদৃশ্য কিছু হয় না!"

"তা হলে তুই কোথায় ছিলি, সন্তু?"

"সেটা একটা মজার ব্যাপার! তোমার সেই ত্রিপুরার রাজকুমারের কথা মনে আছে? আমাদের ওপর তার খুব রাগ! সে দুটো গুণ্ডা পাঠিয়েছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। গুণ্ডা দুটো ড্রেন পাইপ বেয়ে উঠে এসেছিল ছাদে। তারা ভেবেছিল, আমাকে জোর করে, হাত-পা বেঁধে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা ধরবার আগেই আমি অজ্ঞান। ওরাই ঘাবড়ে গেল!"

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "তোর ভয় পাবার দরকার নেই, সন্তু। আসল ব্যাপার কী হয়েছিল বল তো?"

সন্তু বলল, "আমি আসল কথাটাই বলছি তো! রাজকুমার আমাকে বেঁধে নেবার জন্য দুটো লোক পাঠিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে আমি অজ্ঞান, কোনও বাধাই দিতে পারিনি। লাল লঙ্কাটা তক্ষুনি খেয়ে ছিলুম যে! তারপর নাকি আমি পাক্কা আড়াই দিন অজ্ঞান হয়ে থেকেছিলুম। গোড়ার দিকটা আমার মনে নেই। কিন্তু শেষের দিকে আমি আধো-আধো স্বপ্নে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি! অন্যদের কথা একটু-একটু শুনতে পেলেও উত্তর দিতে পারিনি! বুঝলে কাকাবাবু, এই লাল লঙ্কার রহস্যটা আমি আবিষ্কার করেছি। ওটা একটা বুনো বিষাক্ত ফল, ওটা খেলে মানুষ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে। সেই সময় স্বপ্ন দেখে ভাবে, বুঝি অদৃশ্য হয়ে অনেক জায়গায় ঘুরছে। আমি ডেফিনিট, অরিজিৎদার এইরকম ব্যাপারই হয়েছে!"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "সেই রাজকুমার লোক পাঠিয়ে তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? সেখান থেকে তুই ছাড়া পেলি কী করে!"

সন্তু হাসতে হাসতে বলল, "রাজকুমার খুব জব্দ হয়ে গেছে, কাকাবাবু! ওর লোক তো অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আড়াই দিনের মধ্যে আমি জাগিনি, মাঝখানে কী ঘটেছে তা-ও আমি জানি না! এদিকে রাজকুমার ভেবেছিল, ওর শাগরেদদের হাতে মার খেয়ে আমি বুঝি মরতে বসেছি। ডাক্তার ডেকে এনে আমার চিকিৎসা করিয়েছে। ওষুধ খাইয়েছে। আমি চোখ

মেলবার পর সে বলেছিল, উঃ, বাঁচালে ! তোমাকে দু-চারদিন আটকে রেখে তোমার কাকাবাবুর কাছ্ থেকে দু-চারটে জিনিস আদায় করব ভেবেছিলাম। শেষে দেখছি, মরা মেরে খুনের দায়ে পড়ার মতন অবস্থা ! তুমি মরে গেলে আমাদের পুরো উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যেত ! যাও বাছা, এবারের মতন ফিরে যাও ঘরে। কী খেলাই দেখালে ! আড়াই দিন অজ্ঞান, অথচ শরীরে মাথায় কোনও চোট নেই। জানো কাকাবাবু, শেষ পর্যন্ত রাজকুমার আমাকে খাতির করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে কাল দুপুরে। তারপর থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করছি।"

সন্তুর সঙ্গে কথা শেষ করার পর কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। অরিজিতের ওপর তাঁর রাগটাও কমে গেল। সে বেচারা ওই বিষফল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই অদৃশ্য হওয়া ভেবেছে। এইজন্যই ঝোপেঝাড়ে যেসব অচেনা ফলটল ফলে থাকে, তা হুট করে খেতে নেই। নিজের ভুলের জন্য অরিজিৎ যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে।

কিন্তু কাস্তে-পাহাড়ের চূড়ার কাছে যে এসে হঠাৎ হানা দিল, সে কি কোনও ছদ্মবেশী মানুষ, না, সত্যিই ইয়েতি !

কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবার ওই পাহাড়ের চূড়ায় একবার যেতে হবে।

কাকাবাবু হেরে গেলেন ?

গাড়ির দরজাটা বন্ধ হওয়ার পর কাকাবাবু জানলার কাচ খুলে একবার ওপর দিকে তাকালেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সন্তু। মনখারাপের ভাবটা সে কিছুতেই লুকোতে পারছে না। কাকাবাবু বাইরে যাচ্ছেন, কিন্তু এবার সঙ্গে যেতে পারছে না সন্তু। কিছুতেই সম্ভব নয়। পরশু থেকে তার পরীক্ষা আরম্ভ।

কাকাবাবু বারবার বলেছেন, তিনি এবার কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছেন না। কোনও রহস্য-টহস্যের ব্যাপার নেই। এমনিই বেড়াতে যাচ্ছেন বিমানের সঙ্গে। বড়জোর দিন সাতেক থাকবেন। সন্তু তাতেও কোনও সান্ত্বনা পায়নি। কাকাবাবু যেখানেই যান, সেখানেই কিছু-না-কিছু একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটে যায়।

কাকাবাবু ওপরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। সন্তুও হাত নাড়ল বটে, কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটল না।

কাকাবাবু বসেছেন সামনে ড্রাইভারের পাশে। পেছনে বিমান আর তার স্ত্রী দীপা। গাড়ি চলতে শুরু করার পর বিমান বলল, "সন্তু বেচারা এল না বটে, কিন্তু ও কি এখন পড়াশোনায় মন বসাতে পারবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ সকালটা ছটফট করবে বটে, তারপর ঠিক মন বসে যাবে। পরীক্ষার একটা ভয় তো আছে।"

বিমান বলল, "না, কাকাবাবু আজকাল দেখেছি ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার আগে বিশেষ ভয়টয় পায় না। এখন সব সিস্টেম তো পালটে গেছে। বেশি মুখস্থ করারও দরকার হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ছোটবেলার কথা মনে আছে, ইস্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার আগে প্রতি বছর ভয়ে বুক কাঁপত। প্রত্যেকবার মনে হত, এবার ঠিক ফেল করব! তাই শেষের দিনটায় ভাবতাম, ফেলই যখন করব, তখন আর পড়ে কী হবে? তাই টেক্সট-বইয়ের বদলে সেদিন গল্পের বই পড়তাম।"

বিমান বলল, "তারপর প্রত্যেক বছরই ফার্স্ট হতেন। সবাই জানে, আপনি

জীবনে কখনও শেষ পরীক্ষায় সেকেন্ড হননি।”

কাকাবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, “ও একটা বাজে গুজব বুঝলে! শেষের দিকে দু-একবার ফার্স্ট হয়েছিলাম, তাই অনেকে বলে আমি প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি।”

দীপা জিজ্ঞেস করল, “সত্যিই আপনি কখনও সেকেন্ড-থার্ড হয়েছেন?”

কাকাবাবু বললেন, “অনেকবার। প্রত্যেকবার আমি ফার্স্ট হব, এমন স্বার্থপর আমি নই। অন্যরা কী দোষ করেছে? আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সুপ্রিয়, সে এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে বড় কাজ করে। সে কখনও সেকেন্ড হলে তার চেয়ে আমার বেশি কষ্ট হত।”

দীপা বলল, “তাই আপনি ইচ্ছে করে তাকে ফার্স্ট করাতেন?”

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, “আরে না, না! সে আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলে ছিল। ইস্কুলে আমি ছিলাম বেশ ফাঁকিবাজ। ক্লাসের পড়ার বইয়ের চেয়ে গল্পের বই পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল খুব। আর খুব কবিতা মুখস্থ করতাম।”

দীপা বলল, “আমি তো ইস্কুলে পড়াই। আমি লক্ষ করেছি। যেসব ছেলেমেয়ে শুধু টেক্সট বুক মুখস্থ না করে নানা রকম বাইরের বই পড়ে, তারাই কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট হয়। তারা অনেক বেশি শেখে।”

বিমান বলল, “আর ছোটবেলায় কবিতা মুখস্থ করলে তা মানুষ কখনও ভোলে না। আমি ক্লাস সিক্সে পড়বার সময় সুকুমার রায়ের সব কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। ক্লাস এইটে উঠে পুরো ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। আজও সবটা মনে আছে। দেখবে? “সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি, বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে, তখন কহ গো দেবী অমৃতভাষিণী...”

দীপা বলল, “থাক, থাক, তোমাকে আর পরীক্ষা দিতে হবে না!”

কাকাবাবু বললেন, “কহ গো দেবী, না ‘কহ হে দেবী’?”

বিমান বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, কহ হে দেবী! বাঃ, আপনারও তো বেশ মনে আছে!”

দীপা বলল, “আর কয়েকটা দিন পরে, সন্তুর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমরা যদি যেতাম ভাল হত। সন্তু থাকলে বেশ মজা হয়।”

বিমান বলল, “দেরি করবার যে উপায় নেই। সামনের সোমবার থেকে বাড়িটা ভাঙতে শুরু করবে।”

দীপা বলল, “অত পুরনো বাড়ি। ভাঙবার সময় সাপটাপ বেরোবে না তো?”

বিমান গম্ভীর মুখ করে বলল, “বলা যায় না। শুনেছি, একতলার ঘরগুলো বহুদিন বন্ধ আছে। সেখান থেকে অজগর কিংবা পাইথন বেরোতে পারে। আর তহবিলখানার দিকে ভূত-পেত্নি তো আছেই, সে বেচারারা কোথায় যাবে

কে জানে !”

দীপা বলল, “আমি সোমবারের আগেই ফিরতে চাই। বাড়ি ভাঙা-টাঙা আমি দেখতে পারব না !”

গাড়িটা এলগিন রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাড়ির কাছেই আর-একটা বাড়ির সামনে থামল। বিমান ড্রাইভারকে বলল, “দু’বার হর্ন দাও।”

এখান থেকে আর একজনকে তুলে নেওয়া হবে। এর নাম অসিত ধর। বিমানের এক বন্ধুর সূত্রে চেনা। এই অসিত ধর বছরের অনেকটা সময় ইংল্যান্ড-আমেরিকায় থাকে। পুরনো দামি জিনিসপত্র কেনাবেচার ব্যবসা আছে, ইংরেজিতে যেগুলোকে বলে অ্যান্টিক। বেশ ভাল ব্যবসা।”

অসিত ধর তৈরিই ছিল, হর্ন শুনে নেমে এল।

খয়েরি রঙের স্যুট পরা বেশ ফিটফাট চেহারা। চোখে সানগ্লাস। সঙ্গে একটা বড় ব্যাগ আর ক্যামেরা।

বিমান কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, “অসিতবাবু, ইনি হচ্ছেন মিঃ রাজা রায়চৌধুরী। খুব বিখ্যাত লোক, আমরা এঁকে কাকাবাবু বলি।”

মুখ দেখেই বোঝা গেল, অসিত ধর কাকাবাবুর নাম আগে শোনেনি। কাকাবাবু সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে ইংরেজি কায়দায় বলল, “গ্ল্যাড টু মিট ইউ !”

কাকাবাবু হাতজোড় করে বললেন, “নমস্কার !”

বিমান অসিত ধরকে পেছনের সীটে তুলে নিল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে বিমান বলল, “কাকাবাবু, ইনি পুরনো ফার্নিচার, ঘড়ি, ছবিটবির ব্যবসা করেন। আমাদের আলিনগরের বাড়ির সব কিছুই তো বেচে দেব, ইনি দেখতে যাচ্ছেন যদি কিছু পছন্দ হয়।”

অসিত ধর বলল, “ঠিক সেজন্যও নয়। এমনিই বেড়ানো হবে। অনেকদিন তো কলকাতার বাইরে যাওয়া হয় না, প্রায় সারা বছরই বিদেশে কাটাতে হয়।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “বিমান, তোমাদের এই বাড়িটা কতদিনের পুরনো ?”

দীপা বলল, “ওটা কিন্তু বিমানদের নিজের বাড়ি নয়। মামাবাড়ি। ওর একমাত্র মামা গত বছর মারা গেলেন। তাঁর কোনও ছেলেপুলে ছিল না। তাই বিমানরা তিন ভাই ওই সম্পত্তি পেয়েছে।”

বিমান বলল, “হ্যাঁ, প্রায় ফাঁকতালে পেয়ে গেছি বলতে পারেন। আমার মামা খুব কিপ্পুস ছিলেন। অত বড় বাড়িতে একা-একা থাকতেন, আমাদের কখনও যেতেও বলতেন না। ছোটবেলা কয়েকবার গেছি, ভাল করে কথাও বলতেন না আমাদের সঙ্গে। সেই মামা চুরাশি বছর বেঁচে তারপর মারা

গেলেন। ও-বাড়ি যে আমরা কখনও পাব, তা ভাবিওনি। মামার মৃত্যুর পর জানা গেল, তিনি কোনও উইল করেননি। তাই মামার উকিল আমাদের তিন ভাইকে ডেকে সম্পত্তি দিয়ে দিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মামা বিয়ে করেননি ?"

"হ্যাঁ করেছিলেন। এক সময় উনি বিলেতে থাকতেন, তখন মেমসাহেব বউ ছিল। সেই মেম-মামিমা এদেশে আসেননি। তিনিও এতদিনে আর বেঁচে নেই বোধ হয়। আমার আর একজন মামা ছিলেন, ছোটমামা। তিনি তাঁর বিয়ের ঠিক আগের দিন ওই বাড়িতেই মারা যান। এসব অবশ্য আমার জন্মের আগেকার কথা। আমার মা তো বলেন যে, ছোটমামাকে নাকি ওই বাড়িতে ভূতে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছিল।"

দীপা বলল, "মা কিন্তু খুব বিশ্বাসের সঙ্গেই বলেন কথাটা !"

অসিত ধর বলল, "সব পুরনো বাড়ি সম্পর্কেই এরকম কিছু ভূতের গল্প থাকে। সেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হয়।"

বিমান বলল, "বাড়িটা ঠিক কতদিনের পুরনো তা বলতে পারব না। তবে দুশো বছর তো হবেই। আমার মামাদের এক পূর্বপুরুষ নবাব আলিবর্দির কাছ থেকে জায়গির পেয়ে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন শুনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আলিবর্দি ? তা হলে তো আড়াইশো বছর আগে। আলিবর্দি মারা গেছেন সতেরোশো ছাপান্ন সালে।"

দীপা বলল, "তার মানে পলাশী যুদ্ধেরও আগে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা তো হবেই। আলিবর্দির নাতি সিরাজদ্দৌল্লা, নবাবি করেছিলেন মাত্র চোদ্দ মাস।"

অসিত ধর বলল, "ইতিহাসের সাল তারিখ আপনার তো বেশ মুখস্থ থাকে।"

বিমান বলল, "সন্তু এসব পটাপট বলে দিতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর কাছে শুনে-শুনেই তো আমারও মুখস্থ হয়ে গেছে। তা এত পুরনো বাড়ি ? আমাদের দেশে এত পুরনো বাড়ি খুব কমই আছে।"

অসিত ধর বলল, "এত পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলবেন ? ইউরোপে এইসব বাড়ি ওরা খুব যত্ন করে রেখে দেয়। যার বাড়ি সে ভাঙতে চাইলেও গভর্নমেন্ট বাধা দেয়।"

দীপা বলল, "অত বড় বাড়ি ঠিকঠাক রাখার মতন সাধ্য আছে নাকি আমাদের !"

অসিত ধর বলল, "ফরাসি দেশে পুরনো আমলের রাজা-মহারাজা বা জমিদারদের বিরাট-বিরাট বাড়িগুলোকে বলে শাতো। এইরকম অনেকগুলো শাতো আমি দেখেছি। সেখানে ঢুকতেই চারশো-পাঁচশো বছরের ইতিহাস ফিল

করা যায়।”

বিমান বলল, “কুচবিহারের রাজাদের বাড়িটা দেখেছেন, অত চমৎকার একটা প্রাসাদ, সেটারই কী ভাঙাচোরা অবস্থা এখন। ফরাসি দেশের শাতোগুলোর চেয়ে সেই রাজপ্রাসাদ কোনও অংশে কম সুন্দর ছিল না।”

গাড়িটা কলকাতা ছাড়িয়ে বালি ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোডে পড়েছে। মেঘলা-মেঘলা আকাশ, গরম নেই, বেড়াবার পক্ষে খুব ভাল সময়।

অসিত ধর ফরাসি দেশের শাতোর গল্প শোনাতে লাগল।

বর্ধমানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। সে একেবারে সাঙ্ঘাতিক বৃষ্টি। চতুর্দিক অন্ধকার। এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। সেইজন্য ওরা আশ্রয় নিল রাস্তার পাশে এক ধাবায়। গরম-গরম রুটি আর মাংস খাওয়া হল।

বৃষ্টির তেজ কমল প্রায় এক ঘন্টা পরে, তাও পুরোপুরি থামল না। রাস্তার অনেক জায়গায় জল জমে গেছে, গাড়ি চালাতে হল আস্তে-আস্তে।

বীরভূম জেলায় ঢুকে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু, কাঁচা রাস্তায় ঢুকতে হল। সে-রাস্তায় আবার খুব কাদা। দু'বার গাড়ির চাকা বসে গেল। দীপাকে শুধু গাড়িতে বসিয়ে অন্যরা সবাই গাড়ি ঠেলে তুলল।

অসিত ধর সাহেবি ধরনের মানুষ। তার ঝকঝকে পালিশ করা জুতো কাদায় একেবারে মাখামাখি। প্যান্টেও কাদা লেগেছে।

বিমান বলল, “ইস, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। আমি গত সপ্তাহেও একবার এসেছিলাম, তখন রাস্তা এত খারাপ ছিল না।”

অসিত ধর বলল, “কষ্ট আবার কী! আমার তো বেশ মজা লাগছে। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে।”

বিমান বলল, “আজ আর বৃষ্টি থামবে না মনে হচ্ছে। আজ সন্ধেবেলা ভূতের গল্প খুব জমবে। পুরনো বাড়িতে এমনিতেই অন্ধকারে গা-ছমছম করে।”

দীপা চেঁচিয়ে বলে উঠল, “এই খবর্দার, ভূতটুতের কথা একদম উচ্চারণ করা চলবে না।”

অসিত ধর খানিকটা অবাক হয়ে বলল, “আপনি ভূত বিশ্বাস করেন নাকি?”

দীপা বলল, “মোটেই করি না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি। কিন্তু ওসব গল্পটল্প শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না!”

বিমান বলল, “দীপা বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ভূতের নাম করলেই ও ঠকঠক করে কাঁপে। অসিতবাবু, আপনি ভূতটুত মানেন না নিশ্চয়ই।”

অসিত ধর বলল, “এত ভাল-ভাল ভূতের গল্প শুনেছি যে, সত্যি বলে মানতে ইচ্ছে করে। ভূত দেখার ইচ্ছেও আছে খুব। ক্যামেরা এনেছি, ভূত

দেখলেই ছবি তুলে ফেলব। ফরেনে সেই ছবি দেখলে হইচই পড়ে যাবে।"

কাকাবাবু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার হেসে বললেন, "ভূতের ছবি? এটা তো বেশ ভাল আইডিয়া! ভূতের গল্পগুলোতে শুধু আঁকা ছবি থাকে, ফোটোগ্রাফ কেউ কখনও দেখেনি!"

গাড়ির ড্রাইভার বিলাস সারা রাস্তা কোনও কথাই বলেনি। এবারে সেও আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলল, "স্যার, ওনাদের ছবি তোলা যায় না। আমার এক কাকা একবার চেষ্টা করেছিল, ক্যামেরার ফিলিম সব সাদা হয়ে গেল।"

বিমান উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "বিলাস, তোমার কাকা নিজের চোখে ভূত দেখেছেন নাকি?"

বিলাস বলল, "হ্যাঁ, স্যার। আমিও তো দেখেছি। আমি তখন কাকার পাশে ছিলাম!"

বিমান বলল, "বাঃ বাঃ! এই তো একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেল। রাত্তিরবেলা ভাল করে শুনিও তো ঘটনাটা!"

দীপা বলল, "আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর।"

অসিত ধর বলল, "আমি এমন ক্যামেরা এনেছি, তাতে পুরো অন্ধকারেও ছবি তোলা যায়। ভূত দেখা গেলে তার ছবি উঠবেই!"

কাকাবাবু বললেন, "এবার মনে হচ্ছে, আমরা এসেই গেছি!"

॥ ২ ॥

গাড়িটা একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল সেই বিশাল প্রাসাদ।

রোদ্দুর নেই বলে বিকেলবেলাতেই সন্ধে-সন্ধে ভাব। সেই ম্লান আলোয় বাড়িটাকে মনে হয় আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিক থেকে আর একদিকের যেন শেষ নেই।

কাকাবাবু মহাবিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "এত বড় বাড়ি, আমি যে আগে ধারণাই করতে পারিনি।"

অসিত বলল, "এ যে প্রায় কাস্‌ল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একবার ওড়িশার একটা পুরনো আমলের ফাঁকা রাজবাড়িতে থেকেছিলাম। কিন্তু সে-বাড়িটাও এত বড় নয়।"

অসিত বলল, "এমন একটা গর্জাস বাড়ি ভেঙে ফেলবেন? খুবই অন্যায় কথা কিন্তু!"

বিমান বলল, "কী করি বলুন তো! এ-বাড়ি এমনিতেই ভেঙে পড়ছে। পুরো মেরামত না করলে আর রক্ষা করা যাবে না। তার জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা দরকার, সে-টাকা কোথায় পাব বলুন।"

দীপা বলল, "মাঠের মধ্যে এরকম একটা জগদ্দল-মার্কা বাড়ি রেখেই বা লাভ কী ? আমরা তো কেউ এখানে থাকতে আসব না।"

বিমান বলল, "আমার আর দু' ভাইয়ের মধ্যে একজন থাকে দিল্লিতে, আর-একজন জাপানে। তারাও কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না। তারাই আমাকে বলেছে বিক্রি করে দিতে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যিনি কিনেছেন, তিনি এটা ভেঙে ফেলতে চাইছেন কেন ?"

বিমান বলল, "কিনেছেন এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। তাঁর পাইপের কারখানা আছে আসানসোলে। এ-বাড়িটা ভেঙে তিনি এখানে আর একটা কারখানা তৈরি করবেন।"

অসিত বলল, "এত চমৎকার একটা প্যালেসের বদলে হবে চিমনিওয়ালা কারখানা ! ছি, ছি !"

কাকাবাবু বললেন, "ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, 'ওল্ড অর্ডার চেইঞ্জেথ্, ইলডিং প্লেস টু নিউ' !"

দীপা বলল, "রবীন্দ্রনাথেরও লেখা আছে, 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে'।"

গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছে দু'জন লোক। একজনের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, অন্যজন বেশ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধটিকে বিমান বলল, "রঘুদা, মালপত্রগুলো নামিয়ে নাও, আর শিগগির চায়ের জল চাপাতে বলো। চা, দুধ চিনি আমি সঙ্গে এনেছি।"

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবুকে বলল, "আসুন, আগে আমাদের ঘরগুলো দেখে নিই।"

সামনেই একটা বিরাট সিংহ দরজা। দু' পাশের দুটো পাথরের সিংহ একেবারে ভাঙা। লোহার গেটটা কিন্তু অটুট আছে। ভেতরে এককালে নিশ্চয় বাগান ছিল, এখন জংলা হয়ে আছে। তারপর ধাপেধাপে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে গেছে, মুর্শিদাবাদের নবাব প্যালেসের মতন।

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেতেই অসিত এগিয়ে এসে ভদ্রতা করে বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করব ?"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। দরকার হবে না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমার কোনও কষ্ট হয় না। নামার সময় বরং কিছুটা অসুবিধা হয়।"

বিমান বলল, "আরও সিঁড়ি আছে। এটা একতলা। একতলার ঘরগুলো ব্যবহার করা যায় না। আবর্জনায় ভর্তি। দোতলায় চার-পাঁচখানা ঘর মোটামুটি ঠিক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে কাছাকাছি নদী আছে নিশ্চয়ই ?"

দীপা বলল, "না, নদী-টদি নেই ধারেকাছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিনে সাধারণত নদীর ধারেই এরকম বড় বাড়ি তৈরি করা হত।"

বিমান বলল, "ঠিক বলেছেন, শুনেছি, আগে একটা নদী ছিল। সেটা শুকিয়ে গেছে অনেকদিন। তবে দিঘি আছে দুটো বেশ বড় বড়।"

দোতলায় উঠে এসে বিমান বলল, "আমাদের ঘরগুলো অবশ্য পাশাপাশি হবে না। এদিকে দুটো আছে ব্যবহার করা যায়। আর একটা একটু দূরে।"

অসিত সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আপনারা এদিকে থাকুন। আমাকে দূরের ঘরটা দিন।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে। কাকাবাবু আমাদের পাশেই থাকবেন। তাতে দীপার যদি ভূতের ভয় একটু কমে।"

একটা ঘরের তালা খুলে বিমান সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

কাকাবাবু বললেন, "ইলেকট্রিসিটি আছে, যাঃ, তা হলে তো অনেকটাই রহস্য চলে গেল। এসব জায়গায় টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলবে, হঠাৎ ঝড়ে সেই লণ্ঠন উলটে গিয়ে ভেঙে যাবে, তবেই তো মজা!"

দীপা বলল, "ইলেকট্রিসিটি না থাকলে আমি আসতাম নাকি? রাত্তিরবেলা আলোর চেয়েও বেশি দরকার ফ্যান। ফ্যান না চললে আমি ঘুমোতেই পারি না।"

ঘরটায় আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। একটা মাঝারি ধরনের খাট, একটা দেওয়াল আলমারি আর কয়েকটা চেয়ার। একটা ছোট শ্বেত পাথরের টেবিল। ঘরটা অবশ্য অন্য সাধারণ ঘরের চারখানা ঘরের সমান। এত জায়গা খালি পড়ে আছে যে মনে হয়, সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

অসিত চেয়ারগুলো আর খাটটায় একবার হাত বুলিয়ে বলল, "এগুলো তো তেমন পুরনো নয়।"

বিমান বলল, "আগেকার জিনিস তেমন কিছু নেই। অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, আমার বড়মামা বেশ কিছু ফার্নিচার বিক্রিও করে দিয়েছেন। জমিদারি-টমিদারি তো কিছু আর ছিল না, অন্য আয়ও ছিল না, বড়মামা এখানকার জিনিসপত্র বিক্রি করে খরচ চালাতেন।"

কাকাবাবু বললেন, "উনি বৃদ্ধ বয়েসেও একা থাকতেন এত বড় বাড়িতে?"

বিমান বলল, "আগে দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন ছিল কয়েকজন। এখানে থেকে কোনও লাভ নেই বলে তারাও চলে গেছে আস্তে-আস্তে। বড়মামা মাঝে-মাঝে যেতেন কলকাতায়। আমাদের বাড়ি থাকতেন না, উঠতেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। কিছু একটা ব্যবসা করতেন শুনেছি, তবে সে-ব্যবসা সাকসেসফুল হয়নি কখনও। টাকাটাই নষ্ট হয়েছে শুধু।"

দীপা বলল, "আসলে পাগল লোক ছিলেন, সেটা বলো না।"

বিমান হেসে বলল, "ঠিক পাগল নয়, পাগলাটে! আমার বাবা তো বলেন,

আমাদের মামাবাড়ির সবাই ছিটগ্রস্ত ! আমার মা সুদ্ধু !"

দীপা আবার বলল, "তোমাদের এক দাদু একেবারে বদ্ধ পাগল ছিলেন না ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, ক্রিশ্চানদাদু ! তাঁর গল্প পরে বলব ! পুরনো বংশগুলোতে যেন কিছু একটা অভিশাপ লাগে, আস্তে-আস্তে শেষ হয়ে যায় এইরকমভাবে। বড়মামার পর রাও-বংশ শেষ হয়ে গেল !"

কাকাবাবু বললেন, "রাও !"

বিমান বলল, "টাইটেল শুনলে অবাঙালি মনে হয় তো ? আমার মামারা অবাঙালিই ছিলেন এককালে। নবাবি আমলে বাংলাদেশে এসে সেট্‌ল করেছিলেন। হয়তো লড়াই করে নবাব আলিবর্দিকে খুশি করেছিলেন।"

অসিত বলল, "এইসব পুরনো বাড়িতে গুপ্তধন-টুপ্তধন থাকে অনেক সময়। দেখুন বাড়ি ভাঙার সময় কিছু পেয়ে যেতে পারেন !"

বিমান বলল, "সে গুড়ে বালি ! আমার ছোটভাই, যে জাপানে থাকে, সেই ধীমানের মাথাতেও এই চিন্তা এসেছিল। বাড়িটা আমাদের ভাগে পড়বার পর ধীমান একবার এসেছিল এখানে। আমরা দু' ভাই সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। দামি জিনিস প্রায় কিছুই নেই। আগেই যে-যা পেরেছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ-বাড়িতে সুড়ঙ্গ-টুরঙ্গ কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "যাক, বাঁচা গেছে ! সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটাচলা করা আমাদের পক্ষে বড্ড কষ্টকর ! অথচ আমার এমনই ভাগ্য, কতবার যে সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাতে হয়েছে কিংবা চোর তাড়া করতে হয়েছে তার ঠিক নেই ! এখানে এসে গুপ্তধনও খুঁজতে হবে না, সুড়ঙ্গতেও ঢুকতে হবে না !"

অসিত বলল, "সুড়ঙ্গ যে নেই, সে-বিষয়ে আপনি শিওর হলেন কী করে ? হয়তো আপনারা খুঁজে পাননি। আগেকার দিনে গোপনে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা তো থাকতই !"

বিমান বলল, "সেরকম কিছু থাকলে আমার মা অন্তত জানতেন। আমার মা তো জন্মেছেন এই বাড়িতে। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি, ওঁদের ছোটবেলা থেকেই গুপ্তধন আর সুড়ঙ্গ খোঁজা শুরু হয়েছিল। আমার ছোটমামা অনেক দেওয়াল ভেঙে ফেলেছেন। নাঃ, ওসব কিছু নেই।"

অসিত ছোট শ্বেত পাথরের টেবিলটা টোকা মেরে পরীক্ষা করে বলল, "এটা মন্দ নয়। তবে মাত্র ষাট-সত্তর বছরের পুরনো। চলুন, আমার ঘরটা দেখা যাক।"

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু ঘরটার পেছন দিকের একটা জানলা খুললেন। অনেকদিন এ-জানলা খোলা হয়নি বোঝা যায়। বড় পেতলের ছিটকিনি আঁটা, খুলতে বেশ জোর লাগল।

জানলাটা খুলতেই এমন একটা সরু আর তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল যে, কাকাবাবু চমকে উঠলেন। তারপর ঝটাপট শব্দে উড়ে গেল একটা চিল।

জানলার বাইরেই চিলটা বাসা করেছে, জানলা খোলায় সে বেশ বিরক্ত হয়েছে।

জানলা দিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল।

বৃষ্টি থেমে গেছে, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। কাছেই একটা মস্ত বড় ঝিল, সেখানে ফুটে আছে অজস্র পদ্মফুল। ঝিলের ওপারের আকাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। দারুণ লালের ছড়াছড়ি। আকাশ থেকে লাল-লাল শিখা এসে পড়েছে পদ্মফুলগুলোর ওপর।

কাকাবাবু মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য।

একটু পরেই দরজার কাছ থেকে একজন বলল, "সার, চা দেওয়া হয়েছে। আপনাকে ডাকছেন!"

কাকাবাবু পেছন ফিরে দেখলেন অল্পবয়েসী কাজের লোকটিকে।

কাকাবাবু বললেন, "চলো, যাচ্ছি।"

বারান্দাটা প্রায় একটা রাস্তার মতন চওড়া, তার পাশে-পাশে ঘর। কাকাবাবু ডান দিকে একটুখানি গিয়েই দেখতে পেলেন ডাইনিং-রুম। এ-ঘরেও প্রায় বিশেষ কিছুই নেই, একটা বড় কাঠের টেবিল আর কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার, দেওয়ালের গায়ে একটা কাচ-ভাঙা আলমারি। টেবিলটার পালিশ উঠে গেছে। জমিদার বাড়িতে এসব একেবারেই মানায় না!

অসিত টেবিল-চেয়ারগুলোয় হাত বুলিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "আপনার মামা ভাল-ভাল জিনিস সব বিক্রি করে দিয়ে বাজে ফার্নিচারে ভরিয়ে রেখে গেছেন বাড়িটা। আমার ঘরে যে খাটটা রয়েছে, সেটার দাম একশো টাকাও হবে না।"

বিমান লজ্জা পেয়ে বলল, "আপনি তা হলে আমাদের ঘরটায় এসেই থাকুন। সেখানে একটা পুরনো পালঙ্ক আছে।"

অসিত বলল, "না, না, তার দরকার নেই। ঘরটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। জানলা দিয়ে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ দেখা যায়, দূরে একটা জঙ্গল।"

দীপা বলল, "খাবারগুলো জুড়িয়ে যাবে, আগে খেয়ে নিন।"

দু'জন কাজের লোক টেবিলের ওপর কয়েকটা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গেল। একটাতে হ্যামবার্গার, একটাতে প্যাটিস, একটাতে সন্দেশ।

কাকাবাবু বললেন, "এ কী, এর মধ্যে এতসব খাবার জোগাড় করলে কী করে?"

দীপা বলল, "আমি সব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে কী পাওয়া যাবে, না যাবে তার ঠিক নেই।"

বিমান বলল, "দীপা গাড়ি ভর্তি করে ভাল চাল, মুগের ডাল, পাঁপড়, আচার, চিজ, মাখন এইসব নিয়ে এসেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "খাওয়াদাওয়া তা হলে বেশ ভালই হবে মনে হচ্ছে!"

বিমান বলল, "কালকে দিঘিতে জাল ফেলিয়ে মাছ ধরব।"

অসিত একটা হ্যামবার্গারে কামড় দিয়ে বলল, "চা-টা খাওয়ার পর আমরা পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখব।"

বিমান বলল, "সন্ধে হয়ে গেল। সব জায়গায় কিন্তু আলো নেই। ইলেকট্রিক রয়েছে মাত্র চার-পাঁচখানা ঘরে।"

অসিত বলল, "আমার কাছে বড় টর্চ আছে।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে আমরা যতটা পারি দেখব। তবে সারা বাড়িটা কাল দিনের আলোতেই ভাল দেখা যাবে।"

কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "এতদিনের পুরনো বাড়ি, এখানে সেকালের কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই ?"

বিমান বলল, "সেরকম কিচ্ছু নেই। আমি ছেলেবেলায় এসে কয়েকখানা তলোয়ার আর বর্শা দেখেছিলাম। কিছু বন্দুক-পিস্তল ছিল। কিন্তু সবই বিক্রি হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত বড়মামার ঘরে একটা রাইফেল ছিল। সেটাও আমি থানায় জমা দিয়ে দিয়েছি। আমাদের কলকাতার বাড়িতে রাইফেল রাখার কোনও মানে হয় না। এখানে থাকলে চুরি হয়ে যেত !"

অসিত বলল, "পুরনো ফায়ার আর্মসের অনেক দাম হয়। ইস, আমাকে একবার দেখালেন না !"

দীপা বলল, "হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা দু'খানা ছুরিও পাওয়া গিয়েছিল। সে দুটো আমরা রেখে দিয়েছি।"

অসিত ব্যস্ত হয়ে বলল, "কই, কই, দেখান তো ?"

দীপা বলল, "সে দুটো কলকাতার বাড়িতে রয়েছে। আর-একটা বেশ ছোট্ট সুন্দর পাথরের বাক্সও পেয়েছিলাম। দেখলেই মনে হয়, গয়নার বাক্স। কিন্তু তার মধ্যে একটুকরো গয়নাও নেই !"

বিমান বলল, "বড়মামা তো অনেকদিন বেঁচেছেন, দামি জিনিস সবই বিক্রি করে দিয়ে গেছেন।"

অসিত বলল, "খালি গয়নার বাক্সেরও অনেক দাম হতে পারে। সেটা কতদিনের পুরনো সেটা দেখতে হবে।"

দীপা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী করে বোঝেন কতদিনের পুরনো ?"

অসিত বলল, "তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। সামান্য একটুকরো কাগজও পরীক্ষা করে বলা যায়, কতদিন আগে সেটা তৈরি হয়েছিল।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "মনে করো দীপা, তোমার ওই গয়নার বাক্সটা ছিল বেগম নূরজাহানের, তা হলেই ওটার দাম হয়ে যাবে কয়েক লক্ষ টাকা। আমি কলকাতায় একটা বাড়িতে একটা সাধারণ কাচের দোয়াত দেখেছিলাম, সেই দোয়াতটা সম্রাট নেপোলিয়ান ব্যবহার করতেন। সেইজন্যই সেটার অনেক দাম।"

অসিত বলল, "ওই দোয়াতটা কোন বাড়িতে আছে আমি জানি। আমি পাঁচ লক্ষ টাকা দাম দিতে চেয়েছিলাম, তাও তারা বিক্রি করতে রাজি হয়নি।"

দীপা বলল, "একটা দোয়াতের দাম পাঁচ লাখ টাকা?"

বিমান বলল, "নেপোলিয়ানের দোয়াত!"

চা-পর্ব শেষ হতে সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বারান্দাটা দু'দিকেই চলে গেছে অনেকখানি। বিমান বলল, "ডান দিকটায় অনেকখানি ভাঙা। ছাদ খসে পড়েছে। বিশেষ কিছু দেখার নেই। চলুন, বাঁ দিকটা দেখা যাক।"

অসিত বলল, "চলুন, পরে ডান দিকটাও দেখব।"

অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরেটা, আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু কাকাবাবুর ক্রাচের আওয়াজ হতে লাগল খট খট করে। পর পর ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। কোনওটাতেই তালা নেই, বিমান দরজা ঠেলে ঠেলে খুলে দেখতে লাগল। তিন-চারখানা ঘরে কিছুই নেই। একটা ঘরে অনেকগুলো ভাঙা চেয়ার-টেবিল উলটোপালটা করে রাখা। একটা ঝাড়লণ্ঠন চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, মনে হয়, ওপর থেকে একদিন খসে পড়েছিল, তারপর আর কেউ সেটাতে হাত দেয়নি।

অসিত জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

দীপা খানিকটা অধৈর্যের সঙ্গে বলল, "ওগুলো কালকে ভাল করে দেখবেন। এখন চলুন, তাড়াতাড়ি একবার চক্কর দিয়ে আসা যাক।"

অসিত ঝাড়লণ্ঠনের একটা প্রিজ্‌ম তুলে নিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে, চলুন।"

আর-একটা ঘরে রয়েছে শুধু বালিশ আর তোশক। লাল মখমলের কয়েকটা তাকিয়া বেশ দামি মনে হলেও সেগুলো ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে এসেছে।

দীপা বলল, "এই ঘরটায় কি বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ। এখানে কোনও বাঘ-টাঘ লুকিয়ে নেই তো?"

কাকাবাবুর সঙ্গেও টর্চ রয়েছে। তিনি ওপরের দিকে আলো ফেলে বললেন, "ওই দ্যাখো, কত চামচিকে বাসা বেঁধে আছে। চামচিকের এইরকম গন্ধ হয়!"

দীপা বলল, "চলো, চলো, শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে চলো!"

আর-একটুখানি যাওয়ার পর বারান্দাটা একদিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে ছাতের দিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে, একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। পাশে একটা খালি ঘর, তার দরজা খোলা।

সেখানে দাঁড়িয়ে বিমান বলল, "আমার ছোটমামা এখান থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন।"

দীপা বলল, "পড়ে গিয়েছিলেন, না ঠেলে মেরে ফেলা হয়েছিল?"

বিমান বলল, "অনেকে তা-ই বলে। কিন্তু শুধু-শুধু কেউ ঠেলে ফেলবে

কেন ?"

দীপা বলল, "তোমার মা-ও তো বলেন, কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল !"

অসিত বারান্দার রেলিংটায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এটা তো বেশ মজবুতই রয়েছে এখনও, এখান দিয়ে শুধু-শুধু কারও পড়ে যাওয়া তো স্বাভাবিক নয় !"

বিমান বলল, "মোট কথা, কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কি না, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি !"

কাকাবাবু বললেন, "বিমান, তোমার ওই ছোটমামা কতদিন আগে মারা গেছেন ?"

বিমান বলল, "প্রায় কুড়ি বছর !"

কাকাবাবু বললেন, "ওঃ অতদিন আগে। তা হলে আর ওই ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। এখন তো আর ওই রহস্যের সমাধান করা যাবে না !"

অসিত জিজ্ঞেস করল, "ওপরের সিঁড়িটা ছাদে গেছে ? নিশ্চয়ই মস্ত বড় ছাদ।"

বিমান বলল, "ছাদে একখানা ঘর আছে, সেটাই ছিল আমাদের ক্রিশ্চান দাদুর ঘর। সেটা বছরের পর বছর তালাবন্ধই পড়ে থাকে।"

দীপা বেশ জোরে বলে উঠল, "ওখানে এখন যাওয়া হবে না। না, না, কিছুতেই না। দিনের বেলা দেখবেন।"

অসিত বলল, "ছাদে যেতে তো ভালই লাগবে। বাইরেটাও অনেকখানি দেখা যাবে।"

দীপা আবার সেইরকমভাবে বলল, "কাল সকালে।"

অসিত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশের খালি ঘরটায় কিসের যেন একটা শব্দ হল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল চারজনই।

বিমান টর্চ সেদিকে ফিরিয়ে বলল, "কে ?"

আর কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই।

আর এগোতে যেতেই দীপা হাত চেপে ধরে বলল, "এই, তুমি ভেতরে যেও না !"

বিমান বলল, "দাঁড়াও, দেখি ভেতরে কী আছে। তুমি শব্দ শোনোনি ?"

অসিত এগিয়ে গিয়ে টর্চের জোরালো আলো ফেলতেই দেখা গেল, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, খালি গা। আলোয় যেন চকচক করে উঠল তার দু' চোখ।

দীপা "ও মা গো" বলে আর্ত চিৎকার করে উঠল।

অসিত নিজের টর্চটা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, "আপনারা কেউ আলোটা ধরুন তো ! ক্যামেরা ! আমি ক্যামেরা বার করছি।"

কাকাবাবু ততক্ষণে পকেটের রিভলভারে হাত দিয়েছেন, ওটা সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে। কিন্তু তিনি রিভলভারটা বার করলেন না। সেই মূর্তিটা ছুটে এল ওদের দিকে। বিমান আর দীপাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল সিঁড়ির দিকে। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করেও পারলেন না।

বিমান আর দীপা দু'জনেই দারুণ ভয় পেয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

অসিত ততক্ষণে ক্যামেরা খুলে বলল, "চলে গেল ? ভূতটা চলে গেল ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ঘরটার এক কোণে একটা বিছানা পাতা আছে। ভূতেরা বিছানা পেতে শোয়, এমন কখনও শুনিনি।"

সত্যিই এবার দেখা গেল, ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা মাদুর, বালিশ, ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। কিছু এঁটো শালপাতা, একটা কলকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমরা বোধ হয় কারও ঘুম ভাঙিয়েছি। আমাদের চেয়েও ও বেচারা ভয় পেয়েছে বেশি !"

অসিত বলল, "যাঃ ! প্রথম ভূতটা ফসকে গেল।"

বিমান উঠে দাঁড়িয়ে এবার মেজাজ গরম করে বলল, "এখানে কে থাকবে ? কারও তো থাকার কথা নয় !"

সে গলা চড়িয়ে ডাকল, "রঘুদা ! ভানু !"

দু-তিনবার ডাকতেই ছুটতে-ছুটতে এল অল্প বয়েসী কাজের ছেলেটি।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ভানু ! এখানে কে থাকে ?"

ভানু বলল, "কেউ না তো !"

বিমান প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "কেউ থাকে না তো কার বিছানা পাতা রয়েছে ? ভূতে পেতেছে ?"

ভানু ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলল, "তা হলে বোধ হয় দিনু পাগলটা !"

"দিনু পাগলটা মানে ?"

"এত বড় বাড়ি, সব ঘরে তো নজর রাখা যায় না ? খুব বৃষ্টিবাদলায় গ্রামের কিছু লোক এ-ঘরে ও-ঘরে এসে শুয়ে থাকে।"

"তার মানে, যার খুশি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে ? রাত্তিরবেলা বাইরের সব দরজা বন্ধ করে রাখতে পারো না ?"

"পেছন দিকের অনেকগুলো দরজাই একেবারে ভাঙা। বন্ধ করব কী করে ? এই সিঁড়িটার নীচের দরজাটা পুরোটাই নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "কয়েকদিন পর বাড়িটা পুরোটাই ভেঙে ফেলা হবে। এই ক'টা দিন গ্রামের লোক যদি শুতে চায়, শুয়ে নিক না ; ক্ষতি কী ?"

দীপা বলল, "ওমা, যে-সে এসে ঢুকে পড়বে ! দোতলায় উঠে আসবে ? তারপর যদি রাত্তিরবেলা আমাদের গলা টিপে মেরে ফেলে ?"

বিমান বলল, "ভানু, যেমন করে হোক, এই সিঁড়ির মুখটা আটকাও ! একতলায় তো অনেক ভাঙা দরজা-জানলা পড়ে আছে, সেইগুলো দিয়ে যা

হোক একটা কিছু করো ! কেউ যেন ওপরে আসতে না পারে।"

॥৩॥

রাত্তিরে খাওয়ার আগে বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পেতে নানারকম গল্প হল অনেকক্ষণ। এ-দিকের কয়েকটা ঘরে ইলেকট্রিকের আলো থাকলেও নিভে গেল একটু বাদেই। গ্রামের দিকে লোডশেডিং হয় শহরের চেয়েও বেশি। এক-এক সময় দু-তিনদিন একটানা কারেন্ট থাকে না।

দীপা বলল, "এই রে, সারারাত অন্ধকারে থাকতে হবে ! পাখাও ঘুরবে না !"

বিমান বলল, "বৃষ্টির জন্য গরম অনেক কমে গেছে। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বেলে আনব ?"

অসিত বলল, "এখন থাক। এই তো বেশ লাগছে। পরে খাওয়ার সময় হ্যাজাক দরকার হবে।"

বিমান বলল, "তখন একটা নিরীহ লোককে দেখে আমরা কী ভয় পেয়ে গেলাম ! লজ্জার কথা !"

দীপা বলল, "সব সময় আমাকে দোষ দাও। কিন্তু তুমিই বেশি ভয় পেয়েছিলে !"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা কেউই তো ভূতে বিশ্বাস করি না। এমন কী দীপাও মানে যে, ভূত বলে কিছু নেই। মানুষ মরে গেলে আর কোনওরকমেই তার পৃথিবীতে ফিরে আসার উপায় নেই, এ তো আমরা সবাই জানি। তবু ভয় পাই কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা ভূতের ভয় পাই না। আমরা অন্ধকারকে ভয় পাই। এটা বহু যুগের সংস্কারের ব্যাপার।"

দীপা বলল, "শুধু অন্ধকারের জন্যই ভয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "দিনের বেলায় রোদ্দুরের আলোয় তুমি যদি দ্যাখো একটা জীবন্ত কঙ্কাল খটখটিয়ে আসছে, তা দেখে কি তোমার ভয় হবে ? বরং তোমার হাসি পাবে। কারণ, তুমি জানো, কোনও কঙ্কালের পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। কেউ নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করে তোমাকে ঠকাতে চাইছে। কিংবা ধরো, এখানে একশো পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলছে, তার মধ্যে যদি একটা ঘোমটাপরা পেত্নি এসে পড়ে, তা হলে তুমি কি ভয় পাবে ? তুমি অমনি জিজ্ঞেস করবে, 'অ্যাই, তুই কে রে ? এখানে ন্যাকামি করছিস ?"

অসিত বলল, "যেসব দেশে লোডশেডিং হয় না, সমস্ত গ্রামেও আলো জ্বলে, সেসব দেশ থেকে ভূত পালিয়ে গেছে চিরকালের জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকার সম্পর্কে বহু যুগ আগেকার ভয় এখনও

আমাদের রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে। অন্ধকারে বিপদ আসতে পারে যে-কোনও দিক থেকে। যে-বিপদটাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। সেটা সম্পর্কে আমাদের যুক্তিও গুলিয়ে যায়।"

অসিত বলল, "আমারও প্রথমটা লোকটাকে দেখে বুকটা কেঁপে উঠেছিল, স্বীকার করতে লজ্জা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, ভাগ্যিস আমি বিছানাটা দেখতে পেয়েছিলাম, তাই লোকটাকে গুলি করিনি !"

অসিত বেশ অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, "গুলি করতেন মানে ? আপনার কাছে কি রিভলভার-টিভলভার আছে নাকি ?"

বিমান বলল, "বাঃ, আপনি রাজা রায়চৌধুরী, মানে কাকাবাবু সম্পর্কে কিছু জানেন না ? ওঁর কত শত্রু। সব সময় একটা অস্ত্র তো সঙ্গে রাখতে হবেই !"

অসিত আবার জিজ্ঞেস করল, "ওঁর এত শত্রু কেন ? উনি কী করেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা থাক। বিমান, তুমি যে তখন বললে, ছাদের ঘরে তোমার এক ক্রিশ্চান দাদু থাকতেন। তিনি সত্যিই ক্রিশ্চান ছিলেন ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, উনি ছিলেন আমার মায়ের এক কাকা। ঠিক আপন নন, একটু দূর সম্পর্কের। উনি এ-বাড়িতেই থাকতেন। শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছিলেন। এখানে কাছাকাছি ক্রিশ্চান মিশনারিদের একটা চার্চ আছে। সেখানে কিছুদিন যাতায়াত করতে-করতে উনি হঠাৎ দীক্ষা নিয়ে ফেললেন। ওঁর আগে নাম ছিল ধর্মনারায়ণ রাও, দীক্ষা নেওয়ার পর নাম হল গ্রেগরি রাও।"

"তাই নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছিল নিশ্চয়ই !"

"তা তো হবেই। আগেকার দিনের ব্যাপার। ধর্ম বদল করার ব্যাপারটা কেউ সহজে মেনে নিতে পারত না। এ-বাড়ির যিনি তখন কর্তা ছিলেন; তিনি এত রেগে গেলেন যে, সেই গ্রেগরি রাওকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। শুধু তাই নয়, হুকুম দেওয়া হল যে সে এই জেলাতেই কোথাও থাকতে পারবে না। এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও যেন কেউ না জানতে পারে। গ্রেগরি রাও নিরুদ্দেশে চলে গেলেন।"

দীপা বলল, "তারপর তো অনেক বছর পর তাঁকে বম্বে না কোথায় আবার খুঁজে পাওয়া গেল !"

বিমান বলল, "আমাকে বলতে দাও না ! আমার মামাবাড়ির ব্যাপার আমি তোমার থেকে ভাল জানি। গ্রেগরি রাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর অনেকদিন তার কোনও খবর পাওয়া যায়নি, কেউ খবর জানতেও চায়নি !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "উনি বিয়ে-টিয়ে করেননি ?"

"না। কখনও চাকরিবাকরি করেননি, টাকা রোজগার করতেও শেখেননি। এ-বাড়িতে তাঁর কোনও দরকারও হত না সে-আমলে। তিনি কোথায় চলে

গেলেন কে জানে। প্রায় বছর দশেক বাদে আমার মায়ের বাবা, তার মানে আমার দাদু একবার কী কাজে গিয়েছিলেন বম্বেতে। সেখান থেকে বেড়াতে গেলেন গোয়ার পাঞ্জিম শহরে। যে হোটেলে উঠলেন, তার ম্যানেজার বাঙালি। তিনি আমার দাদুকে আগে থেকেই চিনতেন। কথায়-কথায় সেই ম্যানেজার বললেন, 'আপনাদের বংশের একজন মানুষ এখানে খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। তিনি খুব অসুস্থ, বিনা চিকিৎসায়, না খেতে পেয়ে মারা যাবার উপক্রম।"

"গ্রেগরি রাও গোয়া চলে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় তাঁর এত অভিমান হয়েছিল যে, বাংলা থেকে যত দূরে সম্ভব তিনি চলে যেতে চেয়েছিলেন। গোয়াতে অনেক বড়-বড় চার্চ আছে জানেন নিশ্চয়ই। সেইরকম একটা চার্চে আশ্রয় পেয়েছিলেন গ্রেগরি রাও। সেখানে একজন পর্তুগিজ পাদ্রি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, দু'জনে থাকতেন এক বাড়িতে। তারপর সেই পর্তুগিজ পাদ্রির সঙ্গে চার্চের কী যেন গণ্ডগোল হল, তিনি চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে থাকতে লাগলেন আলাদাভাবে। গ্রেগরি রাও কিন্তু তাঁকে ছাড়লেন না, তিনিও চার্চ ছেড়ে দিয়ে সেই পাদ্রির সঙ্গেই রয়ে গেলেন। আমার দাদু যখন গোয়ায় গেলেন, তখন সেই পাদ্রিও মারা গেছেন, গ্রেগরি রাও একা থাকেন।"

"হোটেলের ম্যানেজারের কাছে এইসব কথা শুনে তোমার দাদু গেলেন গ্রেগরি রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে?"

"প্রথমে দাদু রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ও রাও পরিবারের কেউ না! কিন্তু আমার দিদিমা ছিলেন খুব দয়ালু। তিনি প্রচুর দান-ধ্যান করতেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'আচ্ছা, একজন লোক অসুস্থ অবস্থায় একা একা পড়ে আছে, তাকে সাহায্য করবে না? তা কি হয়? সে মারা গেলে লোকে বলবে তো রাও বংশের একজন মানুষ না খেয়ে মরেছে! আমাদের বাড়িতে তো কত লোক এমনই থাকে, খায়।' দিদিমার অনুরোধে দাদু গেলেন দেখা করতে। পাঞ্জিম থেকে খানিকটা দূরে, কালাংগুটে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, গ্রেগরি রাওয়ের আস্তানা তখন একজন লোকের বাড়ির আস্তাবলে। সেখানকার লোকে তার গ্রেগরি নামটাও জানে না। সবাই বলে বাঙালিবাবু। আমার দাদু গিয়ে কী দেখলেন জানেন?"

"কী?"

"গ্রেগরি রাও তখন বদ্ধ পাগল। তাঁর অন্য কোনও অসুখ নেই। এমনই পাগল যে, মানুষ চিনতেও পারেন না। দাদুকেও চিনতে পারলেন না। পর্তুগিজ ভাষায় কী সব বিড়বিড় করতে লাগলেন। দাদু ভেবেছিলেন, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে আসবেন। কিন্তু দিদিমা বললেন, 'ওই পাগলকে

টাকা দিয়ে কী হবে ? ওঁর তো টাকা-পয়সা সম্পর্কেও কোনও জ্ঞান নেই। ওঁর হাতে টাকা দিলে দু'দিনেই অন্য লোকরা লুটেপুটে নেবে।' তখন ঠিক হল, সেই পাগলকে সঙ্গে নিয়ে আসা হবে এখানে। কিন্তু পাগলকে আনা কি সহজ ? তাঁর ওই আস্তাবলের ঘরের মধ্যে নানারকমের নুড়িপাথর, ঝিনুক, পুঁতির মালা, ছেঁড়াখোঁড়া বইপত্র ছড়ানো। এইসব হল পাগলের সম্পত্তি। তাঁকে ঘর থেকে বার করা যায় না, ওইসব জিনিস বুকে চেপে ধরে চিৎকার করতে থাকেন। দাদু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দিদিমার দয়াতেই শেষ পর্যন্ত লোকজন জুটিয়ে ওই ঘরের সমস্ত হাবিজাবি জিনিসপত্রসমেত গ্রেগরি রাওকে নিয়ে আসা হল বীরভূমের এই বাড়িতে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার-কবিরাজরা বললেন, ওঁর ভাল হওয়ার আর কোনও আশা নেই। বাড়িতে একটা পাগল রাখা তো সোজা কথা নয়। সেইজন্য তাঁকে রাখা হল ওই ছাদের ঘরটায়। ওখানেই তিনি আপনমনে থাকতেন। এখানে আসার পর এগারো বছর বেঁচে ছিলেন।"

অসিত জিজ্ঞেস করল, "এইসব ঘটনা আপনি কার কাছে শুনেছেন! আপনার মা'র কাছে ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, মা'র কাছে তো অনেকবার শুনেছি। আমার দিদিমার কাছেও শুনেছি। খুব ছোটবেলায় আমি পাগলাদাদুকে দেখেছিও। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে মারতে আসতেন। ওঁর ভয়ে আমরা ছাদে যেতাম না। সারা মুখে দাড়িগোঁপের জঙ্গল, মাথার চুল জট পাকানো, চেহারাটাও হয়ে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর। তবে ছাদ থেকে কখনও নীচে নেমে আসতেন না বলে আর কোনও ভয় ছিল না।"

"এগারো বছর ওই ছাদের ঘরে ছিলেন ?"

"তাই তো শুনেছি। একদিনের জন্যও কেউ ওঁকে ঘর থেকে বার করতে পারেনি। ওই ঘরের সঙ্গেই একটা বাথরুম তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সেইজন্য। বাড়ির একজন কাজের লোক রোজ ওঁর ঘরের সামনে খাবার দিয়ে আসত। সেও ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকত না। একদিন নাকি পাগলাদাদু তার হাত কামড়ে দিয়েছিল !"

দীপা বলল, "তোমার ছোটমামার কথাটা বলো।"

বিমান বলল, "হ্যাঁ। একমাত্র আমার ছোটমামার সঙ্গেই ওই পাগলাদাদুর কিছুটা ভাব ছিল। ছোটমামা ছিলেন অনেকটা আমার দিদিমার মতন। মায়া-দয়া ছিল খুব। প্রথম থেকেই তিনি পাগলাদাদুর সেবা করতেন। সাহস করে ওঁর ঘরে ঢুকে জোর করে কয়েকদিন ওঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, ঘরখানা অসম্ভব নোংরা হয়ে উঠেছিল দিনের পর দিন। অনেকটা যেন সিংহের খাঁচার মতন। ভয়ে কোনও কাজের লোক ঢোকে না। ছোটমামাই শুধু ঢুকতেন, এবং জমিদারের ছেলে হয়েও তিনি নিজের হাতে

সে-ঘরের ময়লা পরিষ্কার করেছেন কয়েকবার। পাগলাদাদু নাকি ছোটমামার মাথায় হাত দিয়ে কী সব যেন বলতেন, তা বোঝা যেত না কিছুই, কিন্তু মনে হত যেন আশীর্বাদ করছেন। কিন্তু পাগলের ব্যাপার তো। হঠাৎ একদিন মেজাজ বদলে গেল। ছোটামামা সেদিন ঘরটা একটু গুছিয়ে দিচ্ছেন, পাগলাদাদু আচমকা খেপে গিয়ে প্রথমে ছোটমামাকে এক লাথি কষালেন। চিৎকার করে বললেন, শয়তান, তুই আমার ঘরে জিনিস চুরি করতে এসেছিস ? সাত রাজার ধন এক মানিক আছে আমার কাছে। দেব না ! কাউকে দেব না ! তারপর হাতের বড় বড় নোখ দিয়ে ছোটমামার গাল চিরে দিলেন। বোধ হয় চোখ দুটোও গেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ছোটমামা কোনওক্রমে পালিয়ে আসে। তারপর থেকে দিদিমা ছোটমামাকে ওপরে যেতে বারণ করে দিয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বাবাঃ, সাঙ্ঘাতিক পাগল ছিলেন তো !"

বিমান বলল, "অথচ কিন্তু লেখাপড়া জানতেন বেশ। পাগল অবস্থাতেও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতেন। বাইবেলের শ্লোক বলতেন। কিন্তু লোকজন দেখলেই হিংস্র হয়ে উঠতেন।"

অসিত বলল, "হুঁ। তা হলে মনে হচ্ছে, উনিই আপনার ছোটমামাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ওঁর কাছে কোনও দামি জিনিস আছে সেটা টের পেয়ে আপনার ছোটমামা রাত্তিরবেলা চুরি করতে গিয়েছিলেন। পাগল জেগে উঠে তাঁকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক বছর আগেকার ব্যাপার। এখন আর এ-নিয়ে গবেষণা করে কোনও লাভ নেই।"

বিমান একগাল হেসে বলল, "তা ছাড়া ওঁর ঘরে দামি জিনিস কিছু ছিল না। ওটা পাগলের প্রলাপ।"

অসিত বলল, "নানারকম পাথর, ঝিনুক ছিল বলছিলেন। তার মধ্যে কোনও-কোনওটা খুব দামি হতে পারে।"

বিমান বলল, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না ! সেগুলো সব ওই ঘরের মধ্যেই আছে, কাল সকালে দেখবেন। নদীর ধারে কিংবা সমুদ্রের ধারে যে নানারকম ছোট-ছোট নুড়িপাথর থাকে, অনেকে কুড়িয়ে আনে, ওই পাথরগুলো সেরকম। আর কিছু ঝিনুক। তাও সমুদ্রের ধার থেকে কুড়োনো, তার মধ্যে আবার অনেকগুলোই ভাঙা। আর ছিল পুঁতির মালা, অনেকগুলো। নানান রঙের, কিন্তু অতি সাধারণ পুঁতি। ক্রিশ্চানদের রোজারি বলে একরকম জপের মালা থাকে, ওঁর বোধ হয় সেইরকম মালা জমানোর শখ ছিল !"

দীপা বলল, "ওইসব পুঁতিটুঁতির মধ্যে দু-একটা হিরে-মুক্তোও থেকে যেতে পারে।"

বিমান বলল, "সেসব কী আর কম খুঁজে দেখা হয়েছে। জমিদারি চলে

যাওয়ার পর যখন এই বংশের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়, তখন হ্যাংলার মতন সবাই সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে কোথাও কোনও দামি জিনিস আছে কি না ! বড়মামা চেয়ার-টেবিল বিক্রি করতে শুরু করেছিলেন, তাতেই বুঝতে পারছ, দামি জিনিস আর কিছু বাকি ছিল না।"

অসিত জিজ্ঞেস করল, "আপনার পাগলাদাদুর ঘরের জিনিসপত্রগুলো আপনি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছেন ?"

"অনেকবার। আমার ছোটভাই একজন স্যাকরা ডেকে এনে পুঁতির মালাগুলো দেখিয়েছে। সেই স্যাকরা বলেছিল, ওইসব মালার দাম দশ টাকাও হবে না। আমাদের আগেও অনেকে দেখেছে। তবে পাগলাদাদু মারা যাওয়ার আগে কেউ ঘরে ঢুকে দেখেনি। উনি মারা যাওয়ার পরেও কয়েক মাস ভয়ে কেউ ও-ঘরে ঢোকেনি।"

"তখনও ভয় ছিল কেন ?"

"ওঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা যে ভয়াবহ। আগেই বলেছি, বাড়ির একজন কাজের লোক রোজ ওঁকে খাবার দিয়ে আসত। সেই লোকটি এক সময় ছুটি নেয় দেশে যাওয়ার জন্য। আর একজনের ওপর ভার দিয়ে যায়। সেই লোকটা পর-পর দু'দিন দেখে যে খাবার বাইরে পড়ে আছে, পাগলাদাদু কিছু খাননি। সে ভেবেছিল, পাগলের খেয়াল। কাউকে বলেনি কিছু। তৃতীয় দিনেও ওইরকম খাবার পড়ে থাকতে দেখে সে কয়েকবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তখন সে জানিয়েছিল বড়মামাকে। বড়মামা পাত্তা দেননি, বলেছিলেন, 'খিদে পেলে ঠিক খাবে।' দিদিমা তখন বেঁচে নেই, ওই পাগলের জন্য বাড়িতে কারও কোনও মায়া-দয়া ছিল না। আরও দু'দিন পর বিশ্রী গন্ধ পেয়ে দরজা ভাঙা হল। পাগলাদাদু অন্তত তিন দিন ধরে ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন। শীতকাল ছিল, খুব শীত ছিল সেবার, তাই আগে গন্ধ পাওয়া যায়নি। এইরকমভাবে মৃত্যু হলে নানারকম ভয়ের গল্প রটে যায়। কাজের লোকেরা ধরেই নিল পাগলাদাদু অপঘাতে মরে ভূত হয়েছেন। একে ছিলেন হিংস্র পাগল, তার ওপরে ভূত, কেউ আর ওই ঘরের ধারেকাছে যায় ? ঘরটা সেইরকমই পড়ে আছে। এখনও নাকি ছাদে মাঝে-মাঝে শব্দ হয় রাত্তিরে, এরা বলে যে পাগলা সাহেবের ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

দীপা কান খাড়া করে বলল, "চুপ, চুপ ! শোনো, ওপরে কিসের শব্দ হচ্ছে না ?"

সবাই শোনার চেষ্টা করল। বিমান বলল, "ধ্যাত ! কোথায় শব্দ ? এখনও তোমার ভূত-প্রেতের ভয় গেল না ?"

অসিত বলল, "বোধ হয় নীচে কোনও শব্দ হয়েছে, আপনি ভেবেছেন ছাদে। এরকম হয়। আচ্ছা, বিমানবাবু, আপনার ওই পাগলাদাদু যখন মারা যান, তখনও কি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ ! আপনি ভাবছেন, কেউ তাঁকে মেরে ফেলেছিল ? তা নয় ! দরজা বন্ধই ছিল ।"

দীপা বলল, "থাক, আর ওসব কথার দরকার নেই। কতকালের পুরনো ব্যাপার !"

একজন কাজের লোক এই সময় এসে জানাল যে, খাবার তৈরি হয়ে গেছে।

সবাই এবার উঠে গেল খাবার ঘরে। টেবিলের ওপর পাঁচখানা প্লেট পাতা রয়েছে।

কাকাবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, "আমরা তো চারজন। পাঁচজনের ব্যবস্থা কেন ? আর কেউ আসবে ?"

বিমান হেসে বলল, "না, আর কেউ নেই। এটা এ-বাড়ির একটা অনেককালের নিয়ম। খাবার সময় একটা জায়গা সব সময় বেশি রাখা হত। যদি হঠাৎ কোনও অতিথি এসে পড়ে !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ ভাল নিয়ম তো।"

দীপা বলল, "আমার কিন্তু ভাল লাগে না। একটা খালি প্লেট দেখলে বারবার মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি কেউ আসবে। বারবার দরজার দিকে চোখ চলে যায়।"

বিমান বলল, "আমাদের বাড়িতে কিন্তু এরকম অনেকবার হয়েছে। খেতে বসেছি, এমন সময় কোনও খুড়তুতো কিংবা মাসতুতো ভাই এসে পড়ল। আমরা অমনই বলি, এসো, এসো, খেতে বসে যাও। প্লেট সাজানো দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তখন আমরা বলি, তুমি যে আসবে, তা আমরা আগে থেকেই জানতাম !"

দীপা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। পদ বেশি নেই। সরু চালের সাদা ধপধপে ভাত, বেগুনভাজা আর আলুভাজা, মুর্গির ঝোল। ঝোলটার চমৎকার স্বাদ।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় কোথায় যেন ধুড়ুম-ধড়াম শব্দ হল। বেশ জোর আওয়াজ। চমকে উঠল সবাই।

বিমান চেঁচিয়ে উঠল, "ভানু, ভানু !"

অল্পবয়েসী কাজের ছেলেটি এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ও কিসের শব্দ রে ?"

ভানু বলল, "পশ্চিম দিকের বারান্দাটা খানিকটা ভেঙে পড়ল। মাঝে-মাঝেই ভাঙছে। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছে তো।"

দীপা সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ ওপরে তুলে বলল, "ওরে বাবা, এ-দিকটাও ভাঙবে না তো ?"

বিমান বলল, "না, না, সে-ভয় নেই। এ-দিকের অংশটা মজবুত আছে।

কয়েক বছর আগে সারানোও হয়েছিল খানিকটা !"

দীপা তবু বলল, "কেন যে সাধ করে এই ভুতুড়ে বাড়িতে আসা !"

ভানু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে, তারপর তোমাদের এ-বাড়িতে যারা কাজ করত, তাদের কী হবে ? তারা বেকার হয়ে যাবে ?"

বিমান বলল, "ওদের জন্য ব্যবস্থা করেছি। এখন এখানে কাজ করে পাঁচজন। তাদের মধ্যে দু'জন খুবই বুড়ো হয়ে গেছে, তাদের কিছু টাকা দিয়ে রিটায়ার করিয়ে দেব, তারা নিজেদের দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে। আর তিনজন এখানে পাইপের কারখানা হবে, তাতে চাকরি পাবে। যিনি এ-জায়গাটা কিনেছেন, তিনি ওদের চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন।"

অসিত বলল, "এ-দিকের বারান্দারও অনেক টালি খসে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে পুরো বাড়িটা নিজে-নিজে ভেঙে পড়ত।"

খাওয়ার পর আর বেশিক্ষণ গল্প হল না। যে যার নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

কাকাবাবু পোশাক পালটে পাজামা-পাঞ্জাবি পরলেন। এক্ষুনি তাঁর শুতে ইচ্ছে করছে না। তিনি বাইরের দিকের জানলাটার কাছে দাঁড়ালেন।

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ এখনও মেঘলা। বাইরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তবু হাওয়া দিচ্ছে বেশ।

যখন একদম একলা থাকেন, তখন কাকাবাবু গুনগুন করে গান করেন। তাঁর এই গানের কথা কেউ জানে না। এ একেবারে তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত গান। কোনও বিখ্যাত কবিতার তিনি নিজে সুর লাগিয়ে দেন।

এখন তিনি সুর দিতে লাগলেন সুকুমার রায়ের একটি কবিতায় :

শুনেছ কী বলে গেল
সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি
আকাশের গায়ে নাকি
টক টক গন্ধ...
(আ-হা-হা-হা- না-না-না-না)
টক টক থাকে নাকো
যদি পড়ে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে
তখন দেখেছি চেটে
একেবারে মিষ্টি !

এই গানটাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানারকমভাবে গাইতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আর-একটা গানে সুর দিলেন :

আম আছে, জাম আছে
আর আছে কদবেল
সবসে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল, জাঁদরেল...

গানটান শেষ করার পর কাকাবাবু বিছানায় চলে এলেন। তবু তাঁর ঘুম এল না। নানারকম কথা ভাবতে লাগলেন। একবার সন্তুর কথাও মনে এল। সন্তু কি এখন রাত জেগে পড়াশোনা করছে ? ওর পরীক্ষা মাত্র তিনদিনের। এখানে তার বেশিদিন থাকা হলে সন্তু ঠিক চলে আসবে !

ঘন্টা দু-এক কেটে গেল, তবু ঘুম আসার নাম নেই। নতুন জায়গায় এলে তাঁর এরকম হয় প্রথম রাত্তিরটা। ঘুমের জন্য তিনি ব্যস্ত নন। একটা রাত না ঘুমোলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। এইসব গ্রাম-দেশে সন্ধের পর এমনিতেই কোনও শব্দ থাকে না। আজ ভাল বৃষ্টি হয়ে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সবাই আরাম করে ঘুমোচ্ছে।

এক সময় ছাদে তিনি অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলেন। কাকাবাবুর কান খুব তীক্ষ্ণ, সামান্য শব্দও তিনি শুনতে পান। মনে হচ্ছে, ছাদে কেউ হাঁটছে।

কাকাবাবু আর একটুক্ষণ শুনলেন। কোনও সন্দেহ নেই, কোনও মানুষের পায়ের শব্দ। এ-বাড়ির দরজা-জানলা এতই ভাঙা যে, চোর-টোরের ঢুকে পড়া খুব স্বভাবিক। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়িটা একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে, তার আগে এ-গ্রামের চোরেরা এসে যা পাবে তাই নিয়ে যেতে চাইবে। ভাঙা চেয়ার-টেবিল কিংবা পুরনো লোহাও বিক্রি হয়।

এর পর একটা চাপা ঝন-ঝন শব্দ হতে লাগল। যেন কোনও লোহার শিকল ধরে টানাটানি করা হচ্ছে। একটু পরেই আবার বদলে গেল শব্দটা। খট খট খট। কেউ যেন কিছু ভাঙার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু খাট থেকে নেমে পড়লেন। তিনি কৌতূহল দমন করতে পারছেন না। ছাদে নানারকম শব্দ হলে তিনি ঘুমোবেন কী করে ?

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে ভরলেন। এক হাতে নিলেন টর্চ। তারপর ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে এগোলেন।

দরজাটা খোলার সময় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। কাকাবাবু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বেরোলেন বাইরে। লম্বা-টানা বারান্দাটা পুরো অন্ধকার। কাকাবাবু দেওয়ালের একটা সুইচ টিপে দেখলেন, এখনও লোডশেডিং।

কাকাবাবুর পক্ষে নিঃশব্দে চলার কোনও উপায় নেই। ক্রাচের শব্দ হবেই। এত রাত্তিরে যেন বেশি জোর শব্দ হচ্ছে খট-খট করে।

বিমানদের ঘরের দরজা খুলে গেল।

বিমান মুখ বাড়িয়ে বলল, "কে ? কে ?"
কাকাবাবু বললেন, "আমি।"
"এ কী, কাকাবাবু ! কোথায় যাচ্ছেন ?"
"একটু ভূত দেখে আসি।"
"অ্যাঁ ? কী বললেন ?"
"ছাদে একটা শব্দ হচ্ছে। যদি ভূত-টুত হয়, তা হলে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করে আসি।"
"না, না, কাকাবাবু, এত রাত্তিরে ছাদে যাবেন না।"
"ঘুম আসছে না। আমার একটু পায়চারি করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"
"দাঁড়ান, তা হলে আমিও যাব আপনার সঙ্গে। চটিটা পরে আসছি !"
পাশ থেকে দীপা বলল, "আমি একলা এই অন্ধকারের মধ্যে থাকব নাকি ? ওরে বাবা রে, না, কিছুতেই না !"
বিমান বলল, "তা হলে তুমিও চলো।"
দীপা বলল, "আমি এখন কিছুতেই ছাদে যেতে পারব না। তোমাদেরও যেতে হবে না !"
কাকাবাবু বললেন, "বিমান, তুমি থাকো। আমি আগে দেখে আসছি। কোনও চিন্তা নেই।"
বিমান তবু চেষ্টা করল কাকাবাবুকে থামাবার। কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন।
টর্চের আলো ফেলে-ফেলে তিনি দেখছেন। খানিকটা পরে অসিতের ঘর। কাকাবাবু একবার ভাবলেন, অসিত যদি জেগে থাকে, তা হলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। দরজাটা ঠেলা দিলেন আলতো করে। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। শব্দ শুনে অসিত জাগেনি, তার গাঢ় ঘুম।
ছাদে ওঠার সিঁড়িটার কাছে এসে কাকাবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর ক্রাচের আওয়াজ আর বিমানের কথাবার্তা শুনে চোরের সজাগ হয়ে যাওয়ার কথা। সে যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাতে চায়, কাকাবাবুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাবে। সে ইচ্ছে করেও কাকাবাবুকে ঠেলে দিতে পারে।
কাকাবাবু এবার রিভলভারটা বার করে তৈরি রাখলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। সামান্য একটা চোর ধরার জন্য এতটা ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। কিন্তু এই ধরনের উত্তেজনা বোধ করতে কাকাবাবুর ভাল লাগে।
ছাদের দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। যদি দরজার পাশেই কেউ লুকিয়ে থাকে, সেইজন্য কাকাবাবু টর্চ দিয়ে দেখে নিলেন ভাল করে। একটা ক্রাচ বাড়িয়ে দিলেন প্রথমে। কেউ কিছু করল না।
এবার কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন ছাদে।
কেউ কোথাও নেই। শব্দটা থেমে গেছে অনেক আগেই। এত বড় ছাদ

যে, অন্য দিক দিয়ে পাঁচিল টপকে কারও পক্ষে পালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ।

ছাদের ঘর সাধারণত সিঁড়ির পাশেই থাকে। এটা কিন্তু তা নয়। সিঁড়ি থেকে অনেকটা দূরে, মাঝামাঝি জায়গায় বেশ বড় একটা ঘর। এক সময় যত্ন করে তৈরি করা হয়েছিল। চার-পাঁচখানা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, তারপর দরজা। কাকাবাবু সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে আন্দাজ করলেন যে, এই ঘরটার প্রায় নীচেই দোতলায় তাঁর ঘর।

এ-ঘরের দরজাটা বেশ শক্তপোক্ত রয়েছে এখনও। আগেকার দিনের কায়দা অনুযায়ী সেই দরজার তলার দিকে একটা শিকল, ওপর দিকে একটা শিকল। দুটো শিকলেই তালা দেওয়া। পেতলের বেশ বড় তালা।

কেউ একজন এই শিকল খোলার ও তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।

কাকাবাবু টর্চ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সিঁড়ির নীচটা ভাল করে দেখলেন। বৃষ্টিতে ছাদে জল জমেনি বটে, তবে অনেক দিনের পুরু ধুলো ভিজে দইয়ের মতন হয়ে আছে। তার ওপর পায়ের ছাপ।

কাকাবাবু যদি শার্লক হোম্‌সের মতন গোয়েন্দা হতেন, তা হলে সেই পায়ের ছাপ মাপবার চেষ্টা করতেন বসে পড়ে। কিন্তু ওসব তাঁর ধাতে পোষায় না। তিনি শুধু লক্ষ করলেন, আসা ও যাওয়ার দু'রকমের ছাপ। যে এসেছিল, সে এসেছিল পা টিপে-টিপে, গোড়ালির ছাপ পড়েনি। আর যাওয়ার সময় গেছে দৌড়ে। একটু দূরে গিয়েই মিলিয়ে গেছে, সেখানটায় শ্যাওলা।

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন, বিমানের পাগলাদাদু বেশ ভালই থাকবার জায়গা পেয়েছিল। এই ঘরটাই এ-বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘর বলা যায়। চতুর্দিক খোলা। আজ যদি জ্যোৎস্না থাকত, তা হলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যেত।

কাকাবাবু নীচে নেমে আসার পরই বিমানের গলা শোনা গেল। সে দরজার কাছেই ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "কী হল কাকাবাবু?"

কাকাবাবু হালকা গলায় বললেন, "ভূত দেখা আমার ভাগ্যে নেই। তোমার পাগলাদাদুকে দেখা গেল না। ওখানে কেউ নেই।"

॥ ৪ ॥

সকালবেলা চায়ের পাট শেষ করার পর বিমান বলল, "চলুন, এবার আপনাদের সারা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখানো যাক। প্রথমে কোনদিকে যাবেন? নীচের তলা থেকে শুরু করব?"

অসিত বলল, "না, না, আগে ছাদের ঘরটা দেখব। ওই ঘরটা সম্পর্কে এমন গল্প বলেছেন যে, কৌতূহলে ছটফট করছি।"

দীপা বলল, "সেই ভাল। আগে ছাদটা ঘুরে আসা যাক।"

বিমান তার ব্যাগ থেকে একটা চাবির তোড়া বার করল। তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা চাবি।

অসিত ভুরু তুলে বলল, "এত চাবি ?"

বিমান বলল, "আগে তো সব ঘরের জন্যই তালা-চাবি লাগত। এখন অবশ্য অনেক চাবিই কাজে লাগে না।"

দীপা বলল, "কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল। ছাদে তো তালা লাগাতে পারোনি !"

বিমান বলল, "ছাদের দরজার একটা পাল্লা যে ভাঙা !"

অসিত বলল, "অ্যাঁ ! কাল চোর এসেছিল ? কখন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন রাত প্রায় দুটো।"

অসিত বলল, "আমি কিছু টের পাইনি তো ! একবার ঘুমিয়ে পড়লে আমার আর ঘুম ভাঙে না।"

সবাই মিলে চলে এল ছাদে। আগের দিন অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলে পরের দিনের সকালটা বেশি ফরসা দেখায়। ঝকঝক করছে রোদ। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে।

একদিকের ছাদের কার্নিসে একটা বেশ বড়, খয়েরি রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখি বসে আছে চুপটি করে।

দীপা জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী পাখি ?"

কাকাবাবু বললেন, "ইষ্টকুটুম।"

দীপা বলল, "কী সুন্দর পাখিটা ! ইষ্টকুটুমের নামই শুনেছি, দেখিনি কখনও। ওর একটা ছবি তুলে রাখব, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। দেখবেন যেন পাখিটা উড়ে না যায় !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সে-দায়িত্ব কিন্তু আমরা নিতে পারব না।"

দীপা ক্যামেরা আনবার জন্য নীচে ছুটে যেতেই পাখিটা উড়ে চলে গেল !

বিমান বলল, "যাঃ—"

অসিত পাখির দিকে মনোযোগ দেয়নি। সে এগিয়ে গেল ঘরটার দিকে। কাকাবাবু তার পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে অ্যান্টিকের ব্যবসা করেন, আপনার কি কলকাতায় কোনও দোকান আছে ?"

অসিত বলল, "না। দোকান-টোকানে বসা আমার পোষায় না। লন্ডনের এক অ্যান্টিক ডিলারের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ আছে। আমি নানা দেশ ঘুরে-ঘুরে খাঁটি জিনিস জোগাড় করি। সে বিক্রি করে। অস্ট্রেলিয়াতেও একটা দোকানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, ওরা খুব কেনে।"

বিমান চাবির তোড়া থেকে এই পাগলাদাদুর ঘরের তালার চাবি খুঁজছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই ঘরটায় এত বড় আর শক্ত পেতলের তালা কেন ? অন্য ঘরে তো দেখিনি !"

বিমান বলল, "কী জানি ! অনেকদিন ধরে এখানে এ-তালাই ছিল, তাই রয়ে গেছে। এ-ঘরটায় দামি জিনিস কিছু না থাকলেও একটা খাট আছে, একটা অনেকগুলি ড্রয়ারওয়ালা টেবিল আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "খাট আছে ? বাঃ, তা হলে আজ রাত্তিরে আমি এ-ঘরেই থাকব।"

বিমান বলল, "না, না, তা হয় নাকি ? ছাদের ওপর আপনি একা-একা থাকবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এটাই তো এ-বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ঘর। আমার এখানেই থাকতে ভাল লাগবে। খাট যখন আছে, একটা তোশক আর বালিশ এনে দিলেই চলবে।"

অসিত বলল, "থাকার পক্ষে এই ঘরটা কিন্তু সত্যিই আইডিয়াল !"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমি কিন্তু আগে বুক করেছি।"

অনেকগুলো চাবি লাগিয়ে-লাগিয়ে দেখার পর ঠিক-ঠিক দুটো চাবি খুঁজে পাওয়া গেল। বিমান পেতলের তালা দুটো খুলছে। কাকাবাবু দেখলেন, সিঁড়ির নীচে একটা ইট পড়ে আছে, তালার গায়েও খানিকটা ইটের গুঁড়ো লেগে আছে। কাল যে চোর এসেছিল, সে এই ইট মেরে তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।

দরজার ওপর আর নীচের শিকল খুলে একটা ধাক্কা মারার পর ভেতর থেকে একটা পচা গন্ধ বেরিয়ে এল।

বিমান একটা ভয়ের শব্দ করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "তোমার পাগলাদাদু এই ঘরে মরে পচে ছিলেন, তুমি কি ভাবছ, সেই গন্ধ এখনও আছে ? তারপর তো এই ঘরে অনেকে ঢুকেছিল, তুমিই বলেছ !"

অসিতের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বিমান লজ্জা পেয়ে বলল, "আমি নিজেই তো চার-পাঁচবার ঢুকেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও ইঁদুর-টিঁদুর মরে আছে।"

অসিত বলল, "জানলাগুলো সব বন্ধ। খুলে দিলে হাওয়া আসবে।"

এই সময় ছাদের দরজার কাছে ভানু নামের কাজের লোকটি এসে ডাকল, "দাদাবাবু !"

বিমান মুখ ফিরিয়ে দেখল, ভানুর সঙ্গে আর-একজন লোক এসেছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কাঁধে ঝোলানো একটি ব্যাগ।

কাকাবাবু ঘরটার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, বিমান তাঁকে ডেকে বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। এর নাম ব্রজেন হালদার। আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই গ্রামের স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। আপনি আসবেন শুনে ও খুব ধরেছিল আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে

দেওয়ার জন্য। আপনার খুব ভক্ত।"

কাকাবাবু সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন।

ইংরেজি মাস্টারটি ছুটে এসে কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর গদগদ স্বরে বলল, "আপনিই কাকাবাবু! সন্তু কোথায়?"

কাকাবাবু বিব্রতভাবে পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "সন্তু আসেনি।"

ব্রজেন বলল, "সন্তুকে ছাড়া আপনি কোথাও যান নাকি? আমার ধারণা ছিল, সন্তু সব সময় আপনার সঙ্গে থাকে।"

বিমান বলল, "সন্তুর এখন পরীক্ষা চলছে, সে আসতে পারেনি।"

ব্রজেন চোখ বড় করে বলল, "সন্তু পরীক্ষাও দেয়? অন্য ছেলেদের মতন?"

বিমান বলল, "কেন, সন্তু পরীক্ষা দেবে না কেন?"

ব্রজেন বলল, "আমার ধারণা ছিল, সন্তু একটা গল্পের চরিত্র, তাকে পরীক্ষা-টরিক্ষা দিতে হয় না। সে সব সময় অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ায়।"

কাকাবাবু ও বিমান দু'জনেই হেসে উঠলেন।

বিমান বলল, "সন্তু গল্পের চরিত্র হবে কেন? সন্তু আমাদের পাড়ায় থাকে, বাচ্চা বয়েস থেকে তাকে চিনি।"

ব্রজেন কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এতদিন ধারণা ছিল, কাকাবাবু বলে সত্যিকারের কেউ নেই। লেখকদের বানানো ব্যাপার। বিমান যখন প্রথম বলল, "আপনি এখানে আসবেন, আমি বিশ্বাসই করিনি।"

বিমান বলল, "ছুঁয়ে দেখবি নাকি সত্যি কি না!"

ব্রজেন বলল, "ইস, আমার ছেলেটাকে আনলাম না। আমার ছেলে একেবারে পাগলের মতন আপনার ভক্ত। ও আপনার অটোগ্রাফ নিলে কত খুশি হত! একটা কথা বলব, 'সার? একবার দয়া করে আমাদের বাড়িতে যাবেন? সামান্য, পাঁচ মিনিটের জন্য?"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, বিকেলের দিকে আমরা একবার বেড়াতে বেরোব। তখন তোমার বাড়িটাও ঘুরে আসব। তোমার বাড়িতে একবার আচারের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি খেয়েছিলাম, মনে আছে, দারুণ লেগেছিল। সেইরকম মুড়ি খাওয়াবে?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! মুড়ির মতন সামান্য জিনিস, তা কি উনি খাবেন?"

"হ্যাঁ, খাবেন। কাকাবাবু মুড়ি ভালবাসেন। আর কোনও খাবার-টাবার রাখার দরকার নেই কিন্তু।"

কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাল ব্রজেন। কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, যাব।"

ব্রজেন বলল, "আমার বাড়ি খুব কাছে। এখান থেকে দেখা যায়। আসুন, দেখবেন।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে। বিকেলবেলা তো যাচ্ছিই!"

ব্রজেন তবু বলল, "কাকাবাবুকে আমার বাড়িটা দেখিয়ে রাখি।"

প্রায় জোর করেই ব্রজেন ওদের নিয়ে গেল পাঁচিলের দিকে। পেছন দিকে পদ্মফুলে ভরা দিঘিটার ডান পাশে অনেক গাছপালা, প্রায় জঙ্গলের মতন। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ব্রজেন বলল, "ওই যে দেখুন, শিমুলগাছটার ফাঁক দিয়ে..."

বাড়িটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, তবু কাকাবাবু ও বিমান একসঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

ব্রজেন বলল, "আমাদের ওখান থেকে এই বাড়িটাকে মনে হয় একটা পাহাড়ের মতন। দিগন্ত ঢেকে থাকে। এই বাড়িটার জন্যই আমাদের গ্রামের অনেক নাম। কত দূরদূর থেকে লোকে এই বাড়িটা দেখতে আসে। এত বিখ্যাত বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে, ছি ছি, কী লজ্জার কথা বলুন তো! আমার যদি সেরকম টাকা থাকত, আমি এ-বাড়িটা কিনে নিতাম।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা সত্যিই খুব দুঃখের কথা। তবে বাড়িটা তো ভেঙেই পড়ছে ক্রমশ।"

ব্রজেন বলল, "ঐতিহাসিক বাড়ি! এখানে আলিবর্দি আর সিরাজদ্দৌল্লা এসে থেকে গেছেন!"

বিমান বলল, "এসব আবার তুমি কোথা থেকে পেলে?"

ব্রজেন বলল, "নবাব আলিবর্দির আমলের বাড়ি নয় এটা? বর্গির হাঙ্গামার সময় নবাব আলিবর্দি তাঁর নাতিকে নিয়ে একসময় পালিয়ে এসেছিলেন এদিকে। এ-বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন।"

বিমান হেসে বলল, "এসব গালগল্প। কোনও প্রমাণ নেই।"

ব্রজেন জোর দিয়ে বলল, "রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অনেকেই যে এসেছিলেন, তা নিশ্চয়ই জানো!"

বিমান বলল, "তা যাই বলো। এ-বাড়ি মেরামত করার সাধ্য আমার নেই।"

ব্রজেন বেশি কথা বলতে ভালবাসে। সে বাড়িটা সম্পর্কে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। কাকাবাবু খানিকটা অস্থির বোধ করলেন।

দীপা ফিরে এসে বলল, "এই ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ? খুঁজেই পেলাম না!"

বিমান বলল, "তোমার পাখি কবে উড়ে গেছে। আর ক্যামেরা দিয়ে কী হবে?"

দীপা বলল, "তবু বলো না ক্যামেরাটা কোথায়? আমি ছাদে তোমাদের ছবি তুলব।"

এই সময় ঘরটার মধ্যে ঘটাং করে একটা জোর শব্দ হল।

বিমান বলল, "এই যে. ওখানে মেঝের অনেক পাথর আলগা আছে। দীপা,

দ্যাখো তো, অসিতবাবুকে একটু বলে দাও।"
দীপা ঢুকে গেল সেই ঘরের মধ্যে।
ব্রজেন প্রসঙ্গ পালটে বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আপনার 'উল্কা রহস্য'-এর প্রথম দিনে আপনি যে জাটিঙ্গা পাখিদের কথা বলেছিলেন, পরে সেই পাখিদের রহস্য সম্পর্কে তো আর কিছু জানা গেল না। পাখিগুলো আগুন দেখলে ইচ্ছে করে ঝাঁপ দেয় কেন?"
কাকাবাবু বললেন, "জাটিঙ্গা পাখিদের রহস্যের কোনও মীমাংসা এখনও হয়নি।"
বিমান বলল, "আচ্ছা ব্রজেন, বিকেলে তো তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিই। তখন এসব কথা আলোচনা হবে। এখন আমাদের কিছু কাজ আছে।"
ব্রজেন বলল, "ছি, ছি, হঠাৎ এসে তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম। এই ছাদটা আমার খুব ভাল লাগে। রঘুদাকে বলে মাঝে-মাঝে আমি এখানে এসে বসে থাকি। আচ্ছা, আসি তা হলে এখন। বিকেলে কিন্তু ঠিক আসতে হবে!"
ব্রজেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পর বিমান বলল, "আমি ছোটবেলায় যখন মামার বাড়ি আসতাম তখন ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল। আমরা একই বয়েসী।"
কাকাবাবু বললেন, "চলো, এবার তোমার পাগলাদাদুর ঘরটা দেখা যাক।"
ঘরটা খুব ছোট নয়। এক সময় বেশ যত্ন করেই তৈরি করা হয়েছিল। মেঝেতে শ্বেতপাথরের টালি বসানো। সেগুলো মাঝে-মাঝে ভেঙে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে এখন। একপাশে একটা বড় খাট পাতা। কয়েকটা ঘুণ-ধরা কাঠের বাক্স। সারা ঘরে ছড়ানো ছেঁড়া পুঁতির মালা, ঝিনুক, ছোট-ছোট শাঁখ, প্রচুর ছেঁড়াখোঁড়া বই, পুরনো খবরের কাগজ, কয়েকটা ম্যাপ।
অসিত ঘরের একটা জানলা খুলে দিয়েছে, তাতেই প্রচুর রোদ এসেছে। পচা গন্ধটা নেই।
বিমান জিজ্ঞেস করল, "ইঁদুরটা দেখতে পেলেন?"
দীপা ভয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "ইঁদুর! ইঁদুর কোথায়?"
অসিত হেসে বলল, "না, না, ইঁদুর টিদুর দেখতে পাইনি। ওটা আসলে বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ!"
দীপা বিরক্তভাবে বলল, "এই রাজ্যের ঝিনুক-মিনুকগুলো ঘরের মধ্যে জমিয়ে রেখেছ কেন তোমরা এতদিন? ঝেঁটিয়ে বার করে দেওয়া উচিত ছিল।"
বিমান বলল, "যদি এর মধ্যে কোনওটা দামি হয়, সেইজন্য কেউ ফেলেনি।"
অসিত একটা ঝিনুক তুলে নিয়ে জোর করে টিপে ভেঙে ফেলল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, "এগুলো অতি সাধারণ। কোনও দাম নেই।"
কাকাবাবু একটা ছেঁড়া বই তুলে নিয়ে দেখলেন, সেটা একটা শেক্‌সপীয়রের

নাটক। সামনের দিকের অনেক পাতা নেই।

বিমান বলল, "আপনার কী মনে হয়, অসিতবাবু, এ ঘরে কোনও দামি জিনিস থাকতে পারে? বহুবার সার্চ করে দেখা হয়েছে। আমার বড়মামা মেঝে খুঁড়ে-খুঁড়েও দেখেছেন। কেউ কিছু পায়নি।"

অসিত বলল, "দামি জিনিস কিছু থাকলেও অন্য কেউ আগেই নিয়ে নিয়েছে। এখন যা পড়ে আছে, সবই রদ্দি জিনিস। আবর্জনা। মোটামুটি সবই তো দেখলাম।"

দীপা বলল, "মার্বেলের টালিগুলোর কিছু দাম হতে পারত, তাও তো সবই প্রায় ভাঙা।"

বিমান বলল, "কাকাবাবু, আপনি এই ঘরে থাকবেন বলছিলেন? দেখলেন তো কিরকম নোংরা!"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। একটু ঝাঁট-টাঁট দিয়ে নিলেই চলবে। চতুর্দিকে জানলা। সবক'টা খুলে দিলে..."

অসিত হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওই বন্ধ জানলাটার কাছে ওটা কী দেখুন তো? চকচক করছে?"

সবাই ফিরে তাকাল। সত্যি, যে-জানলাটা খোলা, তার ঠিক উলটো দিকের জানলাটার পাশে কী যেন চকচক করছে হিরের মতন।

অসিত সেদিকে এগোবার আগেই কাকাবাবু বললেন, "আমি দেখছি।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে দু' পা এগোলেন কাকাবাবু। তৃতীয়বার একটা ক্রাচ একটা পাথরের ওপর ফেলতেই সেটা নড়বড় করতে-করতে সম্পূর্ণ উলটে গেল। তার নীচে একটা বড় গর্ত। ক্রাচটা পিছলে ঢুকে গেল সেই গর্তের মধ্যে। কাকাবাবু তাল সামলাতে পারলেন না। তিনি পড়ে গেলেন, দেওয়ালে খুব জোর ঠুকে গেল তাঁর মাথা। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে তাঁর একটা পা। কিন্তু কাকাবাবু উঠতে পারলেন না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

॥ ৫ ॥

জানলা দিয়ে এসে পড়েছে সকালের আলো। কাছেই ডেকে চলেছে একটা চিল। অনেক দূরে কারা যেন কথা বলছে। খুব মিষ্টি এক ঝলক বাতাসের স্পর্শে কাকাবাবু চোখ মেলে তাকালেন।

প্রথমে তিনি বুঝতেই পারলেন না, এটা কোন দিন। তিনি কতক্ষণ শুয়ে আছেন। মাথাটা ভারী মনে হতেই হাত দিয়ে দেখলেন অনেকখানি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তারপর তিনি টের পেলেন তাঁর যে-টা ভাল পা, সেই পা-টাতেও খুব ব্যথা।

ওই পায়ের ব্যথাটার জন্যই কাকাবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। যাঃ, এই পা-টাও ভাঙল নাকি ? তা হলে সারাজীবনের মতন একেবারে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে ?

তিনি ডাকলেন, "বিমান, বিমান !"

ঘরে ঢুকল দীপা।

খাটের কাছে এসে বলল, "আপনার ঘুম ভাঙাইনি। চা দেব ? এখন কেমন লাগছে ? খুব ব্যথা আছে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কী হয়েছিল বলো তো ?"

দীপা চোখ বড়-বড় করে বলল, "উঃ কী কাণ্ড ! যা ভয় পেয়েছিলাম। ছাদের ঘরটায় আপনি পা পিছলে পড়ে গেলেন। পাথরের টালিগুলো সব আলগা হয়ে আছে। একটাতে তো আমিও পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে !"

কাকাবাবু মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "হ্যাঁ, আছাড় খেয়েছিলাম। একটা পাথর উলটে গেল !"

দীপা বলল, "আপনার মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তখনও বুঝতে পারিনি যে পায়ে কিছু হয়েছে। কিন্তু আপনার একটু জ্ঞান ফিরতেই আপনি পা-টা চেপে ধরে আঃ আঃ করতে লাগলেন। মনে হল যেন পায়েই বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে..."

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "কী হয়েছে আমার পায়ে ? কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার ?"

দীপা বলল, "ভাগ্যিস সেরকম কিছু হয়নি। বিমান ঘাবড়ে গিয়ে পানাগড় চলে গেল। এ-গ্রামে ভাল ডাক্তার নেই। একজন বড় ডাক্তার নিয়ে এল পানাগড় থেকে। তিনি আবার অর্থোপেডিক সার্জেন। খুব ভাল করে দেখে বললেন, পায়ে কিছু হয়নি, শুধু বুড়ো আঙুলের নখ আধখানা উড়ে গেছে। সেইজন্যই অত ব্যথা। তবে, আপনার মাথায় তিনটে স্টিচ করতে হয়েছে, রক্ত বেরিয়েছে অনেকটা।"

কাকাবাবু এবার যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "মাথায় তিনটে সেলাই এমন কিছু নয়। পায়ে তা হলে বড়রকমের কোনও ক্ষতি হয়নি।"

"বাঃ, অর্ধেকটা নখ উড়ে গেছে, তাও কম নাকি ?"

"নখ উড়ে গেলে আবার নখ হবে। এটা কবে হয়েছে ? আজ, না কাল, না পরশু ?"

"কাল সকালে।"

"তা হলে তারপর কাল সারা দিন আমি কী করলাম ?"

"বাঃ, এতবড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হল, তারপরও কি আপনি ঘুরে বেড়াবেন নাকি ? আপনার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে ডাক্তার আপনাকে ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়েছিলেন। তার মধ্যেও আপনি জেগে উঠেছিলেন মাঝে-মাঝে।"

"সেসব কিছু মনে পড়ছে না। এমন বিচ্ছিরিভাবে আছাড় খেয়ে তোমাদের খুব বিপদে ফেললাম।"

"আমাদের আবার কী বিপদ ?"

"বিপদ মানে দুশ্চিন্তা।"

"হ্যাঁ, দুশ্চিন্তা তো হয়েছিল খুবই। কিন্তু ডাক্তারটি খুব ভাল। উনি অনেকক্ষণ ছিলেন। আপনার নাম জানেন আগে থেকে। উনি বলে গেছেন যে ভয়ের কিছু নেই। উনি আজ আবার আসবেন।"

"বিমান কোথায় ?"

"বাড়ি ভাঙার লোকজন সব আসতে শুরু করেছে। এ-বাড়ির নতুন মালিকও এসেছে, বিমান তার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটা বলে কী জানেন ? বলল, আপনারা এ-পাশটায় থাকুন, আমরা অন্য-পাশটা ভাঙতে শুরু করে দিই। আমি বলে দিয়েছি, তা চলবে না। আমরা চলে গেলে তারপর ওসব শুরু হোক গে। আমি আওয়াজ সহ্য করতে পারব না।"

এতক্ষণে কাকাবাবুর মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটল।

তিনি বললেন, "বাড়ির একদিকে আমরা থাকব, আর-একটা দিক ভাঙা শুরু হয়ে যাবে, এটা সত্যিই অদ্ভুত। আর বুঝি দেরি করতে পারছে না ?"

এই সময় বিমান ঘরে ঢুকে বলল, "কাকাবাবু ! অল রাইট ? ওফ্ ! আমার এ-বাড়িতে আপনার যদি বড় রকম কোনও ক্ষতি হত, তা হলে সারাজীবন আমার দুঃখের শেষ থাকত না।"

দীপা বলল, "বলেছিলাম না এটা একটা অপয়া বাড়ি। আর ওপরের ওই ঘরটা, ওটা একটা ভুতুড়ে ঘর। ঢুকলেই গা ছমছম করে। ওই ঘরটাই আগে ভেঙে ফেলা উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তা যে কোনও জায়গায় হতে পারে।"

চা এল। কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

বিমান বলল, "অসিত আপনার কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারল না।"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "অসিত চলে গেছে ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, আজ ভোরবেলাই চলে গেল। আমাদের গাড়ি পানাগড়ে গিয়ে ওকে ট্রেন ধরিয়ে দেবে। সেই গাড়িতেই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসবে।"

"কেন, এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন ?"

"ও বলল, আর থেকে তো কোনও লাভ নেই। এ-বাড়ির সব কিছুই ওর দেখা হয়ে গেছে। কলকাতায় কাজও আছে কী একটা।"

"ওর পছন্দমতন জিনিসপত্র কিছু পেল ? ভাল কোনও অ্যান্টিক ?"

"ও বলল, দামি জিনিস কিছু নেই। বড়মামা সবই বেচে দিয়েছে। শুধু কয়েকটা ঘড়ি, বুঝলেন কাকাবাবু, একতলায় গুদামঘরগুলোয় কয়েকটা ভাঙা

দেওয়াল ঘড়ি পড়ে ছিল, একেবারেই অকেজো, ভেতরের কলকব্জা নেই। সেইগুলো দেখে অসিত বলল, পুরনো ঘড়ির কিছু দাম আছে বিদেশে। আমি তো ওগুলো একেবারে ফেলেই দেব ঠিক করেছিলাম। আর একটা ক্যামেরা। আগেকার দিনের একরকম প্লেট ক্যামেরা ছিল, তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে, মাথায় কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে ছবি তোলা হত, সেই ছিল একটা। তা-ও ভাঙা, বহুকাল ব্যবহার করা হয়নি। এই ক্যামেরাও তো ফিল্ম দিয়ে ছবি তোলা যায় না, কাচের প্লেট লাগত, সে-প্লেটও পাওয়া যায় না। ওটাও ফেলে দেওয়ারই জিনিস ছিল। কিন্তু অসিত বলল, "ওটার জন্য এক হাজার টাকা দাম দেবে। আমি অবাক! আর একটা ড্রেসিং টেবিলের হাতল। টেবিলটা নেই, শুধু কাচের হাতলটা পড়ে ছিল, সেটাও ওর পছন্দ। সব মিলিয়ে তিন হাজার টাকা দাম ধরেছে। যা পাওয়া যায় তাই লাভ!"

"ইস, জিনিসগুলো আমার দেখা হল না। সব নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। এক জায়গায় প্যাক করে দেওয়া হয়েছে। তবে আপনাকে বলছি কাকাবাবু, একদমই রদ্দি জিনিস। আমাদের দেশে কেউ এক পয়সাও দাম দিত না। হয়তো বাতিকগ্রস্ত সাহেবরা কিনতে পারে। শুনেছি অস্ট্রেলিয়ানরা এইসব জিনিস বাড়িতে ছড়িয়ে রাখে, যাতে লোকে ভাবে ওদের বংশ অনেক পুরনো।"

"ওপরের ঘরে কিছু পায়নি অসিত?"

"নাঃ! সারা দুপুর ধরে প্রতিটি জিনিস তন্ন-তন্ন করে দেখেছে। প্রতিটি ঝিনুক, পুঁতি, কাচের টুকরো। ওর কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছিল, আর একটা কী যেন চোখে লাগাবার যন্ত্র, সব কিছু দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। সব বাজে জিনিস। শুধু বলল, খাটের চারটে পায়ার কিছু দাম আছে। অনেকরকম লতাপাতার কাজ রয়েছে, ওরকম এখন পাওয়া যায় না। তবে, অসিত কাঠের জিনিস কেনে না। ও বলল, কলকাতায় অ্যান্টিক ডিলাররা এই চারটে পায়ার জন্য অন্তত দু' হাজার টাকা দিতে পারে।"

দীপা বলল, "যাই বলো প্লেট ক্যামেরার দাম আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। আমি শুনেছি, পুরনো ক্যামেরার অনেক দাম হয়।"

বিমান বলল, "আরে, ওই ক্যামেরাটা যে ছিল, তাই তো জানতুম না। একতলার একটা ভাঙা ঘরে অনেক আবর্জনার মধ্যে পড়ে ছিল। অসিতই তো খুঁজে বার করল। অসিত না দেখতে পেলে আমি ওটাকে ক্যামেরা বলে চিনতেই পারতুম না। আর সব বাজে জিনিসের সঙ্গে চলে যেত!"

কাকাবাবু বললেন, "অসিতের বাড়ি গেলে ওই ঘড়ি আর ক্যামেরা দেখতে দেবে নিশ্চয়ই?"

বিমান বলল, "তা দেবে না কেন? ও বলে গেল, আগামী পনেরো তারিখে ওর টিকিট কাটা আছে। লন্ডনে যাবে। তার আগে পর্যন্ত কলকাতাতেই

থাকবে।"

কাকাবাবুর গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর দেওয়া ছিল। সেটা সরিয়ে ফেলে খাট থেকে নামবার জন্য পা বাড়ালেন।

দীপা অমনই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ও কী করছেন ? ও কী করছেন ? নামবেন না !"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন, নামব না কেন ?"

দীপা বলল, "এই অবস্থায় আপনি হাঁটাচলা করবেন নাকি ? না, না, শুয়ে থাকুন।"

কাকাবাবু বললেন, "সামান্য একটু মাথা ফেটে গেছে আর পায়ের আধখানা নখ ভেঙে গেছে বলে আমি শুয়ে থাকব ? এ তো ভারী আশ্চর্য কথা !"

বিমান বলল, "কাকাবাবুকে তুমি আটকাতে পারবে না। এর চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় কাকাবাবু পাহাড়ে পর্যন্ত উঠেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আধ ঘন্টার মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তারপর ছাদের ঘরে যাব। সে ঘরটা তো আমার দেখাই হয়নি !"

ঠিক আধ ঘন্টা পরে কাকাবাবু পোশাক বদলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বগলে ক্রাচ কিন্তু খালি পা।

বিমানকে দেখে বললেন, "ব্যথার জন্য পায়ে জুতো পরতে পারলাম না। আমার রবারের চটিটাতেও সুবিধে হচ্ছে না। তোমাদের একজোড়া চটি দিতে পারো ?"

বিমানের চটি পায়ে গলিয়ে কাকাবাবু উঠে এলেন ছাদে। বিমান তাড়াতাড়ি তালা খুলে দিল। ঘরের একটা জানলা খোলাই ছিল, রাত্তিরে সেখান থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসেছে, মেঝেতে একটু একটু জল জমে আছে।

কাকাবাবু প্রথমেই ভাঙা পাথরটার দিকে তাকালেন।

পাথরটা আর ঠিকমতন লাগানো হয়নি, সেখানে একটা গর্ত। এই ঘরের মেঝেতে কোনও দামি জিনিস পোঁতা আছে কি না তা জানার জন্য গর্ত খুঁড়েও দেখা হয়েছিল। গর্তটার ওপরে পাথরখানা ঠিক মাপমতন বসেনি।

বিমান বলল, "সাবধান, কাকাবাবু, আরও অনেক পাথর আলগা আছে !"

কাকাবাবু বললেন, "এরকম বাজে অ্যাকসিডেন্ট আমার কখনও হয়নি।"

তারপর তিনি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

দীপা জিজ্ঞেস করল, "এত যে সব বইটই রয়েছে, এগুলোর কোনও দাম নেই ?"

বিমান বলল, "এসব ছেঁড়াখোড়া বই কে কিনবে ? কিলো দরে পুরনো কাগজওয়ালার কাছে বিক্রি করতে পারো, কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে ?"

দীপা একটা বই তুলে নিয়ে বলল, "এই বইটা তো তেমন ছেঁড়েনি। মলাট

ঠিক আছে।"

বিমান বলল, "ওখানা তো বাইবেল ! বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। বড়-বড় হোটেলের প্রত্যেক ঘরে একখানা করে বাইবেল থাকে, খুব সুন্দর ছাপা আর বাঁধাই, যে-খুশি নিয়ে যেতে পারে।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পাশে রেখে মেঝেতে বসে পড়লেন। চারদিকে ঝিনুক আর পুঁতির মালা ছড়ানো। আগে তিনি দেখতে লাগলেন বইগুলো। অনেকগুলোই বাইবেল। ইংরিজিতে আর পর্তুগিজ ভাষায়। কিছু ধর্মের বই। কিছু পত্রপত্রিকা। বেশ কয়েকটি নাটক। অনেক বইয়ের পাতা ছেঁড়া। এসব বইয়ের সত্যিই কোনও দাম নেই। কিছু হাতের লেখা কাগজও রয়েছে। সেগুলো কিছুই প্রায় পড়া যায় না। বিমানের খ্রিস্টান দাদুও বোধ হয় পাগল অবস্থায় এসব লিখেছিলেন।

দীপা পুঁতির মালা কয়েকটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছে। বিমান বলল, "আর কতবার দেখবে ? অনেকবার তো দেখেছ ? ওগুলো খুবই সাধারণ। কোনও দাম নেই।"

কাকাবাবু কয়েকটা ঝিনুক তুলে নিয়ে দেখলেন। খাটের নীচে, ঘরের কোণে কোণে রাশিরাশি ঝিনুক।

দীপা বলল, "পাগলাদাদু ঝিনুক কুড়িয়ে-কুড়িয়ে মুক্তো খুঁজতেন বোধ হয়। দু-একটা মুক্তোটুক্তো আমাদের জন্য রেখে যেতে পারলেন না ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই ঘর থেকে কোনও দামি জিনিস আগে পাওয়া গেছে কি ?"

বিমান বলল, "আমি যতদূর জানি, কিছুই পাওয়া যায়নি।"

কাকাবাবু একটা কালো রঙের চৌকো ছোট বাক্স দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটার মধ্যে কী ছিল ?"

দীপা ঠোঁট উলটে বলল, "ওটাও তো আমি খালিই দেখেছি। ভেতরে একটা মোহর-টোহরও নেই। একটা প্লাস্টার অব প্যারিসের যিশু মূর্তি ছিল, তাও ভাঙা।"

কাকাবাবু বাক্সটা খুলে দেখলেন, খুবই পুরনো বাক্স, ভেতরটায় একসময় লাল ভেলভেটের লাইনিং ছিল, এখন তা কুচি-কুচি হয়ে গেছে।

দীপা বলল, "দেখলে মনে হয় গয়নার বাক্স।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম এক বাক্সভর্তি গয়না থাকলে তা তো আগে থেকে হাওয়া হয়ে যাবেই। তা ছাড়া গির্জার পাদ্রির সঙ্গে উনি থাকতেন, গয়না পাবেন কোথায় ?"

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, জানলার কাছে একটা খুব চকচকে জিনিস দেখে এগোতে গিয়ে আমি যে আছাড় খেয়ে পড়লাম, সেটা কী ছিল ?"

বিমান বলল, "সেটাও কিছুই না। একটা প্রিজ্‌মের টুকরো। রোদ পড়ে সেটা ঝকঝক করছিল।"

দীপা বলল, "ওই যে কতকগুলো লম্বা-লম্বা ম্যাপ রয়েছে, ওগুলোর কোনওটার মধ্যে কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত নেই তো? উনি বলতেন কেন যে ওঁর কাছে সাত রাজার ধন এক মানিক আছে?"

বিমান বলল, "ওসব পাগলের প্রলাপ। যার কাছে সত্যিকারের দামি জিনিস থাকে, সে কি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে? ম্যাপগুলো হাতে আঁকা নয়, সাধারণ ছাপা ম্যাপ। এ-ম্যাপ সব জায়গায় পাওয়া যায়।"

একটা লম্বা করে গোটানো ম্যাপ সে তুলে দিল কাকাবাবুর হাতে। কাকাবাবু দেখলেন, সেটা গোয়া, দমন আর দিউ এই তিন জায়গার ম্যাপ। ওইগুলি ছিল পর্তুগিজ কলোনি। দুটো একই রকম ম্যাপ পশ্চিম ইউরোপের। কোনও ম্যাপেই কিছু আলাদা দাগটাগ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যে গুপ্তধনের সঙ্কেত থাকলেও তা বোঝার সাধ্য নেই আমাদের।"

বিমান বলল, "ছোটবেলায় আমার পাগলাদাদুর গলায় ঝোলানো একটা সোনার ক্রস দেখতাম। সেটাই বোধ হয় ওঁর একমাত্র দামি জিনিস ছিল। সেটা উনি গলা থেকে কক্ষনো খুলতেন না। মাঝে-মাঝে তিনি সেটায় চুমু খেতেন।"

দীপা বলল, "সেটা কে নিল?"

বিমান বলল, "কে জানে কে নিয়েছে! ওঁর মৃত্যুর সময় তো আমি এখানে ছিলাম না!"

কাকাবাবু বললেন, "বসো, এ-ঘরের সব কিছু দেখা হয়ে গেছে। এবার নীচে যাওয়া যাক! একটা মজার ব্যাপার কী জানো, পরশুদিন রাত্তিরবেলা আমি এই ছাদে একা-একা ঘুরে গেলাম, তখন ভূতের দেখা পেলাম না। অথচ দিনের বেলা এই ঘরের মধ্যে আমাকে ভূতে ঠেলা মারল?"

দীপা চমকে উঠে বলল, "আপনাকে ভূতে ঠেলা মেরেছে!"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "তবে কি আমি এমনি-এমনি পড়ে গেলাম?"

দীপা বলল, "না, না, আমি তো আপনার পাশেই ছিলাম। কেউ আপনাকে ঠেলা মারেনি।"

নীচে নেমে আসার পর খবর পাওয়া গেল যে পানাগড় থেকে ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ডাক্তারের নাম শিবেন সেনশর্মা, বয়েস বেশ কম, সুন্দর চেহারা। কাকাবাবুকে দেখে বলল, "এ কী, আপনি হাঁটাচলা শুরু করেছেন? পায়ের আঙুলে ব্যথা নেই?"

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ। ব্যথা আছে। তবে শুয়ে থাকলে ব্যথার কথাটা বেশি মনে পড়ে।”

ডাক্তার কাকাবাবুর মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করল, আবার বেঁধে দিল নতুন ব্যাণ্ডেজ। তারপর পা দেখে একটু চিন্তিতভাবে বলল, “আঙুলটা একটু ফুলেছে কেন? আর একটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে। আপনার কিন্তু এইরকম পা নিয়ে এখন হাঁটাচলা করা উচিত নয়। একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।”

দীপা বিমানকে বলল, “চলো, কাল আমরা কলকাতায় ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কী হবে?”

বিমান বলল, “চলো, আমার আপত্তি নেই। নতুন মালিক বাড়িটা ভাঙার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে...”

ডাক্তার হাত ধুতে-ধুতে বলল, “এই বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে... আচ্ছা, আপনাদের পরিবারে একটা চুনির মালা ছিল, যেটা নবাব সিরাজদ্দৌল্লা উপহার দিয়েছিলেন আপনাদের এক পূর্ব পুরুষকে, সেটা একবার দেখতে পারি?”

বিমান ভুরু তুলে বলল, “নবাব সিরাজদ্দৌল্লার দেওয়া চুনির মালা? আমি কখনও শুনিনি তো সে মালার কথা!”

ডাক্তার বলল, “সে কী! আমি আমাদের বাড়িতে গল্প শুনেছি। আপনাদের বাড়িতে একজন ক্রিশ্চান হয়েছিলেন, তিনি সেই মালাটা চুরি করে পালিয়েছিলেন। তারপর গোয়াতে গিয়ে সেটা বিক্রি করতে যেতেই ধরা পড়ে যান। তাই না?”

বিমান হেসে বলল, “ওসব গল্পই। ক্রিশ্চানদাদু কিছু চুরি করেননি। গোয়াতে গিয়ে ধরাও পড়েননি।”

ডাক্তার বলল, “তিনি তো পাগল হয়ে গিয়েছিলেন? এ বাড়িতে এসে আবার কী করে সেই মালাটা হাতিয়ে লুকিয়ে ফেলেন।”

দীপা বলল, “সেটাই তবে সাত রাজার ধন এক মানিক। নবাব সিরাজের দেওয়া চুনির মালা!”

বিমান বলল, “ধ্যাত! আমি কোনওদিন সেরকম মালার কথা শুনিনি। আমার মা'র কাছেও শুনিনি।”

ডাক্তার বলল, “আমাদের এদিকে কিন্তু অনেকেই শুনেছে। 'কান্না আর রক্ত' নামে একটা যাত্রা হয়, সেটাতেও আপনাদের এ-বাড়ির চুনির মালার কথা আছে। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা মালাটা আপনাদের এক পূর্বপুরুষের বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন। সিরাজকে যেদিন মেরে ফেলা হয় মুর্শিদাবাদে, সেদিন আপনাদের এই বাড়িতে মালাটা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছিল!”

কাকাবাবুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

বিমান বলল, “গাঁজাখুরি গল্প আর কাকে বলে!”

ডাক্তার বলল, "কান্না-টান্নার ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই বানানো। কিন্তু একরকম একটা ঐতিহাসিক মালা আপনাদের এখানে বোধ হয় সত্যিই ছিল। সেটার খোঁজ পাননি ? আপনার পাগলাদাদু তো ছাদের ওপরে একটা ঘরে থাকতেন। সেই ঘরটা খুঁজে দেখেছেন ভাল করে ?"

বিমান কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কি খুঁজতে কিছু বাকি আছে ? আমার আগে আরও কতজন ও ঘরের সব কিছু ওলোট-পালোট করে দেখেছে !"

দীপা বলল, "তবু, মনে করো, ওই ঘরে যদি অত দামি জিনিসটা থেকে যায় ? আমরা চলে যাব... নতুন মালিক এসে বাড়ি ভাঙার সময় যদি পেয়ে যায় সেটা ? তা হলে কি আর আমাদের দেবে ?"

বিমান এবার খানিকটা বিরক্তভাবে বলে উঠল, "বলেছি ওরকম কিছু দামি জিনিস এখানে নেই। কোনও এক সময় থাকলেও বড়মামা সব বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। ঠিক আছে, সন্দেহ মেটাবার জন্য ছাদের ঘরটা আজ আমি নিজেই ভাঙব। লোক ডাকিয়ে দেয়াল ভেঙে, মেঝের পাথর সরিয়ে দেখা হবে ! তারপর নিশ্চিন্ত হবে তো !"

॥ ৬ ॥

পরদিন কলকাতায় ফেরার পথে কাকাবাবুর একটু-একটু জ্বর হল।

বিমান আর দীপা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। মাথায় আর পায়ে চোট লাগার পর প্রথম দু'দিন জ্বর আসেনি, এখন হঠাৎ জ্বর হল কেন ? সেপটিক-টেপটিক হয়নি তো !

কাকাবাবু বললেন, "না, না, চিন্তার কিছু নেই। ছাদের ঘরটা যখন ভাঙা হচ্ছিল, তখন প্রচুর ধুলো উড়ছিল তো। ধুলোতে আমার অ্যালার্জি আছে, তার জন্যই জ্বর হয়েছে। কমে যাবে একদিন বাদেই।"

বিমান বলল, "দেখলেন তো, শুধু-শুধু ছাদের ঘরটা ভাঙাতে হল আমাকে। আমার পয়সা খরচ হল, পাওয়া গেল কিছু ?"

দীপা বলল, "মারবেল-টালিগুলো তো পাওয়া গেল কয়েকটা। ওরও কিছু দাম আছে। আগেকার দিনের ইটালিয়ান মারবেল, এখন অনেক দাম।"

বিমান বলল, যাই হোক, এবার এসে মোটামুটি লাভই হল। বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার পরেও পুরনো চেয়ার-টেবিল, কিছু পাথর, কিছু ভাঙা জিনিসপত্র মিলিয়ে আরও প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা পাওয়া যাবে। অসিত ধর যে ভাঙা ক্যামেরা আর ঘড়িগুলো কিনল, সেগুলোর জন্য আমি তো একটা পয়সাও পাব ভাবিনি !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, অসিত ধর কি নবাব সিরাজের দেওয়া

চুনির মালার গল্পটা শুনেছিল ?”

বিমান বলল, “ও-গল্প আমিই তো আগে শুনিনি। বাড়িতে গিয়েই মাকে জিজ্ঞেস করব।”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “যাত্রার গল্পটা বেশ বানিয়েছে। মুর্শিদাবাদে খুন করা হল নবাব সিরাজকে, আর বীরভূমে তোমাদের বাড়িতে তাঁর দুঃখে মালা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।”

দীপা বলল, “রক্ত আর কান্না ! এই যাত্রাটা কলকাতায় এলে আমি দেখব।”

গাড়িতে বাকি রাস্তা আর বিশেষ কিছু কথা হল না। কাকাবাবু জ্বরের ঘোরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাড়ির সামনে পৌঁছবার পরও কাকাবাবুর ঘুম ভাঙেনি। বিমান একটু ঠেলা দিয়ে বলল, “কাকাবাবু, কাকাবাবু, এসে গেছি !”

কাকাবাবু জেগে উঠে বললেন, “ওহ ! খুব ঘুমিয়েছি তো ! তাতেই জ্বরটা কমে গেছে মনে হচ্ছে।”

দীপা বলল, “শরীর দুর্বল লাগছে ? আপনি ওপরে উঠতে পারবেন, না বিমান আপনাকে তুলে দিয়ে আসবে ?”

কাকাবাবু বললেন, “শরীর ঠিক আছে।”

ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, তারপর বললেন, “যাওয়ার সময় অসিত আমাদের সঙ্গে ছিল। ফেরার সময়েও সে সঙ্গে থাকলে ভাল লাগত। সে যে হঠাৎ আগেই ফিরে এল এটা তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি, বিমান ?”

বিমান বলল, “না, না। সত্যি তার একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে কেউ আসবে। আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেনি বলে বারবার ক্ষমা চেয়েছে।”

কাকাবাবু বললেন, “না, না, এতে আর ক্ষমা চাইবার কী আছে। ঠিক আছে, নবাব সিরাজের চুনির হারটা সম্পর্কে তোমার মা কী বলেন আমাকে জানিও !”

বিকেল চারটে, সন্তু এখনও ফেরেনি। কাকাবাবু নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর আর ঘুম এল না, শুয়ে-শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগলেন।

সন্ধের একটু আগেই সন্তু বাড়ি এল। কাকাবাবু ফিরে এসেছেন শুনেই সে ছুটে এল কাকাবাবুর ঘরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন কাকাবাবু।

সন্তু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, ওখানে কী হল, কাকাবাবু ? পুরনো বাড়ি, কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেল ?”

কাকাবাবু এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোর পরীক্ষা কেমন হচ্ছে রে ?”

“বেশ ভালই। সোজা-সোজা কোশ্চেন এসেছে।”

"আর ক'টা পরীক্ষা বাকি আছে ?"

"আর মোটে একটা। কালকেই শেষ !"

"ঠিক আছে, এখন পড়াশোনা কর। কাল পরীক্ষা হয়ে গেলে ওখানকার গল্প বলব।"

"একটুখানি বলো না। ওখানে মারামারি হয়েছিল ?"

"এখন তোর মাথায় ওসব ঢোকাতে হবে না। মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষা শেষ কর। তারপর তোকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।"

সন্তু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু পুলিশ কমিশনার আর হোম সেক্রেটারিকে দুটো ফোন করলেন।

তারপরেই বিমানের ফোন এল।

"আপনার শরীর কেমন আছে, কাকাবাবু ? জ্বরটর বাড়েনি তো ?"

"না না, এখন একদম ভাল হয়ে গেছি। কোনও চিন্তা কোরো না।"

"সেই রক্তঝরা চুনির মালাটার কথা মাকে জিজ্ঞেস করলুম। মা আমাকে আগে বলেননি, এখন মা'র মনে পড়ল। ছোটবেলায় মা ওইরকম একটা মালার কথা শুনেছিলেন। তবে, মা নিজেও সেটা কখনও দেখেননি।"

"তা হলে নবাবের মালা তোমাদের বাড়িতে সত্যিই ছিল ?"

"সত্যিও হতে পারে, গল্পও হতে পারে। মা ও-বাড়ির মেয়ে, মা পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেননি। সেরকম মালা থাকলেও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই সেটা বিক্রি হয়ে গেছে।"

"ওইরকম একটা ঐতিহাসিক মালা কে কিনল ? ওইসব জিনিস আমাদের মিউজিয়মে থাকা উচিত।"

"আমার কিন্তু এখনও ধারণা, ওটা গুজব।"

ফোন রেখে দিয়ে কাকাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। কিছু একটা ধাঁধার যেন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। রাত্তিরে তাঁর ভাল করে ঘুম হল না।

সকালে চা-টা খেয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ট্যাক্সি নিয়ে। এলগিন রোডে অসিত ধরের বাড়ির কাছে এসে থামলেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে তিনি প্রথমে রাস্তা থেকে দেখলেন বাড়িটা। একটু পুরনো ধরনের তিনতলা বাড়ি। একতলায় সামনের দিকে কয়েকটা দোকান। দরজার পাশে তিন-চারটে নেম প্লেট। অসিত ধর থাকেন তিনতলায়।

সামনের গেটটা খোলা। কাকাবাবু সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে এলেন। দোতলায় তিনখানা ফ্ল্যাট, তিনতলায় মোটে একটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা ছোট বারান্দা, পাশের একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় যে বাড়িটার পেছনে ছোট্ট বাগান রয়েছে।

দরজার বেলে আঙুল রাখলেন কাকাবাবু।

অসিত ধর নিজেই দরজা খুলল। কাকাবাবুকে দেখে সে একটুও অবাক হয়নি। হাসিমুখে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আসুন, আসুন। কেমন আছেন এখন ? মাথার চোটটা..."

কাকাবাবু মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছেন কলকাতায় ফেরার আগেই। পায়ের আঙুলে সেলোটেপ জড়ানো, জুতো পরতে গেলে ব্যথা লাগে বলে আজও চটি পরে এসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, "কোনও খবর না দিয়ে এসে পড়লাম।"

অসিত বলল, "তাতে কী হয়েছে ? আমি মোটেই ব্যস্ত ছিলাম না। আসুন, ভেতরে আসুন।"

বসবার ঘরটি জিনসপত্রে ঠাসা। কোনওরকমে মাঝখানে একটা সোফা-সেট রাখা হয়েছে, আর সব দেওয়ালের ধারে-ধারে অনেকরকমের মূর্তি, পাথরের, ব্রোঞ্জের, পেতলের। মাটির ওপর জড়ো করে রাখা আছে প্রচুর স্ট্যাম্পের অ্যালবাম, বই, ছবি। কোনও কিছুই নতুন নয়, সবই পুরনো।

সাদা প্যান্ট আর নীল রঙের একটি টি-শার্ট পরে আছে অসিত, তার চেহারা সুন্দর, যে-কোনও পোশাকে তাকে মানায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অনেককাল ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি।"

অসিত বলল, "তা হলে কী খাবেন ? চা, কফি ? আমার কাজের লোকটি বাইরে গেছে, আমি নিজেই অবশ্য বানিয়ে দিতে পারি। আমি এখানে একাই থাকি, বছরে ছ' মাসের বেশি তো বিদেশেই কাটাতে হয়।"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন। আমি কিছু খাব না।"

"আপনারা কালকেই ফিরেছেন, খবর পেয়েছি। বিমান ফোন করেছিল। ওদের বাড়ি থেকে আমি যে ভাঙা ক্যামেরা আর ঘড়ি এনেছি, সেগুলো আপনি দেখতে চান ?"

"না।"

"দেখতে চান না ? বিমান বলছিল... আপনার সম্পর্কে আমি আগে বিশেষ কিছু জানতাম না। ওখানে গিয়ে বিমানের মুখেই শুনেছি, আপনি প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার করেছেন, অনেক মিস্ট্রি সল্‌ভ করেছেন।"

কাকাবাবু কড়া চোখে কয়েকপলক তাকিয়ে রইলেন অসিতের দিকে। এ পর্যন্ত তিনি অসিতের সঙ্গে আপনি বলে কথা বলছিলেন, এবার তিনি তুমিতে নেমে এলেন।

ধমকের সুরে বললেন, "তুমি এটা শোনোনি যে, আমার গায়ে কেউ হাত তুললে আমি তাকে ক্ষমা করি না ?"

অসিত যেন বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল। আস্তে-আস্তে বলল, "তার মানে ?"

"আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, কেউ যদি আমার দিকে রিভলভার তোলে, কিংবা কেউ যদি আমাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে, তবে তাকে আমি শাস্তি দিতে ছাড়ি না।"

"আমি আপনার দিকে রিভলভার্ তুলিনি, আপনার গায়ে হাতও ছোঁয়াইনি। তা হলে হঠাৎ এসব কথা আমাকে বলছেন কেন ?"

"তুমি ফাঁদ পেতে আমাকে আঘাত দিয়েছ !"

"তার মানে ?"

"তার মানে তুমি ভালই জানো। ছাদের ঘরটার মেঝেতে কয়েক জায়গায় গর্ত খোঁড়া ছিল। সেইরকম একটা গর্তের মুখে তুমি আলগা করে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলে। তুমি জানতে, সেখানে আমার ক্রাচটা পড়লেই উলটে যাবে। আমি যাতে সেদিকে তাড়াহুড়ো করে যাই, সেইজন্য তুমি জানলার ধারে একটা প্রিজ্‌মের টুকরো রেখেছিলে। রোদ পড়ে সেটা ঝকমক করছিল।"

"আমি এতসব করতে যাব কেন ? আপনাকে আঘাত দিয়ে লাভ কী ?"

"এর একটাই মাত্র কারণ হতে পারে। তিনতলার ঘরটা তুমি আমার আগে নিজে ভাল করে সার্চ করতে চেয়েছিলে। আগের রাত্তিরে তুমি ছাদে উঠে তালাটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলে। পারোনি। পরের দিন সকালে তোমার একটা সুবিধা হয়ে গেল। একজন ইংরেজির মাস্টার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেকটা সময় নিয়ে নিল। তুমি আমার আগে ঘরে ঢুকে গেলে। তুমি অ্যান্টিকের ব্যবসা করো, নিশ্চয় কোনও দামি জিনিস তোমার নজরে পড়ে গিয়েছিল। আমি যাতে সেটা দেখতে না পাই, সেইজন্যই তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে !"

আমি যদি বলি, এ-সবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ? আপনি যা বললেন, এক বিন্দুও প্রমাণ করতে পারবেন ? আপনার মাথায় চোট লেগেছিল, তারপর দেখছি, এখনও আপনার মাথা ঠিক হয়নি। আপনি ভাল করে ডাক্তার দেখান !"

"অসিত ধর, কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোরো না ! রাজা রায়চৌধুরীর চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না !"

অসিত এবার হা-হা করে হেসে উঠল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন, তাই না ? ঠিক আছে, আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আপনি যা বললেন, তা সবই সত্যি। তবে, এসব প্রমাণ করতে হলে আপনাকে জানতে হবে, ওই ছাদের ঘর থেকে আমি কী নিয়েছি ! হ্যাঁ, সত্যিই আমি একটা মহা মূল্যবান জিনিস পেয়েছি ওই ছাদের ঘর থেকে। বছরের পর বছর জিনিসটা ওই ঘরে রয়েছে, এর আগে যারা খুঁজেছে, কেউ সেটা চিনতে পারেনি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার। সুতরাং সেটা আমি নেবই নেব, এটা তো স্বাভাবিক। সেটা কী, আপনি হাজার

চেষ্টা করলেও বুঝতে পারবেন না !"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, "সেটা দেখলে আমিও হয়তো চিনতে পারতাম।"

অসিত বলল, "সে চান্স আমি দেব কেন ? আপনি আর আমি দু'জনেই বাইরের লোক। বিমানরা তো এত বছর ধরে খোঁজাখুঁজি করেও সেটা পায়নি !"

কাকাবাবু আদেশের সুরে বললেন, "সে জিনিসটা আমি একবার দেখতে চাই।"

অসিত তা গ্রাহ্য না করে বলল, "বা-বা-বা-বা ! আপনি চাইলেই সেটা আমি দেখাব ? আপনাকে তো আমি চ্যালেঞ্জ জানালাম। অন্য কারও কাছে আমি স্বীকারই করব না যে, কিছু নিয়েছি। বিমান আপনার কাছে কোনও অভিযোগ করেছে ? পুরনো ঘড়ি, ক্যামেরাগুলো আমি দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। সে জানে, আমি আর কিছু আনিনি।"

"তোমার জন্য আমার মাথা ফেটেছে। পায়ের নখ আধখানা উড়ে গেছে।"

"জানলার ধারে একটা ঝকঝকে কাচ দেখে আপনি লোভীর মতন সেটা ধরতে গেলেন কেন ? আপনি অত তাড়াহুড়ো না করলে পড়ে যেতেন না ! সুতরাং ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।"

"আমি অজ্ঞান হয়ে যেতেই অন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সেই ফাঁকে তুমি জিনিসটা সরিয়ে ফেললে ?"

"কী সরালাম ?"

কাকাবাবু আবার চুপ করে যেতেই অসিত হা-হা করে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল।

এই সময় ফ্ল্যাটে একজন তাগড়া চেহারার লোক ঢুকল। লোকটি যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। নাকের নীচে মস্ত বড় গোঁফ।

অসিত বলল, "কিষণ, এসেছিস ? দু' কাপ কফি বানা বেশ ভাল করে।"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "কিষণের হাতে কফি খেয়ে দেখুন, খুব ভাল করে। আমি যখন বিদেশে থাকি, তখন কিষণই আমার ফ্ল্যাটটা পাহারা দেয়। খুব বিশ্বাসী লোক।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ, আমি কফি খাব না !"

অসিত মিটিমিটি দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, "আপনি কী ভাবছেন, বলে দেব ? পুলিশ দিয়ে আমার ফ্ল্যাটটা সার্চ করাবেন, তাই তো ? পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে আপনার চেনা আছে। কিন্তু পুলিশের বাপের সাধ্য নেই বিনা অভিযোগে কারও বাড়ি সার্চ করার। ঠিক আছে, ধরে নিলাম, আপনার কথা শুনে পুলিশ কোনও মিথ্যে অভিযোগ এনে আমার বাড়ি সার্চ করল। তা হলেও

সেই জিনিসটা চিনতে পারার মতন বুদ্ধি পুলিশেরও নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মনের কথা বোঝা এত সহজ ? আমি জানি, এমনি-এমনি তোমার বাড়ি সার্চ করানো যাবে না। কিন্তু আমি আর-একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেই দামি জিনিসটা তুমি এদেশে রাখবে না, বিদেশে নিয়ে বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। তুমি এদেশ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এয়ারপোর্টে যাতে তোমাকে তন্ন-তন্ন করে সার্চ করানো যায়, সে ব্যবস্থা করব। পুরনো আমলের দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাওয়া বেআইনি, তা জানো নিশ্চয়ই ?"

অসিত ঠোঁট উলটে বলল, "আই ডোন্ট কেয়ার ! আমি প্লেনের টিকিট বুক করে রেখেছি। যেদিন যাওয়ার কথা, সেদিন ঠিক চলে যাব, কেউ আমায় আটকাতে পারবে না !"

তিনতলা থেকে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলেন কাকাবাবু। বুকটা খালি-খালি লাগছে। অসিতের কাছে যেন তিনি হেরে গেলেন। ওকে তিনি যতটা চালাক ভেবেছিলেন, ও তার চেয়েও অনেক বেশি ধুরন্ধর। নিজেই চট করে স্বীকার করল যে, একটা খুব দামি জিনিস পেয়ে গেছে। কাকাবাবু ভেবেছিলেন, অনেক চাপ দিয়ে কথাটা আদায় করতে হবে। তার বদলে ও হাসতে-হাসতে চ্যালেঞ্জ জানাল !

জিনিসটা কী হতে পারে ?

নবাব সিরাজের দেওয়া সেই চুনির মালা ? ছাদের ঘরে একটা পুরনো গয়নার বাক্স ছিল ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে মালাটা থাকলে আগে আর কেউ নিশ্চয়ই দেখতে পেত ! চুনি পাথর উজ্জ্বল লাল রঙের হয়। সাধারণ পুঁতির মালার সঙ্গে তার অনেক তফাত ! বিমানের মামারা অনেককালের জমিদার বংশ, হিরে-মুক্তো-চুনি-পান্না চিনতে ওদের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অনেকেই ওই ঘরটা খুঁজেছে, সেরকম দামি জিনিস কেউ-না-কেউ দেখতে পেতই !

ছোট কোনও মূর্তি ? তিন-চারশো বছরের পুরনো কোনও মূর্তি হলে তার দামও অনেক হতে পারে। ও ঘরে দু-একটা ভাঙা মূর্তি ছিল যিশু খ্রিস্টের, সেগুলো মোটেই দামি নয়। খাটের তলায় আর কোনও মূর্তি পড়ে ছিল ?

জিনিসটা যাই-ই হোক, সেটা উদ্ধার করা যাবে কী করে ? বিমানরা কোনও অভিযোগ করেনি। জিনিসটা কী তা না জানলে অভিযোগ করবেই বা কী করে ? অসিত ফাঁদ পেতে তাঁর মাথা ফাটিয়েছে, সেটাও তো প্রমাণ করা অসম্ভব। ছাদের ঘরটা একেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছে। গর্তের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখার ব্যাপারটাও এখন কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, কাকাবাবুরই সাবধানে পা ফেলা উচিত ছিল।

ভাবতে-ভাবতে কাকাবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তিনি মনে-মনে

বললেন, তবু অসিত ধরকে শাস্তি পেতেই হবে।

একটা ট্যাক্সি পেয়ে তখনই বাড়ি না ফিরে কাকাবাবু চলে এলেন লালবাজারে। পুলিশ কমিশনার তাঁর বন্ধুস্থানীয়, দু'জনেই একবয়েসী।

কমিশনার সাহেবের ঘরে ভিড় ছিল, কাকাবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভিড় ফাঁকা হলে কাকাবাবু বললেন, "এক কাপ কফি দিতে বলো, তোমাকে মন দিয়ে কিছু কথা শুনতে হবে।"

সব শোনার পর কমিশনার সাহেব বললেন, "রাজা, আমি যে এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কী জিনিস চুরি করেছে, তা বুঝতে না পারলে একটা লোককে চোর বলি কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সে নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে।"

কমিশনার বললেন, "হয়তো, সেটাও মিথ্যে কথা। তোমার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে চাইছে। বাড়ির মালিকই বলছে, ও ঘরে দামি জিনিস কিছু ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছু একটা পেয়েছে। ঘরে ঢুকেই ওর অভিজ্ঞ চোখে সেটা নজরে পড়েছে। তাও ও আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল!"

কমিশনার সাহেব বললেন, "খুব ছোট জিনিস, মনে করো একটা স্ট্যাম্প, তাও খুব দামি হতে পারে। কিংবা খুব ছোট একটা মূর্তি। কিন্তু ডেফিনিট কোনও অভিযোগ না থাকলে তো এসব কিছু খোঁজ নেওয়া যায় না। আমি বরং একটা কাজ করতে পারি। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি, অসিত ধর লোকটা কেমন। আগে কোনও বেআইনি কাজ করেছে কি না। আজ রাত্তিরের মধ্যেই তুমি সব জেনে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "গোয়াতে এখন পুলিশের বড়কর্তা ডি সিল্‌ভা না? তার ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা আমাকে দাও।"

বাড়িতে ফিরে কাকাবাবু দেখলেন দীপা এসে তাঁর বউদির সঙ্গে গল্প করছে। কাকাবাবুকে দেখে সে বলে উঠল, "এর মধ্যেই টো-টো করে বেড়াচ্ছেন? ডাক্তার আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল না?"

সন্তুর মা অবাক হয়ে বললেন, "ডাক্তার... কেন, কী হয়েছিল?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই বউদি। এবারে কোনও গুণ্ডা, ডাকাত কিংবা অপরাধচক্রের নায়কের পাল্লায় পড়িনি। এমনিই পড়ে গিয়ে মাথায় একটু চোট লেগেছিল।"

তারপর তিনি দীপাকে বললেন, "তুমি একবার আমাদের ঘরে এসো তো! তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।"

ঘরে এসে দীপাকে তিনি একটা ইজিচেয়ারে বসতে বললেন। ঘরের সবক'টা জানলা বন্ধ করে দিতে অন্ধকার হয়ে গেল। মাঝখানের একটা আলো

জ্বেলে দিলেন। তারপর কাকাবাবু এককোণে দাঁড়িয়ে বললেন, "দীপা, তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে শুধু। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করব, তা মনে করবার চেষ্টা করবে। ছোটখাটো, খুঁটিনাটি সব কিছু। তোমাদের এই বাড়িটার ছাদের ঘরে সেদিন সকালবেলা তুমি আমার চেয়ে আগে ঢুকেছিলে। ঢুকে তুমি কী দেখলে?"

দীপা বলল, "অসিতবাবু আগে থেকেই সেই ঘরের মধ্যে ছিলেন।"

"সে কী করছিল?"

"অসিতবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে সবকিছু উলটে পালটে দেখছিলেন।"

"সবকিছু মানে?"

"ঝিনুক, পুঁতির মালা, বই, ম্যাপ, টেবিলের ড্রয়ার..."

"সবগুলোই একসঙ্গে দেখছিলেন?"

"তাই তো মনে হল। অন্যদের আগেই তিনি সব দেখে নিতে চান।"

"কোনও জিনিসটা উনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন?"

"না। খালি বলছিলেন, বাজে, বাজে, ঝুটো মাল!"

"আর-একটু ভাল করে ভাবো। কোন জিনিসটা বেশি করে দেখছিলেন? ঝিনুক, বই..."

পুঁতির মালা। প্রত্যেকটা মালা তুলে-তুলে চোখের সামনে দেখছিলেন আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন মাটিতে..."

"খাটের ওপর বিছানা-বালিশ ছিল। আমি পরের দিন গিয়ে দেখেছি, বালিশটা ফালা-ফালা করে ছেঁড়া। তুলো বার করা। তুমিও সেরকম দেখেছিলে, না বালিশটা তখন আস্ত ছিল?"

"বালিশটা ছেঁড়াই ছিল। অনেকদিন থেকেই ছেঁড়া।"

"তোশকও ছেঁড়া?"

"হ্যাঁ। ছেঁড়া ছিল।"

"ঘরের মেঝেটা কীরকম ছিল?"

"মাঝে-মাঝে গর্ত ছিল। পাথর তোলা ছিল।"

"আমি যেখানে পড়ে গেলাম, সেখানেও গর্ত ছিল, না পাথর বসানো ছিল?"

"মনে নেই।"

"মনে করার চেষ্টা করো!"

"আমি ওদিকটা ভাল করে দেখিনি।"

কাকাবাবু এগিয়ে এসে দীপার চোখের সামনে একটা হাত রেখে খুব নরম গলায় বললেন, "আর-একটু মনে করার চেষ্টা করো।"

"আর কিছু মনে পড়ছে না, কাকাবাবু!"

"ভাবো। খুব একমনে ভাবো।"

"হ্যাঁ, আমি জানলার কাছে যাচ্ছিলাম, তখন অসিতবাবু আমার হাত ধরে টেনে বললেন, এদিকে দেখুন। এই আয়নার বাক্সটা দেখুন! আমাকে জানলার দিকে যেতে দেয়নি! জানলার দিকে গেলে আমিও আপনার মতন আছাড় খেয়ে পড়তাম।"

"তা হলে অসিত জানত যে ওদিকে গর্তের ওপর একটা পাথর আলগা করে বসানো আছে। কিংবা সেটা সে নিজেই বসিয়েছে।"

কাকাবাবু এবার সব জানলাগুলো খুলে আলো নিভিয়ে দিলেন।

দীপা চোখ বিস্ফারিত করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "অসিতবাবু জেনেশুনে ইচ্ছে করে আপনাকে আছাড় খাইয়েছে? কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর তোমরা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। সেই সুযোগে অসিত ঘর থেকে কোনও দামি জিনিস সরিয়ে ফেলতে পারে অনায়াসে, তাই না?"

দীপা প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "কী সরিয়ে ফেলেছে? নবাবের দেওয়া সেই চুনির মালা?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা যদি অসিত ঘরে ঢোকামাত্র খুঁজে নিতে পারে, তা হলে সে দোষ তোমাদের। তোমরা অনেকে মিলে ওই ঘরে অনেকবার খোঁজাখুঁজি করেছ, কিন্তু দামি জিনিস কিছুই পাওনি। এমন কী, ওই চুনির মালাটার কথা তোমরা জানতেই না। সুতরাং অসিত যদি ওটা আবিষ্কার করে থাকে, তা হলে সেটা তার কৃতিত্ব!"

দীপা বলল, "পাগল দাদুটা হয়তো মালাটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল, যা কেউ ধারণাই করতে পারেনি। পাগলদের মতিগতি কি বোঝা যায়? ইস, অমন দামি জিনিসটা অসিত ধর নিয়ে নিল? আমাদের ঠকাল? ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া যায় না?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও? সে যে নিয়েছে, তার কোনও প্রমাণ আছে? ওরকম একটা মালা ছিল কি না, তারই তো ঠিক নেই। হুট করে কি কাউকে চোর বলা যায়? তুমি এক কাজ করো। বাড়ি গিয়ে বিমানকে জিজ্ঞেস করো, ওই ঘরটায় কী কী জিনিস ছিল, তার কোনও লিস্ট বানানো আছে কিনা! যদি সেরকম না থাকে, তা হলে বিমানকে একটা লিস্ট বানাতে বলো—ও তো ওই ঘরে বেশ কয়েকবার ঢুকেছে, যা যা জিনিস দেখেছে সব মনে করে লিখতে বলো। যেসব জিনিসকে মনে হয় আজেবাজে, তাও যেন বাদ না দেয়! তুমি যেমন মেঝের গর্তটার কথা ভুলে গিয়েছিলে, সেরকম কিছুও ভুললে চলবে না।"

দীপা ঠোঁট উলটে বলল, "ওর আমার চেয়েও ভুলো মন।"

দীপা চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু নিজের টেবিলের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে একটা টেলিগ্রামের ফর্ম বার করলেন। তারপর গোয়ার পুলিশের কর্তার কাছে

কয়েকটা খবর জানতে চেয়ে লিখলেন অনেকখানি। বাড়ির কাজের লোকটির হাতে টাকা দিয়ে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলেন পোস্ট অফিসে।

সন্ধেবেলাতে পুলিশ কমিশনার ফোন করলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, এবার তো মনে হচ্ছে, তোমার পুরো ব্যাপারটা ওয়াইল্ড গুজ চেইজ !"

কাকাবাবু শুকনো গলায় বললেন, "কেন ?"

কমিশনার-সাহেব বললেন, "অসিত ধর সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তার নামে কোনও অভিযোগ নেই। সে কখনও জেল খাটেনি, চুরি-জোচ্চুরি কোনও কেস তার নামে কখনও ওঠেনি। পাড়ার লোক তাকে নির্ঝঞ্ঝাট, ভদ্রলোক বলে জানে। যদিও সে পাড়ায় লোকদের সঙ্গে তেমন মেশে না। সে প্রায়ই বিদেশে যায়, সেখানে তার ব্যবসা আছে। তার পাসপোর্টেও কোনও গোলমাল নেই। শিগগিরই আবার বিদেশে যাবে, তার টিকিট কাটা আছে। এরকম লোককে তো পুলিশ কোনও কারণেই ধরতে পারে না !"

"আমি তো তোমাকে ধরতে বলিনি।"

"এরকম লোককে তুমিই বা সন্দেহ করছ কেন ?"

"দ্যাখো, সন্দেহ যখন আমার মনে জেগেছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।"

"আরও একটা ব্যাপার। আমি আজ বীরভূমের এস·পি·-কে ফোন করেছিলাম। মজার কথা কী জানো, এস·পি·-র নাম চঞ্চল দত্ত, সে নাকি বীরভূমের ওই রাও-পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নবাবের উপহার দেওয়া পান্নার মালাটার কথা চঞ্চলও জানে।"

"পান্না নয়, চুনির মালা।"

"তাই নাকি ? ও যে বলল, পান্না ?"

"চুনি হচ্ছে লাল রঙের, আর পান্না সবুজ। দুটো একেবারে দু'রকম।"

"তাই নাকি ? আমি আবার অত চুনি-পান্না চিনি না। চঞ্চলও বোধ হয় গুলিয়ে ফেলেছে। যাই হোক, চঞ্চল ওই মালাটার কথা শুনেছে। এখন ওটার দাম হবে কয়েক কোটি টাকা। আজও কেউ মালাটা খুঁজে পায়নি। এখন তো বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে, কোনও দেওয়ালের গর্ত থেকে কোনও মিস্তিরি-মজুর পেয়ে যেতে পারে। চঞ্চলকে বলেছি নজর রাখতে।"

"বেশ ভাল কথা।"

"শোনো রাজা, অসিত ধর যদি লোভের বশে ছোটখাটো কোনও জিনিস হাতসাফাই করে ওখান থেকে নিয়েও থাকে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কী দরকার ? বিমান তো কোনও অভিযোগ করেনি।"

"সেটা ঠিক। আমার মাথা ঘামাবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু সে

আমার চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছে কেন, তা জানতে হবে না ? সে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বিমানের কাছ থেকে কয়েকটা ভাঙা জিনিসপত্র কিনেছে। বিমান তাতেই খুশি। কিন্তু আমার পায়ের নখ আধখানা কেন উড়ে গেল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না ?"

"তোমার পায়ের নখ উড়ে গেছে ? সেটা আবার কী ব্যাপার ? কিছু বলোনি তো ?"

"থাক, পরে বলব। এখন আপাতত আমি নিজেই মাথা ঘামাই।"

সন্তু শেষ পরীক্ষা দিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে একটা সিনেমা দেখে ফিরল রাত সাড়ে আটটায়। এসেই কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে বলল, "এবার বলো! কী হল বীরভূমে!"

কাকাবাবু একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন ঘর অন্ধকার করে। উঠে আলো জ্বাললেন। তারপর বললেন, "বলছি। কাল সকাল থেকে তোকে একটা কাজ করতে হবে, সন্তু। একটা লোককে সারাদিন ফলো করতে পারবি ? পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে না। লোকটি তোকে চেনে না, এই একটি সুবিধে আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকে ফলো করব ? লোকটিকে আমি চিনব কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি লোকটির বাড়ি আর লোকটিকে চিনিয়ে দেব। সারাদিনে ও কোথায় কোথায় যায়, কার কার সঙ্গে দেখা করে, সব তোকে নোট করতে হবে।"

"লোকটা যদি গাড়ি করে যায় ?"

"সেও একটা সমস্যা বটে। তোকে ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য টাকা দিতে পারি, কিন্তু কলকাতা শহরে যে ঠিক সময়মতন ট্যাক্সি পাওয়াই যায় না।"

"আমি মোটর সাইকেল চালাতে শিখে গেছি। বিমানদার মোটর সাইকেলটা চেয়ে নেব ?"

"চালাতে শিখেছিস ? তোর এখনও লাইসেন্স হয়নি ?"

"না।"

"তা হলে চালাতে হবে না। তা ছাড়া মোটর সাইকেলে বড্ড আওয়াজ হয়। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমনিই দ্যাখ যতটা পারিস। উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবি।"

এর পর কাকাবাবু প্রথম থেকে বলতে শুরু করলেন সন্তুকে। পুরনো আমলের বিশাল বাড়ি, ভূতের ভয়, ছাদের ওপর পাগলা দাদুর ঘর...।

অনেকটা যখন বলা হয়েছে, সেই সময় ঝন-ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। সন্তুই ফোনটা ধরে বলল, "কাকাবাবু, তোমাকে চাইছে।"

কাকাবাবু রিসিভারটা নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে একটা হাসির

আওয়াজ ভেসে এল।

কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি আবার বললেন, "হ্যালো, কে?"

এবার ওদিক থেকে একজন বলল, "সরি, মিস্টার রায়চৌধুরী। হঠাৎ হাসি পেয়ে গিয়েছিল। সকালে আপনি যখন রাগারাগি করছিলেন, সেই মুখখানা মনে পড়ে গেল কি না! যাই হোক, ভেবেচিন্তে কিছু পেলেন?"

অসিত ধরের গলা!

কাকাবাবু বললেন, "না, কিছু পাইনি।"

"অনেকের মুখেই শুনেছি, আপনার নাকি দারুণ বুদ্ধি। অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন। এবার তা হলে আপনার ওপর টেক্কা দিলুম, কী বলুন!"

"আমার চেয়ে যাদের বুদ্ধি বেশি, তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার কাছে আমি হেরে গেলে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাব। তবে, তিনতলার ঘরখানা তুমি আর আমি যদি একসঙ্গে দেখতাম, তা হলেই আসল বুদ্ধির পরীক্ষা হত। তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে সরিয়ে দিয়েছ।"

"সে-চান্সটা আমাকে নিতেই হয়েছে। তবে আপনার চিন্তার বোঝাটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি। ওই যে সিরাজদ্দৌল্লার দেওয়া একটা চুনির মালার কথা এখন শোনা যাচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি নিইনি! মালা জাতীয় কোনও কিছু আমি নিইনি, এ-বিষয়ে আপনাকে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিতে পারি।"

"মালাটা ছিঁড়ে পাথরগুলো আলাদা করে নিলেও তার দাম একই থাকে। আলাদা-আলাদাভাবে পাথরগুলো লুকিয়ে রাখাও সোজা।"

"হা-হা-হা! মিস্টার রায়চৌধুরী, অত সোজা নয়! ভাবুন, ভাবুন, হাল ছেড়ে দেবেন না, ভাবুন, ভেবে যান!"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই ফোন রেখে দিল অসিত।

অপমানে কাকাবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

সকাল আটটা থেকে এলগিন রোডে অসিত ধরের বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু। কাকাবাবু আসেননি, বাড়ির নাম্বার আর অসিত ধরের চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল, তবু অসিত ধরের দেখা নেই। এমনিতে সন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে পারে, কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে তার পায়ে ব্যথা করছে। এক-একবার একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিচ্ছে। সে একবার ভাবল, ট্র্যাফিক পুলিশরা সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকে কী করে?

সকালবেলায় সবাই ব্যস্ত, কতরকম মানুষ যাচ্ছে হনহনিয়ে। সন্তুই শুধু দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। অন্যরা কী ভাবছে? কেউ যদি তাকে সন্দেহ

করে ?

কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকানও নেই যে, সেখানে গিয়ে বসবে।

সন্তু একটা ছাই রঙের প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে এসেছে। ইচ্ছে করে বেশি রংচঙে পোশাক পরেনি, যাতে তার প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে। কাঁধে ঝোলানো একটা সাধারণ ব্যাগ, তাতে রয়েছে দু-একখানা গল্পের বই, আর ক্যামেরা।

প্রায় সাড়ে ন'টার সময় অসিত ধর নেমে এল রাস্তায়। স্যুট-টাই পরা, পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক পরা, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। সন্তু রাস্তা পেরিয়ে তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

অসিত প্রথমে হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করল। সেটা থামল না। তখন সে হাঁটতে লাগল বাঁ দিকে।

নেতাজি সুভাষ বসুর বাড়ির সামনে দু'খানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সন্তুর মনটা নেচে উঠল আনন্দে। একেই বলে ভাগ্য। একসঙ্গে দু'খানা ট্যাক্সি, সন্তুর কোনও অসুবিধাই হবে না।

অসিত প্রথম ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে জানলা দিয়ে দু-একটা কথা বলল। ড্রাইভারটি রাজি হয়ে খুলে দিল দরজা।

সে ট্যাক্সিটা স্টার্ট করার পরই সন্তু ঝট করে উঠে পড়ল দ্বিতীয়টায়। এ ট্যাক্সির ড্রাইভার মিটার ঘোরাবার আগে সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে ?"

সন্তু ব্যস্তভাবে বলল, "জলদি, জলদি, ওই সামনের ট্যাক্সিটাকে ফলো করুন।"

ড্রাইভারটি ভুরু তুলে বলল, "তার মানে ?"

সন্তু বলল, "ওই ট্যাক্সিটাকে ফলো করুন ! দূরে চলে যাবে।"

ড্রাইভারটি বলল, "কেন, ফলো করব কেন ?"

সন্তু অস্থির হয়ে বলল, "কী মুশকিল ! বলছি যে ট্যাক্সিটা হারিয়ে যাবে, শিগগির চলুন।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে ?"

"আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করব কেন ? আমার কাছে টাকা আছে, আমি ভাড়া যত লাগে দেব, আপনি ট্যাক্সি চালাবেন।"

"কই, দেখি টাকা।"

"এই তো দেখুন না। এবার দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন। স্পিড নিন। আগের গাড়িটাকে ধরতে হবে।"

"কেন, ধরতে হবে কেন ?"

"ওই ট্যাক্সিতে একজন...একজন ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল বসে আছে।"

"ওই লোকটা যদি ক্রিমিনাল হয়, তা হলে তুমি কে ?"

"আমি, মানে আমি, আমার বিশেষ দরকার।"

"চোর-পুলিশ খেলা হচ্ছে ? নামো, নামো আমার গাড়ি থেকে।"

তর্ক করে লাভ নেই। অসিতকে নিয়ে অন্য ট্যাক্সিটা রাস্তার গাড়ির ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। ড্রাইভারটাকে একটা ভেংচি কেটে সন্তু নেমে পড়ল।

কত ইংরেজি বইতে সে পড়েছে কিংবা বিদেশি সিনেমায় দেখেছে যে, রাস্তায় ঝট করে একটা ট্যাক্সি ধরে আগের গাড়িটাকে ফলো করতে বললে, ড্রাইভার বিনা বাক্যব্যয়ে অমনই ফলো করে। কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলো এক-একটি জ্যাঠামশাই ! কোথায় যাবে, কেন যাবে, সব জিজ্ঞেস করা চাই।

প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থ। সন্তু বিরক্ত মুখে হাঁটতে লাগল। শম্ভুনাথ হাসপাতালের কাছে আর-একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্তুর একটা কথা মনে পড়ল। অসিত ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলেছিল, বউবাজার। সেখানে গিয়ে একবার খুঁজে দেখা যেতে পারে। যদিও বউবাজার স্ট্রিট চেনা রাস্তা, সেখানে অসিত এর মধ্যে কোন্ বাড়িতে ঢুকে পড়বে কে জানে। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই ট্যাক্সির কাছে গিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বউবাজার যাবেন ?"

ড্রাইভারটি সন্তুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনও রুগি যাবে ? কিসের রুগি ?"

সন্তু বলল, "না, অন্য কেউ যাবে না। আমি একা যাব।"

ড্রাইভারটি বলল, "বাসে চলে যাও। অনেক শস্তা পড়বে !"

এবার সন্তু বুঝল। তার বয়েসী ছেলেরা কলকাতা শহরে একা একা ট্যাক্সি চড়ে না, ট্রামে-বাসে যায়। তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। কিন্তু ট্রামে-বাসে চেপে কি কাউকে ফলো করা যায় ?

আর একটু হাঁটতে-হাঁটতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কলকাতায় এখন তো গাড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় সে Rent A Car সাইনবোর্ড দেখেছে। কাকাবাবু তাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়েছেন, এই টাকায় সারাদিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করা যেতে পারে অনায়াসে।

এদিকে কোথায় Rent A Car আছে ? খুব দরকারের সময় ঠিক সেই জিনিসটাই পাওয়া যায় না। আগে থেকেই এসব চিন্তা করা উচিত ছিল। যাই হোক, কাকাবাবু বলেছেন উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে। কোনও পেট্রোল পাম্পে গেলে ওরা নিশ্চয়ই গাড়ির খবর দিতে পারবে।

ভবানীপুরের দিকে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। কিন্তু সেখানে জিজ্ঞেস করতে হল না, পাম্পের পাশেই সন্তু একটা গাড়ি ভাড়ার সাইন বোর্ড দেখতে পেল। সেখানে ব্যবস্থা হয়ে গেল সহজেই। ড্রাইভার সমেত গাড়ি পাওয়া যাবে, ঘন্টা হিসাবে ভাড়া দিতে হবে। আড়াইশো টাকা জমা দিয়ে দিল সন্তু। তার বেশি ভাড়া হলে বাড়ি পৌঁছেও দেওয়া যায়।

নতুন একটা গাড়িই পাওয়া গেল। ড্রাইভারটি তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েসের, বেশ চটপটে ধরনের। গাড়িতে ওঠার পর সন্তু যেন নিজের বয়েসের চেয়েও বড় হয়ে গেল। গাড়িটাকে নিজের গাড়ি বলে মনে করা যায়।

সে বলল, "প্রথমে বউবাজার চলুন।"

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "বউবাজারে কোথায়?"

সন্তু বলল, "কোথায় মানে? বউবাজার মানে বউবাজার!"

ড্রাইভার বলল, "বউবাজার রাস্তাটা তো শিয়ালদা থেকে আরম্ভ আর ডালহাউসিতে শেষ। সেইজন্যই জিজ্ঞেস করছি, কোন্ দিকে যাব!"

সন্তু বলল, "শিয়ালদা থেকে শুরু করুন, ডালহাউসি পর্যন্ত চলুন! আর-একটা কথা শুনে রাখুন। আমি টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করেছি, আমি যেখানে খুশি যাব। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এসব কিছু জিজ্ঞেস করবেন না!"

গাড়িটা শিয়ালদার দিক থেকে বউবাজারে ঢুকে চলে এল রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "এবার?"

সন্তু নিজেই বুঝতে পারছে না, এত বড় রাস্তায় কোথায় সে অসিতকে খুঁজবে। কোন্ বাড়িতে সে গেছে, তা জানা অসম্ভব। কিন্তু এখন ফিরে গিয়ে কাকাবাবুকে যদি বলতে হয়, অসিতকে সে হারিয়ে ফেলেছে, তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।

সে ড্রাইভারটিকে বলল, "গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, আবার শিয়ালদার দিকে চলুন।"

গাড়িটা আবার শিয়ালদার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "থামান, থামান!"

ড্রাইভারটি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল।

উলটো দিকে একটা ট্যাক্সি থেমে আছে। সন্তু সেদিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

অসিত যখন এলগিন রোডে ট্যাক্সিতে চাপে, সেই সময়টার দৃশ্যটুকু সে প্রাণপণে নিখুঁতভাবে মনে করার চেষ্টা করছিল। ট্যাক্সিটার নাম্বার সে ভাল করে দেখেনি, কিন্তু শেষে দুটো জিরো ছিল। আর ড্রাইভারটির মুখে তিন-চারদিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। এই তো সেই ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিটার মিটার ডাউন করা, আর ড্রাইভারটি এমনভাবে গা এলিয়ে দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে যে বোঝা যায়, কেউ তাকে ভাড়া করে রেখেছে। এই ড্রাইভারের কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নেওয়া যায়, অসিত কোথায় নেমেছে।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় গয়নার দোকানের সামনে। আবার বুক কেঁপে উঠল সন্তুর। নবাবের সেই চুনির মালা এখানে বিক্রি করতে এসেছে অসিত?

গাড়ি থেকে নেমে অন্য ফুটপাথে চলে এল সন্তু। দোকানটার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। হ্যাঁ, ঠিক, একটু ভেতর দিকে চেয়ারে বসে আছে অসিত, মন দিয়ে কথা বলছে একজনের সঙ্গে।

খবরটা এক্ষুনি জানানো দরকার কাকাবাবুকে। টেলিফোন পাওয়া যাবে কোথায় ? ইংরেজি ছবিতে দেখা যায়, ওদের দেশের রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাবলিক টেলিফোনের কাচের ঘর থাকে। আমাদের দেশে সেসব কিছু নেই। পোস্ট অফিসে ফোন করা যায়, কিন্তু সেখানে সব সময় লোক থাকে। কেউ টেলিফোন করলে অন্যরা কান খাড়া করে সব কথা শোনে।

বেশি দূর যাওয়া যাবে না, অসিত যদি বেরিয়ে পড়ে।

কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়ে সন্তু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "একটা ফোন করতে দেবেন ? আমার খুব দরকার। যা পয়সা লাগে দেব।"

দোকানের একজন কর্মচারি বলল, "দু' টাকা।"

সন্তু ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে মনে-মনে বলতে লাগল, হে ভগবান, যেন নাম্বারটা পাওয়া যায়। টেলিফোনের দেবতা কে ? বিশ্বকর্মা ? হে বিশ্বকর্মা, যেন নাম্বারটা পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি।

একবারেই পাওয়া গেল। কাকাবাবুর গলা শুনেই সন্তু বলল, "কাকাবাবু, পার্টি এখন বউবাজারে একটা গয়নার দোকানে, পার্টি অনেকক্ষণ কথা বলছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দোকানটার নাম কী ?"

সন্তু উঁকি দিয়ে দোকানটার নাম দেখে নিয়ে বলল, "এস· পি· জুয়েলার্স !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। তুই নজর রাখ।"

সন্তু বলল, "আমি আর ওকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছি না !"

ফোন রেখে সন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসল। ট্যাক্সিটা থেমে আছে। অসিতের বেরোবার নাম নেই।

কাঁধের ঝোলা থেকে সন্তু একটা বই আর ক্যামেরাটা বার করল। এমনিই গয়নার দোকানটার ছবি তুলল দু'খানা।

সন্তুর গাড়িটার একটু আগেই আর-একটা সাদা রঙের গাড়ি থেমে আছে। তাতে বসে আছে দু'জন লোক। লোক দুটো পেছন ফিরে মাঝে-মাঝে সন্তুকে দেখছে। এরা কারা ?

মিনিটদশেক বাদে গয়নার দোকান থেকে বেরোল অসিত। হাতে সেই কালো ব্যাগ। ওই ব্যাগ ভর্তি কি হার বিক্রির টাকা ?

অসিত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

সেই ফাঁকে অসিতের একটা ছবি তুলে নিল সন্তু।

সামনের সাদা গাড়িটা থেকে একজন লোক নেমে গিয়ে ঢুকে গেল ওই গয়নার দোকানে। অসিতের ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিতেই সাদা গাড়িটাও চলতে শুরু

করল।

সন্তু বেশ অবাক হয়ে গেল। এই সাদা গাড়িটাও অসিতকে ফলো করছে নাকি ?

বউবাজার আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের কাছে ট্র্যাফিক জ্যাম। গাড়িগুলো নড়ছে না। সন্তু ছটফট করতে লাগল। অসিত কিন্তু মন দিয়ে একটা বই পড়ছে, কোনওদিকে তাকাচ্ছে না।

কিসের জন্য এমন জ্যাম হয়েছে দেখার জন্য সন্তু গাড়ি থেকে নেমে গেল। অসিতের ট্যাক্সিটা ডান পাশের দ্বিতীয় সারিতে একটু এগিয়ে আছে। অসিতকে ভাল করে দেখার জন্য সন্তু সেই ট্যাক্সির পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। অসিতের ব্যাগে নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ টাকা আছে, তবু জ্যাম নিয়ে তার কোনও চিন্তা নেই, সে বই পড়ে যাচ্ছে মন দিয়ে।

একেবারে সামনের দিকে এসে সন্তু দেখল একটা লরি থেকে অনেকগুলো বস্তা পড়ে গেছে মাটিতে, লরিটাও বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে, সেইজন্য অন্য গাড়িগুলোও যেতে পারছে না। একজন পুলিশ কনস্টেবল এসে হম্বি-তম্বি করছে সেখানে।

একটু বাদে রাস্তা পরিষ্কার হল। ডান দিকে ঘুরে গিয়ে খানিক দূরে অসিতের ট্যাক্সিটা থামল। পাশেই একটা ব্যাঙ্ক। অসিত ওখানে টাকাগুলো জমা দেবে ? সত্যিই অসিত ঢুকে গেল ব্যাঙ্কের মধ্যে।

অন্য সাদা গাড়িটাও এখানে থেমেছে। তার থেকে কালো চশমা পরা একজন লোক নেমে ব্যাঙ্কের মধ্যে চলে গেল অসিতের পেছন-পেছন। এই সাদা গাড়ির লোকেরা কি অসিতের কাছ থেকে টাকাগুলো কেড়ে নেওয়ার মতলবে আছে ? ব্যাঙ্কের ভেতরে গিয়ে ডাকাতি করবে ?

অসিত ট্যাক্সিটা ছাড়েনি। কাকাবাবু বলেছেন, অসিত কোথায় যায়, কার সঙ্গে দেখা করে, সেইসব লক্ষ রাখতে। অসিত ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গেলে তো সন্তু বাধা দিতে পারবে না ! ডাকাতরা অসিতের ওপর হামলা করলেই বা সে কী করবে ?

সন্তু গাড়িতে বসে রইল। একটা বই খুলেও পড়তে পারল না। প্রত্যেক মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে ব্যাঙ্কের মধ্যে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাবে।

সেরকম কিছুই হল না।

মিনিট দশেক বাদে অসিত বেরিয়ে এল ব্যাঙ্ক থেকে। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে আবার সে চারদিকটা একবার দেখে নিল। সন্তু মাথাটা নিচু করে নিল, যাতে তার দিকে অসিতের নজর না পড়ে।

অসিতের ট্যাক্সি এবার চলতে লাগল উত্তর কলকাতার দিকে। আবার অসিত বই খুলে পড়তে শুরু করেছে। সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সাদা গাড়িটাও আসছে পেছনে-পেছনে।

কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া ছাড়িয়ে গিয়ে অসিতের ট্যাক্সি থামল একটা বড় জুতোর দোকানের সামনে। সন্তুকে অবাক করে অসিত ঢুকে গেল সেই জুতোর দোকানের মধ্যে। এটা কি জুতো কেনার সময় ? বড়-বড় চোর ডাকাতদের কারও হঠাৎ জুতো কেনার শখ হয়, এটা কেমন যেন অদ্ভুত।

জুতোর দোকানে সবাই ঢুকতে পারে। সন্তু নিজের জন্য একটা চটিই না হয় কিনে ফেলবে। সেও ভেতরে চলে এল।

দোকানটাতে বেশ ভিড়। সেল্সম্যানরা সবাই ব্যস্ত। অসিত একটা জায়গায় বসল, কিন্তু সন্তু আর কোনও চেয়ার খালি পেল না। সে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। সাদা গাড়ি থেকে কালো চশমা পরা লোকটাও নেমে এসেছে। চশমায় লোকটার চোখ ঢাকা, কোন দিকে তাকায় তা বোঝা যায় না। এই লোকটা কার ওপর নজর রাখছে ? এমন কী হতে পারে যে, এই লোকটা অসিতের বডি গার্ড ? কিন্তু বডি গার্ড গাড়ি করে ঘুরছে, আর অসিত কেন ট্যাক্সিতে ? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

অসিত হাতের কালো ব্যাগটা পাশে না রেখে কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে। সন্তু এসে দাঁড়াল ঠিক তার পেছনে।

একটু বাদে একজন সেলস্ম্যান এল অসিতের কাছে। অসিত গম্ভীরভাবে বলল, "চটি দেখান। বাড়িতে পরার ভাল চটি।"

সেলস্ম্যান বলল, "আপনার পায়ের মাপটা দেখি, সার !"

অসিত পা থেকে জুতো-মোজা খুলে ফেলল।

সেলস্ম্যানটি দু' জোড়া চটি আনতেই অসিত সেগুলো পায়ে না দিয়েই বিরক্তভাবে বলল, "এগুলো কী এনেছেন ? আমি কম দামি জিনিস চাইনি। সবচেয়ে ভাল ডিজাইনের কী কী চটি আছে দেখান !"

সেলস্ম্যানটি বলল, "ভেতর থেকে আনতে হবে। একটু বসবেন সার ? আপনার পায়ের সাইজ দশ নম্বর। দশ নম্বরের চটির বেশি ডিজাইন নেই। পেছনের গোডাউন থেকে আনব, পাঁচ মিনিট লাগবে।"

অসিত বলল, "ঠিক আছে, আনুন।"

কালো ব্যাগটা খুলে একটা বই বার করে সে পড়তে লাগল ওইটুকু সময় কাটাবার জন্য।

সন্তু উঁকি মেরে দেখল, বইটার প্রত্যেক পাতার তলায়-তলায় রঙিন ছবি।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল। দারুণ সাজগোজ করে একজন খুব ফর্সা মহিলা ঢুকলেন সেই দোকানে। সঙ্গে ছোটখাটো একটা দল। মহিলার মুখখানা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল সন্তুর।

দোকানের সব লোক ফিসফাস করতে লাগল। অনেকে সেই মহিলার কাছে এগিয়ে গেল। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, "ডিম্প্ল ! ডিম্প্ল !"

মহিলাটি হিন্দি সিনেমার নায়িকা। সন্তু হিন্দি সিনেমা দেখে না, কিন্তু সারা

কলকাতার দেওয়ালে এইসব নায়িকার এত ছবি থাকে যে, মুখগুলো চেনা হয়ে যায়।

হিন্দি সিনেমার নায়িকা এই দোকানে এসেছে জুতো কিনতে, তাই হইচই পড়ে গেল সারা পাড়ায়। দোকানের বাইরে ভিড় জমে গেল। দোকানের ম্যানেজার বলল, "ছবি তুলে রাখতে হবে, ক্যামেরা, ক্যামেরা !"

দু-তিনটে ক্যামেরা বেরিয়ে পড়ল।

অসিত হিন্দি সিনেমার নায়িকাটিকে গ্রাহ্য করল না। একবার শুধু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আবার মন দিল বইয়ের পাতায়।

বাইরে থেকেও অনেক লোক ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে এল। সবাইকে ছবি তুলতে দিতে হবে। নায়িকাটির তাতে কোনও আপত্তি নেই। দোকানের ঠিক মাঝখানে তিনি পোজ দিয়ে দাঁড়ালেন। অনেকগুলি ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠল।

সন্তুই বা এই সুযোগ ছাড়বে কেন ? সেও তার ক্যামেরা বার করল। কিন্তু নায়িকার ছবি তুলল মোটে একটা, আর তিনখানা ছবি তুলল শুধু অসিতের। এত ফ্ল্যাশ জ্বলছে যে, অসিত কোনও সন্দেহ করল না। অসিতের খুব ক্লোজআপ ছবি তুলে নিল সন্তু, যদিও এত ছবি কী কাজে লাগবে সে জানে না, কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে।

সেই নায়িকাকে নিয়ে সবাই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, অসিতের কাছে আর কেউ এলই না। অসিত ঘড়ি দেখল, দশ মিনিট কেটে গেছে।

বেশ রাগের সঙ্গে সে আবার মোজা-জুতো পরল, তারপর গটমট করে বেরিয়ে গেল।

সন্তু ভেবেছিল, জুতো কেনাটা একটা ছুতো, অসিত নিশ্চয়ই এখানে কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জুতো কেনার ছলে কোনও গোপন কথা বলা কিংবা কোনও জিনিস পাচার করে দেওয়া সহজ।

কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। কালো ব্যাগটা নিয়ে অসিত আবার ট্যাক্সিতে উঠে গেল।

এ-পাড়ায় অনেক জুতোর দোকান। কিন্তু অন্য কোনও দোকানে আর গেল না অসিত। জুতো কেনার দরকার নেই, না খুব রেগে গেছে ?

এবার অসিতের গাড়ি চলে এল ডালহাউসিতে। ট্রেনের টিকিটের বড় অফিসটার সামনে থামল। ট্রেনের টিকিট কাটবে ? কোথাকার টিকিট কাটছে, সেটা জানা খুব দরকার। সন্তুও ঢুকে পড়ল সেখানে। টিকিট কাটার অনেকেগুলো লাইন। অসিত কিন্তু কোনও লাইনে দাঁড়াল না। একপাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। সন্তুও সেখান দিয়ে ঢুকতে যেতে একজন লোক তাকে আটকাল। ভেতরে যাওয়া নিষেধ। অসিত নিশ্চয়ই কোনও চেনা লোকের নাম বলেছে। ভেতর থেকে সে টিকিট কাটবে।

অগত্যা সন্তুকে ঘোরাঘুরি করতে হল বাইরে। সাদা গাড়ির কালো চশমা পরা লোকটাও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে অসিত গেল সার্কুলার রোড আর ল্যান্সডাউনের মোড়ের কাছে একটা দোকানে। এখানে পুরনো দামি-দামি জিনিস বিক্রি হয়। অ্যান্টিকের দোকান। অসিতেরও এই ব্যবসা।

দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মাত্র মিনিট পাঁচেক কথা বলল, কিছু নিল না কিংবা দিল না। অন্তত দেখা গেল না সেরকম কিছু। কাউন্টারের লোকটা তার চেনা, সে হাসিমুখে বারবার অসিতকে হাত ধরে টেনে ভেতরে বসাবার চেষ্টা করল, অসিত বলল, "সময় নেই, খুব ব্যস্ত আছি।"

দুপুর প্রায় বারোটা। আকাশে গনগনে রোদ। প্রথম-প্রথম সন্তু যতটা উত্তেজনা বোধ করছিল, এখন তা অনেকটা থিতিয়ে আসছে। অসিত কোথায় যেন যাচ্ছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সন্তু আর কী করতে পারে? এর চেয়ে বেশি কাছাকাছি গেলে অসিত বুঝে যাবে।

থিয়েটার রোডের দুটো দোকানেও থামল অসিত। একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকে লিফ্‌ট দিয়ে ছ' তলায় উঠে গেল। সন্তু সাহস করে একই লিফটে উঠে গেল ওর সঙ্গে। অসিত বাঁ দিকের একটা ফ্ল্যাটে বেল বাজাল। দরজা খুলে একজন অসিতকে দেখে কী যেন বলল, আনন্দের সঙ্গে। লোকটা যেন অসিতেরই অপেক্ষায় ছিল। সন্তু তাড়াতাড়ি ডান দিকের একটা অচেনা ফ্ল্যাটে বেল বাজাল, তার বুক টিপ টিপ করছে। অসিত তার দিকে মনোযোগ দেয়নি, ওদিকের লোকটি অসিতকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, এদিকের ফ্ল্যাটের দরজা তখনও খুলল না, বোধ হয় ভেতরে কেউ নেই। সন্তু আর দেরি না করে নেমে গেল নীচে।

অসিত কিন্তু ট্যাক্সিটা ছাড়েনি। সাদা গাড়িটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

এবার আধ ঘন্টা বাদে নীচে নামল অসিত। এর মধ্যে সন্তু গাড়িতে বসে-বসে তার নোট বুকে টুকে নিয়েছে অসিত কোথায়-কোথায় গেছে। গয়নার দোকান, ব্যাঙ্ক, জুতোর দোকান, রেলের টিকিটের অফিস, অ্যান্টিক শপ, ফোটোগ্রাফি শপ, ঘড়ির দোকান, থিয়েটার রোডের 'বলাকা' বাড়ির ফ্ল্যাট নং ৬বি।

ট্যাক্সিটা খুব কাছেই একটা হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই হোটেলটার বাইরের বাগানে অনেকগুলো রঙিন ছাতা পোঁতা আছে। তার নীচে একটা করে টেব্‌ল। অসিত বসল সেরকম একটা টেব্‌লে। বোঝা যাচ্ছে, এবার সে লাঞ্চ খাবে।

সন্তুরও খিদে পেয়ে গেছে। পকেটে এখনও আড়াইশো টাকা আছে। সেও এখানে খেয়ে নিতে পারে। গাড়ির ড্রাইভারকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি খেয়ে এসেছেন? আপনি এখানে খাবেন?"

ড্রাইভারটি বলল, সে খেয়ে-দেয়েই ডিউটি করতে এসেছে। এখন কিছু খাবে না।

সন্তু হোটেলের বাগানে অসিতের থেকে খানিকটা দূরের একটা ছাতার তলায় বসল। বেয়ারা আসবার পর সে অর্ডার দিল তন্দুরি নান আর রেশমি কাবাব। এত বড় হোটেলে সন্তু আগে কখনও একা একা আসেনি। তার বয়েসী আর কেউ নেইও এখানে।

অসিতের টেবিলে এসে বসল দুটি মেয়ে। একজনের বয়েস সতেরো-আঠারো, আর একজনের তিরিশের কাছাকাছি। আগে থেকেই ওদের আসার কথা ছিল? না, এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে বেশ ভালরকম চেনা, তা বোঝা গেল!

এবার কোটের পকেট থেকে একটা লাল পাথরের মালা বার করল অসিত। সন্তুর চোখ দুটো ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। এই সেই নবাব সিরাজদ্দৌল্লার দেওয়া চুনির হার! এরকম সবার সামনে বার করে দেখাচ্ছে অসিত? অবশ্য এখানে অন্য কেউ ওটার কথা জানে না।

একজন বেয়ারা ওদের টেবিলে অর্ডার নিতে এসেও হাঁ করে মালাটা দেখতে লাগল। মেয়ে দুটিও এ একবার, ও একবার মালাটা হাতে নিয়ে দেখছে।

সন্তু একটা জয়ের নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, ওই বিখ্যাত মালাটা যে অসিত চুরি করেছে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। নিজের চোখেই তো দেখল সন্তু। এর পর কাকাবাবু যা করবার করবেন।

ক্যামেরাটা বার করে যেন এমনিই নাড়াচাড়া করছে, এমন ভান করে সন্তু খচাখচ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল ওই টেবিলের। মেয়ে দুটির ছবি তোলা থাক, পরে কাজে লাগবে।

সাদা গাড়ির কালো চশমা পরা লোকটাকে এখন আবার দেখা গেল এখানে। সে কোনও টেবিলে বসল না, শুধু একবার পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। সন্তু তারও ছবি তুলে নিল চট করে। এ-লোকটা যদি গুণ্ডা হয়, তা হলে একেও পরে চেনা যাবে। অবশ্য কালো চশমার জন্য তার মুখখানা ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তবে লম্বা, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারাটা গুণ্ডাদেরই মতন।

অসিত তার কালো রঙের ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রাখেনি, এখানেও কোলের ওপর রেখেছে। ব্যাগটাতে আরও কী আছে? টাকা? এমনকী হতে পারে যে, এই মেয়ে দুটো চুনির হারটার দাম আগেই দিয়ে দিয়েছে, অসিত ব্যাঙ্ক থেকে সেই চেক ভাঙিয়ে নিল?

ওরা অনেক খাবারের অর্ডার দিয়েছে। সন্তু আস্তে-আস্তে খেতে লাগল। বেশ খানিকটা সময় লাগবে মনে হচ্ছে। সন্তু এক গেলাস লস্যি নিল।

কালো চশমা-পরা লোকটা দূরে ঘোরাঘুরি করছে। ওর কাছে যদি রিভলভার থাকে, তা হলে তো এখন ওই দামি চুনির হারটা কেড়ে নেওয়া কিছুই

নয়। লোকটা নিচ্ছে না কেন ?

যে-মেয়েটির কম বয়েস, সে এখন মালাটা গলায় পরে আছে। রোদ্দুরে ঝক-ঝক করছে লাল রঙের পাথরগুলো।

ওদের খাওয়া শেষ হতে দেরি আছে। সন্তু ঝট করে একবার উঠে গেল। বাগানের রেস্তরাঁর একপাশেই হোটেল। এখানে লোক থাকে। লবিতে ফোন রয়েছে কয়েকটা। সন্তু পয়সা ফেলে ফোন করল বাড়িতে।

কাকাবাবু নেই, মা ধরলেন।

সন্তু একটু নিরাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু নেই ? ফিরলেই বলবে, গ্রিনভিউ হোটেল, একটি সতেরো বছর বয়েসী মেয়ে, চুনির মালা !"

মা দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললি ?"

সন্তু বলল, "মনে রাখতে পারবে না ? গ্রিনভিউ হোটেল, একটি সতেরো বছর বয়েসী মেয়ে..."

"তার মানে কী ?"

"তোমাকে মানে বুঝতে হবে না। শুধু কথাগুলো মনে রাখবে !"

"গ্রিনভিউ হোটেল ? তুই সেখানে কী করছিস ?"

"কাজ আছে। কাজ আছে।"

"একটা সতেরো বছরের মেয়ে ? তার সঙ্গে তোর কী করে ভাব হল ? সন্তু, ওইসব হোটেলের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে তোকে কে বলেছে ?"

"আঃ, কে বলেছে যে আমার সঙ্গে ভাব হয়েছে ? তার সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয়নি !"

"তবে তার কথা বলছিস কেন ?"

"তা তুমি বুঝবে না। শুধু কথাগুলো মনে রাখবে।"

"তুই দুপুরে বাড়িতে খেতে আসবি না ?"

"না।"

ফোন রেখে সন্তু আবার তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ওরা বিল মেটাচ্ছে। সন্তু আগেই বিল দিয়ে দিয়েছে, নিজের থলেটা তুলে নিয়ে চলে গেল এক কোণে।

ওরা খাবার টেবিল ছেড়ে চলে গেল হোটেলের লবির দিকে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল লিফ্‌টের সামনে। ওই হোটেলেরই কোনও ঘরে মেয়ে দুটি থাকে তা হলে ! কেননা, অল্প বয়েসী মেয়েটি চাবি চেয়ে আনল কাউন্টার থেকে।

লিফ্‌ট থামার পর অল্প বয়েসী মেয়েটি ঢুকে গেল, অসিত আর অন্য মহিলাটি গেল না। দূর থেকে সন্তু দেখল, সেই কম বয়েসী মেয়েটির গলায় দুলছে চুনির মালা। অন্য মহিলাটি ও অসিত হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ট্যাক্সিতে উঠল।

সন্তু একবার ভাবল, বাচ্চা মেয়েটা হোটেলের ঘরে একলা থাকবে, ওর কাছ

থেকে এখন যদি চুনির মালাটা কেউ কেড়ে নেয় ? সন্তুর কি উচিত মেয়েটার ঘরের বাইরে পাহারা দেওয়া ? কিন্তু মেয়েটা লিফ্‌টে উঠে কোন্ তলায়, কত নম্বর ঘরে গেল কে জানে !

তা ছাড়া কাকাবাবু তাকে বলেছেন, অসিতকে ফলো করতে।

অসিতদের ট্যাক্সি এল নিউ মার্কেটে। এখানে বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে ওরা গেঞ্জি, রুমাল, মোজা কিনল অনেকগুলো। এক দোকান থেকে চটিও কিনল অসিত। সন্তু পেছন-পেছন ঘুরছে, তার আর কিছুই করার নেই।

নিউ মার্কেটে কেনাকাটা সেরে অসিত সেই মহিলাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে চলে এল গঙ্গার ধারে। খানিকটা যাওয়ার পর এক জায়গায় ট্যাক্সিটা থামাল। তার থেকে নেমে এবার অসিত ভাড়া মিটিয়ে দিল, খালি ট্যাক্সিটা ঘুরে চলে গেল উলটো দিকে।

গঙ্গার ধার দিয়ে অলসভাবে পাশাপাশি হাঁটছে অসিত আর সেই মহিলাটি। দু'জনে মাথা নেড়ে কী যেন বলছে। কেউ রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে হাঁটলে, তাকে গাড়ি নিয়ে ফলো করা যায় না। সেটা বিচ্ছিরি দেখায়। সন্তুও গাড়িটাকে এক জায়গায় থামতে বলে নেমে পড়ল। অসিত এখনও তাকে লক্ষ করেনি। একবারও তার দিকে ফিরে চায়নি। একজন ছোট ছেলে অনুসরণ করবে, এরকমটা কেউ ভাবতে পারে না।

সন্তু ঠিক করল, 'অসিতের খুব কাছাকাছি গিয়ে হাঁটবে। ওরা কী কথা বলছে, তা শোনার চেষ্টা করবে।'

কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। ওদের কাছাকাছি যেতেই অসিত সেই মহিলাকে নিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল জলের ধারে। সেখানে একটা নৌকো থেমে আছে। নৌকোর মাঝির সঙ্গে দু-একটা কী কথা বলে ওরা নৌকোয় উঠে গেল, মাঝিটিও দড়ি খুলে দিল। সন্তু মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। এবার কী করা যায় ? কাছাকাছি আর কোনও নৌকো নেই। একটু দূরেই গোটা দু-এক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। অসিতদের নৌকোটা সেইদিকেই যাচ্ছে, একটু বাদেই জাহাজের আড়ালে চলে যাবে।

সেই সাদা রঙের গাড়িটাকে অনেকক্ষণ দেখেনি সন্তু। হঠাৎ কোথা থেকে খুব জোরে এসে থামল। কালো চশমা পরা লোকটি নেমে এসে দৌড়ে গঙ্গার ধারে রেলিং-এর কাছে গিয়ে দেখল অসিতদের নৌকোটা। মনে হল, এই লোকটাও খুব হতাশ হয়েছে। গাড়ি নিয়ে তো কোনও নৌকোকে ফলো করা যায় না। গঙ্গায় আরও অনেক নৌকো ভাসছে, কিন্তু এখানে ঘাটের কাছে একটাও নেই।

কালো চশমা-পরা লোকটা আবার ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। একবার যেন সন্তুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কিংবা অন্য কোনও কারণেও হাসতে পারে। তার গাড়িটা স্টার্ট নিয়েই ফুল স্পিডে চলে গেল হাওড়া ব্রিজের

দিকে।

সন্তু ক্যামেরা বার করে নৌকোটার ছবি তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু শাটার টেপা গেল না। তার মানে ফিল্‌ম শেষ।

সন্তুর মনে হল, আর অসিতকে ফলো করা মানে বৃথা চেষ্টা। শুধু-শুধু গাড়ি ভাড়া বাড়বে। নৌকো থেকে অসিত কোথায় নামবে, তার কি কোনও ঠিক আছে? গঙ্গার ওপারে চলে যেতে পারে।

গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "এবার কোথায় যাব? ট্যাক্সিটা তো চলে গেল, লোকটাকে এখন কোথায় পাবেন?"

সন্তু ধমক দিয়ে বলল, "আপনাকে বলেছি না, কোথায় যাব, কেন যাব জিজ্ঞেস করবেন না। এখন আমার বাড়িতে চলুন।"

ড্রাইভারটি ধমক খেয়েও মজা করে বলল, "আপনার বাড়ি কোথায়, সেটা কি আমার জানার কথা? আপনি কি রাজভবনে থাকেন?"

সন্তু বলল, "সোজা চলুন। তারপর বাঁ দিকে।"

একদম বাড়ির সামনে না গিয়ে কাছাকাছি এসে গাড়িটাকে ছেড়ে দিল সন্তু। বাড়ি চিনিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ড্রাইভারকে আর কিছু টাকা দিতে হল।

সন্তুদের পাড়াতেই একটা ফোটোগ্রাফির দোকান আছে, সেখানে এক ঘন্টার মধ্যে ফিল্‌ম ডেভেলাপ করে প্রিন্ট দেয়। সন্তুর নতুন ক্যামেরা, তাই ছবিগুলো দেখার খুব ইচ্ছে। ফিল্‌মের রোল্‌টা খুলে সেখানে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল সন্তু।

॥ ৮ ॥

কাকাবাবু সন্তুর প্রথম ফোন পাওয়ার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুপুরে আর বাড়িতে আসেননি। ফিরলেন প্রায় রাত আটটার সময়।

সারা দিনের রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সন্তু ছটফট করছিল। কাকাবাবু না ফিরলে সে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিল না। একবার শুধু দৌড়ে গিয়ে ছবিগুলো নিয়ে এসেছে। অনেকগুলো ছবিই উঠেছে বেশ ভাল।

কাকাবাবু ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিলেন। প্রথমেই স্নান করলেন, তারপর নিজের ঘরে এক কাপ কফি নিয়ে বসার পর সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি সকাল পৌনে দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত অসিত ধরকে ফলো করেছি, তারপর ওকে হারিয়ে ফেললাম। আর কোনও উপায় ছিল না। এতে কোনও কাজ হল কি?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই আগাগোড়া দারুণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিস। কোনও পেশাদার গোয়েন্দাও এত ভালভাবে কাজটা করতে পারত না।"

সন্তু বলল, "চুনির মালাটা যে অসিত ধর নিয়েছে, সেটা তো বোঝা গেছে। সেই মালাটা আছে গ্রিন ভিউ হোটেলে একটা মেয়ের কাছে। সেটা কী করে উদ্ধার হবে ?"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "ও মালাটা নকল !"

সন্তু আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ ? নকল ? কী করে জানা গেল ?"

কাকাবাবু বললেন, "অসিত ধর অতি চালাক। ও জানত, ওকে ফলো করা হবে। তাই আগাগোড়া তোদের সঙ্গে মজা করেছে। বউবাজারে গয়নার দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সেখানে কোনও মালা বিক্রি করেনি, কিছু কেনেওনি। চোরাই চুনির মালার জন্য সে-দোকান সার্চ করা হয়েছিল, সব কর্মচারীরা একবাক্যে বলেছে, ওরকম কোনও মালা দোকানে আসেনি। অসিত ওখানে কয়েকটা আংটি নিয়ে দর করছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু কেনেনি অবশ্য ! ব্যাঙ্কে গিয়েও সে কোনও চেক কিংবা টাকা জমা দেয়নি, শুধু দু' হাজার টাকা তুলেছে। সেটা কিছুই না। থিয়েটার রোডে একটা বাড়িতে যে-ফ্ল্যাটে গিয়েছিল, সেই ফ্ল্যাটের মালিক অসিতের মামা হন। অসিত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই ভদ্রলোক আগে পুলিশে কাজ করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁকে কোনওক্রমেই সন্দেহ করা যায় না।

সন্তু বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও ! অসিত ধর যে থিয়েটার রোডের একটা বাড়িতে গিয়েছিল, সেটা তো তোমাকে এখনও বলিনি। তুমি জানলে কী করে ?"

কাকাবাবু কয়েক পলক সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুই সাদা গাড়িটা দেখিসনি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি ! ওটা কাদের গাড়ি ?"

"পুলিশের গাড়ি !"

"আমি তো ভেবেছিলাম গুণ্ডাদের। কালো চশমা-পরা লোকটাকে আমার গুণ্ডা মনে হয়েছিল !"

"অনেক সময় গুণ্ডা আর সাধারণ পুলিশদের চেহারার তফাত বোঝা যায় না। সাদা গাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল।"

হঠাৎ সন্তুর খুব অভিমান হল। পুলিশই যদি সারাদিন অসিতকে ফলো করে যাবে, তা হলে সন্তুর এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল ?...

সন্তু অভিযোগের সুরে বলল, "পুলিশ ছিল, তা হলে কাকাবাবু, তুমি আমাকে পাঠালে কেন ?"

কাকাবাবু সন্তুর তোলা ছবিগুলো দেখতে-দেখতে বললেন, "পুলিশ যে যাবে, তা আমি আগে জানতাম না রে সন্তু। পুলিশ কমিশনার বলেছিল, অসিতের ব্যাপারে আমাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না। তবু সে গোয়েন্দা দফতরকে বলে অসিতের পেছনে লোক লাগিয়েছিল। আমি পরে জেনেছি।

তোর যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেদিকেও নজর রেখেছিল পুলিশ। যাই হোক, তুই যেমনভাবে দেখেছিস, তেমনভাবে তো পুলিশ দেখতে পারে না। তুই আজ পাকা ডিটেকটিভের মতন কাজ করেছিস। পুলিশ তো এত ছবি তোলেনি !"

সন্তু তবু নিরাশ গলায় বলল, "চুনির মালাটা নকল ? আমি ভেবেছিলাম..."

কাকাবাবু বললেন, "আমি নিজে গ্রিন ভিউ হোটেলে সে মেয়েটির ঘরে গিয়ে দেখেছি। মেয়েটির নাম রাজিয়া। ওর মায়ের নাম নাজিয়া সুলতানা। ওরা লন্ডনে থাকে, কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। অসিত লন্ডনেই ওদের চেনে। মেয়েটিকে একটা মালা উপহার দিয়েছে, সেটা চুনি তো নয়ই, আসল পাথরও নয়, ঝুটো। তোদের ঠকাবার জন্যই অমনভাবে দেখিয়ে-দেখিয়ে অসিত মালাটা দিয়েছে।"

সন্তু বলল, "তা হলে অসিত ধর বীরভূমের সেই পুরনো বাড়ি থেকে কী চুরি করেছে, তা জানা গেল না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ ! জানা গেল না। আমার মাথাতেও কিছুই আসছে না। হয়তো ও কিছুই চুরি করেনি। আগাগোড়াই আমাদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছে।"

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এ-বাড়ির কাজের লোক রঘু। সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে। সন্তু ভাবল, রঘু নিশ্চয়ই খেতে যাবার জন্য তাড়া দিতে এসেছে।

রঘু বলল, "নীচে একজন ভদ্রলোক ডাকছে। ওপরে আসবার জন্য খুব পেড়াপিড়ি করছে !"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "এত রাতে আবার কে ওপরে আসতে চায় ! দেখে আয় তো, সন্তু !"

সন্তু নীচে চলে গেল। সদর দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মারতেই সে দারুণ চমকে গেল। এরকম অবাক সে কখনও হয়নি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অসিত ধর !

অসিত হেসে বলল, "তোমার নামই তো সন্তু, তাই না ? আজ সারাদিন কলকাতা দেখা হল কেমন ? মাঝে-মাঝে সারা শহরটা এরকম ঘুরে দেখা ভাল !"

সন্তুর মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না।

অসিত সন্তুর মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করে বলল, "তুমি খুব ব্রাইট বয়। চলো, তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি !"

সন্তু প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতন অসিতকে নিয়ে এল ওপরে। অসিতের ব্যবহারের মধ্যে অপছন্দ করার কিছু নেই।

কাকাবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অসিত বেশ নাটকীয়ভাবে বলল, "নমস্কার, মিস্টার রায়চৌধুরী, নমস্কার। ভাল আছেন ? পায়ের ব্যথাটা

কমেছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “নমস্কার। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।”

অসিত একটা সোফায় এসে বসল। এখানেও তার হাতে সেই কালো ব্যাগ। সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বলল, “তা হলে কী ঠিক হল শেষ পর্যন্ত ? বোঝা গেল কিছু ? আমি বিমানদের বীরভূমের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করেছি, না করিনি ?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি হার স্বীকার করছি। আমি এখনও কিছু বুঝতে পারিনি। হয়তো আপনাকে মিথ্যে সন্দেহ করেছি।”

অসিত হা-হা করে খুব জোরে হেসে উঠল, তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বলল, “আপনি হার স্বীকার করছেন তা হলে ? আপনি বিখ্যাত লোক, আপনি অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন শুনেছি। আপনার মুখে হার-স্বীকারের কথা শোনাটা একটা নতুন ব্যাপার, কী বলুন ?”

কাকাবাবু বললেন, “নিজের ভুল স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই। আপনি তা হলে কিছু নেননি ওখান থেকে ?”

“হ্যাঁ, নিয়েছি।”

“নিয়েছেন ? সত্যি, কিছু নিয়েছেন ?”

“সে-কথা তো আপনার কাছে আগেই স্বীকার করেছি ! আসল প্রশ্ন ছিল, আমি কী নিয়েছি ? এবার বলে দিই ?”

“আগে বলুন, সে-জিনিসটা কোথায় লুকোনো ছিল ?”

“হুঁ ! সেটাই বড় কথা। আগে অনেকেই খুঁজেছে। সব্বাই বোকা ! চোখ থাকলেও অনেকে অনেক জিনিস দেখতে পায় না। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার কি মনে আছে যে, বিমানকে আমি বলেছিলাম, তার পাগলা-দাদুর ঘরের খাটের যে চারটে পায়া, সেগুলো বেশ দামি ?”

“সেই খাটের পায়াগুলো আমিও দেখেছি। কাঠের ওপর নানারকম কারুকার্য করা। সেগুলোর কিছু দাম পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই !”

“আপনি আসল ব্যাপারটাই দেখেননি, মিস্টার রায়চৌধুরী। ও ঘরে ঢোকা মাত্র আমি চিনতে পেরেছিলাম। ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে বড় লোকেরা ওই ধরনের খাটের পায়া ব্যবহার করত দুশো-আড়াইশো বছর আগে। ওই খাটের পায়াগুলো মাঝখান থেকে খোলা যায়। ভেতরে গর্ত থাকে। সেই গর্তে বড়লোকেরা দামি-দামি জিনিস লুকিয়ে রাখত।”

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, “আমার আবার পরাজয় ! অসিত ঠিকই বলেছে, খাটের পায়ার মধ্যে দামি জিনিস লুকিয়ে রাখার একটা প্রথা এক সময় ছিল ইউরোপে। বিমানরা তা জানে না। আমিও খেয়াল করিনি। কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আসল দামি জিনিস অসিত আগেই নিয়ে চলে গিয়েছে !”

অসিত বলল, "এমন কিছু দামি জিনিস নয়। নবাবের দেওয়া চুনির মালা-টালা যে একেবারে বাজে গপ্পো, তা আপনি স্বীকার করবেন? হিরে-জহরত নিয়ে যারা কারবার করে, তারা এসব খবর রাখে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরকম চুনির মালার কথা কেউ শোনেনি। আমার ধারণা, নবাব সিরাজ যদি সেরকম কোনও মালা দিয়েও থাকেন, তা হলেও ও-বাড়ির কোনও পূর্ব পুরুষ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। অমন একটা মালা ও-বাড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক পাগলের ঘরে থাকা সম্ভব নয়!"

অসিত বলল, "কিন্তু ওই ধরনের খাটের পায়া দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, ভেতরে কিছু লুকোনো আছে। খাটটা বেশ ভারী, সেটা তুলে পায়াগুলো খুলে দেখতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। সেইজন্যই আপনাকে ও-ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল, তাই আপনাকে আমি একটা আছাড় খাইয়েছিলাম। আমি দুঃখিত। তবে, আপনার যে অত জোরে লাগবে, পায়ের আধখানা নখ উড়ে যাবে, তা আমি বুঝিনি। ভেবেছিলাম, আপনার মাথায় খানিকটা চোট লাগবে, সবাই আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই-ই হয়েছিল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। বিমানরা ব্যস্ত হয়ে আমাকে ও-ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ডাক্তার ডাকল..."

অসিত বলল, "সেই সুযোগে আমি নিরিবিলিতে ঘরখানা ভাল করে খুঁজলাম, খাটের পায়া চারটেও খুলে দেখলাম।"

এবার অসিত কালো ব্যাগটা খুলে বার করল একগাদা পুরনো কাগজ। সেগুলো গোল করে গোটানো।

কাগজগুলো কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে অসিত বলল, "এগুলো বাজে কাগজ নয়। নানারকম জমির দলিল। বিমানবাবুকে পড়ে দেখতে বলবেন। হয়তো উনি আরও কিছু সম্পত্তি পেয়ে যেতে পারেন। ওঁর মামাদের যে অন্য জায়গাতেও জমিটমি ছিল, তা বোধ হয় উনি জানতেন না!"

কাকাবাবু একটা দলিল খুলে দেখলেন।

অসিত বলল, "তিনখানা খাটের পায়ায় এইসব দলিল ছিল। আর একখানায়..."

অসিত কোটের পকেটে হাত দিয়ে বার করল দুটো কাগজের মোড়ক। একটাতে রয়েছে চারখানা ছোট ক্রস। ক্রিশ্চান পাদ্রীরা যেগুলো গলায় ঝোলান।

অসিত বলল, "ধুলো জমে গেলেও এগুলো সোনার তৈরি। একটার পেছনে লেখা রয়েছে সেন্ট জোসেফ চার্চ, গোয়া। মনে হয়, বিমানবাবুর পাগলাদাদুর গুরু ছিলেন যে পাদ্রী, তাঁর জিনিস।"

আর-একটা কাগজের মোড়ক খুলে অসিত জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কি চিনতে পারছেন ?"

কাকাবাবু মোড়কটি হাতে নিলেন। সন্তু পাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে দেখে বলে উঠল, "এগুলো তো পুঁতি !"

অসিত হেসে বলল, "ছাদের ওই ঘরটায় অনেক ঝিনুক ছিল, পুঁতির মালা ছিল মনে আছে ? পাগলদের খেয়াল, অত পুঁতির মালা জমিয়ে তিনি হয়তো অন্যদের ঠকাতে চাইতেন। কিন্তু এগুলো পুঁতি নয়, খাঁটি মুক্তো !"

কাকাবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "মুক্তো ? এত ছোট-ছোট ?"

অসিত বলল, "হ্যাঁ, মুক্তো। আমি গয়নার দোকানে দেখিয়েছি। পুরনো খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাবেন, বছর চল্লিশেক আগে গোয়ার সমুদ্রের ধারে কিছু-কিছু ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো পাওয়া যাচ্ছিল। তাই নিয়ে হইচই হয়েছিল খুব। দলে-দলে লোক ছুটে গিয়েছিল গোয়ায়। সবাই ঝিনুক কুড়োতে শুরু করল। বিমানের পাগলা-দাদুটিও ঝিনুক কুড়িয়েছিলেন অনেক। এই বারোটা মুক্তো তিনি পেয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই ঘরে অত ঝিনুক !"

অসিত বলল, "মুক্তো পেয়ে তিনি ঝিনুকগুলোও ফেলেননি। চার-পাঁচশো ঝিনুক খুলে একটা মুক্তো পাওয়া যেত ! তবে, এগুলো মুক্তো হলেও কিন্তু তেমন দামি নয়। জাপানে এরকম মুক্তো অনেক পাওয়া যায়। এক-একটার দাম বড়জোর পাঁচশো টাকা।"

কাকাবাবু বললেন, "পাগলা-দাদু এগুলো কাউকে দিয়েও যাননি, কেউ খুঁজেও পায়নি !"

অসিত বলল, "তা হলে এগুলো আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার ?"

কাকাবাবু বললেন, "অবশ্যই। বিমানরা এগুলোর অস্তিত্বই জানে না। কাঠের পায়াগুলো এমনিই বিক্রি করে দিত কোনও কাঠের মিস্তিরির কাছে। সুতরাং এগুলো তোমারই প্রাপ্য !"

অসিত কালো ব্যাগটা বন্ধ করে বলল, মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি চোর নই। অন্যের জিনিস আমি নেব কেন ? এই চারটে সোনার ক্রস আর বারোটা মুক্তোর দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা তো হবেই। এর কিছু আমি চাই না। এগুলো আপনি সব বিমানবাবুদের দিয়ে দেবেন !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি দেব কেন ? তুমিই নিজে দিয়ে এসো।"

অসিত বলল, "আপনি দিলে আপনিও খানিকটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব পাবেন। আপনি বলবেন যে, আপনি সন্দেহ করেছিলেন বলেই আমি এগুলো ফেরত দিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো কৃতিত্ব চাই না। আমি তো স্বীকারই করছি যে, আমি তোমার কাছে হেরে গিয়েছি।"

অসিত বলল, "তবু এগুলো আপনার কাছেই থাক। বিমানবাবুর সঙ্গে দেখা করার আমি সময় পাব না।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অসিত সন্তুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

সন্তুর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "জানি, এই ছেলেটির মনের মধ্যে এখন কোন্ কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ও ভাবছে, খাটের পায়ার মধ্যে আরও কিছু ছিল কি? আরও কোনও দামি জিনিস? সেটা আমি নিয়ে পালাচ্ছি!"

সন্তু ঠিক সেই কথাটা ভাবছিল, তাই লজ্জা পেল।

অসিত বলল, "কী হে সন্তু, আমায় সার্চ করে দেখবে নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না! এই দামি জিনিসগুলো তুমি নিজে থেকে ফেরত দিয়ে গেলে। অন্য কেউ হলে হয়তো দিত না। কেউ কিছু জানতেও পারত না।"

অসিত বলল, "খাটের পায়ার মধ্যে অন্য আর কিছু ছিল না। এটা একেবারে ধ্রুব সত্য। এ-বিষয়ে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিয়ে যাচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

অসিত বলল, "এবার আমি চলি! আপনাকে নিয়ে আমি খানিকটা মজা করেছি, এই ছেলেটাকে আজ সারাদিন কলকাতা শহরে ঘুরপাক খাইয়েছি। এ জন্য আশা করি আমার ওপর রাগ পুষে রাখবেন না। তবে, আপনার পায়ের ওই আঘাতটার জন্য আমি দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত! একদিন আসবেন আমাদের বাড়িতে। অনেক পুরনো-পুরনো জিনিস আছে, দেখে আপনার ভাল লাগবে। আচ্ছা, নমস্কার!"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই ওকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।"

অসিত হাসিমুখে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে লাগল।

এই লোকটা কাকাবাবুকে হারিয়ে দিয়ে গেল, কাকাবাবু কিছুই করতে পারলেন না, এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সন্তু। এরকম আগে কোনওদিন হয়নি। লোকটা অতি ধুরন্ধর।

সদর দরজাটা বন্ধ রয়েছে। আর পাঁচখানা সিঁড়ি মাত্র বাকি, এই সময় সন্তু তাড়াহুড়ো করে আগে যাওয়ার ভান করে অসিতের পায়ে পা দিয়ে একটা ল্যাং মারল।

অসিত ধড়াম করে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। তার হাত থেকে ছিটকে গেল কালো ব্যাগটা।

সন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ইস, কী হল? আপনার লাগল? ইস, ছি-ছি-ছি, আমি দেখতে পাইনি। আমি ভাবলুম, আগে গিয়ে দরজাটা খুলে দেব।"

অসিতের বেশ লেগেছে। তার নাক দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সে রুমাল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল।

কালো ব্যাগটা খুলে গিয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে এসেছে শুধু একটা বই।

আর কিছু নেই। সন্তু নিজেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে একবার ঝাড়ল। লোকটা সত্যি কথাই বলেছে তা হলে, ব্যাগে আর কিছু লুকিয়ে রাখেনি।

অসিত চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "তোমার কাকাবাবুকে আমি আছাড় খাইয়েছিলুম, তুমি আমাকে ফেলে দিয়ে তার শোধ নিলে, তাই না ? স্মার্ট বয়। ঠিক আছে, এজন্য তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।"

বইটা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরল অসিত। বেরিয়ে এল রাস্তায়। এ-বেলাও সে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ট্যাক্সিতে উঠে অসিত বলল, "কাটাকুটি তো ? এর পর নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুত্ব হবে !"

ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে সন্তু উঠে এল কাকাবাবুর ঘরে।

কাকাবাবু সন্তুর তোলা ছবিগুলো মন দিয়ে দেখছেন। টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বেলে একখানা ছবি ভাল করে দেখার জন্য সেই আলোর নীচে ধরলেন। জুতোর দোকানে সন্তু যে ছবি তুলেছিল, তার একটা। ছবিটা খুব স্পষ্ট। দোকানে অনেক ভিড়, তার মধ্যে বসে অসিত বই পড়ে যাচ্ছে।

ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে কাকাবাবু ছবিটাকে আরও বড় করে দেখতে লাগলেন। আপনমনে বললেন, "লোকটার সত্যিই খুব বুদ্ধি, না রে সন্তু ? আমাদের একেবারে জব্দ করে দিয়ে গেল। জিনিসগুলো পর্যন্ত ফেরত দিয়ে গেল ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, অসিত ধর নিজেও কি ক্রিশ্চান ? সব সময় বাইবেল নিয়ে ঘোরে কেন ?"

কাকাবাবু যেন শুনতেই পেলেন না সন্তুর কথাটা। তিনি ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন।

সন্তু বলল, "আমি সারাদিন ওকে ওই বইটা পড়তে দেখেছি। খুব ভক্ত ক্রিশ্চান !"

কাকাবাবু হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যাঁ ? কী বললি ?"

সন্তু বলল, "অসিত ধর কি ক্রিশ্চান ? এইমাত্র ওর ব্যাগটা খুলে গেল, দেখলাম শুধু একটা বাইবেল..."

কাকাবাবু বিস্ফারিত চোখে সন্তুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। হাতের ছবিটা আবার দেখলেন।

তারপর নিজের গালে পটাশ করে এক চড় মেরে বললেন, "হোয়াট আ ব্লাডি ফুল আই অ্যাম !"

তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "সন্তু, লোকটা চলে গেল ? শিগগির চল, ওকে ধরতে হবে !"

ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু লাফিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন, সন্তু তাড়াতাড়ি ক্রাচ দুটো ওঁর বগলে গুঁজে দিল। কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে এমনভাবে হুড়মুড়িয়ে

নামতে লাগলেন, সন্তুর ভয় হল উনি পড়ে না যান।

রাস্তায় এসেই কাকাবাবু চিৎকার করে বললেন, "ট্যাক্সি! শিগগির একটা ট্যাক্সি ডাক।"

রাত প্রায় দশটা বাজে। এখন সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। হাজরার মোড়ের দিকে যেতে হবে। কাকাবাবুর এত ধৈর্য নেই। অস্থিরভাবে বলতে লাগলেন, "আঃ, দেরি হয়ে যাচ্ছে, যে-কোনও উপায়ে একটা ট্যাক্সি।"

এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমান জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?"

বিমানকে দেখে খুশি হওয়ার বদলে কাকাবাবু বললেন, "ইডিয়েট!"

নিজেই দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পড়ে ধমকে বললেন, "শিগগির চলো, এলগিন রোড।"

বিমান ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি একটা আস্ত গবেট। পাগলা-দাদুর ঘরটা অতবার খুঁজে দেখেছিলে, কিন্তু অত দামি জিনিস যে চোখের সামনে পড়ে আছে, তা বুঝতে পারোনি? যার দাম কয়েক কোটি টাকা!"

বিমানের পাশে-বসা দীপা প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "অ্যাঁ? কয়েক কোটি টাকা? সেই চুনির মালা?"

কাকাবাবু বললেন, "মালা না ছাই! সে মালা পাওয়া গেলেও তার দাম হত কয়েক হাজার মাত্র। আর এর দাম দশ কোটি টাকা তো হবেই। শুধু টাকা দিয়েও এর দাম কষা যায় না!"

বিমান বলল, "কী জিনিস? কী জিনিস?"

কাকাবাবু বললেন, "আগে অসিতের বাড়ি চলো!"

বিমান গাড়ির স্পিড দারুণ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "কী জিনিস, কাকাবাবু, বলুন, বলুন!"

কাকাবাবু বললেন, "একখানা বাইবেল!"

দীপা যেন অগাধ জলে পড়ে গিয়ে বলল, "বাইবেল? তার আবার অত দাম হয় নাকি? পাগলা-দাদুর ঘরে তো অনেকগুলো বাইবেল ছিল।"

এবার সন্তু ফিসফিস করে বলল, "গুটেনবার্গ বাইবেল?"

কাকাবাবু বললেন, "এই দ্যাখো, সন্তুও জানে। অথচ তোমরা জানো না?"

দীপা বলল, "গুটেনবার্গ বাইবেল কী রে, সন্তু? আমরা তো জানি বাইবেল বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। তা হলে ওটার অত দাম কেন?"

সন্তু বলল, "গুটেনবার্গ বাইবেল হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ছাপা বই। আমি এনসাইক্লোপিডিয়াতে পড়েছি, সে বাইবেল এখন পাওয়া যায় না। সেই বাইবেল পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস। কালেক্টারস আইটেম। কিছুদিন আগে একখানা পাওয়া গিয়েছিল, লন্ডনে নিলামে সেটার দাম উঠেছিল দশ

কোটি টাকা।”

কাকাবাবু বললেন, “পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ছাপা বই নয়। সাহেবদের অনেক আগে জাপান আর কোরিয়ার লোকেরা কাঠের ব্লক দিয়ে বই ছাপা শিখেছিল।”

বিমান বলল, “আমি যতদূর জানি, ইউরোপে প্রথম বই ছাপে ক্যাক্সটন।”

কাকাবাবু বললেন, “সে তো ইংল্যান্ডে। গুটেনবার্গ তারও আগে। জোহান গুটেনবার্গ ছিলেন একজন জার্মান। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মেটাল টাইপ। সেই টাইপ সাজিয়ে বই ছাপা। এতকাল তাই-ই চলেছে। গুটেনবার্গ ছিলেন সত্যিকারের প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁর টাকাপয়সা ছিল না। অন্যের কাছ থেকে ধার করে একটা প্রেস বানিয়েছিলেন। নিজের আবিষ্কার করা টাইপ দিয়ে মাত্র কয়েকখানা বাইবেল ছাপার পরেই তাঁর প্রেস বিক্রি হয়ে যায়। ১৪৫৫ সালে সেই প্রথম ছাপা কয়েকখানা বাইবেল পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ বই।”

দীপা প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতন ঢলে পড়ে গিয়ে বলল, “দশ কোটি টাকা? ওঃ ওঃ ওঃ! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল?”

বিমান বলল, “পাগলা-দাদুর ঘরে আরও অনেক বাইবেলের সঙ্গে গুটেনবার্গ বাইবেল মিশে ছিল? আমরা চিনব কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “অসিতের অভিজ্ঞ চোখ। এক নজর দেখেই চিনেছে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা, প্রত্যেক পাতার নীচে হাতে আঁকা রঙিন ছবি।”

বিমান বলল, “আমার পাগলা-দাদু ওই বাইবেল পেলেন কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “গোয়া। সেন্ট জোসেফ চার্চ। আগেই আমার মনে পড়া উচিত ছিল। ওই বাইবেলের এক কপি গোয়ার সেন্ট জোসেফ চার্চে সযত্নে রাখা ছিল। অনেক বছর আগে সেটা রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যায়। অনেক বইতে এ-কথা লেখা আছে। খুব সম্ভবত তোমার পাগলা-দাদুর যিনি গুরু ছিলেন, তিনি সেটা সরিয়েছিলেন। বিক্রি করতে পারেননি কিংবা চাননি। তিনি মারা যাওয়ার পর সেটা তোমার পাগলা-দাদুর কাছে আসে।”

রাত্তিরবেলা ফাঁকা রাস্তা, গাড়ি চলেছে দারুণ জোরে। এলগিন রোড প্রায় এসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, “অসিতের কী সাহস, আমার বাড়িতে, আমার সামনে সেই বাইবেল নিয়ে বসে ছিল। অন্য জিনিসগুলো ফেরত দেওয়ার নাম করে ধোঁকা দিয়ে গেল আমাকে। সন্তু যদি জুতোর দোকানে অত ভাল ছবি না তুলত, আর বাইবেলের কথা না বলত, তা হলে আমিও কিছুই বুঝতে পারতাম না! ছবিতে অসিতের হাতে যে-বই, সেই পাতাটার ছবি আমি আগে দেখেছি।”

সন্তু বলল, “সারাদিন ও বাইবেলটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।”

গাড়িটা জোরে ব্রেক কষল অসিতের বাড়ির সামনে। সবাই হুড়মুড় করে নামল গাড়ি থেকে।

সদর দরজা বন্ধ। তিনতলায় আলো জ্বলছে না। বিমান ঘন-ঘন বেল বাজাতেই দোতলার বারান্দা থেকে একজন বলল, "কে?"

বিমান বলল, "দরজাটা খুলে দিন, পুলিশ।"

লোকটি এসে দরজা খুলতেই সবাই তাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

এত গোলমাল শুনে তিনতলায় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে কাজের লোকটি।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "বাবু কোথায়? অসিতবাবু?"

লোকটি অবাক হয়ে বলল, "বাবু তো চলে গিয়েছে।"

"কোথায়?"

"বিলেত চলে গিয়েছেন, বাবু!"

"বিলেত গিয়েছেন? কখন?"

"সাড়ে আটটার সময় সুটকেস নিয়ে চলে গেলেন।"

কাকাবাবু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছেন ফ্ল্যাটের মধ্যে। সন্তুও সব ঘর খুঁজে দেখল। অসিত ধর কোথাও নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকেই সে আমার বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর চলে গিয়েছে। রাত সাড়ে বারোটার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ফ্লাইট আছে দমদম থেকে। এখনও গেলে তাকে ধরা যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "আর যদি ট্রেনে বম্বে কিংবা দিল্লি যায়? সেখান থেকে প্লেনে ওঠে? আজ ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়েছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "ট্রেনে গেলে এখন তাকে ধরার কোনও উপায় নেই। বম্বে-দিল্লি এয়ারপোর্টে জানিয়ে দিতে হবে। তার আগে দমদম গিয়ে একবার দেখা যাক। হয়তো ট্রেনের টিকিট কাটাও তার ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা।"

সবাই দুমদাম করে নেমে এল নীচে। গাড়িতে উঠেই বিমান বলল, "সবাই সিট ধরে বসে থাকো। আমি খুব জোরে চালাব। হঠাৎ ব্রেক কষলে ঝাঁকুনি লাগবে।"

দীপা বলল, "অ্যাকসিডেন্ট কোরো না। মরে গেলে আর অত টাকা পেয়েই বা লাভ কী হবে?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "বাইবেলটা পাওয়া গেলেও তার টাকা তোমরা পাবে না!"

বিমান বলল, "আগে তো জিনিসটা উদ্ধার করা হোক। তারপর ওসব চিন্তা করা যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বইটা একবার দেশের বাইরে নিয়ে গেলে আর উদ্ধারের

কোনও আশা নেই। এ-দেশের কাস্টমস বা পুলিশের লোকেরা ও-বই দেখে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।"

বাকি রাস্তা প্রায় কেউ কোনও কথা বলল না। গাড়ি ছুটল ঝড়ের বেগে। আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে।

বিদেশের যাত্রীরা যেখান থেকে চেক ইন করে, সেখানে বাইরের লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। কাকাবাবু সেই গেটের কাছে যেতেই একজন বন্দুকধারী রক্ষী তাঁকে আটকাল। কাকাবাবু তাকে ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করতেই আর একজন রক্ষী এসে বলল, "কী করছেন ? আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে !"

এইসব সাধারণ রক্ষী কাকাবাবুকে চেনে না। জোর করে ভেতরে ঢোকা যাবে না।

খানিকটা দূরেই দেখা গেল, সিকিউরিটি চেকের লাইন। তার সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে অসিত। সে-ও কাকাবাবুদের দেখতে পেল। তার মুখে কোনও ভয়ের ছাপ ফুটল না। বরং সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে সে একটা হাত তুলে কাকাবাবুর উদ্দেশে বলল, "টা-টা !"

তারপর সে ঢুকে গেল ভেতরে।

এখনও কিছুটা সময় আছে। একবার প্লেন ছেড়ে গেলে আর কিছু করা যাবে না।

কাকাবাবু একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, "এয়ারপোর্টে যে এস পি থাকেন, তাঁর নাম নজরুল ইসলাম না ? নামটা আমার মনে আছে।"

পুলিশটি বলল, "হ্যাঁ।"

"সেই নজরুল ইসলাম সাহেব কোথায় ?"

"তিনি কোয়ার্টারে আছেন।"

"শিগগির একবার তাঁকে ডাকুন। বিশেষ দরকার।"

"কী দরকার আমাকে বলুন। যে-কেউ বললেই কি আমাদের বড় সাহেবকে এয়ারপোর্টে আসতে হবে ?"

প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। অকারণ তর্ক করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

কাকাবাবু এবার ক্রাচ তুলে সাঙ্ঘাতিক রাগের সঙ্গে বললেন, "এবার আমি কাচ ভাঙব, অনেক কিছু ভেঙে হাঙ্গামা বাধাব, তখন এস পি-কে আসতেই হবে। যান, নজরুল ইসলামকে বলুন, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আমি পুলিশ কমিশনারের বন্ধু। আমার বিশেষ প্রয়োজনে ডাকছি। শিগগির যান।"

কাকাবাবু এবার একটা টেলিফোন বুথে পুলিশ কমিশনারকে ফোন করলেন বাড়িতে। তিনি বাড়িতে নেই। এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছেন। সেখানকার টেলিফোন নাম্বার জানিয়ে দিয়েছেন বাড়িতে।

সেই নাম্বারে ফোন করলেন কাকাবাবু। একজন লোক ধরে বলল, "হ্যাঁ,

তিনি আছেন, ডেকে দিচ্ছি।"

তারপর আর কেউ আসে না। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ধৈর্য হারিয়ে কাকাবাবু বারবার ক্রাচটা ঠুকছেন মাটিতে। বাড়ি থেকেই এই ফোনটা করা উচিত ছিল, তখন মনে পড়েনি।

একটু পরেই একজন বলল, "হ্যালো।"

পুলিশ কমিশনারের গলা চিনতে পেরেই কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "এখানে এত বড় একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে, আর তুমি আরাম করে নেমন্তন্ন খাচ্ছ ?"

পুলিশ কমিশনার হেসে বললেন, "আরে, রাজা, কী ব্যাপার বলো আগে ! নেমন্তন্ন খেতে এসে কী দোষ করলাম ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই অসিত ধর, তুমি তো তখন বিশ্বাস করোনি, সে একটা দশ কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি নিয়ে পালাচ্ছে !"

কমিশনার বললেন, "অ্যাঁ ? দশ কোটি টাকা ? ঠিক বলছ ? আমি এক্ষুনি চলে আসব এয়ারপোর্টে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আসতে-আসতে পাখি উড়ে যাবে। প্লেন ছাড়বে এক্ষুনি। দরকার হলে ওকে প্লেনের ভেতরে গিয়েও গ্রেফতার করতে হবে। সেই ব্যবস্থা করো।"

এই সময় নজরুল ইসলাম চলে এলেন। তিনি বললেন, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি তো আপনাকে চিনি। কী ব্যাপার বলুন তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই ফোনে কথা বলুন !"

পুলিশ কমিশনার কী সব নির্দেশ দিতে লাগলেন, আর নজরুল ইসলাম বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ সার ! না, সার ! ইয়েস সার। অবশ্যই সার !"

ফোন রেখে দিয়ে তিনি কাকাবাবুকে বললেন, "চলুন !"

অন্যদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে নজরুল ইসলাম কাকাবাবুকে তুলে নিলেন নিজের জিপে। সেই জিপ চলে এল এয়ারপোর্টের টারম্যাকে।

বিশাল প্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে বেশ খানিকটা দূরে। সিঁড়ির কাছে লাইন দিয়েছে যাত্রীরা। অসিতের সামনে দশ-বারোজন রয়েছে।

জিপটা একেবারে কাছে এসে থামল। কাকাবাবু নেমে গিয়ে অসিতের কাঁধে হাত দিয়ে শান্তভাবে বললেন, "বইটা দাও !"

অসিত মুখ ফিরিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন তা হলে ? অনেক দেরি হল, তাই না ? আমি এক্ষুনি প্লেনে উঠব। আমাকে আটকাবার কোনও ক্ষমতা আপনার নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "বইটা জাতীয় সম্পত্তি। একশো বছরের বেশি পুরনো কোনও বই দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। এটা বেআইনি !"

নজরুল ইসলাম বললেন, "আপনি লাইন থেকে বেরিয়ে আসুন। বইটা না

দিলে আপনাকে অ্যারেস্ট করব।"

অসিত এবার কটমট করে দু'জনের দিকে তাকাল। তারপর ব্যাগটা খুলে বইটা হাতে নিয়েই ব্যাগটা ছুড়ে মারল কাকাবাবুর মুখে।

কাকাবাবু এরকম কিছুর জন্য তৈরি ছিলেন, ব্যাগটা তাঁর মুখে লাগল না, তার আগেই লুফে নিলেন সেটা।

অসিত ফস করে পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে চিৎকার করে বলল, "দেব না। বইটা পুড়িয়ে ফেলব। দেব না!"

গণ্ডগোল দেখে ভয়ে অন্য যাত্রীরা ছিটকে সরে গেল দূরে। দু'জন সিকিউরিটি গার্ড রাইফেল তুলল। নজরুল ইসলামও রিভলভার বার করে উঁচিয়ে ধরলেন অসিতের দিকে।

অসিত বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠল, খবর্দার! আমার কাছ থেকে কাড়তে এলেই এটা আমি পুড়িয়ে দেব। নষ্ট করে দেব।"

নজরুল ইসলাম বললেন, "আপনি পাগল নাকি? আমি যদি গুলি করি। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। বইটার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, গুলি করার কোনও দরকার নেই। আমি জানি, অসিত কিছুতেই ও বই নষ্ট করবে না। ও বইয়ের মর্ম অসিত জানে। দাও, অসিত, বইটা আমাকে দাও।"

অসিত বলল, "দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না। এটা আমার আবিষ্কার! আমি ছাড়া কেউ খুঁজে পায়নি। এত বছর ধরে পড়ে ছিল।"

কাকাবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দাও, অসিত, বইটা দাও!"

অসিত বলল, "কাছে এলে আমি আপনাকে শেষ করে দেব। খুন করব।"

কাকাবাবু তবু আর-একটু এগিয়ে বললেন, "দাও, অসিত! আমি জানি, তুমি মানুষ খুন করতে পারো না।"

অসিত এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে বসে পড়ল মাটিতে। বইটা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে।

কাকাবাবু বইটা তুলে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন।

তারপর নজরুল ইসলামের হাতে বইটা দিয়ে বললেন, "সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বইটা আপনাকে দিলাম। এটা সারা দেশের সম্পদ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে জমা থাকবে, সব মানুষ দেখতে পাবে।"

তারপর তিনি অসিতের হাত ধরে বললেন, ওঠো, অসিত। তুমিই এটা আবিষ্কার করেছ। আবিষ্কারক হিসেবে তোমার নামই লেখা থাকবে। তোমার জন্যই তো আমরা এটা পেলাম।"

অসিতকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কাকাবাবু।

সাধুবাবার হাত

সন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলেজে যাবার জন্য বাসে উঠতে যাবে, এই সময় একটি বেশ জবরদস্ত চেহারার সাধু তার মুখোমুখি দাঁড়াল। সাধুটির মাথায় জটা, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বেশ লম্বা চেহারা, পরনে একটা গেরুয়া আলখাল্লা।

মেঘের ডাকের মতন গম্ভীর গলায় ভাঙা-ভাঙা বাংলায় সে বলল, এই লেড়কা, কুথা যাচ্ছিস ? কলেজে ? আজ তোর কলেজে যাওয়া হোবে না। গেলে তোর খুব বিপদ হবে। যা যা, ঘরে ফিরে যা।

সন্তু শুনে হাসল, একজন সাধুর কথা শুনে সে কলেজে যাওয়া বন্ধ করবে, এমন ছেলেই সে নয়। আর কলেজে গেলে যদি তার বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে তো সে আরও বেশি করে যাবে। বিপদের গন্ধ পেলেই তার মন চনমন করে ওঠে।

সে বলল, আচ্ছা সাধুবাবা, নমস্কার। তোমার কথা যদি মিলে যায়, তা হলে তোমাকে পরে একদিন মিষ্টি খাওয়াব ! এখন চলি।

হন হন করে পা চালিয়ে সে এগিয়ে গেল মোড়ের দিকে। দূরে বাস আসছে। হঠাৎ সন্তু পকেটে হাত দিল। এই রে, সে তো পয়সা আনেনি। জামা বদলেছে একটু আগে, আগের জামার পকেটে পয়সাগুলো রয়ে গেছে। বাসে উঠলে সে ভাড়া দিতে পারত না।

আবার তাকে ফিরে আসতে হল, বাড়ির সামনে সেই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে অন্য একটি লোকের হাত দেখছে। সন্তুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ভাবখানা যেন এই, কী বলেছিলুম না, কলেজে যেতে পারবি না।

সন্তু মনে মনে ঠোঁট উল্টে বলল, বাস ভাড়া নিতে ভুলে গেছি, এটা আবার একটা বিপদ নাকি ? কী আর হত, বড় জোর মাঝপথে বাস থেকে নামিয়ে দিত। এক্ষুনি আমি আবার পয়সা নিয়ে কলেজে যাব।

বাড়িতে ঢুকে সন্তু আগের জামাটা খুঁজতে গিয়ে দেখল সেটা সে ভুল করে বাথরুমে ছেড়ে এসেছে, আর মা এখন বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন।

তা হলে একটু দেরি করতে হবে। কলেজের ফার্স্ট পীরিয়ডটা বোধহয় আর করা হবে না।

এই সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

সন্তু টেলিফোনের রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে ভেসে এল তার বন্ধু জোজো-র গলা।

জোজো বললে, কী রে, তুই কলেজে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়িসনি তো ? যাক, ভাল করেছিস। আজ কলেজ ছুটি হয়ে গেছে।

সন্তু চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ ? কলেজ ছুটি ? কেন ?

জোজো বললে, আমাদের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মারা গেছেন হঠাৎ। আমি গিয়ে দেখি নোটিস ঝুলছে। তুই বাড়িতে থাক, আমি দুপুরবেলা যাচ্ছি তোর কাছে।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভুরু কুচকে বসে রইল। ব্যাপারটা কী হল ? রাস্তার একজন সাধুবাবা তাকে দেখে একটা কথা বললেন, অমনি সেটা মিলে গেল ? পুরোটা মেলেনি অর্ধেকটা। সত্যি তো তার কলেজে যাওয়া হল না।

দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখল, সাধুবাবা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে একজন লোকের হাত দেখছেন।

কৌতূহলী হয়ে সন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোকের হাত ধরে সাধুবাবা বলছেন, তুম যব ছোটা থা, একবার তোমার পা ভেঙে গেল ? ঠিক কি না ?

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, সাধুবাবা পা ভেঙেছিল। দু'মাস বিছানায় শুয়ে ছিলাম।

সাধুবাবা মাথা নেড়ে আবার বললেন, এখন তোমার পেট মে দরদ আছে। পেট বেথা করে মাঝে মাঝে ? ঠিক কি না ? শনি বক্রি আছে, শনি কাটাতে হবে।

লোকটি বলল, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাই।

তুম নোকরি করো...না, বেওসা ? হাঁ হাঁ, হাতে লেখা দেখছি বেওসা।

হ্যাঁ সাধুবাবা, আমি ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি। তবে ইদানীং আমার ব্যবসার...

তুমার এক বন্ধু জিগরি দোস্ত, তুমাকে চোট দিয়েছে। তোমার বেওসা ক্ষতি করে দিয়েছে।

লোকটি এবারে কাঁদো কাঁদো ভাব করে বলল, হ্যাঁ, সাধুবাবা, আমার এক বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার ব্যবসার সর্বনাশ করে দিয়েছে।

সাধুবাবা গম্ভীরভাবে বললেন, শনি বক্রি আছে। আংটি ধারণ করতে হবে।

সন্তু রীতিমতন অবাক। সাধুবাবা প্রত্যেকটি কথা মিলিয়ে দিচ্ছেন কী

করে ? হাত দেখে এরকম বলা যায় ? কাকাবাবু তো একদিন তাকে বলেছিলেন যে হাত দেখার ব্যাপারটা একেবারে গাঁজাখুরি ? আংটি বা মাদুলি ধারণ করাটাও কুসংস্কার।

সন্তু মুখ তুলে দেখল কাকাবাবু ও-বাড়ি থেকে বেরুলেন তক্ষুনি। সে ডেকে উঠল, কাকাবাবু, এদিকে এসো, একবার দ্যাখো।

সাধুবাবাকে দেখে কাকাবাবু হাসি মুখে কাছে এসে বললেন, কী আংটি বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি ?

সন্তু তাড়াতাড়ি বললে, কাকাবাবু, এই সাধুবাবা হাত দেখে যা বলছেন, সব মিলে যাচ্ছে।

সন্তুর কথায় মন না দিয়ে কাকাবাবু ধুতিপরা ভদ্রলোকটিকে বললেন, ও মশাই, সাধুবাবাজী আপনার হাত দেখে কী কী বলেছে ? ছোটবেলায় আপনার একবার হাত কিংবা পা ভেঙেছিল ? আপনার পেটে কিংবা বুকে ব্যথা ? আপনার অফিসের চাকরি কিংবা ব্যবসার অবস্থা এখন ভাল নয় ? একজন বন্ধু আপনার ক্ষতি করেছে।

এবারে সন্তু আর সেই ভদ্রলোক দু'জনেই স্তম্ভিত। কাকাবাবু এসব কথা জানলেন কী করে ?

কাকাবাবু বললেন, মশাই, ছেলেবেলায় কার না একবার হাত-পা ভেঙেছে। আমাদের সবারই ও-রকম হয়। অনেক বাঙালিরই পেটের রোগ থাকে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। চাকরি কিংবা ব্যবসার ব্যাপারেও সকলেরই কিছু-না-কিছু অভিযোগ থাকে। বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাওয়াও এমন কিছু নতুন কথা নয়। বিশেষ করে আপনাদের বয়েসেই বেশি হয়।

সাধুবাবা কটমট করে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুম্ কেয়া বোলতা হ্যায় ? তুম ভাগো হিঁয়াসে।

কাকাবাবু একটু ভয় পাবার ভান করে বললেন, ওরে বাবা ভস্ম করে দেবে নাকি ?

সাধুবাবা বললেন, তুম আপনা রাস্তামে যাও। তুম জানো আমি কে আছি ? আমি মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছু দেখতে পারি।

কাকাবাবু ধুতিপরা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সব আংটির পাথর-টাথরের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের কোনও যোগ নেই, বুঝলেন ? এটা আমার কথা নয়, পঁচাত্তর জন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এই কথা বলেছেন। পেটের রোগ কিংবা ব্যবসার রোগ আংটিতে সারে না।

সাধুবাবা এবারে কাকাবাবুর কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, বেওকুফ, তুই আমার কথা অবিশ্বাস করছিস। তুই দেখবি আমার ক্ষমতা ? দ্যাখ।

সাধুবাবা এবারে নিজের মাথার জটা থেকে কয়েকটা চুল ছিঁড়লেন পট করে। তারপর ধুতিপরা ভদ্রলোকটিকে ধমকে বললেন, ফুঁ দেও ! ফুঁ দেও !

ভদ্রলোকটি ভয় পেয়ে ফুঁ দিলেন সেই চুলে কয়েকবার। সাধুবাবা তারপর হাতটা একবার ঘুরিয়ে কাকাবাবুর মুখের সামনে এনে মুঠো খুললেন।

দেখা গেল সেই মুঠোতে চুল নেই, রয়েছে খানিকটা ছাই!

সাধুবাবা হুংকার দিয়ে বললেন, দেখ দেখ? মাথার চুল ছাই হয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এ তো অতি সাধারণ ম্যাজিক। আমিও ও-রকম দু-একটা ম্যাজিক জানি। ওসব থাক। সাধুবাবাজী তুমি যে লোকজনের হাত দেখে বেড়াও, তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করি। তুমি জাপানের হিরোসিমা নাগাসিকার নাম শুনেছ? ওই দুটো শহরে অ্যাটম বোমা পড়েছিল। অ্যাটম বোমা ফাটার কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়। এখন বলো তো, ওই সব লোকের হাতে কি লেখা ছিল যে, তারা একসঙ্গে মারা যাবে?

সাধুবাবা বললেন, কেয়া অ্যাটম বোম্! বোম ভোলানাথ।

কাকাবাবু বললেন, ও তুমি অ্যাটম বোমা কি তা জানো না! ঠিক আছে, ট্রেন কাকে বলে জানো তো? গত সপ্তাহে ট্রেন দুর্ঘটনায় যে আড়াই শো লোক মারা গেল; তাদের কি হাতে লেখা ছিল যে, তারা একই দিনে একসঙ্গে মরবে?

সাধুবাবা ধমক দিয়ে বললেন, ও সব বাত ছোড়ো! তুমার হাত দেখে আমি যদি সব কুছ বলে দিতে পারি?

কাকাবাবু বললেন, আমার হাত দেখার দরকার নেই। তোমার হাতটা বরং দেখি তো?

কাকাবাবু খপ করে সাধুবাবার বাঁ হাতটা চেপে ধরে উৎফুল্লভাবে বললেন, বাবা, হাতে সব লেখা আছে দেখছি! বাড়ি কোথায় ছিল বিহারে, তাই না?

সাধুবাবা আপত্তি করতে পারলেন না। মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেল।

কাকাবাবু আবার বললেন, যব লেড়কা থা, একবার হাত ভেঙেছিল না?

সাধুবাবা মাথা দু'দিকে জোরে জোরে নেড়ে বললেন, নেহি! নেহি মিলা!

কাকাবাবু বললেন, ও হাত না, পা! পা ভেঙেছিল! ঠিক না?

সাধুবাবা এবারে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও, আরও বলছি। তুমি যে সাধু হবে, তা তোমার হাতেই লেখা আছে, দেখছি। কেন সাধু হলে? আচ্ছা সাধুবাবা, তোমাদের গ্রামে একটা খুন হয়েছিল না? সত্যি কথা বলো...

সাধুবাবা এবারে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উল্টো দিকে ফিরে এক দৌড় লাগালেন। মিলিয়ে গেলেন চোখের নিমেষে।

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন হো হো করে।

ধুতিপরা লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ও মশাই, আপনি যা বললেন, তা সত্যি নাকি? আপনি কী করে জানলেন? হাত দেখে বলে দিলেন, ওদের গ্রামে খুন হয়েছে?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আন্দাজে, সব আন্দাজে বলেছি।

সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু তার কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় জোজো এসে হাজির। সন্তু তার ভুরু দুটো অনেকখানি ওপরে তুলে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল। অবাক হওয়ার মতনই ব্যাপার। জোজো সাঙ্ঘাতিক ঘুমকাতুরে। সাড়ে আটটা-ন'টার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেই না। সে এই সাত সকালে ছুটে এসেছে কেন ?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কি রে, বাড়িতে কোনও বিপদ হয়েছে নাকি ?"

জোজো বলল, "বিপদ ? আমাদের কক্ষনো কোনও বিপদ হয় না। কোনও বিপদকে আমরা বিপদ বলে গ্রাহ্যই করি না। আমার বাবা তো সব আগে থেকেই টের পেয়ে যান। একবার কী হয়েছিল জানিস ? আমরা বেড়াতে গেছি বোমডিলা। ডিসেম্বর মাস, দারুণ শীত। বোমডিলা জায়গাটার বিশেষত্ব হচ্ছে, ওখানে কোনও মশা-মাছি নেই। তবু দ্বিতীয় দিন রাত্তিরে বাবা বললেন, আমাকে মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে। ওখানে মশারি পাওয়া যায় না, কখনও দরকারই হয় না। তবু বাবা জোর করতে লাগলেন, অতিকষ্টে একটা মশারি জোগাড় হল। সেটা আমার বিছানায় টাঙিয়ে দেওয়া হল। তারপর কী হল বল তো ?"

সন্তু হাসল। সকালবেলাতেই জোজোর কল্পনাশক্তি বল্‌গাছাড়া ঘোড়ার মতন ছুটতে শুরু করেছে। এসব শুনতে সন্তুর ভালই লাগে।

সন্তু বলল, "আমি কী করে জানব ?"

জোজো চোখ বড়-বড় করে বলল, "সকালবেলা দেখি যে সেই মশারির ওপরে একটা বিষাক্ত সাপ। ফণা তুলে বসে আছে। মশারি না টাঙালে সেটা নির্ঘাত আমাকে ঘুমের মধ্যে ছোবল মারত। বাবা আগে থেকেই জেনে গিয়েছিলেন।"

সন্তু বলল, "খুব শীতের মধ্যে বিষাক্ত সাপ বুঝি ফণা তুলতে পারে ?"

জোজো বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বলল, "বোমডিলার সাপগুলো যে আলাদা জাতের, তা তুই জানিস না বুঝি ? ওরা কালনাগিনীর বংশধর !"

সন্তুর কুকুরটা ছটফট করছে। প্রত্যেকদিন এই সময় ওর পার্কে গিয়ে দৌড়নো অভ্যেস। সাদা ধপধপে কুকুর। ওর নাম রকুকু। সন্তু কখনও ওকে চেন দিয়ে বাঁধে না।"

রকুকু লাফিয়ে-লাফিয়ে সন্তুর জামা ধরে টানছে। বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাস্তায় পা দিয়ে সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে মহাশয়ের এই অসময়ে আগমনের কারণ কী তা জানতে পারি ?"

জোজো বলল, "একটা মুশকিলে পড়ে গেছি। পিন হেড মাশরুম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস, সন্তু ?"

"পিন হেড মাশরুম, সে আবার কী জিনিস ?"

"সকাল সাতটার মধ্যে জোগাড় করতেই হবে। না হলে ব্রেক ফাস্টের টাইম পেরিয়ে যাবে। তারপর আর উনি কিছু খাবেন না !"

"উনি মানে কিনি ?"

"সাইমন বুবুম্বা। তিনি তো আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন, কাল সন্ধেবেলা থেকে। চুপ, কাউকে যেন বলিসনি। খুব গোপন ব্যাপার।"

"কাকে বলব ! উনি কে তাই-ই তো আমি জানি না।"

"তুই সাইমন বুবুম্বার নাম শুনিসনি ? আফ্রিকার একটা খুব বড় রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ওঁর এত ক্ষমতা যে গাদ্দাফি আর সাদ্দাম হোসেনকে যখন-তখন ধমক দিতে পারেন। আফ্রিকার ওই দেশটায় সোনার খনি আছে তো, তাই টাকা-পয়সার শেষ নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেবের একটাই দুঃখ, তাঁর কোনও ছেলে নেই। তাই আমার বাবার কাছে এসেছেন কুষ্ঠি দেখাতে। ওঁর তো এমনিতেই সাতাশটা বউ। আর একটা বিয়ে করলে ছেলে হবে কি না জানতে চান।"

সন্তু শুনেছে যে, জোজোর বাবা একজন খুব বড় জ্যোতিষী। পৃথিবীর বড়-বড় বিখ্যাত লোকেরা নাকি তাঁর কাছে হাত দেখাতে আর ভাগ্য গণনা করতে আসেন। সন্তু অবশ্য তাঁদের একজনকেও এ-পর্যন্ত চোখে দেখেনি।

সন্তু বলল, "আফ্রিকার একটা দেশের প্রেসিডেন্ট গোপনে এসে তোদের বাড়িতে রয়েছেন, এই তো ! তার জন্য তোকে সকালবেলায় ছুটোছুটি করতে হবে কেন ?"

জোজো বলল, "ওই যে বললুম পিন হেড মাশরুম ! প্রেসিডেন্ট সাহেব ব্রেকফাস্টের সময় চারখানা ডিমের ওমলেট ছাড়া কিছু খান না। সেই ওমলেটে থাকবে রসুন আর মাশরুম। তাও যে-কোনও মাশরুম হলে চলবে না।"

"মাশরুম বুঝি অনেক রকম হয় ?"

"হয় না ? একরকম হয় ছাতার মতন। তাই বাংলায় এর নাম ব্যাঙের ছাতা। আর একরকম আছে কোটের বোতামের মতন, তার নাম বাটন মাশরুম। আর একরকম খুবই ছোট, আলপিনের ডগার মতন। প্রেসিডেন্ট

সাহেব সেই মাশরুম ছাড়া খাবেন না।"

"সে কি আমাদের দেশে পাওয়া যায়?"

"বাবা তো বলে বসলেন, হ্যাঁ পাওয়া যায়। আমাকে বললেন, যা খুঁজে নিয়ে আয়।"

"কোথায় খুঁজবি?"

"একবারটি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস কর না। উনি নিশ্চয়ই জানেন। কাকাবাবু সব জানেন।"

"দুঃখিত, জোজো। এই সময়ে আমি কাকাবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করতে পারব না। কোন দোকানে কী পাওয়া যায়, কাকাবাবু সেসব খবর কিচ্ছু রাখেন না। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, সুন্দরবনের মধু কোথায় পাওয়া যায় রে, নিউ মার্কেটে?"

"ঠিক বলেছিস, নিউ মার্কেট! ওখানে নাকি বাঘের দুধ, হাতির দাঁত, ময়ূরের পালক, হরিণের শিং, সব পাওয়া যায়। তা হলে কি আর সবরকম ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যাবে না? চল সন্তু, চট করে একবার নিউ মার্কেট ঘুরে আসি।"

রকুকু অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল, সন্তু শিস দিয়ে তাকে কাছে ডাকল।

তারপর বলল, "আমি রকুকুকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি, এখন নিউ মার্কেট যাব কী করে? তা ছাড়া এত সকালে কি নিউ মার্কেট খোলে?"

জোজো বলল, "ট্রাম চলতে শুরু করেছে, আমরা ট্রামে যাব। এইসব দোকান ভোরবেলাতেই খুলে যায়।"

সন্তু তবু অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, "কুকুর নিয়ে ট্রামে উঠতে দেবে না!"

জোজো বলল, "আলবাৎ দেবে! এখন বেশি ভিড় হয় না।"

তারপর সন্তুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, "কেন তোর সাহায্য চাইছি, জানিস? আমার পেছনে স্পাই ঘুরছে। ওই দ্যাখ না বড় রাস্তার মুখে একজন দাঁড়িয়ে আছে।"

সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন, তোর পেছনে স্পাই ঘুরবে কেন?"

জোজো বলল, "প্রেসিডেন্ট বুবুম্বা সাহেবের যে অনেক শত্রু। তারা এ-পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেব যে কোথায় উঠেছেন, তা এরা এখনও জানে না।"

সন্তু দূরের লোকটির দিকে একবার তাকাল। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে একজন বড় গোঁফওয়ালা লোক একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে বাঙালি বলে চেনা যায়। আফ্রিকার একজন প্রেসিডেন্টের জন্য বাঙালি স্পাই কেন জোজোর পেছনে ঘুরবে তা বুঝতে পারল না সন্তু। তবে, জোজোর কথা সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করতে পারল না। এত ভোরে কষ্ট করে উঠে এসে কি জোজো নিছক একটা মিথ্যে গল্প বানাবে?

ওরা এগিয়ে গেল ট্রাম স্টপের দিকে।

ঠন্‌-ঠন করতে-করতে একটা ট্রাম এল একটু বাদেই। যাত্রী মাত্র কয়েকজন। গত দু'দিন খুব বৃষ্টি হওয়ার দরুন এই গ্রীষ্মকালের সকালেও শীত-শীত ভাব আছে বলে বেশি লোক রাস্তায় বেরোয়নি।

রকুকুকে কোলে তুলে নিয়ে ট্রামে উঠে পড়ল সন্তু আর জোজো। সেই গোঁফওয়ালা লোকটিও উঠল ওদের পেছন পেছন।

জোজো সন্তুর দিকে চোখের ইঙ্গিত করল।

সন্তু ভাবল, এমনও তো হতে পারে, লোকটি ট্রামের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

ওরা বসতে না বসতেই ট্রাম-কন্ডাক্টর কাছে এসে বলল, "এ কী, না, না। কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না।"

জোজো বলল, "আমরা কুকুরেরও টিকিট কাটব।"

কন্ডাক্টর বলল, "টিকিট কাটতে হবে না। তোমরা নেমে যাও!"

অন্য যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে রকুকুকে দেখছে।

গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, "যাক না। বেশ তো সুন্দর কুকুর।

কন্ডাক্টর বলল, "চলবে না। নেমে পড়ো। আমি কুকুর দেখলেই ভয় পাই। একবার আমাকে কুকুর কামড়েছিল, আর চোদ্দটা ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল।"

সন্তু বলল, "আমার কুকুর অকারণে কাউকে কামড়ায় না!"

এই সময় রকুকু ছটফটিয়ে সন্তুর কোল থেকে নেমে পড়ল লাফিয়ে। তারপর সে চলন্ত ট্রামের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল।

কন্ডাক্টরটি একটা সিটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে, ভয়ে চোখ কপালে তুলে চ্যাঁচাতে লাগল, "ওরে বাবা, আমাকেই কামড়াবে, আবার চোদ্দটা ইঞ্জেকশান!"

সন্তু আর জোজো সিট ছেড়ে ধরবার চেষ্টা করল রকুকুকে। গোঁফওয়ালা লোকটাও জিভ চুকচুক করে বলতে লাগল, "আয় আয়, এদিকে আয়—"

কেউ রকুকুকে ধরতে পারছে না, সে ফুড়ুত-ফুড়ুত করে পালিয়ে যাচ্ছে। সিটের তলায় ঢুকে পড়ল। সব যাত্রীরা তটস্থ!

রকুকু একবার কন্ডাক্টরটির সামনে এসে মুখ তুলে ভুক-ভুক করে ধমকের সুরে ডাকল, যেন তাকে অপমান করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

তারপর রকুকু আবার দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে এক লাফে নেমে পড়ল রাস্তায়।

জোজো ট্রাম থামাবার জন্য জোরে-জোরে বেল বাজাতে লাগল। তার মধ্যেই সন্তু লাফিয়ে পড়েছে। আছাড় খেতে খেতে কোনও রকমে সামলে নিয়ে সন্তু শিস দিয়ে ডাকল, "রকুকু, রকুকু!"

অমনই বেশ শান্তশিষ্ট ভাবে রকুকু সন্তুর কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগল।

ট্রামটা একটু দূরে থেমেছে। সেখান থেকে জোজো ছুটে এসে হাসিমুখে

বলল, "খুব ভাল হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। রকুকু আমাদের বাঁচিয়ে দিল।"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে ?"

"স্পাইটা নামতে পারেনি ! ও আর আমাদের পিছু ধরতে পারবে না.!"

"ও লোকটা সত্যিই স্পাই ছিল ?"

"আলবাৎ ! দেখলি না। রকুকুকে ধরবার চেষ্টা করছিল !"

"স্পাইরা বুঝি কুকুর ধরতে যায় ? যাক গে যাক ! কিন্তু এখন নিউ মার্কেট অবধি যাওয়া যাবে কী করে ? হেঁটে যাওয়া যাবে না। অনেক দূর।"

"তুই কুকুরটাকে বাড়িতে রেখে চলে এলে পারতি, সন্তু !"

"রকুকু রোজ সকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়। ওকে নিয়ে না গেলে ও ডেকে-ডেকে বাড়ির সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিত।"

"তা হলে এক কাজ করা যাক। ওই দ্যাখ একটা দোতলা বাস আসছে। ওকে লুকিয়ে কোলে নিয়ে আমরা একেবারে দোতলায় উঠে যাব। কন্ডাক্টর দেখতে পাবে না। আর যদি দেখতেও পায়, তার সঙ্গে তর্ক করতে-করতে আমরা চলে যাব অনেকখানি। তারপর নেমে পড়ে আমরা আর একটা বাসে উঠব !"

"কিন্তু রকুকু যদি বাসের দোতলা থেকে ঝাঁপ দেয় ?"

"এবার ওকে শক্ত করে ধরে থাকব। ওই যে বাস এসে পড়েছে, চল, চল, উঠে পড়ি।"

ভোরবেলা প্রথমে ট্রাম চলে। বাস বেরোতে দেরি হয়। কিন্তু একটা দোতলা বাস সত্যিই চলে এসেছে সকাল-সকাল। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তার অনেকের গায়েই সোয়েটার বা শাল জড়ানো। নরম-নীল আকাশ। এখনও ধুলো-ময়লা উড়তে শুরু করেনি, এই সময় কলকাতা শহরটাকে বেশ ভালই দেখায়।

বাস থামতেই রকুকুকে সোয়েটারের মধ্যে চাপাচুপি দিয়ে ওরা দু'জনে উঠে গেল দোতলায়। বসল গিয়ে একেবারে সামনে, জানলার কাছে। রকুকুকে রাখল দু'জনের মাঝখানে। ওদের পাশের সিটটাতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে ওদেরই বয়েসী আর একটা ছেলে। তার চোখে গোল চশমা।

সন্তু আর জোজো দু'জনেই রকুকুকে চেপে ধরে রাখলেও রকুকু ওই অবস্থায় থাকতে রাজি হবে কেন ? সে ছটফটিয়ে দু'বার ভুক-ভুক করে ডেকে উঠল !

পাশের সিটের ছেলেটি চোখ গোল-গোল করে এদিকে তাকাল।

জোজো বলল, "ওঃ কী শীত, ভ-র-র-র ! ভ-র-র-র !"

রকুকু আরও দু'বার ডেকে উঠল।

জোজো বলল, "সন্তু, তুই সেই গানটা জানিস, হেমো গয়লার গান...।" উত্তর পাওয়ার আগেই সে নিজে গানটা গেয়ে উঠল :

হেমো গয়লার ছিল যে এক চাষা-বাড়ি
চাষা-বাড়ি-ই-ই-ই
সেথায় ছিল মস্ত বড় একটা কুকুর পাল
হেথায় করে ঘেউ ঘেউ, হোথায় করে ভুক ভুক
হেথায় ঘেউ, হোথায় ভুক
ভুক ভুক ভুক ভুক ভুক
হেমো গয়লার ছিল যে এক...

গানটা শেষ হতেই পাশের সিটের চশমা-পরা ছেলেটা এক গাল হেসে বলল, "তোমরা বুঝি একটা কুকুর লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ ?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে না বলতে যাচ্ছিল, সন্তু বলল, "হ্যাঁ ! ধরা পড়ে গেলি রে, জোজো। তোর গানটা কোনও কাজে লাগল না।"

চশমা-পরা ছেলেটি বলল, "আমিও রোজ নিয়ে যাই। এই দ্যাখো না !"

গায়ের চাদর সরিয়ে সে একটা সুন্দর, ছোট্ট কুকুর দেখাল। সেই কুকুরটা কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল।

অন্য কুকুরের সাড়া পেতেই রকুকু পিঠ উঁচু করে বেরোবার চেষ্টা করে ডেকে উঠল "ভু-ভু-ভু-ক ! ভু-ভু-ভু-ক !"

দুটো কুকুরে শুরু হয়ে গেল ডাকাডাকি প্রতিযোগিতা।

পেছন দিকের একজন যাত্রী বিরক্ত হয়ে বলল, "এ কী, বাসের মধ্যে এত কুকুরের ডাক শুরু হয়ে গেল কী করে ? সকালবেলা একটু নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম করারও উপায় নেই !"

আর একজন যাত্রী বলল, "বাড়িতে কুকুর, রাস্তায় কুকুর, আবার বাসের মধ্যেও কুকুর ? ওঃ, আর পারা যায় না !"

কন্ডাক্টর নীচে ছিল, এবার উঠে এল ওপরে। একেবারে সামনের দুটো সিটের মাঝখানে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কী, ব্যাপারটা কী ?"

কুকুর দুটোকে আর গোপন করার উপায় নেই। তারা ডেকেই চলেছে !

পেছনের দু'জন যাত্রী বলল, "ও কন্ডাক্টর দাদা, নামিয়ে দিন, ওদের নামিয়ে দিন !"

কন্ডাক্টর বলল, "হ্যাঁ, কুকুর নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই ! নেমে যেতে হবে।"

জোজো বলল, "নিয়মটা কোথায় লেখা আছে, একবার দেখান তো !"

কন্ডাক্টর বলল, "নিয়ম দেখাতে হবে ? তার আগে কুকুরটা দেখি তো ভাল করে ?"

নিচু হয়ে রকুকুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "বাঃ, এ তো ভাল জাতের কুকুর। কী সুন্দর। আমার নিজের দুটো কুকুর আছে।"

তারপর সন্তুর চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতন ভঙ্গিতে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস

করল, "তোমরা কত দূর যাবে ভাই ?"

সন্তু বলল, "নিউ মার্কেট ।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অন্য যাত্রীদের শুনিয়ে বলল, "না। কুকুর নিয়ে তো বাসে চাপা যায় না। আচ্ছা ভাই, তোমাদের এই কুকুরটার বয়েস কত ?"

সন্তু বলল, "আড়াই বছর ।"

কন্ডাক্টর বলল, "ওঃ, বাচ্চা কুকুর ! আমাদের নিয়ম হচ্ছে চার বছর বয়েস হয়ে গেলে সে কুকুরকে বাসে তোলা যায় না। তার কম বয়েস হলে কোলে করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, কুকুরটা লম্বায় কতখানি ?"

সন্তু কখনও মেপে দেখেনি, আন্দাজে বলল, "এক ফুটের মতন হবে !"

কন্ডাক্টর বলল, "বাঃ, দেড় ফুট হয়ে গেলে সে কুকুর নট অ্যালাউড। এক ফুট পর্যন্ত চলতে পারে।"

চশমা-পরা ছেলেটি বলল, "আমার কুকুর তার চেয়েও ছোট। বয়েস মাত্র দেড় বছর ! আর দশ ইঞ্চি হাইট ।"

কন্ডাক্টর বলল, "তা হলে তোমরা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো। এত ছোট তো কুকুর হয় না, কুকুরের বাচ্চা !"

জোজো চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক। আমার বড়মামা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, তাঁর কাছ থেকে আমি আগেই জেনে নিয়েছি।

পেছন থেকে একজন রাগী গলায় বলল, "এ রকম অদ্ভুত নিয়ম আমরা তো কখনও শুনিনি। এক ফুট কুকুর তোলা যাবে আর দেড় ফুট তোলা যাবে না ! যত সব বাজে কথা।"

আর-একজন বলল, "এই যে কন্ডাক্টর দাদা, কুকুর সুদ্ধু ওদের নামিয়ে দিন।"

কন্ডাক্টর বলল, "আমাকে তো নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মের বাইরে আমি যেতে পারি না !"

রাগী লোকটি বলল, "ঘোড়ার ডিমের নিয়ম ! কুকুরের বয়েস বোঝা যায় নাকি ? আমি যদি বলি, ওই কুকুরটার বয়েস তিন বছর নয়, দশ বছর !"

চশমা-পরা ছেলেটি বলল, "খবর্দার, আপনি আমার কুকুরের বয়েস বাড়াবেন না।"

জোজো বলল, "আমার ছোটকাকা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার। তিনি এই নিয়ম বানিয়েছেন। আপনি ঘোড়ার ডিমের নিয়ম বলে তাঁকে অপমান করতে পারেন না !"

অন্য একজন বলল, "এই যে একটু আগে বললে তোমার বড় মামা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ? এর মধ্যে সে ছোটকাকা হয়ে গেল ?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "আমার বড় মামাকে তাঁর পাড়ার ছেলেরা ছোটকাকা বলে ডাকে, তাই আমিও মাঝে-মাঝে বলে ফেলি !"

কন্ডাক্টর হাত তুলে বলল, "আস্তে, আস্তে ! আপনারা একটু চুপ করে বসুন। নীচের তলায় আমার পার্টনার আছে, তার কাছ থেকে আমি ভাল করে নিয়মটা জেনে আসছি !"

কন্ডাক্টর ধুপধাপ করে নেমে গেল নীচে।

কয়েকজন যাত্রী রাগে গজগজ করতে লাগল। কিছু যাত্রী এ সব ব্যাপারে মাথা না গলিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। জোজো আর চশমা-পরা ছেলেটি হাসতে লাগল মিটিমিটি। দু' দিকের দুটো কুকুর ভুক-ভুক আর কুঁই-কুঁই করে ডেকেই চলল !

কন্ডাক্টর আর আসেই না !

সেই রাগী যাত্রীটি কিছুক্ষণ পরে অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল "ও কন্ডাক্টর দাদা, কী হল, আপনার পার্টনারকে খুঁজে পাচ্ছেন না ?"

কন্ডাক্টর আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে বলল, "হ্যাঁ। ওদের নেমে যেতে হবে। নেমে যাও ভাই তোমরা। নিউ মার্কেট এসে গেছে। নিউ মার্কেট !"

জোজো আর সন্তু রকুকুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে রাগী লোকটির দিকে এক ঝলক হাসি ছুড়ে দিল জোজো।

সন্তু কন্ডাক্টরকে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ !"

চশমা-পরা ছেলেটিও নেমে এসেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। সে বলল, "আমিও এই কাছেই একটা বাড়িতে যাব।"

সন্তু আর জোজো নিউ মার্কেটের কাছে এসে দেখল সব বন্ধ। মেইন গেটে তালা। শুধু বাইরের দিকের এক কোণে কয়েকটা ফুলের দোকান খুলেছে।

জোজো বলল, "যাঃ, কী হবে ? আমাকে যে সাতটার মধ্যে জিনিসটা নিয়ে পৌঁছতেই হবে !"

সন্তু বলল, "তা হলে চল ওই ফুলের দোকানগুলোতে জিজ্ঞেস করি। ওরা হয়তো বলতে পারবে, পিন হেড মাশরুম কোথায় পাওয়া যায়।"

"জিনিসটা সরু-সরু দেশলাই কাঠির মতন। কচ কচ করে কাঁচাই চিবিয়ে খেতে হয়।"

"তুই খেয়েছিস ?"

"বাবার সঙ্গে যেবার আফ্রিকা গিয়েছিলাম, তখন কত খেয়েছি। ওগুলো খেলে গায়ে দারুণ জোর হয়। সেইজন্যেই তো আমি এক ঘুঁষিতে একটা নারকোল ফাটিয়ে দিতে পারি।"

"পারিস ?"

"তুই একটা নারকোল নিয়ে আয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ?"

"এই সকালবেলা আমি নারকোল কোথায় পাব, জোজো ?"

"ঠিক আছে, তোর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রইল, সন্তু। তোকে আমি নারকোল

ফাটিয়ে দেখিয়ে দেব !"

সন্তু ফুলের দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল।

এত সকালেই এরা এত ফুল কী করে জোগাড় করে কে জানে ! দোকান ভর্তি নানারকম ফুল। কতরকম গোলাপ ! জুঁই, রজনীগন্ধা, স্থলপদ্ম। আরও এমন ফুল আছে, সন্তু সেগুলোর নাম জানে না। দু'জন লোক বড়-বড় বালতি ভর্তি জলে ফুলগুলো ডোবাচ্ছে, কাঁচি দিয়ে ডাল ছাঁটছে, আর একজন রং-তুলি নিয়ে লাল গোলাপকে বেশি লাল করছে।

এখনও গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করেনি, নিউ মার্কেটের সামনেটা একেবারে ফাঁকা। রকুকু মনের আনন্দে সেখানে ছোটাছুটি করতে লাগল।

সন্তু একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কাছে ব্যাঙের ছাতা আছে ?"

দোকানদারটি গম্ভীরভাবে বলল, "এটা ছাতার দোকান নয়, ফুলের দোকান।"

সন্তু বলল, "আমি ছাতা বলিনি। ব্যাঙের ছাতা। ব্যাঙের ছাতাকেও একরকম ফুল বলা যেতে পারে।"

দোকানদারটি মুখ ভেংচি কেটে বলল, "মোটেই না ! এঃ, সক্কালবেলা ব্যাঙের ছাতার নাম শুনলেই খারাপ লাগে !"

জোজো বলল, "আর একটা ফুলগাছের নাম বাঁদরলাঠি !"

দোকানদারটি বলল, "এখান থেকে যাও তো ভাই, বিরক্ত কোরো না।"

জোজো ওপরের দিকের এক গোছা ফুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওগুলো কী ? পিংক রজনীগন্ধা মনে হচ্ছে।"

দোকানদার বলল, "না, ওগুলো অন্য ফুল !"

জোজো বলল, "আলবাৎ পিংক রজনীগন্ধা ! আমি ফুল চিনি না ? জানিস সন্তু, এগুলো খেতে দারুণ লাগে। পিন হেড মাশরুম যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এতেই চলবে। আমাদের ওই প্রেসিডেন্ট এই পিংক রজনীগন্ধা খেতেও খুব ভালবাসেন। এতেও আমার কাজ হয়ে যাবে।"

জোজো হাত বাড়িয়ে সেই ফুলের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে কচ কচ করে চিবিয়ে বলল, "বাঃ, খুব টাটকা। স্বাদও ভাল। সন্তু, একটু খেয়ে দেখবি নাকি ?"

সন্তু বলল, "না, না।"

জোজো দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "এই এক ডজন ফুল কত দাম ?"

দোকানদার বলল, "ও ফুল বিক্কিরি হবে না !"

জোজো বলল, "কেন ?"

দোকানদার বলল, "যারা ফুল খায়, তাদের আমরা ফুল বিক্কিরি করি না !"

জোজো বলল, "ইল্লি আর কী ! আমি দাম দিলে আপনি বিক্রি করবেন না কেন ? কেনার পর আমি সে ফুল দিয়ে পুজো করি কিংবা খেয়ে ফেলি, তাতে

আপনার কী ?”

দোকানের অন্য একজন লোক বলল, “সকালবেলা প্রথম খদ্দের ফেরাতে নেই। তাতে অকল্যাণ হয়। ঠিক আছে, এক ডজন ফুল নিয়ে যান, দশ টাকা দিন।”

জোজো বলল, “অত দাম ? মোটেই না। পাঁচ টাকা দিতে পারি।”

লোকটি বলল, “এ ফুল অত শস্তা নয়। প্রথম খদ্দের, তাই শস্তায় দিচ্ছি। আট টাকা লাগবে। তার কমে হবে না।”

জোজো বলল, “তা হলে আমি চার টাকা দেব।”

“অ্যাঁ ! এই যে বললেন পাঁচ টাকা দেবেন ?”

“দোকানদার যা দাম বলবে, তার আদ্ধেক দেব, এই আমার নিয়ম !”

“প্রথমে পাঁচ টাকা বলেছিলেন, পাঁচ টাকাই দিন অন্তত।”

“তা হলে আমি আড়াই টাকা দেব।”

“ওরে বাবা, প্রথম খদ্দের নিয়ে এত ঝামেলা...আপনাকে...আপনাকে আমি বিনা পয়সায় দিচ্ছি, যান, নিয়ে যান।”

“ বিনা পয়সায় দিলে আমাকে দু' ডজন দিতে হবে !”

“ওরে বাবারে, আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছি, দিনটা কী সাঙ্ঘাতিক যাবে, সকালবেলাতেই এত লোকসান, হায় রাম, হায় রাম, প্রথম খদ্দের, যান, দু' ডজনই নিয়ে যান, কিচ্ছু দিতে হবে না। আর কিছু চাইবেন না তো ?”

সন্তু জোজোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

জোজো এবার একগাল হেসে ফেলে বলল, “আমার বন্ধু রাগ করছে। আমি বিনা পয়সায় কারও কাছ থেকে কিছু নিই না। মরদ কা বাত, হাতি না দাঁত ! প্রথমে পাঁচ টাকা বলেছি, দিচ্ছি পাঁচ টাকা, এক ডজন দিন !”

ফুল হাতে নিয়ে সে-দোকান থেকে খানিকটা দূরে সরে এসে জোজো বলল, “মাশরুমের বদলে বেশ ভাল জিনিসই পাওয়া গেল। পিংক রজনীগন্ধা। স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। এই ফুলের একটা আমি খাব, একটা বাবা খাবেন। আর বাকি দশটা প্রেসিডেন্ট সাহেব খেয়ে ফেলবেন ডাঁটা সুদ্ধু। কী তাড়াতাড়ি যে উনি খেয়ে ফেলবেন, তুই কল্পনাই করতে পারবি না, সন্তু।”

সন্তু বলল, “জোজো, আমি তোর বাড়িতে এখন যাব ? এত ফুল একজন মানুষ কী করে খেতে পারে, একবার দেখব !”

জোজো চোখ কপালে তুলে বলল, “ভেরি সরি, এখন কাউকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বারণ। প্রেসিডেন্ট সাহেব যে আমাদের ওখানে আছেন, সেটা টপ সিক্রেট। তুই যেন মুখ ফসকে কাউকে বলে ফেলিস না !”

॥ ২ ॥

জোজোর কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা যায় না কখনও। কতটুকু যে সত্যি আর কতটা গুল, সেটাই ধরা মুশকিল।

দু'দিন বাদে কাগজে একটা খবর বেরোল। আফ্রিকার একটি রাজ্যের প্রেসিডেন্টের ভাই কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল থেকে উধাও হয়ে গেছেন। তিনি দার্জিলিং যাওয়ার পথে কলকাতায় ছিলেন। হোটেলের ঘরে তাঁর সব জিনিসপত্র পড়ে আছে। কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে দু'জন সেক্রেটারি এসেছে, তারা কিছুই বলতে পারছে না।"

তা হলে আফ্রিকার কোনও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট না হোক, প্রেসিডেন্টের ভাই একজন এসেছিলেন ঠিকই। জোজো কোনওক্রমে সেটা জানতে পেরেছিল। হয়তো সেই প্রেসিডেন্টের ভাই জোজোর বাবার সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু জোজোদের বাড়িতে তো তিনি ছিলেন না, ছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। কাগজে লিখেছে, প্রেসিডেন্টের ভাই সাইমন বুবুম্বা খুব পণ্ডিত লোক, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন, তিনি কি কাঁচা কাঁচা রজনীগন্ধা চিবিয়ে খান ?

কলেজের গেটের কাছে জোজোর সঙ্গে দেখা হতেই সে ফিসফিস করে বলল, "তোকে বলেছিলুম না, আমার পেছনে স্পাই ঘুরছে ? দেখলি তো, প্রেসিডেন্টকে গুম করে দিল ?"

সন্তু বলল, "উনি তো প্রেসিডেন্ট নন, প্রেসিডেন্টের ভাই !"

জোজো বলল, "পরের বছর উনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে।"

সন্তু বলল, "উনি কি তোদের বাড়িতে থাকতেন ? কাগজে যে লিখেছে, গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছিলেন। হোটেলে থাকলে তো সবাই জানতে পারে।"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "কাগজে অনেক ভুল লেখে। কাকাবাবুকে তুই একটু বল না। উনি চেষ্টা করলে হয়তো বুবুম্বাকে খুঁজে বার করতে পারবেন।"

"কাকাবাবু এখন খুব ব্যস্ত। কী নিয়ে যেন খুব পড়াশোনা করছেন সারাদিন। তোর বাবা তো জ্যোতিষী। তিনি গুনেটুনে বলে দিতে পারেন না, ওঁকে কোথায় ধরে রাখা হয়েছে ?"

"বাবা তো এখানে নেই। কাল রাত্তিরের প্লেনেই চলে গেলেন আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট বুশ ডেকে পাঠিয়েছেন। খুব আর্জেন্ট !"

"কেন, প্রেসিডেন্ট বুশ তোর বাবাকে ডেকে পাঠালেন কেন ?"

"খুব গোপন ব্যাপার ! আমেরিকায় এ-বছর ইলেকশান হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট

খুশ ভয় পেয়ে গেছেন, দ্বিতীয়বার জিততে পারবেন না। সেইজন্য বাবাকে দিয়ে একটা মাদুলি তৈরি করতে চান। অষ্টবজ্র মাদুলি! সেই মাদুলি ধারণ করলে যে-কোনও ইলেকশান একেবারে ফুঃ! তুড়ি মেরে বেরিয়ে যাবে!"

"আমাদের দেশের নেতারা ভোটের সময় তোর বাবার কাছ থেকে ওই মাদুলি ধারণ করতে যায় কেউ?"

"ওই মাদুলির কত খরচ জানিস? নিরানব্বই লাখ টাকা। দশ দিন যজ্ঞ করতে হবে, তিন কেজি প্ল্যাটিনাম লাগবে... অত টাকা দেওয়ার হিম্মত আর কার আছে?"

"আচ্ছা, জোজো, তুই তোর বাবার কাছ থেকে জ্যোতিষ বিদ্যেটা শিখে নিস না কেন? তা হলে আর তোকে চাকরি করতে হবে না।"

"সব শেখা হয়ে গেছে। গুলে খেয়েছি। তুই কী জানতে চাস বল না! তোর পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সব বলে দিতে পারি।"

"মাফ করো ভাই, জোজো। আমি জ্যোতিষে—হাত দেখা-টেখায় বিশ্বাস করি না। আমাদের বাড়িতে কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

এই সময় ওদের ক্লাসের আরও তিন চারটি ছেলে এসে পড়ায় এ-কথা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা ঢুকে গেল ক্লাসে।

কলেজে সন্তু চুপচাপ থাকে। তার বয়েসী ছাত্রদের তুলনায় সন্তু বেশ বিখ্যাত। সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে গেছে, খবরের কাগজে সেসব বেরিয়েছে। কিন্তু সন্তু সেসব নিয়ে কলেজে কোনও আলোচনা করতে চায় না। অবশ্য তার ভালনাম সুনন্দ, সেই নামেই সমস্ত ছেলেরা তাকে চেনে, তার ডাকনামটা জানে না অনেকেই।

জোজো সব সময় জমিয়ে রাখে। তার গল্পের শেষ নেই। কামস্কাটকা, পাপুয়া নিউগিনি, আদ্দিস আবাবা এই সব কত জায়গা সে ঘুরে এসেছে বাবার সঙ্গে। একবার প্লেন ক্র্যাশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগরে, সেখান থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছে। আর একবার উগান্ডার জঙ্গলে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল সিংহর কবলে, শুধু টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে সিংহ দুটোর চোখ ধাঁধিয়ে কাবু করে দেয়।

ক্লাস চলছে। সবাই মন দিয়ে শুনছে সারের লেকচার। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ডেস্কের ওপর। জোজো খাতা খুলে হিজিবিজি ছবি আঁকছিল, হঠাৎ এক সময় এক টুকরো পাথর পকেট থেকে বার করে রাখল টেবিলের ওপর। দেখলে মনে হয় সাধারণ একটা কালচে রঙের পাথরের টুকরো।

জোজোর একপাশে বসেছে সন্তু, অন্যপাশে অভিজিৎ। সন্তু কোনও কৌতূহল দেখাল না, সে লেকচার শুনে শুনে নোট নিচ্ছে। অভিজিৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী রে?"

জোজো বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছিস, একটা পাথর।"

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, "পাথর তো বুঝলাম, এটা তুই পকেটে রাখিস কেন ?"

জোজো বলল, "এটা আমি সব সময় পকেটে রাখি। এর কত দাম, তা শুনলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি। তবে, মাঝে মাঝে পকেট থেকে বার করে রোদ খাওয়াতে হয়।"

"পাথরকে রোদ খাওয়াতে হয় ?"

"হ্যাঁ। নইলে এ পাথর নরম তুলতুলে হয়ে যাবে !"

অভিজিৎ হি-হি করে জোরে হেসে উঠল।

প্রোফেসর পড়া থামিয়ে এদিকে তাকালেন। প্রোফেসর জি সি বি গম্ভীর ধরনের মানুষ, কখনও হাসেন না, সবাই তাঁকে সমীহ করে। জোজো আর অভিজিৎ মাথা নিচু করে লেখায় মন দিল।

একটু পরে জোজো আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "এই অভিজিৎ, বোকার মতন হাসলি কেন রে ?"

অভিজিৎ বলল, "পাথর নরম হয়ে যায়, তাই শুনে হাসি পেয়ে গেল !"

জোজো অবজ্ঞার সুরে বলল, "নরম পাথর বুঝি হয় না ? জানিস না কিচ্ছু ! এই পাথরটা...এই পাথরটা চাঁদ থেকে আনা হয়েছে। এটা একটা চাঁদের টুকরো। সারাদিন রোদ্দুর খেলে রাত্তিরবেলা চকচক করে।"

অভিজিৎ বলল, "এটা চাঁদের পাথর ?"

জোজো বলল, "না হলে কি এমনই পকেটে নিয়ে ঘুরছি ?"

অভিজিৎ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সার, সার, রজত একটা চাঁদের পাথর নিয়ে এসেছে !"

সারা ক্লাসে অমনই হইচই পড়ে গেল।

জি সি বি পড়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন।

অভিজিৎ পাথরটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "দিস ইজ আ মুন স্টোন সার !"

জোজো তার ইংরিজি শুদ্ধ করে দিয়ে বলল, "মুন স্টোন নয়, সে তো অন্য জিনিস, লোকে আংটিতে পরে। দিস ইজ আ পিস অফ স্টোন ফ্রম দা মুন।"

সন্তু আগাগোড়া চুপ করে আছে, একটাও কথা বলেনি। মিটিমিটি হাসছে শুধু। জোজোর কাণ্ডকারখানা দেখে সে আর অবাক হয় না।

জি সি বি এগিয়ে এসে পাথরটা নিজের হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "এটা সত্যিই চাঁদের টুকরো ? তুমি এটা পেলে কী করে ?"

জোজো বলল, "আমাকে নীল আর্মস্ট্রং দিয়েছেন। প্রথম মানুষ যিনি চাঁদে পা দিয়েছিলেন, সেই নীল আর্মস্ট্রং। উনি পকেটে ভরে অনেক টুকরো নিয়ে এসেছিলেন তো !"

অধ্যাপক একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়ে বললেন, "নীল আর্মস্ট্রং ! তিনি তোমাকে দিলেন, মানে, তোমার সঙ্গে তাঁর কোথায় দেখা হল ?"

জোজো বলল, "কলকাতায়। উনি তো এখানে অনেকবার এসেছেন। আমায় খুব ভালবাসেন। নীল সাহেব আমার ছোট কাকার সঙ্গে হার্ভার্ডে পড়েছেন যে এক ক্লাসে। দু'জনে পাশাপাশি বসতেন। আমাদের বাড়িতে এসে উনি ডাল-ভাত খান। ঝিঙে-পোস্ত ওঁর খুব পছন্দ!"

ক্লাসের অনেক ছেলে হাসতে শুরু করেছে। কিন্তু জি সি বি মুখ্যভাবে পাথরটা দেখতে লাগলেন। আপন মনে বললেন, "এ ঘটনা তো কাগজে বেরনো উচিত। চাঁদের পাথর, দারুণ দামি জিনিস। হাতে ধরাটাও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা রজত, নীল আর্মস্ট্রং তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেননি তো? একটা যে-কোনও পাথর দিয়েই যদি বলা যায় চাঁদের পাথর..."

জোজো বলল, "সার, আমার ছোটকাকা একজন সায়েন্টিস্ট। মাইক্রো কারবন টেস্ট করে দেখে নিয়েছেন।"

জি সি বি আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক!"

এই সময় ঘন্টা পড়ে গেল। ক্লাস শেষ। জোজো সারের হাত থেকে পাথরটা নিয়ে অবহেলার সঙ্গে পকেটে ভরে ফেলল। তারপর বীরদর্পে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, "বাড়ি যাই। আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে অমিতাভ বচ্চন আসবে চা খেতে। বেচারিকে ছদ্মবেশে আসতে হয়, নইলে বাড়ির সামনে বড্ড ভিড় হয়ে যায়।"

কলেজের বাইরে এসে সন্তু আর জোজোকে খুঁজে পেল না। সে আগেই কোনও বাসে উঠে পড়েছে।

জোজোর স্বভাব জানে সন্তু। কাল যদি জোজোকে ওই চাঁদের পাথরটার কথা জিজ্ঞেস করা হয়, ও হেসে উড়িয়ে দেবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলবে, "সেটা রেখে দিয়েছি ছাদের এক কোনায়। আজ একটা অন্য জিনিস দেখবি?"

তারপরই জোজো আর-একখানা চমক দেবে।

বাড়ি ফিরে সন্তু জলখাবার খেয়ে নিল। তারপর জামা-প্যান্ট বদলে গেল সাঁতারের ক্লাবে। গরমকালে প্রত্যেকদিন সন্তুর সাঁতার কাটা অভ্যেস। সকালবেলা সময় পায় না, তাই বিকেলের দিকে যায়।

সাঁতারের ক্লাব পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না সন্তু। সামনের রাস্তায় দারুণ ভিড়। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে একখানা গাড়ি ঘিরে চ্যাঁচামেচি করছে। এক গাড়ি পুলিশও এসে গেল। কী ব্যাপার, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

অন্যদের কথাবার্তা শুনে সন্তু বুঝল, সেরকম, কিছু নয়। বিখ্যাত সিনেমা-স্টার অমিতাভ বচ্চন এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, কিছু লোক তাঁকে চিনে ফেলেছে। সবাই চায় ওঁর অটোগ্রাফ নিতে, কেউ-কেউ ওঁর গলায় শোলে ফিল্মের দু' চারটে ডায়ালগ শুনতে চায়।

সন্তু মনে-মনে হাসল।

জোজো অনেক রকম খবর রাখে। কোথা থেকে জেনেছে যে অমিতাভ

বচ্চন এখন কলকাতায়। তা হলে জোজোদের বাড়িতে ওঁর চা খেতে যাওয়াটা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা যায় না।

অমিতাভ বচ্চন ছদ্মবেশ ধরতে ভুলে গেলেন কেন ?

এতসব ঝঞ্ঝাট দেখে সাঁতার না কেটেই ফিরে এল সন্তু।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়েই সন্তুর চক্ষু স্থির। প্রথম পাতাতেই বড় বক্স করে ছাপা হয়েছে, চাঁদের পাথর চুরি !

কলকাতার মিউজিয়ামে এক টুকরো চাঁদের পাথর রাখা ছিল, সেটা গতকাল চুরি হয়ে গেছে। এই পাথরটা মার্কিন সরকার দিয়েছিল। এ-পর্যন্ত আমেরিকানরাই শুধু চাঁদে নেমেছে। তারা যে পাথর কুড়িয়ে এনেছে, তার কিছু-কিছু দেওয়া হয়েছে অন্য কয়েকটা দেশকে। আমাদের দেশ পেয়েছে পাঁচটা টুকরো। সেগুলো দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর আর কলকাতার মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। একমাস বাদে আবার পাথরগুলো আমেরিকায় ফেরত চলে যাবে। তার মধ্যে কলকাতারটা চুরি হয়ে গেছে খুবই রহস্যময়ভাবে। রাখা হয়েছিল খুবই সাবধানে। বুলেট প্রুফ কাচের বাক্স, সবাই দূর থেকে দেখবে। কেউ কাচের বাক্সটার গায়ে হাত দিলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। রাত্তিরে মিউজিয়াম ভালভাবে পাহারা দেওয়া হয়। কেউ কিছু টের পায়নি, কিন্তু গতকাল সকালে দেখা গেছে সেই কাচের বাক্সটা খোলা। পাথরটা উধাও হয়ে গেছে !

সন্তুর বুকের ভেতরটা ধক-ধক করতে লাগল। জোজোটা কোনও পাগলামি করেনি তো ? এটা যদি জোজোর কীর্তি হয়, তা হলে ওকে খুব সহজেই পুলিশে ধরে ফেলবে। কাল কলেজে ক্লাসসুদ্ধু ছেলেমেয়েরা জোজোর কাছে চাঁদের পাথর দেখেছে। অধ্যাপক জি সি বি দেখেছেন। কেউ না কেউ পুলিশকে বলে দেবেই।

চাঁদের পাথর অতি দুর্লভ জিনিস। নীল আর্মস্ট্রং পকেট থেকে লজেন্স বার করার মতন একটা ওই পাথর জোজোকে দিয়ে যাবেন, এ কি হতে পারে ? সব ক'টা টুকরোই মার্কিন গভর্নমেন্টের সম্পত্তি !

চুরির কথা জানা গেছে কাল সকালে। আর দুপুরবেলাতেই জোজো একটা পাথর দেখিয়েছে। এটা কি কাকতালীয় ? না কি, জোজো বারফট্টাই দেখাতে গিয়ে সত্যিই এরকম কাণ্ড করেছে !

ছি ছি, পুলিশ যদি এখন জোজোকে ধরে তা হলে কী হবে ? জোজো কতটা সত্যি বলে আর কতটা বানায়, তা যে ধরাই যায় না। ওটা সত্যি যদি চাঁদের পাথর হয়, তা হলে জোজোর ওপর সন্দেহ তো পড়বেই !

খবরের কাগজখানা হাতে করে সন্তু কাকাবাবুর ঘরে চলে এল।

কাকাবাবু একটা পাতলা সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে ইজি চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। সামনে একটা ছোট্ট টুলের ওপর পা-দু'খানা তোলা।

সন্তু পাশে গিয়ে বলল, "কাকাবাবু, এই খবরটা পড়েছ ?"

কাকাবাবু এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তোর এ-ব্যাপারে এত আগ্রহ হল কেন ? তুই ডিটেকটিভ হতে চাস নাকি ?"

সন্তু বলল, "না, তা নয়, তবে আমি ভাবছি, হঠাৎ কেউ এই পাথরটা চুরি করতে গেল কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "যেসব জিনিস খুব সাবধানে, পাহারা দিয়ে রাখা হয়, সেসব জিনিসের ওপরেই চোরেদের লোভ বেশি হয়। কেউ-কেউ বেশি দুঃসাহস দেখাবার জন্য সেগুলো চুরি করতে যায়।"

"চাঁদের পাথরের দামও নিশ্চয়ই অনেক ?"

"তা তো হবেই। যে-জিনিস কম পাওয়া যায়, তারই দাম বেশি হয়। ইস্পাত কিংবা লোহার তুলনায় সোনা অনেক কম আছে, সোনা সেইজন্য দামি। পৃথিবীতে হিরে-চুনি-পান্নার মতন মূল্যবান পাথরের তুলনাতেও চাঁদের পাথর আর কতটা ? চাঁদের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য বেশি বড়-বড় পাথর ভেঙে আনা হয়নি ! কয়েকটা বড়-বড় পাথর সরে গেলে চাঁদটা যদি আঁকাবাঁকা ভাবে ঘুরতে শুরু করে তা হলে কী হবে বল তো ?"

"তা হলে পৃথিবীতে সমুদ্র, নদীগুলোতে জোয়ার-ভাটা সব উলটোপালটা হয়ে যাবে !"

"ঠিক বলেছিস। ভাব দেখি, চাঁদটা পৃথিবীর একটু কাছে চলে এল, অমনই সমুদ্রের জল লাফিয়ে উঠতে শুরু করল ! জলস্তম্ভ হয়ে কত দেশ ভেসে যাবে। সেইজন্যই চাঁদের অভিযাত্রীরা খুব হিসেব করে ছোট-ছোট কিছু টুকরো নিয়ে এসেছে। এগুলো একেবারে অমূল্য। বৈজ্ঞানিকদের কাছে চাঁদকে ভাল করে জানার অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। আবার এক হিসেবে এই পাথরগুলোর কোনও দামই নেই।"

"কেন ?"

"কেউ এই পাথর তো অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারবে না ! এ-পর্যন্ত চাঁদ থেকে যত পাথর আনা হয়েছে, সবই সরকারি সম্পত্তি। কেউ নিজের কাছে রাখতে পারবে না। বিক্রি করা না গেলে আর দাম কিসের !"

সন্তু হঠাৎ চুপ করে গেল। তার মনের মধ্যে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। জোজো মিথ্যে কথা বলেছে, না সত্যি কথা বলেছে ? যদি পুরোটাই মিথ্যে কথা বলে থাকে, তা হলেও বোধ হয় পুলিশ ওকে ছাড়বে না !

আমতা-আমতা করে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

কাকাবাবু খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "কী রে, তোর কী হয়েছে ? কী জিজ্ঞেস করবি ? তার জন্য ঘাড় চুলকোচ্ছিস কেন ?"

সন্তু বলল, "আমার বন্ধু জোজোকে তো তুমি চেনো ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, চিনব না কেন ? সেই যে আমাদের সঙ্গে একবার

মধ্যপ্রদেশে গেল, যেবারে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে আমরা একটা অপূর্ব সুন্দর নীল মূর্তি উদ্ধার করলাম !"

"জোজো কাল আমাদের একটা চাঁদের পাথর দেখিয়েছে !"

"তাই নাকি ? কী করে বুঝলি সেটা চাঁদের পাথর ?"

"জোজো বলল, ওটা নীল আর্মস্ট্রং নিজে ওকে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু হা-হা করে খুব জোরে হেসে উঠলেন। দু-তিনবার নীল আর্মস্ট্রং-এর নাম উচ্চারণ করে বললেন, "নীল আর্মস্ট্রং যাকে তাকে চাঁদের পাথর বিলি করে বেড়ায়, এমন তো শুনিনি ! আমি সেবারেই লক্ষ করেছি, তোর ওই বন্ধুটির কল্পনাশক্তি খুব প্রবল !"

"জোজো তা হলে মিথ্যে কথা বলেছে ?"

"উচ্চ কল্পনাশক্তি আর মিথ্যে কথা ঠিক এক নয়। মিথ্যে অনেক রকম। পয়লা এপ্রিল কেউ যদি এপ্রিল ফুল করার জন্য কিছু বলে, তাকে ঠিক মিথ্যে বলা যায় না। অনেকে বানিয়ে-বানিয়ে গল্প বলে। যাকে আমরা বলতুম গুল মারা। তোরাও কি তাই বলিস ?

"হ্যাঁ।"

"গুলবাজরা খুব মজার লোক হয়, সাধারণ মিথ্যুকদের সঙ্গে তাদের তফাত আছে।"

"মিউজিয়াম থেকে কাল সকালে চাঁদের পাথরটা চুরি গেছে। আর দুপুরবেলা জোজো আমাদের চাঁদের পাথর বলে একটা পাথর দেখাল। এটা জানতে পারলে পুলিশ ওকে সন্দেহ করবে না ?"

"তা করতে পারে অবশ্য। পুলিশ তো আর আসল চোরকে সহজে ধরতে পারবে না, ওকে নিয়েই টানাটানি করবে !"

"জোজোর বাবা এখন ইণ্ডিয়াতে নেই। পুলিশ যদি জোজোকে জেলে ভরে দেয়—"

"তুই এক কাজ কর, সন্তু। জোজোকে গিয়ে বল, ওটা নিয়ে এক্ষুনি এখানে চলে আসতে। আমি পাথরটা একবার দেখতে চাই।"

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে কাকাবাবু বাথরুমে চলে গেলেন।

এই ঘরেই টেলিফোন। সন্তু চট করে জোজোদের বাড়ির নম্বর ঘোরাল। জোজোই ওদিক থেকে প্রথম হ্যালো বলল।

সন্তু উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "এই জোজো, আজকের খবরের কাগজ পড়েছিস ?"

জোজো বলল, "না। কেন ? সকালবেলাতেই ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ বাবাকে ফোন করেছিলেন একটা ব্যাপার জানতে। বাবা তো কলকাতায় নেই। কুইন তখন আমায় বললেন, মাস্টার জোজো, তুমি তো তোমার বাবার

কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছ। তুমি এটা বলতে পারবে না ? আমি যত বলি, ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমি অতটা শিখিনি, তবু তিনি বলতে লাগলেন, তুমি একবার পুজোয় বসে চেষ্টা করে দ্যাখো না !"

"ইংল্যান্ডের রানি তোর কাছে কী জানতে চাইলেন ?"

"সেটা টপ সিক্রেট। তোকে বলা যাবে না। এই সন্তু, টেলিফোনটা বেশিক্ষণ আটকে রাখিস না। একটু বাদেই নরওয়ের রাজার ফোন করার কথা আছে। ওঁর জিনিসটা অবশ্য আমি রেডি করে রেখেছি।"

"ওসব রাজা-রানির কথা ছাড় তো, জোজো। আজকের কাগজ পড়ে দ্যাখ। সব কাগজেই ফার্স্ট পেজে বেরিয়েছে।"

"কী বেরিয়েছে তাই বল না ! এখানে কাগজ নেই হাতের কাছে।"

"কলকাতার মিউজিয়াম থেকে চাঁদের পাথর কাল সকালে চুরি গেছে।"

জোজো একটুক্ষণ থমকে গেল যেন। তারপর নীরস গলায় বলল, "ও, চুরি গেছে। সেই খবরের জন্য তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? আমিই বা কী করব ?"

"তুই কাল যেটা দেখালি, সেটা সত্যিই চাঁদের পাথর ?"

"রজত ভট্টাচারিয়া কখনও এলেবেলে কথা বলে না।"

"যদি এলেবেলে কথা না হয়, তা হলে, তা হলে, ওই পাথর কলকাতা শহরে, শুধু কলকাতা কেন ইণ্ডিয়াতেই আর কারও কাছে নেই। এর মানে বুঝতে পারছিস না ?"

"না। পারছি না।"

"পুলিশ তোকে সন্দেহ করবেই।"

"সন্দেহ করলেই হল ? কোথাকার কী চুরি গেছে, তার জন্য আমি দায়ী হব কেন ?"

"তোকে যে ওই পাথরটা নীল আর্মস্ট্রং দিয়েছেন তার কোনও প্রমাণ আছে ?"

"প্রমাণ, মানে, প্রমাণ আবার কী ? কেউ যদি কাউকে কোনও জিনিস দেয়, তার সঙ্গে কি কোনও প্রমাণের সার্টিফিকেট লিখে দেয় ? তুই যে সেবারে ইজিপ্টে গেলি, সেখান থেকে আমাকে একটা পিরামিডের পাথরের মূর্তি এনে দিলি, সেটার কি কোনও প্রমাণ রাখতে হয়েছে ?"

"সেটা তো একটা সাধারণ জিনিস। তার সঙ্গে কি এটার তুলনা হয় ? তুই এক কাজ কর জোজো, পাথরটা নিয়ে চট করে আমাদের এখানে চলে আয়। কাকাবাবু পাথরটা দেখতে চেয়েছেন।"

"বিকেলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। এখন তো পারব না। নরওয়ের রাজার জরুরি কাজ আছে।"

"দূর ছাই তোর নরওয়ে-ফরওয়ে ! শোন জোজো, তোর কাছে যে-কোনও সময় পুলিশ যেতে পারে। কাকাবাবু তোকে সাহায্য করতে চেয়েছেন।

কাকাবাবুর কাছে থাকলে তুই বেঁচে যাবি। এখন তোর যা ইচ্ছে কর!"

রাগ করে সন্তু টেলিফোনটা রেখে দিল।

একতলা থেকে মা চা-জলখাবারের জন্য ডাকছেন, তাই নেমে যেতে হল একতলায়। মনে-মনে সে গুমরোচ্ছে। জোজোটা এক-এক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়! সন্তু যেন কল্পনায় দেখতে পেল পুলিশ জোজোদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তারপর হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে জোজোকে। তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে ওর আঙুলের ডগায় আলপিন ফুটিয়ে-ফুটিয়ে তিন-চারজন পুলিশ অফিসার জেরা করছে, "বল, ছোকরা, তুই এই চাঁদের পাথর কোথায় পেয়েছিস? পরশু রাতে মিউজিয়ামের কাছে কেন গিয়েছিলি?

ঠিক সতেরো মিনিটের মধ্যে সাঁ-সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে জোজো এসে উপস্থিত হল। সাদা প্যান্ট আর নীল রঙের একটা গেঞ্জি পরা। চেহারা দেখলে মনে হয়, কী সরল, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না!

ভেতরে ঢুকেই সন্তুর মাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, "মাসিমা, এই সাতসকালে কেন ছুটে এলুম জানেন? অন্য একটা কাজে সন্তু টেলিফোন করেছিল, সেই টেলিফোনেই গন্ধ পেলুম এখানে আজ লুচি ভাজা হচ্ছে। সেইসঙ্গে আলুর দম! আমি লুচি-আলুর দম যা ভালবাসি!"

মা অবাক হয়ে বললেন, "শোনো কথা! টেলিফোনে বুঝি গন্ধ পাওয়া যায়! তাও টেলিফোনটা দোতলায় আর রান্নাঘর একতলায়।"

সন্তু অস্থিরভাবে বলল, "ওঃ, মা! একতলা-দোতলায় কিছু আসে-যায় না। টেলিফোনে গন্ধ পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জোজোটা আন্দাজে ঢিল মেরেছে।"

জোজো বলল, "অন্য কেউ না পেলেও রজত ভট্টাচারিয়া টেলিফোনেও গন্ধ পায়। একবার আফ্রিকা থেকে একজন ফোন করেছিল—"

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "তুই সেই ফোনেই সিংহের গন্ধ পেয়েছিলি? আমাদের বাড়িতে সব ছুটির দিনই লুচি হয়। একদম বাঁধা। একঘেয়ে। তুই আগেও এসে খেয়েছিস!"

জোজো অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল, "প্রত্যেক ছুটির দিন আলুর দম হয়?"

মা বললেন, "এটা ও বলল কী করে?"

এইটাই জোজোর জয়। ও আন্দাজে ঢিল মারলেও খানিকটা মিলিয়ে দেয়। সন্তুদের বাড়িতে লুচির সঙ্গে থাকে সাধারণত বেগুন ভাজা কিংবা ডিমের তরকারি। আজই স্পেশাল আলুর দম হয়েছে। জোজো বোধ হয় ভেতরে এসেই গন্ধ পেয়েছে।

॥৩॥

কাকাবাবু পাথরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, "হুঁ, এটাকে দেখতে তো একেবারে একটা সাধারণ পাথরের মতন। একটু কালচে-কালচে ধরনের। পূর্ণিমার রাত্তিরে আকাশের চাঁদ চকচক করে। দেখলে মনে হয়, ওর একটা টুকরোও অমন চকচকে হবে। সুন্দর-সুন্দর খোকা-খুকুদের মায়েরা আদর করে বলত, চাঁদের কণা!"

সন্তু বলল, "চাঁদের ওপর সূর্যের আলো পড়ে বলেই ওরকম চকচক করে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো আজকাল ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে। কিন্তু আকাশের দিকে তাকালে কি আর সে-কথা মনে থাকে? চাঁদ নিয়ে এখনও কত কবিতা লেখা হয়। গান হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো...'। আসলে কিন্তু চাঁদের কোনও হাসিও নেই, নিজস্ব আলোও নেই। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই চাঁদের পাথরে নতুন কোনও ধাতু কিংবা খনিজ পদার্থও নেই। চাঁদ তো আসলে পৃথিবীরই একটা টুকরো। এক সময় পৃথিবী থেকে একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

সন্তু বিজ্ঞের মতন বলল, "এ-বিষয়ে অনেক থিয়োরি আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব থিয়োরির কথা থাক। আচ্ছা জোজো, নীল আর্মস্ট্রং এই পাথরটা তোমায় কবে দিলেন?"

জোজো বলল, "এই তো গত মাসে। একুশে এপ্রিল।"

কাকাবাবু বললেন, "একুশে এপ্রিল? পয়লা এপ্রিল নয়?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? এটা দেখতে সাধারণ পাথরের মতন হলেও মোটেও সাধারণ নয়। এটাকে সারাদিন রোদ খাওয়ালে রাত্তিরবেলা এর থেকে আলো ফুটে বেরোয়। ঠিক জ্যোৎস্নার মতন।"

কাকাবাবু বললেন, "বটে, বটে? তা হলে তো রাত্তিরবেলা দেখতে হচ্ছে!"

এই সময় সিঁড়িতে বেশ ভারী পায়ের শব্দ হল। রঘু একজন বেশ বড়সড় চেহারার মানুষকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সন্তু এঁকে চেনে। ইনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা নাসির হোসেন। খুব গান ভালবাসেন। এক-একদিন সন্ধেবেলা কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসেন ইনি, অনেক গান গেয়ে শোনান, তখন ওঁকে দেখে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বলে মনেই হয় না।

কাকাবাবু বললেন, "এসো নাসির, এসো! চা-টা খেয়ে এসেছ, না খাবে?"

নাসির হোসেন বললেন, "নাস্তা করে এসেছি। কী ব্যাপার, রাজাদা, আজ এত সকাল-সকাল তলব; আপনার বাড়িতে কিছু চুরিটুরি হয়েছে নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, সেসব কিছু না। তুমি নিশ্চয়ই আজ সকাল থেকেই ব্যস্ত ?"

নাসির হোসেন বললেন, "আর বলেন কেন ! কাল থেকেই কপালের ঘাম ছুটে যাচ্ছে। মিউজিয়াম থেকে চাঁদের পাথরটা চুরি হয়েছে জানেন তো ? ওই পাথরটা আবার আমাদের সম্পত্তি নয়। আমেরিকান গভর্নমেন্ট এক মাসের জন্য ধার দিয়েছে, সাধারণ মানুষদের দেখবার জন্য। আবার ফেরত দিতে হবে। এর মধ্যে চুরি। উদ্ধার করতে না পারলে আমাদের মান-সম্মান সব যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা চোরেরা কেন নেবে ? কী লাভ ?"

নাসির হোসেন বললেন, "সেই তো ! কোনও এক স্টুপিড চোরের কাণ্ড। সে ব্যাটা ওটাকে কোথাও বিক্রিও করতে পারবে না !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি তো সন্তুকে চেনো। আর এই ছেলেটি সন্তুর বন্ধু, ওর ডাকনাম জোজো, সবাই সেই নামেই চেনে, তবে কলেজের খাতায় ওর নাম রজত ভট্টাচার্য।"

নাসির হোসেন যেন হঠাৎ ভূত দেখলেন। চোখ বড়-বড় করে জোজোর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "জোজো ! রজত ভট্টাচার্য ! প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ?"

জোজো দু'দিকে মাথা নাড়ল।

নাসির হোসেন মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "মাই গড ! আমার ডিপার্টমেন্টের অন্তত দশজন অফিসার এর মধ্যে সারা শহরে এই ছেলেটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "জানেন রাজাদা, আজকের কাগজে খবরটা ছাপা হওয়ার পর অন্তত সাতজন আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানিয়েছে যে তারা জোজো ওরফে রজত ভট্টাচার্যের কাছে একটা চাঁদের পাথর দেখেছে। এখন চাঁদের পাথর তো আর রাস্তা-ঘাটে ছড়াছড়ি যায় না। কী করে ওই ছেলেটি পেল ! কিন্তু যারা খবর দিয়েছে, তারা কেউ ছেলেটির ঠিকানা বলতে পারেনি। আজ কলেজ বন্ধ। আমি অর্ডার দিয়ে এসেছি, যে করে হোক আজই প্রেসিডেন্সি কলেজের অফিস খুলিয়ে, খাতাপত্র দেখে ছেলেটির ঠিকানা বার করতেই হবে।"

কাকাবাবু চওড়াভাবে হেসে বললেন, "তোমার অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে দিলাম। তোমাকেও টেলিফোনে ডাকলাম। জোজোকেও এখানে আনিয়ে রেখেছি। এবার তোমরা কথাবার্তা বলে নাও !"

জোজো কটমট করে তাকাল সন্তুর দিকে। সন্তু নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, কাকাবাবু জোজোকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য নাসির হোসেন সাহেবকে

আসতে বলেছেন।

কাকাবাবু কোলের ওপর পাথরটা রেখেছিলেন। তুলে ধরে বললেন, "এটাই কি চাঁদের পাথর নাকি ?"

হঠাৎ খুশিতে ঝলমলে হয়ে গেল নাসির হোসেনের ফরসা মুখখানা।

তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, "দিস ইজ ইট ! দিস ইজ ইট ! এই তো সেই পাথর। জিনিসটাও পাওয়া গেল ! রাজাদা, আপনি কী উপকার যে করলেন ! কলকাতা পুলিশের মান বাঁচালেন।"

তারপর জোজোর দিকে ফিরে, মুখের চেহারা পালটে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এটা কোথায় পেলে ?"

জোজো বলল, "এটা আমার জিনিস !"

"তোমার জিনিস ? এটা ছিল জাদুঘরে। কী করে তোমার হল ?"

"জাদুঘরে অন্য একটা ছিল। এটা আমি পেয়েছি গত মাসে।"

"কে দিয়েছে ?"

"আমার ছোটকাকার এক বন্ধু।"

"আজকাল বুঝি যে-সে চাঁদের পাথর বিলিয়ে বেড়াচ্ছে ? জাদুঘর থেকে এই পাথরটা চুরি করার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আর কে-কে ছিল ?"

"আমি চুরি করিনি। এটা আমার !"

নাসির হোসেন কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "রাজাদা, আর দেরি করা যাবে না। এক্ষুনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হবে। দিল্লিতে রিপোর্ট করতে হবে। এই ছেলেটিকে আমি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছি ! চলো হে ছোকরা, ওঠো !"

জোজো এতক্ষণ বেশ একটা তেজ দেখাচ্ছিল। এবার ভেঙে পড়ল।

ভাঙা-ভাঙা গলায়, প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আমি চুরি করিনি। কাকাবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি ! আমার ছোটকাকার বন্ধু এটা ওড়িশা থেকে এনে দিয়েছেন !"

নাসির হোসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ ! ওড়িশায় চাঁদের পাথরের ছড়াছড়ি যাচ্ছে কবে থেকে ?"

জোজো বলল, "আমার ছোটকাকার বন্ধুর নাম নীলমাধব বাহুবলীন্দ্র। সবাই তাকে নীল আর্মস্ট্রং বলে ডাকে। তিনি বলেছেন, এটা চাঁদের পাথর।"

কাকাবাবু এবার হোহো করে হেসে উঠলেন, সন্তুর ঠোঁটেও আঁকা হল হাসির রেখা।

কাকাবাবু বললেন, "বাহুবলীন্দ্র ! আর্মস্ট্রং ! হ্যাঁ। অনুবাদটা ঠিকই হয়েছে। আর পাথরটা যদি চন্দ্রভাগা নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা হয়, তা হলে চাঁদের পাথর বলা যেতেই পারে।"

জোজো দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

নাসির হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "রাজাদা, হয়তো এই

ছেলেটি মিথ্যে কথাই বলেছে সবাইকে। কিন্তু এখন একে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। এর নাম যখন উঠেছে একবার...পাথরটাও টেস্ট করাতে হবে।"

জোজো ডুকরে উঠে বলল, "না, না, প্লিজ আমায় থানায় নিয়ে যাবেন না। আমার বাবা তা হলে আমাকে দারুণ বকবে। এই পাথরটায়..."

নাসির হোসেন বললেন, "আর কোনও কথা নয়। ওঠো, চলো! বাহুবলীন্দ্র! নীল আর্মস্ট্রং! দেখাচ্ছি মজা!"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও নাসির। অত ব্যস্ততা কিসের! মিউজিয়ামে চাঁদের পাথরের যে টুকরোটা ছিল, তার বর্ণনা তোমার কাছে আছে নিশ্চয়ই। কতটা বড়, কতটা ওজন...."

নাসির হোসেন বললেন, "হ্যা, রাজাদা, সবই আছে। তার সঙ্গে এই পাথরটাও মিলে যায়। পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা পাথর, ওজন পাঁচশো সত্তর গ্রাম।"

কাকাবাবু বললেন, "এক মিনিট বোসো।"

তিনি উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন। কাকাবাবু শখের বিজ্ঞানচর্চা করেন বলে তাঁর কাছে কিছু-কিছু যন্ত্রপাতি থাকে। আলমারি থেকে তিনি বার করলেন একটা ছোট্ট দাঁড়িপাল্লা। পেতলের তৈরি, গয়নার দোকানে যেরকম থাকে।

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "কখন কোন জিনিসটা কাজে লাগে, বলা কী যায়! এই ব্যালান্সটা কিনেছিলাম হংকং থেকে, খুব শস্তায় পাওয়া গিয়েছিল..."

নাসির হোসেনের হাত থেকে পাথরটা নিয়ে পাল্লার একদিকে চাপালেন, অন্যদিকে চাপাতে লাগলেন ছোট-ছোট বাটখারা। এক সময় দু দিকের পাল্লা সমান হতেই কাকাবাবু খুশিতে একটা শিস দিয়ে উঠলেন।

নাসির হোসেন এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়তেই কাকাবাবু বললেন, "ভাল করে দেখে নাও। ছ'শো তিরিশ গ্রাম। মিউজিয়ামের পাথরটার চেয়ে এটা ভারী। এবারে তুমিই বলো, নাসির, একটা পাথরকে ভেঙে কিংবা ঘষে-ঘষে ওজন কমানো যেতে পারে বটে, কিন্তু কোনওক্রমেই কি কোনও পাথরের ওজন বাড়ানো সম্ভব?"

নাসিরসাহেব নিরাশভাবে একবার কাকাবাবুর দিকে, আর একবার জোজোর দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "চোর ধরা কি এত সোজা? মিউজিয়াম থেকে যারা চুরি করে তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর চোর নিশ্চয়ই। তোমাকে আরও অনেক খাটতে হবে, নাসির!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাসির হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, "রাজাদা, আপনি আগে থেকেই জানতেন, তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের খানিকটা পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলাম। জোজোর ঠিকানা খুঁজে বার করা, তারপর ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা করা, এতে তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হত !"

নাসির হোসেন জোজোর দিকে ফিরে বললেন, "তোমাকে থানায় যেতে হবে না, কিন্তু এই পাথরটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। পরে ফেরত পাবে !"

নাসির হোসেনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সন্তু। জোজো এখনও গুম হয়ে বসে আছে।

কাকাবাবু বললেন, "চিয়ার আপ, জোজো ! বেশ চমৎকার একখানা প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছ ! নীল আর্মস্ট্রং আর নীলমাধব বাহুবলীন্দ্র ! এই নামে সত্যি কেউ আছে না তুমি বানিয়েছ ? বানালে স্বীকার করতেই হবে যে তোমার বুদ্ধি আছে বটে !"

সন্তু ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, "জোজো, তুই নরওয়ের রাজার ফোন পেয়েছিলি ?"

জোজো এবার মুখ তুলে বলল, "হ্যাঁ। ফোন করেছিলেন। কাজ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "নরওয়ের রাজা ? তার নাম কী, নরেন্দ্র, না নরোত্তম ?"

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। রঘু পৌঁছে দিয়ে গেল আর একজন আগন্তুককে।

লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, নাকের নীচে তলোয়ারের মতন গোঁফ, ছাই রঙের সুট পরা, তার সঙ্গে মেরুন রঙের টাই। মাথার চুল নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো।

কাকাবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, "আরে, আজ পর-পর সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে ! এইমাত্র আমি নরেন্দ্র নামটা বললাম, অমনই সত্যি-সত্যি এক নরেন্দ্র এসে হাজির ! এ কি ম্যাজিক নাকি ?"

সত্যিই এই আগন্তুকের নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে থাকেন, সি বি আই-এর এক বড় অফিসার। কাকাবাবুর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। একবার ত্রিপুরায় এঁর সঙ্গে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

নরেন্দ্র ভার্মা ঘরে ঢুকে বললেন, "আমার সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল বুঝি ? কী খবর, সন্টুবাবু, কেমুন আছ ? মা-বাবা সবাই বহাল তবিয়তে আছেন নিশ্চয়ই ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "নরেন্দ্রকাকা, আপনি কলকাতায় কবে এলেন ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেম, "এই তো আসছি, বম্বে থেকে মর্নিং ফ্লাইটে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তোমাদের বাড়ি। রাজা, তোমার সঙ্গে আমার বহুত জরুরি দরকার আছে !"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি ! চাঁদের পাথর চুরির খবর শুনেই তুমি ছুটে

এসেছ !"

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, "ভুল বুঝেছ ! বিলকুল ভুল। শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে তোমার কোনও মিল নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "মিল নেই, তার কারণ আমি ডিটেকটিভ নই ! জুতোর কাদা কিংবা সিগারেটের টুকরো নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তুমি তা হলে চাঁদের পাথরের জন্য আসোনি ?"

নরেন্দ্র ভার্মা একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "ক্যালকাটার মিউজিয়াম থেকে চাঁদের পাথর চুরি গেছে আমি জানি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। কিন্তু সেটা নিয়ে এখানকার পুলিশ মাথা ঘামাবে। পুলিশের কেস। আমার কোনও দায়িত্ব নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "একটু আগে এলে ওই চাঁদের পাথর নিয়ে একটা মজার ব্যাপার দেখতে পেতে এখানে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এখুন আমার মজা-টজা দেখার সময় নেই। মাথার ওপর বিরাট দায়িত্ব, তোমার সাহায্য চাই রাজা।"

কাকাবাবু বললেন, "সমস্যাটা কী শুনি !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আরে, এয়ারপোর্ট থেকে সিধা আসছি। কিছু চা-টা খাওয়াবে না ? সন্টু, তোমার মা নারকোলের নাড়ু বানাননি ? ওটা আমার খুব ভাল লাগে !"

সন্তু দৌড়ে নীচে গিয়ে একটা প্লেটে লুচি, আলুর দম আর কয়েকটা নারকোল-নাড়ু নিয়ে এসে বলল, "এগুলো খান। চা আসছে।"

লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই-ই বেশ উপভোগ করে খেলেন নরেন্দ্র ভার্মা। এক-একটা নারকোল নাড়ু আস্ত-আস্ত ছুড়ে-ছুড়ে মুখে ফেললেন। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা, তুমি বললে তোমার এখানে একটু আগে চাঁদের পাথরটা নিয়ে একটা মজা হয়েছে। তুমি কি ওই কেসটা নিয়েছ নাকি ?"

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, "ধ্যাত ! চোর ধরা কি আমার কাজ ? তা হলে পুলিশ রয়েছে কেন ?"

"তবে যে তুমি বললে ?"

"সে অন্য মজা। পরে শুনবে। এখন তোমার সমস্যাটা বলো।"

"পাথরটা পাওয়া গেছে ?"

"না।"

"ওটা পাওয়া না গেলে খুব মুশকিল হবে। আমেরিকার গভর্নমেন্ট সহজে ছাড়বে না।"

"নরেন্দ্র, তুমি কিন্তু পাথরটা নিয়েই কথা বলছ !

"ঠিক আছে, রাজা ! আমার পয়েন্টে আসছি। পাথর চুরি গেলে আবার

পাওয়া যায়, পাথর সহজে নষ্ট করা যায় না। কিন্তু আমার সমস্যা একটা মানুষকে নিয়ে। একটা মানুষ হারিয়ে গেছে।"

"পৃথিবীতে রোজ অনেক মানুষই তো হারাচ্ছে। নরেন্দ্র, তুমি মাথা ঘামাচ্ছ একজন বিশেষ মানুষকে নিয়ে। সাইমন বুবুম্বা।"

জোজো বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল, ওই নামটা শুনে চমকে তাকাল।

সন্তুও চোখাচোখি করল জোজোর সঙ্গে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তুমি সাইমন বুবুম্বার কথা শুনেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "কাগজে পড়েছি। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছেন। ওঁর সঙ্গীরা কিছু বলতে পারছে না। তাইতে মনে হয়, ওঁকে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হুঁ, মোটামুটি এইটুকুই জানানো হয়েছে বাইরে। কিন্তু কেসটা অত্যন্ত জটিল। আফ্রিকার একটা দেশের নাম মুরুণ্ডি। ছোট দেশ, লেকিন খুব শক্তিশালী দেশ। পেট্রোল আছে অনেক, তাই অত্যধিক ধনী। সেখানকার প্রেসিডেন্টের ভাই এই সাইমন বুবুম্বা। খুব পাওয়ারফুল ম্যান। সবাই জানে, তিনিই হবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। এই সাইমন বুবুম্বা আমাদের দেশে এসেছেন একটা চুক্তি সই করতে।"

কাকাবাবু বললেন, "জানি। ওদের দেশে তামা আর লোহা পাওয়া যায় না। ওরা ইণ্ডিয়া থেকে তামা আর লোহা কিনবে, তার বদলে দেবে পেট্রোল। এই তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পাঁচশো কোটি ডলারের চুক্তি। ইণ্ডিয়ার খুব লাভ হবে। সব ঠিকঠাক। এর মধ্যে আমাদের অর্থমন্ত্রীর বেমারি হয়ে গেল। মানে অসুস্থ। বিদেশ মন্ত্রী এখন বিদেশে। সাইমন বুবুম্বা বললেন, কুছ পরোয়া নেহি। অর্থমন্ত্রী সেরে উঠুক, তার মধ্যে আমি কয়েকদিন দার্জিলিংয়ের ঠাণ্ডা খেয়ে আসি। সেইজন্য এলেন কলকাতায়। তারপরেই এই কাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে-করে হোক, তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "দার্জিলিংয়ে খোঁজ করেছ? হয়তো একা-একা সেখানে চলে গেছেন!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দার্জিলিংয়ে নেই। তিনি আমাদের সরকারের মাননীয় অতিথি। একা-একা কোথাও যেতে পারেন না। সরকারের লোক তাঁকে নিয়ে যাবে, সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড থাকবে। কিন্তু কী হল, কারা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর ঘরে ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ। সাইমন বুবুম্বার বয়েস বেশি না, গায়েও খুব জোর। সহজে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। নিশ্চয়ই তাকে চোট দিয়েছে, মেরে আহত করেছে, তারপর ধরে নিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে রক্ত, কতটা চোট দিয়েছে কে জানে!"

কাকাবাবু খানিকটা উদাসীনভাবে বললেন, "হুঁ! কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি বলো তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে সাহায্য করতেই হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু এসব তো পুলিশের কাজ। মানুষ খোঁজা কি আমার পক্ষে সম্ভব নাকি? খোঁড়া পা নিয়ে আমি কি দৌড়োদৌড়ি করতে পারি?"

"রাজা, তোমাকে সাহায্য করতেই হবে। এটা শুধু আমার কাজ নয়, এটা দেশের কাজ। সাইমন বুবুম্বার কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দেশেরও বহুত ক্ষতি হয়ে যাবে!"

"সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু এটা ঠিক আমার কাজ নয়। ভাল-ভাল পুলিশ অফিসারের সাহায্য নাও।"

"তোমাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না। তুমি স্রেফ একটা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করো। যারা ধরে নিয়ে গেছে, তারা যেন বুবুম্বাকে চট করে মেরে না ফেলে। যতদিন সম্ভব তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

"সেটাই বা আমি কী করে পারব?"

"কালই চিঠি এসেছে যে, বুবুম্বার মুক্তির জন্য এক কোটি ডলার চাই সাতদিনের মধ্যে। না হলে তাকে মেরে ফেলা হবে। এই এক কোটি ডলার কে দেবে? ওঁর দেশের প্রেসিডেন্ট, ওঁর বড় ভাই ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন, টাকা তিনি দেবেন না। ইন্ডিয়াতে এই কাণ্ড হয়েছে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে টাকা দিতে হবে। এদিকে আমাদের দেশে কোনও বন্দিকে মুক্ত করার জন্য টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। সরকার তা দিতে পারে না। মহা বিপদ। অথচ সাতদিন মাত্র সময়। এর মধ্যে যেভাবে হোক, বুবুম্বাকে খুঁজে বার করে উদ্ধার করতে হবে। বুবুম্বাকে যদি মেরে ফেলে, তা হলে সব দোষ হবে আমাদের সরকারের।"

"টাকাটা কে চেয়েছে? কোনও বিপ্লবী দল নিশ্চয়ই?"

"কোনও নাম নেই। লেখা আছে যে, টাকাটা জমা দিতে হবে নেপালে। একটা কাপড়ের দোকানে। সে দোকানদার বলেছে, সে কিছু জানে না। চিঠিটা যে খাঁটি, তার প্রমাণ আছে। চিঠিটার এককোণে সাইমন বুবুম্বার সই আছে, বোঝাই যায় যে তাঁকে দিয়ে জোর করে সই করানো হয়েছে।"

"তোমরা কি ঠিক করেছ, নেপালে টাকাটা জমা দেওয়ার ছুতো করে ফাঁদ পেতে ওদের ধরবে আর বুবুম্বাকে উদ্ধার করবে?"

"তার উপায় নেই। টাকাটা দিতে হবে রাত একটায়। ওরা বুবুম্বাকে ছাড়বে পরের দিন সকালে। টাকা দেওয়ার সময় লোকটাকে ধরলেই বুবুম্বাকে মেরে ফেলবে।"

"এবার সত্যি করে বলো তো নরেন্দ্র, আমার কাছে কী চাও? এর মধ্যে

আমার তো কোনও ভূমিকা দেখছি না।"

"তোমার খুব জরুরি ভূমিকা আছে। তোমাকে একবার মেজর ঠাকুর সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।"

"মেজর ঠাকুর সিং ! সে কে ? নামটা বেশ চেনা লাগছে। তার সঙ্গে এই ঘটনার কী সম্পর্ক ?"

"মেজর ঠাকুর সিং বিহারের মস্ত বড় জমিদার। অনেক টাকার মালিক। একবার নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছিলেন। লোকটা সুবিধের নয়, কিন্তু ওকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। তোমার মনে আছে, সাত-আট মাস আগে বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত নিখোঁজ হয়েছিল, সেবারেও টাকা চাওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত টাকা দিতে হয়নি, বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত নিজেই একজন গুণ্ডার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে গুলি চালায়। একজন গুণ্ডাকে মেরে পালিয়ে আসে। যে গুণ্ডাটা মরেছিল, সে ওই মেজর ঠাকুর সিং-এর দলের লোক। কিন্তু ঠাকুর সিং পুরোপুরি অস্বীকার করে। সে বলেছিল, ও লোকটাকে চেনে না, জীবনে কখনও দেখেনি। শেষপর্যন্ত কিছু প্রমাণ করা যায়নি। আমাদের ধারণা, মেজর ঠাকুর সিং এই কারবার করে। ওর বিশাল বাড়ি। সাইমন বুবুম্বাকে ওর বাড়িতে আটকে রাখা আশ্চর্য কিছু নয়। আমরা একটা নামহীন উড়ো চিঠি পেয়েছি, তাতেও বলা হয়েছে যে, সাইমন বুবুম্বার নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে ঠাকুর সিংয়ের সম্পর্ক আছে।"

"পুলিশ নিয়ে ওঁর বাড়ি সার্চ করলেই তো হয়।"

"খুব সাবধানে আমাদের এগোতে হবে, রাজা ! যে-কোনও উপায়ে সাইমন বুবুম্বাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ঠাকুর সিং অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। আমরা একটু বাড়াবাড়ি করলেই বুবুম্বাকে ও খুন করে ফেলতে পারে। সেইজন্যই আমরা চাইছি, তুমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো। তোমার কথা ও শুনবে।"

"কেন, আমার কথা ও শুনবে কেন ? আমার সঙ্গে দেখাই বা করবে কেন ?"

"তোমার সঙ্গে তো ওর আগেই পরিচয় আছে।"

"কবে আবার পরিচয় হল ?"

"আমাদের কাছে সব রিপোর্ট থাকে। তোমার সঙ্গে মেজর ঠাকুর সিংয়ের দেখা হয়েছে দু'বার। একবার কলকাতা থেকে তোমরা দু'জনে প্লেনে পাশাপাশি সিটে বসে দিল্লি গিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে ঠাকুর সিংয়ের অনেক কথা হয়েছিল, সে তোমাকে কিসমিস আর পেস্তাবাদাম খেতে দিয়েছিল।"

"আমি কবে প্লেনে কার পাশে বসে গেছি, সে খবরও সি বি আই জানে নাকি ?"

"জানতে হয়, আমাদের অনেক কিছু জানতে হয়। তোমাকে ফলো করিনি, ঠাকুর সিংকে তখন আমাদের একজন লোক ফলো করছিল। ঠাকুর সিং তোমার এ-বাড়িতেও এসেছে। সিপাহি বিদ্রোহের আমলের একখানা দলিল দেখাতে। ওর ধারণা, ওই দলিলে গুপ্তধনের সন্ধান আছে। তুমি অবশ্য বিশেষ পাত্তা দাওনি। তুমি বলেছিলে, গুপ্তধনটন খোঁজা তোমার কাজ নয়। রাজি হওনি, তবে খারাপ ব্যবহার করোনি ওর সঙ্গে। ওকে অপমান করলে ও ঠিক প্রতিশোধ নিত। সুতরাং ঠাকুর সিং তোমাকে অপছন্দ করে না।"

"এতক্ষণে মনে পড়েছে লোকটার কথা। বিরাট ষণ্ডা-গুণ্ডার মতন চেহারা। কিন্তু কথাবার্তা বলে বেশ ভদ্রভাবে। তুমি বলছ, ও খুব বড়লোক আর জমিদার। প্লেনে আমার পাশে বসে আমাকে বেশ খাতির করেছিল।"

"তুমি তখন নেপালে, এভারেস্টের পথে একটা বিদেশি গুপ্তচর চক্র আবিষ্কার করে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলে, সমস্ত খবরের কাগজে তোমার নাম আর ছবি, তোমাকে ও চিনে ফেলেছিল।"

"ওর নাম মেজর ঠাকুর সিং কেন? ও কি কোনওদিন সেনাবাহিনীতে ছিল?"

"কস্মিনকালেও না। ওদের এক পূর্বপুরুষ ছিল সিপাহি বিদ্রোহের সময় এক নেতা। সে ভাল বন্দুক চালাত, অনেক ইংরেজ খতম করেছিল। সিপাহিরা তাকে ডাকত 'মেজরসাব'। সেই থেকে ওই বংশের বড় ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের মেজর বলে।"

"এই ঠাকুর সিং থাকে কোথায়?"

"তুমি পালামৌ জেলায় বেতলা জঙ্গলের কথা জানো নিশ্চয়ই। সেই বেতলা ফরেস্ট আর ডালটনগঞ্জ শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঠাকুর সিংয়ের বিরাট প্যালেস। প্রায় একটা দুর্গই বলতে পারো। ওর নিজস্ব পাহারাদার বাহিনী আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে, ওই বাড়িটা একেবারে সিংহের গুহা। অচেনা কেউ না বলেকয়ে ভেতরে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারে না। সাইমন বুবুম্বাকে ওখানে আটকে রাখতে পারে!"

সন্তু আর জোজো সব কথা শুনছে কান খাড়া করে।

সন্তু জোজোর পাশে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "তুই সাইমন বুবুম্বাকে সত্যি দেখেছিস?"

জোজো বলল, "হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।"

"আবার দেখলে চিনতে পারবি?"

"নিশ্চয়ই পারব। আমাদের বাড়িতে এসেছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে।"

"দশখানা রজনীগন্ধা ডাঁটাসুদ্ধু কাঁচা খেয়েছে?"

এ-কথার উত্তর না দিয়ে জোজো ফিক করে হাসল।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, "এবার আমাদের প্ল্যানটা বলি শোনো। আজই একটা গাড়িতে করে তোমাকে পাঠানো হবে রাঁচি। সেখানে একটু রেস্ট নিয়ে নেবে। তারপরই সিধা বেলতা ফরেস্ট। ফরেস্ট বাংলোতে তোমার নামে ঘর রিজার্ভ করা থাকবে। গাড়িটাও তুমি সব সময় ব্যবহার করতে পারবে। মনে হবে, তুমি জঙ্গলে বেড়াতে এসেছ, বিশ্রাম নিতে এসেছ। বেড়াতে-বেড়াতে তুমি ঠাকুর সিংয়ের বাড়ির সামনে হঠাৎ হাজির হবে। তারপর ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখা করার পর?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সে-কথাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে, রাজা? তুমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য। সাইমন বুবুম্বাকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর এক কোটি ডলার না দিয়ে উদ্ধার করতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এই প্রস্তাবের একটা অংশ আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় লাগছে। বেতলার জঙ্গলে গিয়ে থাকা। অনেকদিন কোনও জঙ্গলে যাইনি। বেড়াতে যাবি নাকি রে, সন্তু?"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, যাব। জোজোও যাবে আমাদের সঙ্গে।"

॥ ৪ ॥

বেতলার ফরেস্ট বাংলোটি ভারী চমৎকার। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, পেছনেই জঙ্গল। এখানে আবার গাছের ওপরেও থাকার ব্যবস্থা আছে। ট্রি-টপ হাউজ। অরণ্যদেবের কমিক্‌সে যেরকম আছে। সন্তু আর জোজোর ওই ট্রি-টপে থাকার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু দু'খানা ঘরেই লোক এসে আছে আগে থেকে।

বাংলোর সামনে কয়েকটা পোষা হরিণ ঘুরে বেড়ায়। দূরে শোনা যায় হাতির ডাক।

গরম পড়ে গেলেও হাওয়া আছে বেশ। চতুর্দিকে অজস্র ফুল ফুটেছে আর বড়-বড় গাছগুলো থেকে ডাকাডাকি করছে কতরকম পাখি।

বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে কাকাবাবু একটা ফাইল পড়ছেন। সাইমন বুবুম্বা সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র ভার্মা, এমনকী ওর জীবনী পর্যন্ত। আর বিভিন্ন পোজের তিনখানা ছবি।

সন্তু একটা ছবি তুলে নিয়ে বলল, "জোজো, বল তো বুবুম্বাকে কীরকম দেখতে?"

জোজো মন দিয়ে ডাব্‌ল ডিমের ওমলেট খাচ্ছিল। মুখ তুলে বলল, "প্রায় ছ' ফুট লম্বা, কোঁচকানো চুল, পুরু ঠোঁট, চওড়া বুক, দেখলেই বোঝা যায় গায়ে খুব জোর। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বয়েস হবে

চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "গায়ের রং ?"

একজন আফ্রিকানের গায়ের রং যে জিজ্ঞেস করে, সে একটা মহা বোকা, এইরকম একটা ভাব করে সন্তুর দিকে তাকিয়ে জোজো উত্তর দিল, "ছাতার কাপড়ের মতন কুচকুচে কালো ! নিগ্রোদের যেরকম হয়।"

কাকাবাবু পড়া থামিয়ে কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তুমি যে বর্ণনা দিলে জোজো, তা অধিকাংশ আফ্রিকান সম্পর্কে খাটে। কিন্তু সাইমন বুবুম্বার সঙ্গে মেলেনি। ওর গায়ের রং কুচকুচে কালো নয়। ও হচ্ছে মুলাটো। কাকে মুলাটো বলে জানো ?"

জোজো তাকাল সন্তুর দিকে।

সন্তু বলল, "যার বাবা-মায়ের মধ্যে একজন কালো জাতের আর-একজন ফরসা জাতের, তাকে বলে মুলাটো, মুলাটোরা পুরোপুরি ফরসা বা কালো হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "সাইমন বুবুম্বার বাবা ব্ল্যাক আফ্রিকান আর মা জার্মান। সাইমনের গায়ের রং মাজা-মাজা, অনেকটা ভারতীয়দের মতন। চুলও বেশি কোঁচকানো নয়। হঠাৎ তাকে দেখলে আফ্রিকান বলে মনেই হয় না।"

জোজো কথা ঘোরাবার জন্য বলে উঠল, "ওটা কী উড়ে গেল ? ময়ূর না ? সামনের গাছটায় বসেছে !"

সন্তু ভুরু কুঁচকে জোজোর দিকে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জোজো সাইমন বুবুম্বাকে চোখেই দেখেনি। তা হলে গায়ের রং নিয়ে, চুল নিয়ে এত ভুল করত না। কিন্তু সোনালি ফ্রেমের চশমার কথা বলল কী করে ? সত্যিই সাইমন বুবুম্বার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। রঙিন ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একটু দূরের গাছটায় ময়ূরটা ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডাকছে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই আর জোজো এখানে থাক। ইচ্ছে করলে জঙ্গলের মধ্যে বেড়িয়ে আসতে পারিস। আমি একবার মেজর ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা দেখে আসি।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমিও যাব ওখানে। জোজো, তুই থাকবি !"

জোজো বলল, "আমাকে তো যেতেই হবে। সাইমন বুবুম্বাকে যদি ওখানে পাওয়া যায়, আমিই তাকে আইডেন্টিফাই করব।"

কলকাতা থেকে যে-গাড়িটায় আসা হয়েছে, সেই গাড়ির ড্রাইভারের নাম মহিম। সে এর মধ্যেই গাড়িটা ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে ফেলেছে। সে বেশ চটপটে যুবক। মাঝে-মাঝে আপন মনে গুন্‌গুন করে গান গায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মহিম, রেডি ?"

সে বলল, "হ্যাঁ সার। বেরোবেন তো চলুন।"

ফরেস্ট বাংলোর ম্যানেজারের নাম নুরুল। তিনি সামনের বাগানে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর একটা ফুটফুটে মেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে বাগানের মধ্যে। মেয়েটির বয়েস বছরপাঁচেক হবে, ওর নাম আমিনা। ওকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু নুরুল সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইলেন ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা কোন দিকে।

নুরুল সাহেব বললেন, "'রূপ মঞ্জিল', জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রাস্তা পাবেন। পাঁচ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কী করবেন? টুরিস্টদের সে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না!"

কাকাবাবু বললেন, "ঢুকতে না দেয়, বাইরে থেকে দেখে আসব। শুনেছি দারুণ জমকালো বাড়ি।"

নুরুল সাহেব বললেন, "তা বটে। তবে সাবধান, ও বাড়িতে দুটো সাঙ্ঘাতিক কুকুর আছে।"

সবাই মিলে গাড়িতে ওঠা হল। একটুখানি যাওয়ার পরেই চেক পোস্ট। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে গেলে গাড়ির নাম্বার লিখে রাখে এখানে।

একটু দূরে যাওয়ার পরই চোখে পড়ল দুটো খয়েরি রঙের খরগোশ দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

সন্তু আর জোজো দু'জনেই উত্তেজিত খরগোশ দেখে। জঙ্গলে এসে সবাই জন্তু-জানোয়ার দেখতে চায়। সন্তু বলল, "তা হলে পোষা হরিণগুলো ছাড়া একটা ময়ূর আর দুটো খরগোশ দেখা হল এ পর্যন্ত।"

মহিম বলল, "যদি ভাগ্যে থাকে, হাতিও দেখা যেতে পারে। বাংলোর একজন লোক বলছিল, কাছাকাছি একটা হাতির পাল বেরিয়েছে।"

জোজো বলল, "না, না, হাতি-টাতি দরকার নেই। অত বড় জন্তু আমার ভাল লাগে না।"

সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তোমাকে আগে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তোমার সেই পিসেমশাই কেমন আছেন, যিনি কোনও জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড় সহ্য করতে পারেন না? আমার ওপর যাঁর খুব রাগ?"

জোজো বলল, "তিনি বারুইপুরের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। আর কোনও খবর জানি না!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এই জঙ্গলে বাঘ আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "আছে কয়েকটা। তারা সহজে দেখা দেয় না। তবে, এখানকার সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী কী জানিস? এক ধরনের কুকুর। তাদের বলে ওয়াইল্ড ডগ্স। দেখতে এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক নয়, ছোট-ছোট নেড়িকুত্তার

মতন, একসঙ্গে দশ-পনেরোটা থাকে। তারা দল বেঁধে তীরের মতন ছোটে, সামনে কোনও জন্তু পড়লে তার আর নিস্তার নেই। সবাই মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে মেরে, খেয়ে শেষ করে দেবে। হরিণ, বুনো শুয়োর, মানুষ সব খায় ওরা। আমি অনেকদিন আগে এখানে একবার এসে ওয়াইল্ড ডগস্ দেখেছিলাম। ওইটুকু-ওইটুকু কুকুর, একটা বাইসনকে মেরে সব মাংস খেয়ে ফেলল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

"ওরা কি বাঘকেও মারতে পারে ?"

"তা বোধ হয় পারে না। এখানে তো সিংহ নেই, বাঘই বনের রাজা। বাঘের ডাক শুনলেই অন্য সব জানোয়ার ভয় পায়।"

অনেকক্ষণ আর কোনও জন্তু দেখা গেল না। শুধু একপাল বানর ছাড়া। যদিও এরা বনেই থাকে, তবু বানরকে ঠিক যেন বন্যপ্রাণী মনে হয় না।

আসল রাস্তাটা ছেড়ে বাঁ দিকে বেঁকতে হল এক জায়গায়। ক্রমশ জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। এক সময় হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দুর্গের মতন বাড়ি।

বাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে নয়, জঙ্গলের ধারেই। একটা টিলার ওপর অনেকখানি পাঁচিল ঘেরা, তার মধ্যে দোতলা বাড়ি। সেই পাঁচিল ও বাড়ি, সবই পাথরের তৈরি। পাঁচিলের এক জায়গায় বিশাল লোহার গেট, তার দু' পাশে দুটো গম্বুজ। গেটের কাছে নাম লেখা, 'রূপ মঞ্জিল'।

মহিম গাড়িটাকে নিয়ে এল গেটের কাছে।

খাকি পোশাক আর মাথায় পাগড়ি পরা একজন দরোয়ান রয়েছে সেখানে, হাতে বন্দুক। সে হাত তুলে গাড়িটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া মাংতা ?"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে মিষ্টি করে বললেন, "নমস্তে। মেজর ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

দরোয়ান মাথা নেড়ে বলল, "নেহি হোগা। চলা যাও !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে আমার চেনা আছে।"

সে আবার বলল, "নেহি হোগা !"

কাকাবাবু আরও নরম গলা করে বললেন, "আপনি একবার গিয়ে বলুন না, কলকাতা থেকে রাজা রায়চৌধুরী এসেছে। ঠাকুর সিং ঠিক চিনবেন।"

লোকটি এবার বেশ রুক্ষভাবে বলল, "নেহি হোগা ! চলা যাও !"

সন্তু আর জোজোও নেমে এসেছে। কাকাবাবু বললেন, "কী করব রে ? এই লোকটা যে খালি নেহি হোগা, নেহি হোগা বলে !"

জোজো বলল, "কী উঁচু আর শক্ত দেওয়াল !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কি লাফিয়ে পাঁচিল ডিঙোবার কথা ভাবছিস নাকি ?"

জোজো বলল, "একখানা বাঁশ পেলে পোল ভল্ট দিয়ে ওপারে যাওয়া

যায়। আমি তো স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছি দু'বার!"

ভেতরে ঘাউ-ঘাউ করে বিকট কুকুরের ডাক শোনা গেল।

সন্তু বলল, "শুনতে পাচ্ছিস?"

জোজো ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ডাক শুনেই বোঝা যাচ্ছে খুব বড় কুকুর। আমি বেশ লোমওয়ালা ছোট কুকুর ভালবাসি, বড় কুকুর আমার বিশ্রী লাগে!"

কাকাবাবু বললেন, "মহা মুশকিল। এ-লোকটা যে কিছুতেই গেট খুলবে না। ঠাকুর সিংকে খবরও দেওয়া যাবে না!"

মহিম বলল, "ও দরোয়ানজি, একবার ভেতরে যেতে দাও না। ইনি কলকাতার খুব নামজাদা লোক।"

দরোয়ান আবার সেই একই কথা বলল, "নেহি হোগা। যাও, চলা যাও!"

হঠাৎ দূরে কপ-কপ শব্দ হতেই সবাই পেছনে ফিরে তাকাল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটি ঘোড়া, তার আরোহীটি যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। কিংবা সিনেমায় এরকম দেখা যায়। লম্বা-চওড়া একজন মানুষ, মাথায় পালক বসানো উষ্ণীষ। হলুদ রঙের মখমলের কুর্তা-শেরওয়ানি পরা, এক হাতে একটা রাইফেল, বুকে পৈতের মতন জড়ানো বুলেটের বেল্ট।

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লোকটি গেটের কাছে পৌঁছে গেল।

কাকাবাবুদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে সে কড়া গলায় দরোয়ানটিকে হিন্দিতে বলল, "এরা সব কারা? ভাগিয়ে দিসনি কেন?"

দরোয়ানটি এবার বন্দুক বাগিয়ে বলল, "যাও!"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "নমস্তে ঠাকুর সিংজি!"

লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মুখে হরতনের গোলামের মতন গোঁফ, দু'দিকে বড় জুলপি, চোখ দুটো লালচে।

মুখে রাগ-রাগ ভাবটা একটু-একটু করে বদলে অবাক-অবাক হয়ে গেল। প্রথমে চিনতে পারেনি, তারপর বলল, আরে রায়চৌধুরী সাব? আপনি এখানে?"

কাকাবাবু বললেন, "চিনতে পেরেছেন তা হলে? যাক। বাঁচা গেল। আপনার দরোয়ান তো কোনও কথাই শুনবে না, আর-একটু হলে গুলি চালিয়ে দিত বোধ হয়! আমরা এই বেতলা ফরেস্টে বেড়াতে এসেছি কয়েকদিনের জন্য। শরীরটা ভাল নেই, তাই বিশ্রাম নিচ্ছি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। কলকাতায় আপনি একবার আমার বাড়ি গিয়েছিলেন, তাই একটা রিটার্ন ভিজিট দেওয়া উচিত।"

ঠাকুর সিং বিগলিতভাবে হেসে বলল, "আমার কী সৌভাগ্য! আপনি এসেছেন, আমার গরিবখানা ধন্য হয়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "গরিবখানাই বটে! এটা যদি গরিবখানা হয়, তা হলে প্রাসাদ বলে কাকে?"

ঠাকুর সিং বলল, "ব্যাপার কী জানেন রায়চৌধুরী সাব, এই জঙ্গলে যত টুরিস্ট আসে, তাদের তো সকালবেলা কোনও কাজ-কর্ম থাকে না, শুধু গাছপালা দেখে বিরক্ত হয়ে যায়, তখন তারা দল বেঁধে আমার বাড়ি দেখতে আসে। বহুত ঝামেলা হয়। তাই আমি কাউকে ঢুকতে দিই না। কলকাতায় লোকেদের বাড়ি কি যাকে-তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় ? ভেতরে আসুন, আসুন। গাড়িটা বাইরে থাক।"

এবার গেট খুলে গেল। ঠাকুর সিং ঘোড়া থেকে নামতেই একজন লোক এসে সেটাকে নিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "আলাপ করিয়ে দিই। এই আমার ভাইপো সন্তু, আর অন্যজন ওর বন্ধু জোজো। দু'জনেই কলেজে পড়ে।"

ঠাকুর সিং কাকাবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, "তোমরা বোলো তো, কার মোচ বড় ? আংকেলজির, না আমার ?"

সন্তু আর জোজো দু'জনেই বলল, "আপনার !"

ঠাকুর সিং বলল, "রায়চৌধুরী সাব-এর মোচটাও বেশ জবরদস্ত্। অজকাল তো বাঙালি লোক মোচ রাখেই না। মোচ না থাকলে কি পুরুষমানুষ হয় !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বাড়িটা নতুন রং করা হয়েছে বুঝি ?"

ঠাকুর সিং বলল, "হাঁ, পুরানা জমানার বাড়ি। একশো বছরের বেশি বয়েস, অনেক জায়গায় ভেঙে পড়ছিল। সব সারিয়েছি, রং করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "একেবারে নতুনের মতন ঝকঝকে দেখাচ্ছে। এত বড় বাড়ি মেরামত আর রং করাতে বহু টাকা খরচ হয়েছে নিশ্চয়ই।"

ঠাকুর সিং বলল, "আপনাদের দয়া !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই গুপ্তধন পেয়েছিলেন বুঝি ?"

ঠাকুর সিং হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "নাঃ, সেখানে কিছু ছিল না।"

গুপ্তধন না পেলেও ঠাকুর সিংয়ের যে অনেক টাকা তা চারদিক তাকালেই বোঝা যায়। ভেতরে রয়েছে দু' খানা গাড়ি। দু' পাশে বাগান, তার মাঝে-মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্তি বসানো। বাড়ির সামনের দিকে অনেকখানি শ্বেতপাথরের সিঁড়ি।

দূরে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর সিং কাকে যেন উদ্দেশ করে বলল, "এই, কুকুর বেঁধে রাখ।"

তারপর কাকাবাবুকে বললেন, "আসুন, ওপরে আসুন।"

শ্বেতপাথরের সিঁড়িগুলো এমন মসৃণ যে, কাকাবাবুর ক্রাচ পিছলে যাচ্ছে। তবু তিনি কষ্ট করে উঠলেন।

প্রথমে একটা খোলা বারান্দা, তারপর একটা বসবার ঘর। সে ঘরখানা রাজা-মহারাজাদের ঘরের মতন সাজানো। খুব দামি-দামি সোফা-কৌচ, দু'

দিকের দেওয়ালে ঝুলছে একখানা করে ঢাল আর দু' খানা করে তলোয়ার আর কয়েকখানা বড়-বড় গোঁফওয়ালা লোকদের আঁকা ছবি।

সবাই বসবার পর ঠাকুর সিং জিজ্ঞেস করল, "কী খাবেন বলুন? দুটো হাঁস মেরে রোস্ট করে দেব? হাঁসের রোস্ট খুব বড়িয়া!"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, এই সকালে আমরা মাংস খাব না।"

ঠাকুর সিং বলল, "তা হলে রাবড়ি খান। খুব ভাল রাবড়ি-মালাই আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, অত মিষ্টি আমি খাই না। ওরা দু'জন ছেলেমানুষ, ওরা খেতে পারে।"

সন্তু আর জোজো দু'জনে জানাল যে, তারাও এখন মিষ্টি খাবে না।

ঠাকুর সিং বলল, "তা হলে আলুর পরোটা বানাতে বলি। তার সঙ্গে কলিজার সুরুয়া।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা খেয়ে এসেছি, সিংজি। অত কিছু খেতে পারব না। এক কাপ করে চা খেতে পারি।"

ঠাকুর সিং বলল, "হাঁ, হাঁ, চা তো খাবেনই। তার আগে একটু কিছু তো খেতে হবে। গরিবের বাড়িতে এসেছেন।"

ঠাকুর সিং ভেতরে গিয়ে কী সব নির্দেশ দিল। একটু বাদেই দু'জন উর্দিপরা বেয়ারা প্লেটে করে দু'-তিনরকম সন্দেশ, কাজু বাদাম আর বিস্কুট নিয়ে এল। সঙ্গে তিনটে লম্বা গেলাস ভর্তি শরবত। সন্তুর মনে হল, প্লেটগুলো রুপোর।

সে জোজোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কোনওদিন রুপোর থালায় খাবার খাইনি।"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "আবিসিনিয়ার সম্রাট একবার আমাকে আর বাবাকে সোনার প্লেটে করে ফল খেতে দিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "এত খাবার!"

ঠাকুর সিং বলল, "খেয়ে নিন, খেয়ে নিন। এ তো অতি সামান্য। আমি রোজ সকালে দু' কিলো ভইসের দুধ আর একটা আস্ত হাঁসের রোস্ট খাই!"

খেতে-খেতে নানারকম গল্প হতে লাগল। আসল কথার দিকে কাকাবাবু যেতেই পারছেন না।

সন্তু উঠে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছে কাছ থেকে। ঠাকুর সিং বলল, "খোঁকাবাবু, এই কোণের ছবিটা ভাল করে দ্যাখো। ম্যাজিক আছে, ম্যাজিক। দ্যাখো, ছবির মুখ ডাহিন দিকে, পায়ের জুতোও ডাহিন দিকে বেঁকে আছে। এবার এপাশে চলে এসো। ছবির মুখ বাম দিকে ঘুরে যাবে, জুতোও এদিকে ঘুরবে।"

সন্তু সরে এসে দেখল, সত্যিই তাই। কিন্তু খুব অবাক হল না। রাজস্থানের একটা দুর্গে সে আগেই এরকম ছবি দেখেছে।

ঠাকুর সিংয়ের ধারণা, শুধু তার কাছেই এরকম ছবি আছে। সে মহা

উৎসাহের সঙ্গে বলল, "আউর একটা তসবির দেখো।"

এই সময় অন্য একটি লোক ঘরে এসে ঠাকুর সিংয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

শুনতে-শুনতে ঠাকুর সিংয়ের ভুরু কুঁচকে যেতে লাগল। এক সময় সেই লোকটিকে বলল, "ঠিক হ্যায়, যাও। আমি আসছি।"

তারপর সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

এতক্ষণ ঠাকুর সিং দারুণ ভদ্র আর নম্র গলায় কথা বলছিল। সন্তুর মনে হচ্ছিল, লোকটির চেহারা দশাসই হলেও আসলে সে সরল ও ভালমানুষ ধরনের। এখন ঠাকুর সিংয়ের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কর্কশ গলায় বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ, তাই না? তোমার ড্রাইভার গোপনে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। লুকিয়ে ছবি তুলছিল। ধরা পড়ে গেছে। মারের চোটে স্বীকার করেছে যে, সে পুলিশের লোক। তুমি পুলিশ নিয়ে আমার বাড়িতে কী মতলবে ঢুকেছ?"

কাকাবাবু নিরীহ মুখ করে বললেন, "তাই নাকি, মহিম পুলিশের স্পাই? তা আমি জানব কী করে? কলকাতা থেকে গাড়ি ভাড়া করে এসেছি, সঙ্গে ড্রাইভার এসেছে।"

ঠাকুর সিং বজ্রকণ্ঠে বলল, "ফের বাজে কথা? পুলিশ থেকেই এ গাড়ি তোমাকে দিয়েছে। এসো, নিজের কানে শুনবে এসো!"

দুমদাম করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে আবার বলল, "এসো আমার সঙ্গে!"

ভেতরে একটা চৌকো উঠোন, তার একপাশ দিয়ে একটা লম্বা সরু বারান্দা চলে গেছে অনেক দূর। তার পাশে-পাশে ছোট-ছোট ঘর। শেষের দিকের একটা ঘরে কাকাবাবুরা চলে এলেন ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে।

এই ঘরটা তেমন ছোট নয়, হলঘরের মতন লম্বা, সব জানলা বন্ধ, কয়েকটি বেশি পাওয়ারের আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে সন্তু আর জোজো আঁতকে উঠল।

সিলিংয়ের যেখানে পাখা থাকে, সেখান থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে মহিম। মাথাটা নীচের দিকে। দুটো ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে আছে দু' পাশে। তার মধ্যে একজনের দু' হাতে দস্তানা পরা, সে ধরে আছে একটা লোহার রড, তার ডগার দিকটা গনগনে লাল।

অন্য লোকটি ঠাকুর সিংয়ের দিকে একটা ভাঁজ করা কার্ড এগিয়ে দিল।

ঠাকুর সিং কাকাবাবুকে বলল, "পুলিশের আইডেন্টিটি কার্ড!"

তারপর অন্য লোকটির দিকে ইঙ্গিত করতেই সে গরম লোহার রডটা এগিয়ে দিল মহিমের একটা চোখের একেবারে সামনে।

মহিম ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

ঠাকুর সিং দাঁতে দাঁত চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই ক' বছর পুলিশে কাজ করছিস ? বল, না হলে তোর চোখ গেলে দেব !"

মহিম বলল, "সাত বছর !"

"আমার বাড়িতে ঢুকেছিলি কেন ? তোকে বাইরে থাকতে বলেছিলাম।"

"ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল !"

"ছবি তুলছিলি কেন ?"

"আমার ছবি তোলার শখ। কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, বিশ্বাস করুন !"

"চোখটা দেব নষ্ট করে ? আমার বাড়িতে ঢোকার জন্যই তুই কলকাতা থেকে রায়চৌধুরীকে নিয়ে এসেছিস, তাই না ?"

"হ্যাঁ। আমায় পাঠিয়েছে !"

কাকাবাবু বললেন, "সিংজি, এবার ওর বাঁধন খুলে নামিয়ে দিন। ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।"

ঠাকুর সিং হুংকার দিয়ে বলল, "নাঃ ! ওকে আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াব !"

তারপর দেওয়ালে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো দু'খানা তলোয়ারের মধ্যে একখানা ফস করে টেনে নিয়ে কাকাবাবুর গলার সামনে ঠেকিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি সিংহের গুহায় মাথা গলিয়েছ ! তুমি যদি শুধু মেহমান হয়ে আসতে, অতিথি হয়ে আসতে, তোমাকে আমি মাথায় করে রাখতাম। কিন্তু তুমি পুলিশ নিয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছ। তোমাকে আর ওই বাচ্চা দুটোকে আমি টুকরো-টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলব, আর এখান থেকে জান নিয়ে ফিরতে পারবে না।"

কাকাবাবু তলোয়ারটা গ্রাহ্য করলেন না। বাঁ হাত দিয়ে ধরে সেটা সরিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "ঠাকুর সিং, আমার একটা পা খোঁড়া, তাই লোকে ভাবে আমি দুর্বল। হ্যাঁ, আমি দুর্বল, আমি দৌড়তে পারি না। কিন্তু আমার এই হাত দুটোতে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি জোর আছে। আমি চোখ দিয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি দেখতে পাই। আর আমার মাথাটাও বেশি কাজ করে। এর আগে আমি অনেকবার অনেক বিপদের মধ্যে পড়েছি। কেউ আমাকে মারতে পারেনি। তুমি এমনি-এমনি এত সহজে আমাকে মেরে ফেলবে, অত আশা কোরো না।"

ঠাকুর সিং বলল, "তুমি আগে আমার মতন মানুষের পাল্লায় পড়োনি। আমার শত্রুদের মারতে আমার হাত কাঁপে না।"

কাকাবাবু এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দেওয়ালের দিকে চলে গেলেন। ক্রাচ দুটো বগল থেকে সরিয়ে রাখলেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ফুলশার্টের ডান হাতের হাতা গুটিয়ে ফেললেন।

তারপর দেওয়াল থেকে অন্য তলোয়ারটা নিয়ে বললেন, "আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে। কেউ যদি আমার দিকে অস্ত্র তোলে তা হলে তাকে আমি কিছু-না-কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। এসো, লড়ো আমার সঙ্গে।"

ঠাকুর সিং ঠিক সিনেমার দৈত্যদের মতন হি-হি-হি করে অট্টহাস্য করে উঠল। হাসতে-হাসতেই বলল, "তুমি একটা খোঁড়া বাঙালি, তুমি আমার সঙ্গে তলোয়ার লড়বে? আজ পর্যন্ত কেউ আমার সামনে দু' মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখাই যাক না। যদি মরদ হও, একা লড়ো। তোমার লোকদের সরে যেতে বলো। কাপুরুষের মতন সবাই যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।"

ঠাকুর সিং তার লোক দুটির দিকে চেয়ে বলল, "এই, তোরা হঠে য়া তো। আমি এক কোপে এর মুণ্ডুটা নামিয়ে দিই।"

ওরা চলে গেল এক কোণে, সন্তু আর জোজো সরে গেল আর এক কোণে।

ঠাকুর সিং আর কাকাবাবুর তলোয়ার-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর সিং জোরে-জোরে কোপ চালাচ্ছে, কাকাবাবু এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে আটকাচ্ছেন।

সন্তু জানে যে, কাকাবাবু এক সময় দুর্দান্ত ফেন্সিং লড়তে পারতেন। তার ছবিও দেখেছে। কিন্তু সে কাকাবাবুর খোঁড়া হওয়ার আগেকার কথা। এখন সে বুঝতে পারল, এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে কাকাবাবু ঠিক হাতের জোর পাচ্ছেন না। ঠাকুর সিং ভাল লড়তে জানে, কাকাবাবু ওর মারগুলো আটকাচ্ছেন কোনওরকমে।

দুই তলোয়ারে ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছে, ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছেন কাকাবাবু।

জোজোর চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে গেছে। সে মিনমিন করে বলল, "কী হবে রে?"

সন্তু বলল, "দ্যাখ না কী হয়!"

জোজো বলল, "কাকাবাবু হেরে গেলে তো আমরাও ..."

সন্তু বলল, "চুপ।"

কাকাবাবু দেওয়ালের গায়ে সেঁটে গিয়ে হাঁফাচ্ছেন, তাঁর তলোয়ারের ওপরে ঠাকুর সিংয়ের তলোয়ার কোনাকুনি আটকে আছে। এখন ঠাকুর সিং সম্পূর্ণ শরীরের চাপ দিলেই কাকাবাবু সম্পূর্ণ হেরে যাবেন।

ঠাকুর সিং আর-এক দফা হাসি দিয়ে বলল, "এবার? আমার সঙ্গে লড়ার শখ?"

কাকাবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব্যালেন্স করে নিলেন। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে নিজের তলোয়ার ছাড়িয়ে নিয়ে তলার দিক থেকে এত জোরে আঘাত করলেন যে, ঠাকুর সিং সামলাবার সময় পেল না। তার তলোয়ার হাত থেকে

ছিটকে প্রথমে ঘরের সিলিংয়ে লাগল, তারপর ঝনঝন করে পড়ল মাটিতে।

এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল তা ঠাকুর সিং ঠিক যেন বুঝতেই পারল না।

কাকাবাবু নিজের তলোয়ার ঠাকুর সিংয়ের বুকে ঠেকিয়ে বললেন, "বলেছিলাম না, আমার চোখ আর মাথা অন্যদের চেয়ে বেশি কাজ করে। এত বড় শরীরের তুলনায় তোমার মাথাটা এখনও তেমন ব্যবহার করতে পারো না, ঠাকুর সিং! নাও, এবার তোমার লোকদের বলো আমার ড্রাইভারকে নামিয়ে দিতে। বেচারার মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে।"

ঠাকুর সিং ফ্যালফ্যাল করে একবার কাকাবাবুর দিকে, আর-একবার নিজের লোক দুটোর দিকে তাকাল।

সেই লোক দুটো একটা উঁচু টুল এনে মহিমকে নামিয়ে দিল। পায়ের বাঁধন খোলার পরও মহিম সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। বসে পড়ল মাটিতে।

কাকাবাবু তলোয়ারটা ঠাকুর সিংয়ের বুক থেকে সরিয়ে আবার ঝুলিয়ে দিলেন দেওয়ালে। এবার জামার তলায় হাত দিয়ে কোমর থেকে বার করলেন রিভলভার।

সেটা দেখিয়ে বললেন, "আমার কাছে এটাও ছিল। এটা আমি এক পায়ে দাঁড়িয়েও ভাল চালাতে পারি। তোমাদের রাইফেলের চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি, আর আমার একটা গুলিও ফসকায় না। তুমি যখন তলোয়ার ঠেকালে আমার গলাতে, আমি এক গুলিতে তোমাকে শেষ করে দিতে পারতাম। মনে রেখো ঠাকুর সিং, তুমি যদি মানুষকে মারতে চাও, তা হলে অন্য কেউও যে-কোনওদিন তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

ঠাকুর সিং কথা বলতে পারছে না। এখনও সামলে উঠতে পারেনি। তার মতন এক বীরপুরুষ একজন খোঁড়া, মধ্যবয়স্ক বাঙালির কাছে তলোয়ার খেলায় হেরে যাবে, এটা যেন সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। তার অনুচরদের কাছে তার সম্মান অনেকটা কমে গেল!

কপালটা ঘেমে গেছে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ঠাকুর সিং।

তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "রায়চৌধুরীসাব, তুমি আমাকে হারিয়ে দিলেও এখান থেকে বেরোতে পারবে না। আমার দশ-বারোজন লোকের হাতে বন্দুক আছে। তারা একসঙ্গে ঘিরে ধরে তোমাদের খতম করে দিতে পারে, তোমার ওই পিস্তল দিয়ে আটকাতে পারবে না। কিন্তু আমি গুণীর ইজ্জত দিতে জানি। তুমি তলোয়ারে আমাকে হারিয়েছ, আমি তার সম্মান দেব। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না, তোমরা ফিরে যাও!"

কাকাবাবু বললেন, "যাব কী, এখনও তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। এখন তো আর লুকোচুরির কিছু নেই। এখন সোজাসুজি কথা বলা যেতে পারে। তোমার কাছে আমি বিশেষ একটা ব্যাপার জানতে এসেছি। কিন্তু এ-ঘরে নয়। এখানকার সব জানলা বন্ধ, বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে। চলো না,

তোমার বৈঠকখানাতেই আবার বসা যাক।"

ঠাকুর সিং সবিস্ময়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্তু আর জোজো মহিমের দু' হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। মহিমও হাঁ করে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে। যেন, এমন মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি।

॥ ৫ ॥

আবার এসে বসা হল সেই জমকালোভাবে সাজানো ঘরটিতে।

কাকাবাবু খুব সহজভাবে বললেন, "সিংজি, তখন শরবত-টরবত খাওয়ালে, কিন্তু চা খাওয়া হয়নি। এখন কি এককাপ চা পাওয়া যেতে পারে?"

কাকাবাবুর গলা শুনে মনে হয় যেন কিছুই হয়নি। একটু আগে যে দু'জনের মধ্যে তলোয়ার নিয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধ হয়ে গেল, ঠাকুর সিং খুনটুনের হুমকি দিয়েছিল, তা যেন কিছুই না।

ঠাকুর সিং হাঁক দিয়ে বলল, "কই হ্যায়? চায়ে লাও। আচ্ছাসে কলকাত্তাই চা বানাও!"

তারপর সে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর বলুন?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি সাইমন বুবুম্বা নামে কারও নাম শুনেছ?"

ঠাকুর সিং মাথা হেলিয়ে বলল, "হাঁ, শুনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি জানো, সাইমন বুবুম্বা বিদেশ থেকে এসেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ঠাকুর সিং বলল, "হাঁ জানি।"

"কেউ তাকে গুম করেছে। মুক্তিপণ চেয়েছে। এই ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক আছে?"

"হাঁ, আছে। খুব সম্পর্ক আছে। তাকে তো আমারই জিম্মায় রেখেছি। এই বাড়িতেই।"

এবার কাকাবাবুর অবাক হওয়ার পালা। তাঁর ভুরু দুটো কপালে উঠে গেল। এত সহজে স্বীকার করে ফেলল লোকটা!

দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এ-বাড়িতেই আছে? গুড! তবে তো সব ঝামেলাই চুকে গেল। ঠাকুর সিং, সাইমন বুবুম্বার কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দেশের খুব বিপদ হয়ে যাবে। তুমি তাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, দেশ তোমার কাছে ঋণী থাকবে।"

ঠাকুর সিং বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বলল, "ওসব দেশ-ফেশ আমি বুঝি না। তোমাদের মতন শহরের লোকেরা দেশ নিয়ে মাথা ঘামায়। এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দিয়ে যাও, মাল ডেলিভারি নিয়ে যাও। এটা আমার ব্যবসা।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি বলছ কী, ঠাকুর সিং! মানুষ চুরি তোমার ব্যবসা?

সাইমন বুবুম্বা তোমার কাছে আছে আমরা জেনে গেলাম। এখন তো পুলিশ ডেকে এনে তাকে উদ্ধার করে নিতে পারি।"

ঠাকুর সিং বলল, "শোনো রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাফ-সাফ সব কথা বলে দিচ্ছি। আমি মানুষ চুরি করি না, মুক্তিপণও আমি নিজের হাতে নিই না। সেসব কারবার অন্য লোক করে। আমি শুধু জিম্মাদার। এখন সারাদেশে যখন-তখন মানুষ গুম হয়। অসমে, বিহারে, পঞ্জাবে, অন্ধ্র প্রদেশে। সেসব অন্য-অন্য পার্টির কাজ। আমার কাছে তারা সেইসব লোকগুলোকে এনে রাখে। আমি তাদের দেখ্‌ভাল করি। খাওয়াই-দাওয়াই। মুক্তিপণের একটা বখরা আমি পাই, ব্যস !"

"পুলিশ তোমার হদিস পায়নি ?"

"বিহারের পুলিশের সাহস নেই আমার বাড়ির ধারেকাছে আসে।"

"কিন্তু সাইমন বুবুম্বাকে যে আমার চাই। তাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।"

"ওসব ফিকির ছাড়ো, রায়চৌধুরী। তোমাকে আর এই বাচ্চা দুটোকে আমি ছেড়ে দেব কথা দিয়েছি, ভালয়-ভালয় ফিরে যাও। দ্বিতীয়বার যদি গণ্ডগোল করো, আমার ব্যবসার ক্ষতি করতে চাও, তা হলে কিন্তু আমি আর ছাড়ব না। কুত্তা দিয়ে তোমাদের খাওয়াব !"

"ওরে বাবা, খুব যে ভয় দেখাচ্ছ দেখছি।"

"আমি মিথ্যে কথা বলি না। সাইমন বুবুম্বা একটা স্পেশাল কেস। খুব বড় ব্যাপার। এর পেছনে অনেক বড় কোনও লোক আছে। অনেক টাকার খেলা। তুমি কিছুই করতে পারবে না, রায়চৌধুরী। বাইরের পুলিশ এনেও কোনও লাভ হবে না। আমার বাড়িটা দেখছ তো ? পাহাড়ের ওপর। পুলিশের গাড়ি এলে এক মাইল দূর থেকে টের পেয়ে যাব। আমার ওপর অর্ডার আছে, সাইমন বুবুম্বাকে কিছুতেই পুলিশের হাতে দেওয়া হবে না। পুলিশ যদি আমার গেটের কাছে আসে, আমি নিজের হাতে সাইমন বুবুম্বাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে পেছনে একটা নদীতে ভাসিয়ে দেব। পুলিশ ভেতরে ঢুকলেও কিচ্ছু প্রমাণ পাবে না।"

এই সময় একজন বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। চায়ের সঙ্গে দু-তিনরকম কেক।

কথার ভঙ্গি পালটে ভদ্রতার সুরে ঠাকুর সিং বলল, "চা এসে গেছে, খেয়ে নিন !"

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। একটা মানুষকে টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলার কথা শোনবার পর কি চা খাওয়া যায় !

কাকাবাবু একটা কাপ তুলে দিব্যি চুমুক দিলেন।

খানিকটা কৌতূহলের দৃষ্টিতে ঠাকুর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুমি এমন গড়গড় করে সব কথা বলে দিচ্ছ, তাতে আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে

না। সাইমন বুবুম্বা সত্যিই তোমার এখানে আছে ? না কি লম্বা-চওড়া কথা বলে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ !"

ঠাকুর সিং হে-হে করে হেসে উঠে বলল, "নিজের চোখে দেখে যাবে ? তা হলে বিশ্বাস হবে ? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

ঠাকুর সিং বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কাকাবাবু একটা কেকের টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে বললেন, "হুঁ, বেশ ভালই তো !"

সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরা খেয়ে নে। এই জঙ্গলেও ভাল কেক বানায়।"

এই সময় একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকল, "পিতাজি !"

মেয়েটি ভারী সুন্দর। শালোয়ার-কামিজ পরা। ফুটফুটে মুখখানি। হরিণীর মতন সরল চোখ মেলে সে ঘরের মধ্যে কাকে যেন খুঁজল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী ?"

মেয়েটি বলল, "রোশনি !"

তারপরই একটা পাখির মতন ফুড়ুত করে চলে গেল।

ঠাকুর সিং ফিরে এল মিনিট দশেক পরে। বলল, "চলো আমার সঙ্গে !"

কাকাবাবু বললেন, "একটু আগে একটি বাচ্চা মেয়ে উঁকি মেরে গেল। রোশনি। সে কি তোমার মেয়ে ?"

ঠাকুর সিং বলল, "হাঁ। সে এসেছিল বুঝি ?"

কাকাবাবু বললেন, "কী সুন্দর দেখতে তোমার মেয়েকে। আচ্ছা ঠাকুর সিং, তোমার এই মেয়েকে যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, তারপর তোমার কাছে মুক্তিপণ চায়, না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, তা হলে তোমার কেমন লাগবে ?"

ঠাকুর সিং রুক্ষ স্বরে বলল, "ওসব বাত ছাড়ো। ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা। তার মধ্যে আবার ছেলেমেয়ের কথা আসে কী করে ? লোকে তো যুদ্ধ করতে গিয়েও মানুষ মারে। নিজের ছেলেও কোনও যুদ্ধে মরতে পারে ভেবে কেউ কি যুদ্ধ বন্ধ করে ?"

একটু থেমে সে আবার হিংস্র গলায় বলল, "আমার মেয়ে রোশনি, একটা ফুলের মতন মেয়ে, তার গায়ে যদি কেউ হাত ছোঁয়ায়, আমি তার কলিজা ছিঁড়ে নেব। ভীমের মতন আমি তার রক্ত খাব !"

আগের দেখা বারান্দাটা এল-শেপের মতন বেঁকে গেছে। সেখানে একটা ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল ভেতরে আর-একটা দরজা। তারপরে লোহার গরাদ দেওয়া একটা জেলখানার মতন।

সেই ঘরটা আধো-অন্ধকার। সেখানে একটা খাটিয়ার ওপর একপাশ ফিরে

শুয়ে আছে একজন মানুষ। জিন্‌স আর হলুদ গেঞ্জি পরা। দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ। লোকটি ঘুমিয়ে আছে। সোনালি ফ্রেমের চশমাটা পাশে খুলে রাখা।

সন্তু জোজোর দিকে তাকাল।

জোজো মাথা নেড়ে বলল, "ইয়েস !"

ঠাকুর সিং বলল, "আমরা ভাল খেতে দিই। যত্ন করি। খুব ভাল হোটেলেও এরকম যত্ন পাবে না।"

কাকাবাবু ডেকে উঠলেন, "সাইমন, সাইমন !"

ঠাকুর সিং বলল, "ডেকে কোনও লাভ নেই। আফ্রিকানদের কীরকম ঘুম তুমি জানো না। ঠিক কুম্ভকর্ণের মতন। একবার ঘুমোলে সাত ঘন্টার আগে চোখ মেলবে না। এখন তুমি বোমা ফাটাও এখানে। তাও জাগবে না।"

সেই বারান্দার একটা দরজা আছে বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে। ঠাকুর সিং কাকাবাবুদের নিয়ে এল সেখানে। এর মধ্যে টিপি-টিপি বৃষ্টি নেমেছে।

ঠাকুর সিং বলল, "তা হলে তোমাদের গাড়িটা ভেতরে আনতে বলি ! গেট পর্যন্ত যেতে গেলে ভিজে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ ! ঠাকুর সিং, একটা কথা তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। সাইমন বুবুম্বাকে এখানে দেখে গেলাম। তাকে যে-কোনও উপায়ে আমি উদ্ধার করার চেষ্টা করবই। হাল ছেড়ে দেব না, বুঝতেই পারছ ! হি ইজ টু-উ-উ ইমপর্টান্ট !"

ঠাকুর সিং বলল, "রায়চৌধুরী, তোমাকেও আমি বলে দিচ্ছি, তুমি আমার এখান থেকে ওই লোকটাকে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না। কিছুতেই না। আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তোমাকে। তবে আবার তুমি যদি এ-বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করো, তখন কিন্তু আমি আর ছাড়ব না। তোমাকেও জানে মেরে দেব !"

কাকাবাবু বললেন, "অল রাইট। চ্যালেঞ্জ রইল।"

মহিম গাড়িটা চালিয়ে আনল এদিকে। সবাই উঠে গেল। ঠাকুর সিং বলল, "জঙ্গলে ঘোরো। জানোয়ার দেখো, এদিকে আর এসো না !"

কাকাবাবু বললেন, "শিগগির তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

গাড়িটা গেট পার হওয়ার সময় দরোয়ান কী যেন একটা ছুঁড়ে দিল জানলা দিয়ে। একটা কালো বলের মতন। সবাই চমকে উঠল। জিনিসটা পড়েছে জোজোর কোলের ওপর, সে চেঁচিয়ে উঠল. "ওরে বাবা রে, বোমা, বোমা, গাড়িটা উড়িয়ে দেবে।"

জোজো দু' হাত দিয়ে সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

সন্তু নিচু হয়ে টপ করে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর বলল, "এ তো একটা ক্যামেরা !"

মহিম ঘাড় ফিরিয়ে বলল, "কামেরা ? আমারটা কেড়ে নিয়েছিল। ফেরত দিয়েছে।"

সন্তু সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, "ভাঙেটাঙেনি, ঠিকই আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওঃ, তোরা এমন চেঁচিয়ে উঠলি, আমি ভাবলাম সত্যিই বুঝি বোমা। আর-একটু হলে গাড়ির দরজা খুলে লাফাতে যাচ্ছিলাম !"

জোজো বলল, "একবার কম্বোডিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় সত্যিই আমাদের গাড়ির মধ্যে একটা জ্বলন্ত বোমা ছুড়ে দিয়েছিল ডাকাতরা। সেইজন্যই আমি ভাবলাম..."

সন্তু বলল, "সেবারে বোমায় তোদের গাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু তোদের গায়ে একটাও আঁচড় লাগল না, তাই তো ?"

জোজো বলল, "মোটেই তা নয়। আমাদের গাড়িতে এক টিন নারকোল তেল ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই টিনের সবটা তেল ঢেলে দিলাম বোমার ওপর। অমনই সেটা ফুস করে নিভে গেল। নারকোল দিয়ে ভেজালে কোনও বোমা ফাটতে পারে না, জানিস না ?"

সন্তু তাকাল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু থেমে বললেন, "কী জানি ! কোনওদিন তো বোমার ওপর নারকোল তেল ঢেলে দেখিনি। বোধ হয় আর্মির লোকেরাও এই টেকনিকটা জানে না।"

সন্তু পেছন ফিরে ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা আর একবার দেখবার চেষ্টা করে বলল, "উঃ, সত্যিই যেন সিংহের গুহা ! যখন দেখলাম মহিমদাকে বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে—"

জোজো বলল, "আর কাকাবাবু যখন তলোয়ার লড়তে গেলেন, তখন এত ভয় করছিল ..."

কাকাবাবু বললেন, "ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। আমার আত্মবিশ্বাস জিনিসটা খুব স্ট্রং, বুঝলে জোজো ! লোকে বলে জেদ্ কিংবা গোঁয়ার্তুমি। জিতব জেনেই তলোয়ারটা হাতে নিয়েছিলাম। সে যাকগে ! সাইমন বুবুম্বাকে আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখলাম। ওকে উদ্ধার করার একটা উপায় বার করতেই হবে !"

বাংলোয় ফিরে এসে কাকাবাবু টেলিফোন নিয়ে বসলেন। এখানে একটা টেলিফোন আছে বটে, কিন্তু লাইন পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবু কাকাবাবু চেষ্টা করে যেতে লাগলেন অনবরত।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার সময় কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "তোরা এই জঙ্গলের মধ্যে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে পারিস, খবর্দার, বেশি দূরে যাবি না। ওয়াইল্ড ডগ্‌সের ভয় আছে।"

সন্তু বলল, "আমরা গাড়ি করে গেলেও কি ওয়াইল্ড ডগ্‌স কিছু করতে

পারবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা পারবে না বটে। কিন্তু ঠাকুর সিং তোদের একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তাতে আরও মুশকিলে পড়ে যাব। গাড়িতে গেলেও কাছাকাছি থাকবি।"

খাওয়া সেরেই সন্তু আর জোজো ছুটে গেল মহিমের কাছে। তার ঘরটা একটু দূরে। মহিম শুয়ে-শুয়ে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও শুনছে। সন্তু বলল, "মহিমদা, চলো না আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।"

মহিম কাতর মুখ করে বলল, "সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথা দপদপ করছে। আমি এখন গাড়ি চালাতে পারব না।"

ওরা দু'জনে মহিমের দু' পাশে দাঁড়াল।

সন্তু বলল, "মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?"

মহিম বলল, "না, ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ খেয়েছি! তোমরা এখানে থেকে কী করবে !"

মহিমকে ঘুমোতে দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। এখন আর ওদের কিছুই করার নেই। রোদ ঝাঁঝাঁ করছে। অন্য আর কোনও টুরিস্ট আসেনি, চতুর্দিক নিস্তব্ধ। একঝাঁক টিয়াপাখি ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল।

একটু দূরে একটা বড় শিমুলগাছের ছায়ায় গিয়ে বসল দু'জনে।

সন্তু বলল, "দ্যাখ জোজো, তুই যে সেদিন ভোরবেলা এসে সাইমন বুবুম্বার কথা বললি, তখন আমি ঠিক বিশ্বাস করিনি। তারপর জানা গেল, সত্যিই আফ্রিকা থেকে ওই নামে একজন এসেছে। তাকে গুম করা হল। একটু আগে তাকে আমরা দেখেও এলাম। কিন্তু আমার একটা চিন্তা হচ্ছে। ঠাকুর সিং কি ওকে পিন হেড মাশরুম কিংবা পিংক রজনীগন্ধা ফুল খাওয়াতে পারবে ? সেসব কি এখানে পাওয়া যায় ?"

জোজো বলল, "তা হলে ডিমসেদ্ধ খাবে। মধুর অভাবে গুড়ও খেতে হয় জানিস না ?"

"সত্যি করে বল তো, সাইমন বুবুম্বা কাঁচা-কাঁচা ফুল খায় ?"

"আফ্রিকানরা অনেক জিনিস কাঁচা খায়। সেইজন্যই ওদের স্বাস্থ্য এত ভাল। আমরাও তো ফুলকপি কাঁচা খেতে পারি। টমাটো কাঁচা খেতে পারি। পারি না ?"

"জোজো, এখানে শুধু তুই আর আমি আছি। আমার সামনে তোর গুল ঝাড়ার দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করব, স্পষ্ট সত্যি বলবি। সাইমন বুবুম্বা সত্যি-সত্যি তোদের বাড়িতে এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, একদিন সন্ধেবেলা বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ছিলেন প্রায় দেড় ঘন্টা।"

"তুই সব জিনিসই অনেকটা বাড়িয়ে বলিস, তাই না ? সন্ধেবেলা

এসেছিলেন দেড় ঘন্টার জন্য। আর তুই বলেছিলি, তোদের বাড়িতে থাকছেন, সকালে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। কিন্তু তোদের বাড়িতে এসেছিলেন, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তবু কেন তুই আজ বললি যে সাইমন বুবুম্বার গায়ের রং কুচকুচে কালো ?"

"আসল ব্যাপারটা বলি। উনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়নি। আমি বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, আফ্রিকার একটা দেশের প্রেসিডেন্ট বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছে।"

"প্রেসিডেন্ট নয়। প্রেসিডেন্টের ভাই।"

"ওই একই হল। পরে তো প্রেসিডেন্ট হবে। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। আর সামনের ঘরে কুচকুচে কালো একজন আফ্রিকান বসে আছে। সে সাইমন বুবুম্বার সেক্রেটারি। সুতরাং তাকে দেখে আমি ধরেই নিলাম, বুবুম্বারও রং ওইরকম কালোই হবে। সে যে মুলাটো না ফুলাটো, তা জানব কী করে ?"

"তোর সঙ্গে তা হলে দেখাই হয়নি ?"

"বাবার ঘরের পেছন দিকে একটা দরজা আছে। তাতে এক চুল ফাঁক। খুব বিখ্যাত কোনও লোক এলে ওই দরজার ফাঁকে আমি আড়ি পাতি। একটু-একটু দেখা যায়, একটু-একটু কথা শোনা যায়। সাইমন বুবুম্বা সেদিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। টুকরো-টুকরো কথা শুনে বোঝা গেল, কবে প্রেসিডেন্ট হবে তা জানতে চায়। বাবা কী সব ধারণটারন করতে বললেন, আর একটা মুন স্টোনের আংটি দিলেন।"

"উনি বেরোবার সময়েও তুই দেখতে পাসনি ?"

"একটু সময়ের জন্য আমি বাথরুমে গিয়েছিলুম, তার মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন যে। আমি বাথরুম শেষ করে আসতে-আসতে উনি গাড়িতে উঠে বসেছেন। কিন্তু ওঁর সেই সেক্রেটারি আবার নেমে এসে বলল, মিঃ বুবুম্বা চশমাটা ফেলে গেছেন। বাবা আমাকে একটা সোনালি ফ্রেমের চশমা দিয়ে বললেন, এইটা দিয়ে দে, জোজো !"

"তোর এই গল্পটার কতটা সত্যি ?"

"সেটা তুই নিজে বুঝে দ্যাখ !"

"তুই কথায়-কথায় এত বেশি বানাস কেন, জোজো ? সোজাসুজি সত্যি কথা বলতে পারিস না ?"

"আমি তোদের মতন অর্ডিনারি হতে চাই না ! আমার যা মনে আসে তাই বলি। আমার মনটা রিরাট।"

"ওই মুন স্টোনের কথাটা শুনেই বুঝি তুই চাঁদের পাথরের আইডিয়াটা পেয়ে গিয়েছিলি ?"

"আইডিয়াটা কেমন ছিল বল ? ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে, এমনকী জি সি বি

পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল। এরকম দুর্দান্ত প্র্যাকটিক্যাল জোক ক'জন করতে পারে?"

"হ্যাঁ, অনেক দূর পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু মিউজিয়াম থেকে পাথরটা চুরি যাওয়ায় তোর জোকটা প্র্যাংক হয়ে গেল। তাই তো নাসির সাহেবের কাছে ধমক খেয়ে তুই প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলি।"

"কাঁদিনি রে, কাঁদিনি! ওটা অভিনয়। মাঝে-মাঝে কান্নার অভিনয়টা প্র্যাকটিস করতে হয়।"

"আর-একটা কথা বল তো। দিল্লি থেকে নরেন্দ্র ভার্মা যখন এসে কাকাবাবুকে সাইমন বুবুম্বার উধাও হয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন তখন তুই একবারও জানালি না কেন যে, উনি তোদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, বলে আবার একটা ঝামেলায় পড়ি আর কী! একে তো নাসির সাহেব চাঁদের পাথর নিয়ে অত জেরা করে গেলেন, তারপর নরেন্দ্র ভার্মা আবার জেরা শুরু করে দিতেন! জেরায় জেরায় আমি জেরবার হয়ে যেতাম। তা ছাড়া, সাইমন বুবুম্বা আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, এটা তো একটা নিছক ঘটনা। ফ্যাক্ট! শুধু ফ্যাক্ট বলায় আমার কোনও উৎসাহ নেই।"

দেখতে-দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর ঝড় উঠল খানিকক্ষণ। বারান্দায় বসে ঝড় দেখতে দারুণ লাগে। গাছের ডালগুলো মড়মড় করবে। অসংখ্য ঝরা পাতা উড়ছে সামনের মাঠে। একসঙ্গে গোটা দুয়েক বড় কোনও জন্তু হুড়মুড় করে চলে গেল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

এখানে খবরের কাগজ আসে না। বাইরের খবর জানার একমাত্র উপায় রেডিও। রেডিওতে শোনা গেল, অসমের চা বাগান থেকে আবার একজন ম্যানেজারকে কারা যেন জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। চাঁদের পাথরটার এখনও হদিস পাওয়া যায়নি। পঞ্জাবে খুব গণ্ডগোল চলছে। সাইমন বুবুম্বাকে খোঁজা হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে। পুলিশ দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সাইমন বুবুম্বার সঠিক খবর যে দিতে পারবে, সে পাবে। প্রধানমন্ত্রী জরুরি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছেন, আজ রাত্তিরে আরও ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

খবর শুনে জোজো বলল, "ওই দশ লক্ষ টাকা তো আমাদেরই পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমরা সাইমন বুবুম্বাকে বন্দি অবস্থায় একটা বাড়িতে দেখেছি। এটা তো সঠিক খবর।"

সন্তু বলল, "আমরা যে দেখেছি, তার প্রমাণ কী?"

"বাঃ, আমরা তিনজন দেখেছি। স্পষ্ট দেখেছি। দশ লক্ষকে তিন দিয়ে ভাগ কর। থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি থ্রি লাখ টাকা আমিও পাব কিন্তু!"

"দাঁড়া, দাঁড়া জোজো। তুই যে আগেই কালনেমির লঙ্কা ভাগ করতে বসে গেলি। নিজের চোখে দেখাটাই প্রমাণ নয়। আমাদের দেওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ যদি ওকে উদ্ধার করতে পারে, তাকেই বলে প্রমাণ। কিন্তু পুলিশকে

যেতে দেখলেই ঠাকুর সিং হয় সাইমন বুবুম্বাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই কোথাও সরিয়ে ফেলবে কিংবা মেরে কেটে কুচি-কুচি করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। কোনও প্রমাণ থাকবে না। গেটের দু' পাশে দুটো গম্বুজ দেখিসনি ? নিশ্চয়ই ওর ওপর উঠে রাত্তিরবেলা ওরা নজর রাখে। ওই টিলায় ওঠার আর কোনও রাস্তা নেই।"

জোজো বিরক্তির সঙ্গে বলল, "দূর ছাই !"

কাকাবাবু বারবার শুধু সাইমন বুবুম্বার ফাইলটা পড়ে যাচ্ছেন আর টেলিফোনে লাইন পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ওদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলছেন না।

রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া চুকে গেল তাড়াতাড়ি। কাকাবাবু শুতে চলে গেলেন।

সন্তু আর জোজো এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চায় না। ওরা গল্প করতে লাগল বারান্দায় বসে। ঝড় তেমন প্রবল নয়, হাওয়া বইছে শোঁ-শোঁ শব্দে। তার সঙ্গে মিশে আছে উড়ন্ত বৃষ্টি।

রাত যখন প্রায় এগারোটা, তখন একটা গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ওদের গাড়িটা রয়েছে একটা গাছের নীচে। এত রাত্রে সেটা চালাতে চাইছে কে ? কোনও চোর নাকি ?

সন্তু আর জোজো দু'জনেই ছুটে গেল।

না, চোর নয়। মহিমই বসে আছে স্টিয়ারিংয়ে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এ কী মহিমদা, তোমার শরীর খারাপ, এখন কোথায় যাচ্ছ ?"

মহিম বলল, "শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। একটু ঘুরে আসব।"

সন্তু বলল, "আমরাও যাব। এই সময় অনেক জন্তু-জানোয়ার দেখা যেতে পারে।"

মহিম এবার গম্ভীরভাবে বলল, "না, তোমরা যাবে না।"

"কেন, আমরা যাব না কেন ?"

"আমি জঙ্গলে যাচ্ছি না। আমি যেখানে যাচ্ছি...তোমাদের বিপদে ফেলতে চাই না। আমাকে একাই যেতে হবে।"

"অ্যাঁ ? তুমি ঠাকুর সিংয়ের বাড়ি যাচ্ছ ? পাগল হয়েছ নাকি ?"

"মোটেই পাগল হইনি। রেডিওতে শুনলাম দশলাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব।"

"সকালবেলা তুমি ধরা পড়ে গেলে, তারপর ওই কাণ্ড হল। আবার তুমি একা যাচ্ছ ?"

"এবার সাবধান হয়ে যাব। শোনো, দশ লক্ষ টাকা পেলে আমি মধ্যমগ্রামে

একটা ছোট বাড়ি বানাব। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাকি টাকায় একটা রেডিওর দোকান খুলব। বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটবে। এই দশ লক্ষ টাকার জন্য একটা বড়রকমের ঝুঁকি তো নিতেই হবে। যদি লুলুম্বা সাহেবকে উদ্ধার করতে পারি—"

"লুলুম্বা নয়, বুবুম্বা।"

"ওই যা হোক। আফ্রিকার রাজার ভাইটাকে যদি একা উদ্ধার করতে পারি, পুলিশের টাকা তো পাবই, ওই কালো সাহেবও নিশ্চয়ই আমাকে কিছু পুরস্কার দেবেন নিজে থেকে।"

"কিন্তু তুমি একা পারবে কী করে?"

"গাড়ি নিয়ে পুরোটা যাব না। টিলার নীচে রেখে দেব। চুপিচুপি পায়ে হেঁটে উঠব। পাঁচিলের এক জায়গায় খানিকটা নীচু আছে, সকালে দেখে রেখেছি, সেখান দিয়ে ঢুকব।"

"ভেতরে দুটো ভয়ঙ্কর কুকুর আছে।"

"সে-ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। ডিনারে যে মাংস দিয়েছিল, খাইনি, রেখে দিয়েছি। খুব কড়া ঘুমের ওষুধ আছে আমার কাছে। সেই ওষুধ মেশানো মাংস ছুঁড়ে দেব আগে। কুকুর দুটো খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।"

"আর যে দশ-বারোজন লোক বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?"

"তাদেরও ঘায়েল করার উপায় আছে। কলকাতা থেকেই বড় এক শিশি ক্লোরোফর্ম নিয়ে এসেছি। রুমালে ক্লোরোফর্ম ভিজিয়ে এক-একটা লোককে পেছন থেকে ধরে-ধরে অজ্ঞান করে দেব।"

"মহিমদা, এসব সিনেমায় হয়। বাস্তবে হয় না। কেউ না কেউ তোমায় ধরে ফেলবে।"

"বাস্তবে যা হয়, সিনেমাতে তাই-ই দেখায়। সরে যাও, সন্তু, এই দশ লক্ষ টাকা আমার চাই।"

সন্তু এবার হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং চেপে ধরে বলল, "তোমাকে একা কিছুতেই যেতে দেব না। আমরাও যাব। চল, জোজো ওঠ।"

জোজো বলল, "আমাকে মাফ করো, ওই সিংহের গুহায় আমি যেতে চাই না। এমনই দশ-বারোজন গুণ্ডাকেও আমি ভয় পাই না। রদ্দা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। কিন্তু বড়-বড় কুকুর, একটু ওষুধ মেশানো মাংস খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, তুই থাক। কাকাবাবুকে ম্যানেজ করিস, যেন জানতে না পারেন। আমি যাব মহিমদার সঙ্গে।"

মহিম বলল, "যেতে পারো এক শর্তে। যদি সাকসেসফুল হই, তুমি কিন্তু ওই দশ লাখ টাকার ভাগ চাইবে না। তুমি ছেলেমানুষ, পরে অনেক রোজগার করতে পারবে।"

সন্তু বলল, "না, না, আমার টাকা চাই না।"

জোজো বলল, "আমাদের দু'জনকে অন্তত একলাখ করে দিও!"

সন্তু বলল, "মহিমদা, তোমার কাছে ছুরিটুরি আছে কিছু?"

মহিম বলল, "না।"

সন্তু বলল, "একটা অন্তত সঙ্গে রাখা দরকার। অন্তত যদি দড়ি-টড়িও কাটতে হয়...আমার একটা ভোজালি আছে, নিয়ে আসব?"

মহিম বলল, "যাও, চটপট আনো। আর যদি একটা টর্চ আনতে পারো ভাল হয়। আমার কাছে টর্চও নেই।"

সন্তু দৌড়ে বাংলোয় ফিরে গেল। সে আর জোজো এক ঘরে শোয়। ভোজালিটা সে-ঘরেই আছে। কিন্তু টর্চটা কাকাবাবুর কাছে। একটা টর্চ তো লাগবেই।

কাকাবাবুর ঘরের দরজাটা আস্তে করে ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। কাকাবাবুর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সন্তু পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এল।

টর্চটা কাকাবাবুর শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা আছে, সন্তু আগেই দেখেছে। অন্ধকারে আন্দাজে চলে এল সেখানে। টর্চটা তুলে নিল। কাকাবাবু জাগেননি।

দরজা পর্যন্ত ফিরে আসতেই কাকাবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "টর্চ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস এখন?"

সন্তু থমকে গেল, তার বুক কেঁপে উঠল।

অপরাধীর মতন বলল, "একটু মহিমদার সঙ্গে ঘুরে আসতে যাচ্ছি!"

কাকাবাবু বললেন, "এত রাত্রে! আমাকে না বলে? তোকে বারণ করেছিলাম না?"

"মহিমদা যে যেতে চাইছে। একা-একা। তাই আমি—"

"মহিম কোথায় যেতে চাইছে?"

"ওইখানে!"

"মানে, ঠাকুর সিংয়ের বাড়িতে? ইডিয়েট! শিগগির ডেকে নিয়ে আয় মহিমকে। বলবি, নরেন্দ্র ভার্মা গাড়িটা আমার ব্যবহারের জন্য দিয়েছে। আমার হুকুম ছাড়া মহিম গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কে? যা, তাকে ধরে নিয়ে আয়!"

জোজো আর সন্তুর সঙ্গে মহিম যখন এ-ঘরে এল, তখন আলো জ্বলে গেছে, কাকাবাবু বিছানায় উঠে বসেছেন।

কাকাবাবু সাধারণত নিজের লোকদের কড়া গলায় কথা বলেন না। এখন তিনি বেশ রেগে গেছেন বোঝা গেল। মুখখানা থমথমে হয়ে আছে। প্রচণ্ড

ধমকের সুরে তিনি বললেন, "কোন সাহসে তুমি আমাকে না বলে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলে ?"

মহিম গোমড়ামুখে বলল, "ঠিক আছে, আমি গাড়ি নেব না। পায়ে হেঁটেই যাব।"

কাকাবাবু আরও জোরে বললেন, "দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা শুনে বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? সকালে ধরা পড়ে কোনওক্রমে বেঁচে গেছ। এবার ধরা পড়লে ওরা একটুও দয়া মায়া দেখাত না। প্রাণেই যদি বাঁচতে না পারো, তা হলে পুরস্কারের টাকাটা ভোগ করবে কী করে ? নিজের ক্ষমতা না বুঝে যারা বিপদে ঝাঁপ দেয়, তারা বেঘোরে মরে !"

মহিম এবার চুপ করে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "ওইভাবে যদি লোকটাকে উদ্ধার করা যেত, তা হলে আমিই কি সে-চেষ্টা করতাম না ? ঠাকুর সিং ওই লোকটাকে দেখিয়ে দিল তো ওইজন্যই। যাতে আমরা রাত্তিরে আবার ঢোকার চেষ্টা করি আর গুলি খেয়ে মরি। আমি অন্য একটা পরিকল্পনা করছি, এর মধ্যে তোমরা ওর খপ্পরে পড়ে গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

এবার সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "তুই এত বোকা হয়ে গেলি কী করে, সন্তু ! আমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমার ঘরে ঢুকে কেউ কিছু নিয়ে চলে যাবে, অথচ আমি জাগব না, এরকম কখনও হয়েছে আগে ?"

জোজো বলল, "আমি শেষপর্যন্ত ওদের যেতে দিতাম না, কাকাবাবু ! ওরা দু'জনে যখন কথা বলছিল, ততক্ষণে আমি গাড়ির চাবিটা টুক করে সরিয়ে ফেলেছিলাম !"

॥ ৬ ॥

সকালটা বেশ সুন্দর। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। গাছগুলোর পাতা সব ধোওয়া, ঝকমকে সবুজ। আজও একটা ময়ূর এসে ডাকছে। পোষা হরিণগুলো ঘুরছে আপন মনে।

বারান্দায় বসেই চা খাওয়া হয়ে গেছে একটু আগে। এঁটো কাপ-ডিশগুলো পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কাকাবাবু গেছেন বাথরুমে। ম্যানেজার নুরুলসাহেব গল্প করছেন সন্তুদের সঙ্গে।

নুরুলসাহেবের পাঁচ বছরের মেয়ে আমিনা খেলা করছে সামনে। সে ছুটে-ছুটে একটা প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করছে। চার-পাঁচ রকমের রঙিন ফ্রক পরা মেয়েটি নিজেও যেন একটা প্রজাপতি।

একটা জিপগাড়ি এসে থামল বাগানের পাশে। তার থেকে নামল একটা গাঁট্টাগোঁট্টা লোক, এগিয়ে আসতে লাগল বাংলোর দিকে।

আমিনা প্রজাপতির দিকে চেয়ে-চেয়ে ছুটছে, অন্য কিছু দেখছে না, সেই

লোকটার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল বেশ জোরে।

এরকম ধাক্কা লাগলে যে-কোনও লোক ছোট মেয়েটিকে আদর করে কিংবা কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে যে তার লেগেছে কি না। কিন্তু এই লোকটা বিরক্তভাবে আমিনাকে জোরে ঠেলে দিল, সে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কেঁদে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

নুরুলসাহেব মেয়েকে ধরতে গেলেন না, লোকটিকেও কিছু বললেন না।

প্রচণ্ড রাগে সন্তুর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। লোকটা আর একটু কাছে আসতেই সন্তু অন্য কিছু আর চিন্তা না করে ছুটে গিয়ে লোকটির মুখে খুব জোরে একটা ঘুসি কষাল।

লোকটা ধড়াম করে পড়ে গেল চিত হয়ে। এক ঘুসিতেই প্রায় অজ্ঞান। ঘুসিটা লেগেছে ঠিক নাকের ডগায়। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

নুরুলসাহেব আঁতকে উঠে বললেন, "এ কী করলে ভাই? সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ওকে মারলে?"

সন্তু হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "মারব না, নিশ্চয়ই মারব!"

জোজো বলল, "বেশ করেছে মেরেছে। ও না মারলে আমি নিজেই ওর মাথাটা একটা নারকোলের মতন ফাটিয়ে দিতাম।"

জোজো ছুটে গিয়ে আমিনাকে মাটি থেকে তুলে নিল।

নুরুলসাহেব বললেন, "ও লোকটা কর্তার সিং! তোমরা চেনো না। ঠাকুর সিংয়ের ডান হাত!"

সন্তু বলল, "ডান হাত, বাঁ হাত যাই-ই হোক, ওইটুকু একটা মেয়েকে মারলে শাস্তি দিতে হবে না?"

নুরুলসাহেব ভয়ে আমসির মতন মুখ করে বললেন, "ওদের চটালে আমি যে এখানে চাকরিই করতে পারব না। ওরা যা ইচ্ছে তাই-ই করে। শিকার করা নিষেধ, তবু জঙ্গলে গিয়ে হরিণ মারে, খরগোশ মারে। আমার এখানে খাবার নিতে আসে মাঝে-মাঝে। যক্ষুনি যা চাইবে, দিতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে।"

কর্তার সিং উঠে বসল আস্তে-আস্তে। জ্বলন্ত চোখে তাকাল সন্তুর দিকে। দাঁত কিড়মিড় করে কী যেন একটা খারাপ গালাগালি দিল।

সন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই রইল, সরল না এক চুলও।

কর্তার সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কুত্তার বাচ্চা, তোকে জানে মেরে দেব!"

সন্তু দুটো হাত মুঠি করে বুক আড়াল রেখে বলল, "আও না, আও! তোমাকে আরও শিক্ষা দেব আমি।"

সন্তুর তুলনায় কর্তার সিংয়ের শরীর অন্তত আড়াইগুণ বড়। সন্তুকে দেখলে মনেই হয় না তার গায়ে খুব জোর আছে। সে মাস্‌ল-টাস্‌ল ফোলায় না। প্যান্ট আর শার্ট পরা সাধারণ চেহারা। কিন্তু বক্সিং সে ভাল জানে।

কর্তার সিং বক্সিংটক্সিংয়ের ধার ধারে না। একটা ঘুসি খেয়েই সে সন্তুর

মুঠোর ওজন বুঝে গেছে। সে আর ও লাইনে গেল না।

বাঁ হাত দিয়ে সে মুখের রক্ত মুছল। ডান হাতে ঝাঁ করে একটা ছুরি বার করল।

সন্তু তবু পালাল না। কর্তার সিংয়ের চোখে চোখ রেখে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। এরকম একটা আসন্ন লড়াইয়ের দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার, কী হয়েছে?"

জোজো বলল, "ওই লোকটা অমানুষ। বাচ্চা মেয়ে আমিনাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সন্তু রেগে গিয়ে ওর নাকে একটা ঘুসি মেরেছে বলে এখন ও ছুরি তুলেছে। কাওয়ার্ড কোথাকার!"

রোদ্দুরে কর্তার সিংয়ের স্থবির ফলাটা চকচক করে উঠল।

কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই চট করে ঘর থেকে রিভলভারটা আনতে পারতেন। কিন্তু আনলেন না। নিজের একটা ক্রাচ সন্তুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, "এটা ধর, সন্তু। লোকটাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দে।"

সন্তু চট করে একটু ঘুরেই লুফে নিল ক্রাচটা। তারপর সেটা বনবন করে ঘোরাতে লাগাল।

কর্তার সিং একটা ন' ইঞ্চি ছুরি নিয়ে অত বড় ক্রাচের সঙ্গে কী করে লড়বে? সে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সন্তু দমাস দমাস করে মারতে লাগল তার পিঠে, বুকে।

আমিনা কান্না ভুলে গিয়ে খলখল করে হাসতে লাগল তা দেখে।

দু'বার কর্তার সিং ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর উঠেই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। সন্তু তাড়া করে গেল তাকে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "মার, আরও মার দে, সন্তু। ওর এত সাহস, সকালবেলাতেই ছুরি বার করে এত লোকের সামনে?"

কর্তার সিং কোনওক্রমে উঠে পড়ল জিপগাড়িতে। দুর্বোধ ভাষায় কী যেন শাসাল মুখ বার করে। তারপর হুস করে বেরিয়ে গেল জিপটা।

সন্তু ফিরে আসতেই কাকাবাবু তার কাঁধ চাপড়ে বললেন, "বাঃ, ভাল লড়েছিস, সন্তু। বেশ করেছিস ওকে মেরেছিস।"

নুরুলসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, "আপনার ওইটুকু মেয়েকে মারল, আপনি নিজে কিছু বললেন না?"

নুরুলসাহেব বললেন, "আমাকে এখানে চাকরি করতে হয়। পুলিশ পর্যন্ত ওদের ভয় পায়। এই যে কাণ্ডটা ঘটল, এর পর কী হয় কে জানে!"

কাকাবাবু বললেন, "এত ভয়ে-ভয়ে চাকরি করতে হবে? এর চেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে না খেয়ে থাকাও ভাল। মানুষের আত্মসম্মান না থাকলে আর কী রইল?"

জোজো বলল, "ওই লোকটা নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে ফিরে আসবে !"

কাকাবাবু বললেন, "আসুক। দেখি ওদের মুরোদ। ঠাকুর সিং টের পেয়ে গেছে, আমি কে ! তোরা এক কাজ কর তো জোজো। তুই আর সন্তু ওই যে চেকপোস্টটা আছে, তার কাছে চলে যা। ওখান দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। ঠাকুর সিং-এর গাড়ি কিংবা লোকজনেরাও যাবে নিশ্চয়ই। তোরা ওখানে অন্য লোকজনদের শুনিয়ে-শুনিয়ে গল্প কর যে কর্তারি সিংকে কেমন মেরেছিস ! সবাইকে বুঝিয়ে দে যে আমরা ভয় পাই না।"

সন্তু আর জোজো মজা পেয়ে গেল। মহিমও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। ওরা তিনজনে সেই চেকপোস্টের কাছে একটা কালভার্টে গিয়ে বসল।

একটা গাড়ি থামতেই জোজো হাসতে-হাসতে বলল, "ওই যে কর্তারি সিং না কে একটা লোক এসেছিল, ঠাকুর সিং-এর বাঁ হাত ..."

মহিম বলল, "বাঁ হাত না, ডান হাত !"

জোজো বলল, "ডান হাত না ডান পা কে জানে ! দেখতেই তাগড়া চেহারা, আসলে একটা ভস্‌কা ! একখানা ঘুসিতে কুপোকাত !"

মহিম বলল, "মাটিতে পড়ে গিয়েই চ্যাঁচাতে লাগল, ঠাকুর সিং, বাঁচাও, বাঁচাও ! কোথায় ঠাকুর সিং ! সেও তো একটা মহাভিতু !"

জোজো বলল, "অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নামে সিনেমাটায় একটা গান ছিল জানিস !"

তারপর সে গেয়ে উঠল, "ভজন পূজন জানি না, মা,
জেতেতে ফিরিঙ্গি..."

থেমে গিয়ে বলল, "এ গানটা না, আর-একটা গান আছে ঠাকুর সিং সম্পর্কে :

হয়ে ঠাকুর সিংয়ের বাপের জামাই
কোর্তা-টুপি ছেড়েছি।"

মহিম হাসতে-হাসতে বলল, "অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এই ঠাকুর সিংয়ের কথা কী করে জানল ?"

জোজো বলল, "ঠাকুর সিং নাকি খুব বীরপুরুষ। তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক যাত্রাদলের সেনাপতির মতন। কাকাবাবু মাত্র পাঁচ মিনিট লড়ে ওর হাত থেকে তলোয়ারটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর থেকে আর ঠাকুর সিং কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকাতেই সাহস পায়নি, লক্ষ করেছিলি ?"

সন্তু বলল, "ঠাকুর সিংয়ের তো প্রাণ বেঁচে গেল কাকাবাবুর দয়ায়।"

জোজো বলল, "ভারী তো বীর ! বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা !"

তিনজনে হোহো করে হেসে উঠল একসঙ্গে।

একটা গাড়ি থেমে চেকপোস্টে নম্বর লেখাচ্ছিল। দু'জন লোক ওদের কথা

শুনে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল। একজন হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কার কথা বলছেন ? কোন ঠাকুর সিং ?"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "এই তো এখানকার ঠাকুর সিং। যার বাড়ির নাম রূপ মঞ্জিল। আমাদের কাকাবাবুর সঙ্গে লড়তে এসেছিল, হেরে ভূত হয়ে গেছে।"

লোকটি বলল, "কাকাবাবু কে ?"

জোজো উত্তর দিল, "রাজা রায়চৌধুরী ! তাঁর নাম শুনলেই ঠাকুর সিং এখন ভয়ে কাঁপে।"

মহিম বলল, "আর এই যে ছেলেটি সন্তু, এ ঠাকুর সিংয়ের চ্যালা কর্তার সিংয়ের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে এক ঘুসিতে।"

জোজো বলল, "সকালবেলা বেয়াদপি করতে এসেছিল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপর যারা অত্যাচার করে, তাদের আমরা দারুণ শাস্তি দিই !"

লোক দুটি অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। এরকম কথা যেন তারা জীবনে শোনেনি।

এইরকম চলল বেশ কিছুক্ষণ। অনেক গাড়ির লোক এইসব কথা শুনে গেল। তাদের মুখে-মুখে আবার ছড়িয়ে গেল অনেক দূর।

চেকপোস্টে যে-লোকটি নম্বর লেখে সে এক সময় উঠে এসে বলল, "এই, তোমরা এইসব কথা বোলো না। ঠাকুর সিং সাঙ্ঘাতিক লোক !"

সন্তু বলল, "আমরা তো মিথ্যে কথা কিছু বলছি না। যা সত্যি তাই বলছি।"

জোজো বলল, "ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা নাকি সিংহের গুহা ? বাংলায় একটা ছড়া আছে জানেন ? সিংহের মামা আমি নরহরি দাস/ পঞ্চাশটা বাঘ আমার এক-এক গ্রাস !"

একটু পরে বাংলো থেকে একজন লোক এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আজ দুপুরটা সবাই ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। রাত্তিরে আজ বেরোব। সারা রাত জাগতে হতে পারে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "রাত্তিরে কোথায় যাব, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা রাত্তিরেই ঠিক করব !"

পাশাপাশি বিছানায় শুয়েও সন্তু-জোজোর ঘুম এল না অনেকক্ষণ। গল্পই চলতে লাগল। কাকাবাবু কিন্তু দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোলেন। যেন তাঁর কোনও চিন্তাই নেই।

বিকেলে উঠে তিনি চা খেলেন দু'বার।

সন্ধে-সন্ধের সময় ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, "আমাদের চারটে খাবারের প্যাকেট করে দিন। রাত্তিরে এখানে খাব না। জঙ্গলে যাব, জঙ্গলে বসে খাব। আর আপনার এখান থেকে দু-একটা বালিশ-পাশবালিশ আর চাদর নিয়ে

যাচ্ছি।"

ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলে বালিশ-চাদর নিয়ে কী করবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে একটুখানি শুয়ে নেব। জঙ্গলে শুয়ে থাকতে ভারী আরাম লাগে।"

তারপর কাকাবাবু বাংলোর মালি, বেয়ারা, দরোয়ান প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, এখন জঙ্গলে কী-কী জন্তু জানোয়ার আছে, কোথায় গেলে কোন্‌টা দেখা যায়। যেন তিনি সকলকে জানাতে চান যে, তিনি আজ সদলবলে জঙ্গল ঘুরতে যাচ্ছেন।

আটটার সময় বাকি তিনজনকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বললেন, "তৈরি হয়ে নাও, এবার বেরোব।"

মহিমকে বললেন, "কাল তুমি যেন কী-কী অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলে ঠাকুর সিংয়ের লোকদের ঘায়েল করতে? ঘুমের ওষুধ, ক্লোরোফর্ম! নিয়ে নাও সঙ্গে, আজ কাজে লেগে যেতে পারে।"

সবাই গাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু ম্যানেজারকে বললেন, "ডান দিকে দু' কিলোমিটার গেলে একটা সল্ট লিক আছে না? পাশে একটা পুকুর? সেইদিকে যাচ্ছি!"

চেকপোস্টের কাছে এসে সেখানকার লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "সল্ট লিক আছে কোন্ দিকে? ওখানে কি একটা পুকুর আছে? জন্তু-জানোয়ার দেখার জন্য ওইটাই তো ভাল জায়গা, তাই না?"

কাকাবাবু যেভাবে সবাইকে জঙ্গলে যাওয়ার কথা বলছেন, তাতে সন্তু আর জোজো দু'জনেরই ধারণা হল, কাকাবাবু আসলে জঙ্গলে যাবেন না। ঠাকুর সিংয়ের বাড়ির দিকেই গোপনে যাবেন।

মহিম সেইদিকেই গাড়ি চালাচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "উঁহুঁঃ, ডান দিকে ঘোরো।"

গাড়ি ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। খানিক বাদে কাকাবাবু এক জায়গায় থামতে বললেন, সেখানে সত্যিই একটা পুকুর রয়েছে।

টর্চের আলো ফেলে-ফেলে কাকাবাবু আগে জায়গাটা পরীক্ষা করলেন ভাল করে। পুকুরের একদিকে একটা ভাঙা ঘাট, অনেক কাল আগে তৈরি হয়েছিল, বেশ চওড়া। সেই ঘাটের দু'পাশে বড়-বড় আমগাছ। একটু ফাঁকা জায়গায় একটা পাথর বসানো। এর মধ্যে নুন থাকে, জন্তু-জানোয়াররা এসে সেই নুন চাটে।

সব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে কাকাবাবু অন্যদের ডেকে বললেন, "শোনো, আমি একটা প্ল্যান করেছি। এখানে একটা ফাঁদ পাতব। আজ যা কাণ্ড ঘটেছে, তাতে ঠাকুর সিং তার দলবল নিয়ে আমাদের খুঁজতে আসবেই। প্রথমে যাবে বাংলোতে, সেখানে না পেয়ে খবর শুনে ঢুকবে এই জঙ্গলে। ওকে ওর বাড়ির

বাইরেই পেতে চাই, না হলে জব্দ করা যাবে না। আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। সন্তু আর জোজো থাকবে গাছের ওপর। মহিম শুয়ে থাকবে গাড়ির তলায়। মোটর মিস্তিরিরা যেমন তলায় শুয়ে থাকে, সেইভাবে। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, ওরা ক'জন আসে। দু'জন কিংবা তিনজন পর্যন্ত হলে ঠিক আছে। বেশি যদি হয়। দশ-বারোজনের দল হলে আমরা কিছুই করতে পারব না। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাবে। যদি সেরকম বড় দল দেখি, আমরা কোনও সাড়াশব্দ করব না। গাড়ির হেডলাইট জ্বালা থাকবে, ওরা দেখবে ফাঁকা গাড়ি। তখন নিশ্চয়ই ভাববে যে, আমরা গাড়ি এখানে রেখে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে গেছি। ওরা সেদিকে খুঁজতে গেলেই আমরা সুযোগ বুঝে গাড়িতে চেপে পালাব।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আর যদি দু-তিনজন আসে?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমি ধরব ঠাকুর সিংকে। তাকে নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না। বাকি লোক দুটোকে ধরবে সন্তু আর জোজো। আর মহিম, তুমি তোমার ক্লোরোফর্মের শিশিটা কাজে লাগিও, চটপট সবাইকে অজ্ঞান করে ফেলবে। আমরা তো আর মানুষ খুন করব না, অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাব!"

পর পর তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, "কিন্তু মনে রেখো, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাবধানতা আর লুকিয়ে থাকা। ওরা যেন কোনওক্রমেই প্রথমে আমাদের দেখতে না পায়। আর যদি বড় দল আসে, তা হলে আমাদের পালাতে হবে। কোনওরকম হঠকারিতার পরিচয় দিলে চলবে না। আর একটা কথা, আমি যখন বলব, 'এইবার!' ঠিক তখনই তোমরা অ্যাকশন শুরু করবে। তার আগে আমি যাই বলি, এমনকী তোমাদের নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেবে না। পালাবার দরকার হলেও আমি বলব, 'এইবার!'"

মহিম জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা সার, গাড়ির তলায় শুয়ে থাকার চেয়ে আমি গাড়ির ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারি না?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা এসে গাড়ির ভেতরটা খুঁজে দেখবেই। তোমাকে দেখামাত্র গুলি করবে। গাড়ির তলায় সাধারণত কেউ খুঁজে দেখে না।"

মহিম বলল, "তা হলে আমিও কোনও গাছের ওপর লুকিয়ে থাকব। গাড়ির তলায় শুতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে তাই-ই থাকো। কতক্ষণ থাকতে হবে তার ঠিক নেই। একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে, নট নড়নচড়ন হয়ে থাকার দরকার নেই। একটু নড়াচড়া করতে পারো। ওরা জানান দিয়েই আসবে। তবে কথা বলার দরকার নেই। যে-যার খাবার গাছের ওপর বসেই খেতে পারো, কিংবা আগেই খেয়ে নিতে পারো। তোমরা উঠে পড়ো গাছে, আমি আমার কাজ শুরু করি।"

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "তুই গাছে উঠতে পারিস তো ?"
জোজো বলল, "ইজি। আফ্রিকায় আমি বহুবার গাছে উঠেছি, এক-একটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু।"
সন্তু বলল, "তা হলে ওঠ তুই আগে।"
জোজো বলল, "প্রথমটায় তুই একটু ঠেলে দে!"
একটা ঝাঁকড়া মতন আমগাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরল জোজো। সন্তু ঠেলে দিল পেছন থেকে। জোজো হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে খানিকটা উঠে গিয়ে পড়ে গেল ধপাস করে। গাছটা পুকুরের দিকে একটু বাঁকা। জোজো পড়ে গিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে গড়াতে লাগল জলের দিকে।
জোজো প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা রে, ধর, ধর আমাকে; ডুবে যাব, ডুবে যাব।"
সন্তু দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলল।
তারপর জিজ্ঞেস করল, "ডুবে যাবি মানে? তুই সাঁতার জানিস না? তুই যে বলেছিলি, তুই ভূমধ্যসাগরে সাঁতার কেটেছিস ?"
জোজো সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "সে তো দিনের বেলায়। রাত্তিরবেলা আমি সাঁতার কাটি না।"
তারপর আবার গাছটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই তো। একটু ভাল করে ধর আমাকে।"
এবার জোজো কোনওরকমে উঠে ওপরের একটা ডালে গিয়ে বসল।
সন্তু তরতর করে উঠে গেল তার পাশের গাছে।
জোজো বলল, "তোর তো বেশ প্র্যাকটিস আছে দেখছি। রোজ গাছে চাপিস বুঝি ?"
সন্তু বলল, "রোজ গাছে চাপব, আমি কি বানর নাকি ?"
জোজো বলল, "তুই নিজেই তো সেটা প্রমাণ করলি!"
কাকাবাবু বললেন, "উঁহুঃ! আর কথা নয়। শোনো, দু-একটা জন্তু-জানোয়ার জল খেতে কিংবা নুন খেতে আসতে পারে, তখনও কথা বোলো না, কোনও শব্দ কোরো না।"
মহিমও স্বচ্ছন্দেই উঠে পড়ল আর-একটা গাছে।
কাকাবাবু কাজে বসলেন। তোশক, বালিশ, চাদর মুড়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে চটপট একটা মানুষের মতন আকৃতি বানিয়ে ফেললেন। সেটার গায়ে পরিয়ে দিলেন নিজের একটা জামা। সেটাকে বসিয়ে দিলেন ঘাটের একপাশে। একটু দূর থেকে দেখে মনে হবে, একজন মানুষ যেন ঘাটে বসে পুকুরের শোভা দেখছে। পুকুরের মাঝখানে রয়েছে একরাশ শালুক আর পদ্মফুল।
ঘাটের অন্য ধার থেকে নীচে নেমে একটা ঝোপের মধ্যে বসে রইলেন কাকাবাবু।

এর পর শুধু অপেক্ষা।

গাড়ির হেডলাইট দুটো জ্বলছে। সেদিকে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের খানিকটা। অন্যদিকও পুরোপুরি অন্ধকার নয়। আকাশ সামান্য মেঘলা, তবু জ্যোৎস্না আছে। এদিক-ওদিক উড়ছে অসংখ্য জোনাকি। যেগুলো নিচুর দিকে, সেগুলোকে মনে হয় কোনও জন্তুর চোখ। কিংবা সত্যিই কোনও-কোনও ছোটখাটো জন্তু ঘুরছে, তাদের চোখ দেখে মনে হচ্ছে জোনাকি।

একটু বাদে গাছ থেকে ফল পড়ার মতন দুটো শব্দ হল। জোজো আর সন্তুর খাবারের ঠোঙা। কাকাবাবু নিজের খাবারটাও খেয়ে নিলেন। এর পর আর খাওয়া যাবে কি না কে জানে! স্যান্ডুইচ আর মুরগি ভাজা। ফ্লাস্কে চা কিংবা কফি আনলে হত। আগে এ-কথাটা মনে পড়েনি!

ঘণ্টাখানেক বাদে জঙ্গলের মধ্যে খচমচ শব্দ হল। কেউ যেন সাবধানে হাঁটছে। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকে এল না। হঠাৎ তড়বড়-তড়বড় করে ছুটে এল তিনটে হরিণ। ঘাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। জলে নামল না, গাড়িটার দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

এর পর এল দুটো শুয়োর। তারা গাড়িটা গ্রাহ্য করল না, এসেই জল খাওয়া শুরু করে দিল। একটা শুয়োর ফিরল কাকাবাবুর দিকে। নাকটা উঁচু করে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল। কী যেন বুঝে সে কয়েকটা লাফ মেরে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। অন্যটাও গেল তার পিছু-পিছু।

কাকাবাবু ভাবলেন, এও তবু ভাল। হরিণ, শুয়োর ঠিক আছে। আজ একটা বাঘ এসে পড়লেই মুশকিল। বাঘ ঠিক মানুষের গন্ধ পেয়ে যাবে। মানুষ দিয়ে যদি ডিনার সারতে চায়? রিভলভার দিয়ে তো বাঘ মারা যাবে না। ভয় দেখানো যেতে পারে। কিন্তু তা হলেই ভেস্তে যাবে সব প্ল্যান।

খুব কাছেই কাকাবাবু একটা সর্‌সর শব্দ পেলেন। বেশ বড় একটা সাপ। কাকাবাবু নিশ্বাস বন্ধ করে অসাড় হয়ে গেলেন। তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। নড়াচড়া না করলে সাপ কামড়াবে না।

সাপটা কামড়াল না বটে, কিন্তু সেখান থেকে যেতে যেন প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে দিল।

অসহ্য উৎকণ্ঠা আর প্রতীক্ষা।

কাকাবাবুর ঘড়ি অন্ধকারে জ্বলে। তিনি দেখলেন রাত সাড়ে এগারোটা। এভাবে থাকা খুবই কষ্টকর। সন্তু-জোজোরা গাছের ওপর ঘুমিয়ে পড়লে ধপাস করে পড়ে যাবে নীচে। কাকাবাবু ঠিক করলেন আর এক ঘণ্টা দেখে ফিরে যাবেন। ঠাকুর সিং যদি সত্যি ভয় পেয়ে থাকে, তা হলে তাড়া করে আসবে না।

মিনিট পনেরো বাদে পাওয়া গেল জিপের আওয়াজ। এদিকেই আসছে।

কাকাবাবুদের গাড়িটা থেকে খানিকটা দূরে থামল জিপটা। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর লোক নামতে লাগল। দু'জন। রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে এসে গাড়িটার ভেতরে, চারপাশে উঁকিঝুঁকি দিল।

কাকাবাবু ধরে নিলেন, জিপে একজন ড্রাইভার থাকতে পারে। তা হলে মোট তিনজন। ঠিক আছে। ওদের মধ্যে ঠাকুর সিংকে চেনা যাচ্ছে।

গাড়িটা ছেড়ে যখন ওরা ঘাটের কাছাকাছি এসেছে, তখন কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, জোজো, কোথায় গেলি ! এবার ফিরে আয় !"

সঙ্গে-সঙ্গেই ঠাকুর সিং রাইফেল তুলে গুলি চালাল দু'বার।

কাকাবাবু "আঃ" বলে তীব্র, কাতর আর্তনাদ করলেন।

ঠাকুর সিং বলল, "খতম !"

গর্বের সঙ্গে সে রাইফেলের নলে দু'বার ফুঁ দিল।

সঙ্গের লোকটা জিজ্ঞেস করল, "লাশটা ওখানেই ফেলে রেখে যাব ?"

ঠাকুর সিং প্রথমে বলল, "এখানে টেনে নিয়ে আয়।"

পরের মুহূর্তে মত বদলে ফেলে বলল, "না থাক। ওখানেই থাক। লাথি মেরে পানিতে ফেলে দে।"

লোকটি বলল, "সেই ছোকরা দুটো গেল কোথায় ?"

ঠাকুর সিং বলল, "আসবে। গুলির শব্দ শুনেছে, এবার আসবে !"

লোকটি নিজের গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য আর একটা গুলি চালাল বালিশের মূর্তিটার ওপর। তারপর রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে এগিয়ে এল ঘাটের দিকে লাশে লাথি মারার জন্য।

কাকাবাবু চিৎকার করলেন, "এইবার !"

ঠাকুর সিং চকিতে রাইফেল তুলে পাশ ফিরতেই তার কপালে ঠেকল রিভলভারের নল। একটা বজ্রকঠিন স্বর শোনা গেল, "রাইফেলটা ফেলে দাও। না হলে তোমার মাথায় যেটুকু ঘিলু আছে, তা এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে !"

গাছ থেকে ততক্ষণে ঝপাঝপ করে লাফিয়ে পড়েছে সন্তু, জোজো, মহিম।

অন্য লোকটা কর্তার সিং। সে আর রাইফেল নামাবার সময় পায়নি। সন্তু লাফিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। জোজো এসে তাকে জাপটে ধরল।

মহিম একটা রুমালে জবজবে করে ক্লোরোফর্ম ভিজিয়ে নিল। উত্তেজনার চোটে ছুটে এসে এত জোর ধাক্কা দিল ঠাকুর সিংকে যে, সে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মহিম প্রায় তার বুকের ওপর চেপে বসে নাকের কাছে রুমালটা ঠেসে ধরল।

ঠাকুর সিং খানিকটা লড়বার চেষ্টা করেও পারল না। কাকাবাবু তাকে ভয় দেখাবার জন্য পায়ের কাছে একটা গুলি করলেন। ক্লোরোফর্মের ঘোরে একটুক্ষণের মধ্যেই সে নেতিয়ে পড়ল।

কর্তার সিংয়ের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে সন্তু আর জোজো।

কাকাবাবু সেদিকে তাকালেন না। তিনি রিভলভারটা উঁচিয়ে রইলেন জিপটার দিকে।

কিন্তু সেখান থেকে কেউ নামলও না, গুলিও ছুটে এল না। এই দু'জনেরই একজন জিপ চালিয়ে এসেছে? ভেবেছিল, দু' খানা রাইফেলের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

মহিম এবার সন্তু আর জোজোর পাশে গিয়ে কর্তার সিংকেও অজ্ঞান করে ফেলল।

কাকাবাবু তবু জিপটার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা ক্রাচ রেখে, শুধু একটাই ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন, অন্য হাতে উদ্যত রিভলভার।

জিপের চালকের আসনে বসে আছে একজন লোক। স্থিরভাবে চেয়ে আছে। ভয়ে তার মুখখানা ময়লা কাপড়ের মতন হয়ে গেছে। সে ভেবেছে, রাইফেলের গুলি খেয়েও কাকাবাবু মরেননি।

সেই লোকটির কাছে বন্দুক-পিস্তল নেই, রয়েছে একটা রামদা, কিন্তু ভয়ের চোটে সেটাও সে তুলতে পারছে না।

কাকাবাবু আদেশ করলেন, "নেমে এসো!"

লোকটি অমনই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "মহিম, এদিকে এসো তো। এই লোকটাকেও অজ্ঞান করে দাও!"

লোকটি ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল, "হাতজোড় করে বলল, আমি কিছু করিনি, আমাকে মারবেন না। আমি কোনও দোষ করিনি।"

কাঁদতে-কাঁদতে সে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

মহিম দৌড়ে এল এদিকে। ক্লোরোফর্ম ভেজানো রুমালটা চেপে ধরল এর নাকে। লোকটি বাধা দেওয়ার চেষ্টাই করল না। ঢুলে পড়ল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ! তেমন কিছু ঝঞ্ঝাট হয়নি। ফাঁদটা ভালই পাতা হয়েছিল, কী বলো?"

জোজো বলল, "সত্যি যদি আপনি ঘাটটায় বসে থাকতেন, তাহলে ঠাকুর সিং পেছন থেকেই আপনাকে গুলি করত?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা তো সত্যি ভেবেই গুলি চালিয়েছে!"

জোজো বলল, "আমার ইচ্ছে করছে, ঠাকুর সিংয়ের মাথাটা নারকোলের মতন ফাটিয়ে দিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, ঠাকুর সিংকে আমাদের দরকার। ওকে বেঁধে আমাদের গাড়িতে তোলো। আর বাকি দু'জনের কী হবে? এত লোকের তো জায়গা হবে না গাড়িতে।"

মহিম বলল, "ওরা এখানেই পড়ে থাক। যা ডোজ দিয়েছি, তিন-চার ঘণ্টার

আগে জাগবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মাটিতে পড়ে থাকলে কোনও বুনো জানোয়ার কামড়ে দিতে পারে। ওদের জিপগাড়িটায় তুলে দাও।"

সন্তুরা তিনজন সেইরকম ব্যবস্থা করে ফেলল।

কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বললেন, "এবার চলো ডালটনগঞ্জ!"

॥৭॥

ডালটনগঞ্জের সার্কিট হাউসে এত রাতেও অপেক্ষা করছেন নরেন্দ্র ভার্মা, এই জেলার এস. পি, ডি. এম, আরও কয়েকজন অফিসার। কাকাবাবুদের গাড়িটা থামতেই সবাই ব্যগ্র হয়ে বেরিয়ে এলেন।

কাকাবাবু দরজা খুলে বললেন, "নাও নরেন্দ্র, তোমার জন্য ভাল উপহার এনেছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "এ কী? এ তো ঠাকুর সিং! সাইমন বুবুম্বা কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "হবে, হবে, সব ব্যবস্থা হবে! আগে একে নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

এস. পি জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটা মরে গেছে নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ঘুমোচ্ছে!"

এস. পি দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "ঘুমোচ্ছে? অমন একটা দুর্দান্ত লোককে ঘুম পাড়ালেন কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেসব গল্প পরে হবে। এখন অনেক কাজ আছে।"

ঠাকুর সিংকে ধরাধরি করে একটা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। কাকাবাবুরা বসলেন পাশের ঘরে। কাকাবাবু সর্বাঙ্গ চুলকাচ্ছেন। যে ঝোপের মধ্যে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, সেখানে একটা পিঁপড়ের বাসা ছিল। সারা গায়ে পিঁপড়ে ছড়িয়ে গেছে। এতটুকু-টুকু পিঁপড়ের কামড়ে কী জ্বালা!

সেই অবস্থাতেই কাকাবাবু বললেন, "নরেন্দ্র, দু' গাড়ি পুলিশ পাঠাও রূপ মঞ্জিলে। সাইমন বুবুম্বা সেখানে আছে। ঠাকুর সিং উপস্থিত থাকলে সেখান থেকে ওকে উদ্ধার করা মুশকিল ছিল। চট করে কোথাও সরিয়ে দিত। কিংবা ঠাকুর সিং ওকে মেরে ফেলত। সেইজন্যই টোপ দিয়ে ঠাকুর সিংকে বাইরে আনতে হল। ওর চ্যালারা বিশেষ বাধা দিতে পারবে না। ঠাকুর সিংয়ের হুকুম ছাড়া সাইমনকে মেরেও ফেলতে পারবে না!"

ডি. এম বললেন, "ঠাকুর সিংয়ের মতন একটা দুর্দান্ত ক্যারেকটারকে ঘুম পাড়িয়ে, বেঁধে নিয়ে এলেন, এটা এখনও যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "চোখের সামনে দেখতে তো পাচ্ছেন। পুলিশ পাঠাবার

ব্যবস্থা করুন, আর দেরি করবেন না। আমি নিজেও সঙ্গে যেতাম, কিন্তু পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে গেছি। এক্ষুনি আমাকে স্নান করতে হবে! আপনারাই যান।"

এস. পি আর ডি. এম দু'জনেই চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে।

কাকাবাবু বাথরুমে ঢোকার আগে বললেন, "সন্তু, জোজো, মহিম, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও বরং। ওদের ফিরে আসতে তো সময় লাগবে! তোমাদেরও অনেক ধকল গেছে। দ্যাখো, এখানে অনেক ঘর আছে!"

প্রায় আধঘণ্টা বাদে কাকাবাবু স্নান করে, সুস্থ হয়ে বেরোলেন।

সেই ঘরে নরেন্দ্র ভার্মা একা বসে আছেন একটা ইজি চেয়ারে। কাকাবাবু খাটের ওপর খানিকটা হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন।

তারপর বললেন, "উঃ, পিঁপড়ের কামড়ে সারা গা ফুলে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে একটা বিষাক্ত সাপ চলে গেল, ঠাকুর সিং রাইফেলের গুলি ছুড়ল, সে সবেও কিছু হয়নি, কিন্তু কাবু করে দিল এই পিঁপড়েগুলো।"

নরেন্দ্র ভার্মা শুকনো গলায় বললেন, "রাজা, আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সাইমন বুবুম্বাকে উদ্ধার করা যাবে তো?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল সকালেই ওকে আমরা দেখে এসেছি। এর মধ্যে মেরে ফেলার কথা নয়। সাতদিনের সময়সীমা তো পেরোয়নি?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি দেখে এসেছ, তারপর প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। এর মধ্যে কত কী হতে পারে। আমার ভয় হচ্ছে কী জানো? সাইমন বুবুম্বা বেশ দুঃসাহসী মানুষ, খেলাধুলোয় ওস্তাদ ছিল ছাত্র বয়েসে। সে নিজে যদি পালাবার চেষ্টা করে? এরা তো সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করে দেবে! অসমে একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানীকে আতঙ্কবাদীরা বন্দি করে রেখেছিল। কাল রাতে তাঁর ডেড বডি পাওয়া গেছে। তিনি পালাতে গিয়ে মরেছেন। আমাদের সরকার খুব চিন্তিত। মুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাইয়ের খবর জানতে চেয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। সাইমনকে উদ্ধার করতে না পারলে দু' দেশের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, তা হলে আমরা শস্তায় পেট্রোল পাব না। আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "ফাইলে পড়লাম, সাইমন ছাত্র বয়েসে পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলো বেশি করেছে। ইংল্যান্ডে দু'বার মারামারিও করেছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, মানুষটা খুব তেজী। সাহেবদেব দেশে কেউ ওকে কালো লোক বলে ঠাট্টা করলেই তাকে মেরে বসত! এখন অবশ্য প্রেসিডেন্টের দূত হিসেবে সব দেশে যায়, সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "আরও একটা জিনিস দেখলাম। বছর দু-এক আগে

টার্কিতেও সাইমনকে একটা দল গুম করেছিল। সে-দেশের সরকারের কাছ থেকে দু' কোটি ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছিল তারা। সে-দেশের সরকার টাকা দিয়েই ছাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। লোকটা খুব বেশি দামি দেখা যাচ্ছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দামি তো বটেই! মুরুন্ডি দেশটা ছোট হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। পেট্রোল আছে প্রচুর। তাই অনেক দেশই ওই ছোট্ট দেশকে খাতির করে। ওইসব দেশের আতঙ্কবাদীরাও জানে যে সাইমনকে ধরে রাখতে পারলে সরকার কেঁপে যাবে। টাকা দিতে বাধ্য হবে। টার্কিতে কী হয়েছিল জানো? আমাদের মতন ওসব দেশের কাগজে তো সব কিছু বেরোয় না। টার্কির সরকার ওকে উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। শেষপর্যন্ত সরকার বিপ্লবী দলকে দু' কোটি টাকা দিতে বাধ্য হয়ে সাইমনকে ছাড়িয়ে নেয়। ওদের সরকার সেটা স্বীকার করেনি। কিন্তু আমাদের ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব দেশ টাকা দিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ গরিব দেশ, এত টাকা দেবে কী করে? এক কোটি ডলার! অনেক টাকা!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ বিশেষ ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছেন। এই ব্যাপারটা নিয়েই। সাতদিনের মধ্যে আমরা কিছু করতে না পারলে বোধ হয় আমাদের সরকারও টাকাটা দিয়েই দেবে। সাইমন বুবুম্বার প্রাণের ঝুঁকি কিছুতেই নেওয়া যায় না।"

হঠাৎ নরেন্দ্র ভার্মা ঝুঁকে কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "রাজা, আজ যদি সাইমনকে উদ্ধার করা যায়, তা হলে তুমি শুধু যে আমার মুখরক্ষা করলে তাই-ই না, আমাদের দেশেরও মহা-উপকার করলে। তোমার মতন দুঃসাহসী মানুষ ছাড়া কেউ এটা পারত না।"

কাকাবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, "আরে, তুমিই তো আমাকে ঠাকুর সিংয়ের কাছে পাঠালে। তোমারই তো কৃতিত্ব! আমি আর কী করেছি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি ঠাকুর সিংকে ঘুম পাড়িয়ে ধরে আনলে কী করে, সেটা বলো!"

কাকাবাবু বললেন, "তাও আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। সন্তু আর জোজোই যা কিছু করেছে। আর তুমি যে পুলিশের লোকটিকে ড্রাইভার করে পাঠিয়েছ, সেই মহিমেরও খুব সাহস আছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তবু তুমি সবটা বলো। যতক্ষণ না ফিরে আসে ওরা—"

কাকাবাবু জঙ্গলের মধ্যে ফাঁদ পাতার ঘটনাটা সব বুঝিয়ে দিলেন!

শোনার পর নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাই তো, তুমি কিছুই করোনি! ওরা রইল গাছে, তুমি রইলে মাটিতে। তুমি যখন চেঁচিয়ে উঠলে, তখন যদি ওরা ঝোপের মধ্যে গুলি করত? তোমার পায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গেল, সারা

গায়ে বিষ-পিঁপড়ে, তবু তুমি নড়লে না, খোঁড়া পা নিয়ে বুকে হেঁটে-হেঁটে ঠাকুর সিংয়ের কাছে এসে তার কপালে রিভলভাল ঠেকালে, এসব তো কিছু না, তাই না ? তুমি ছাড়া এরকম ঝুঁকি আর কেউ নিতে পারে, এরকম মানুষ আমি জানি না। তবে সন্তু-জোজোরাও দারুণ কাজ করেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি জানো, নরেন্দ্র, সাইমন খুব জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করে। কলকাতায় একজন জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাই নাকি ? কলকাতায়, কার কাছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের জোজো, তার বাবার কাছে। উনি বেশ নামকরা জ্যোতিষী শুনেছি। সাইমন ওঁর কাছে গিয়েছিল নিজের দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারবে কি না কিংবা কবে হবে, সেটা জানতে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, ওর খুব প্রেসিডেন্ট হওয়ার শখ। কিন্তু ওর দাদা প্রেসিডেন্ট কেনেথ বুবুম্বা খুব ভাল লোক। সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। সামনের ভোটে তিনিই জিতবেন। যদি না তিনি ভাইয়ের জন্য সরে দাঁড়ান !"

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন, "রাজা, আমি আর টেনশান সহ্য করতে পারছি না। ওরা কখন আসবে ? কাল সকালেই আমাকে দিল্লিতে রিপোর্ট করতে হবে ! ওরা এত দেরি করছে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এমন কিছু দেরি হয়নি। এবার এসে পড়বে। তুমি বরং এককাপ করে কফির ব্যবস্থা কর্রতে পারো ? এত রাতে কি এখানে কেউ কফি বানিয়ে দেবে ? আমার খুব কফি খেতে ইচ্ছে করছে !"

নরেন্দ্র ভার্মা হাঁকডাক করতেই একজন বেয়ারা এসে হাজির হল। তাকে কফির কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, "হ্যাঁ সার, হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "নরেন্দ্র, বেশি উত্তেজিত হোয়ো না। শান্ত হয়ে বোসো। এখানে তো তবু ঘরের মধ্যে বসে আছি। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। আর খানিক আগে আমরা ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে, একটু নড়াচড়া করার উপায় ছিল না, সেই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুর সিংয়ের জন্য প্রতীক্ষা। প্রত্যেকটা মিনিটকে মনে হচ্ছিল এক মাইল লম্বা।"

নরেন্দ্র ভার্মা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে দু' হাতে মাথা চেপে ধরে বললেন, "ওফ্ !"

বেয়ারা এসে কফি দিয়ে গেল। সবেমাত্র ওঁরা দু-তিন চুমুক দিয়েছেন, এই সময় বাইরে গাড়ির শব্দ হল।

নরেন্দ্র ভার্মা অমনই ছুটে গেলেন। কাকাবাবু ছুটতে পারেন না, তিনি ক্রাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

দুটো গাড়িই ফিরে এসেছে। প্রথমে নামলেন এস. পি সাহেব।

নরেন্দ্র ভার্মা তাঁর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ? পাওয়া

গেছে ?”

এস. পি একগাল হেসে বললেন, “অপারেশান সাকসেসফুল !”

কাকাবাবু একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “সাইমন বুবুম্বাকে পেয়েছেন ? নিয়ে এসেছেন ?”

এস. পি বললেন, “হ্যাঁ। খুব সহজেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন। ঠাকুর সিং নেই বলে ওর চ্যালা-চামুণ্ডারা পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেল। কোনও বাধাই দিল না।”

অন্য গাড়ি থেকে ডি. এম নামলেন, তাঁর সঙ্গে সাইমন বুবুম্বা। জিন্‌স আর হলুদ গেঞ্জি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বুকে ঝুলছে একটা ক্রস।

ডি. এম সাহেব খাতির করা গলায় ইংরেজিতে তাকে বললেন, “আসুন, মিঃ বুবুম্বা, ভেতরে আসুন। আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে জানি।”

সাইমন বুবুম্বা কোনও কথা বললেন না, উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। নরেন্দ্র ভার্মা যে ইজি চেয়ারটায় বসে ছিলেন, সেটাতে বসানো হল তাঁকে।

এস. পি বললেন, “আমরা ঠাকুর সিংয়ের রূপ মঞ্জিলে গিয়ে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করলাম। তারপর গেট খোলার হুকুম দিতেই গেট খুলে গেল। বাড়িটা সার্চ করতে আধঘণ্টার বেশি লাগেনি। ভেতরে প্রায় পঁয়তিরিশজন লোক, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু আমাদের বাধা দেয়নি।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “দাঁড়ান, ওইসব ডিটেইলস একটু পরে শুনব।”

তিনি সাইমন বুবুম্বার কাছে এসে বললেন, “মিঃ বুবুম্বা, আমাদের দেশে এসে আপনার এই যে বিশ্রী ভোগান্তি হল, সেজন্য আমরা খুবই দুঃখিত। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। কাল সকালেই আপনাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।”

সাইমন বুবুম্বা সোজা চেয়ে রইলেন, কোনও কথা বললেন না।

এস. পি বললেন, “সার, উনি বোধ হয় খুব মানসিক আঘাত পেয়েছেন, এ-পর্যন্ত একটাও প্রশ্নের উত্তর দেননি।”

রাত এখন আড়াইটে। এরকম একজন বিশিষ্ট বিদেশিকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে সার্কিট হাউজের সবাই দেখতে এসেছে। সন্তুরা ছিল একটা অন্য ঘরে, জোজো ঘুমিয়ে পড়লেও সন্তু আর মহিম ঘুমোয়নি। তারাও ছুটে এসেছে এ-ঘরে।

কাকাবাবুর মুখখানা প্রসন্ন। তিনি মহিমকে দেখে বললেন, “পুরস্কারটা তোমার কপালেই নাচছিল। আমি রেকমেন্ড করে দেব, পুরস্কারের দশ লাখ টাকা যেন তোমাকেই দেওয়া হয়।”

মহিম বলল, “স্যার, আমি আর কী করেছি ! সব তো আপনার জন্যই হল। আমি এক লাখ পেলেই খুশি হব।”

সন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাইমন বুবুম্বার দিকে। অন্যদের

ঠেলাঠেলিতে তাকে পেছন দিকে চলে যেতে হল।

নরেন্দ্র ভার্মা আর অন্য অফিসাররা সাইমন বুবুম্বাকে কথা বলাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি এ-পর্যন্ত।

এবার কাকাবাবু এসে বললেন, "মিঃ বুবুম্বা, আপনি কফি খাবেন ?"

এবারও তিনি উত্তর দিলেন না, এমনকী মাথাও নাড়লেন না।

কাকাবাবু বললেন, "থাক, এখন ওসব কথা থাক। এখন ওঁর বিশ্রাম দরকার। ওঁকে শুতে দাও। ঘরের মধ্যে এত ভিড়, ঘর খালি করে দাও !"

এস. পি-সাহেব বললেন, "সেই ভাল। উনি ঘুমোন। আপনারা কেউ ওঁকে অফিশিয়ালি আইডেন্টিফাই করবেন ? আমাকে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি নিজে ওকে দেখিনি, ছবি দেখেছি। রাজা, ছবিগুলো কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে ফাইল তো ফরেস্ট বাংলোয় রয়েছে। ছবির সঙ্গে মিল আছে। কাল সকালে জোজো একবার আইডেন্টিফাই করেছিল। সন্তু, একবার জোজোকে ডাক তো।"

সন্তু বলল, "জোজোকে ডাকবার দরকার নেই। এই লোকটি সাইমন বুবুম্বা নয় !"

সবাই সন্তুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ ? কী বলছিস তুই, সন্তু ?"

সন্তু বলল, "কোনও আফ্রিকানের কি টিকি থাকে ? এর চুলে টিকি আছে !"

এস. পি-সাহেব প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লোকটির মাথার ওপর।

ভাল করে পরীক্ষা করতেই বোঝা গেল, লোকটির মাথায় যে কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, তা আসলে পরচুলা। তার তলা দিয়ে, ঘাড়ের কাছে বেরিয়ে পড়েছে একটা বেশ পুরুষ্টু টিকি। ওর ভুরু দুটোও কিছুটা আঁকা।

একটানে পরচুলাটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, লোকটার মাথায় অনেকখানি টাক, বাকি চুলগুলো একটুও কোঁকড়ানো নয়। মোটেই আফ্রিকান নয়, এ এক টিকিওয়ালা বিহারী ব্রাহ্মণ। ছদ্মবেশ ধরলেও টিকিটা কাটতে রাজি হয়নি।

এস. পি বললেন, "মাই গড ! এ যে একটা ইমপস্টার। নকল লোক !"

নরেন্দ্র ভার্মা সাঙ্ঘাতিক হতাশ হয়ে ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে।

কাকাবাবুর মুখখানা পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেছে।

এস. পি-সাহেব রিভলভার বার করে ধমক দিয়ে বললেন, "এই, বোবা সেজে থাকলে তোর খোপড়ি উড়িয়ে দেব, তুই কে ? তোর নাম কী বল !"

লোকটি এবার হাতজোড় করে বলল, "হুজুর, আমার নাম রামশরণ দুবে। আমার কোনও দোষ নেই। ঠাকুরসাহেব আমাকে যেরকম সেজে থাকার হুকুম দিয়েছেন, আমি সেরকম থেকেছি। আমি আর কিছু জানি না !"

এস. পি-সাহেব রাগ সামলাতে পারলেন না। ঠাস করে এক চড় কষালেন লোকটার গালে।

নরেন্দ্র ভার্মা ব্যাকুলভাবে বললেন, "কী হবে, রাজা? পাওয়া গেল না! সাইমন বুবুম্বা কোথায় আছে, এখনও আমরা জানি না!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠাকুর সিং লোকটা এত ধড়িবাজ! ভেবেছিলাম ওর বুদ্ধি নেই! ও একটা নকল লোককে সাজিয়ে রেখে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে! আসল লোকটাকে লুকিয়ে রেখেছে অন্য কোথাও!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, কাল সকালে যখন ঠাকুর সিং আমাদের দেখিয়েছিল সাইমন বুবুম্বাকে, তখনই আমার একটু-একটু সন্দেহ হয়েছিল। অত সহজে দেখাবে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও যে সন্দেহ হয়নি তা নয়। তারপর ভেবেছিলাম, লোকটা অত্যন্ত অহঙ্কারী। বোকা আর অহঙ্কারী। অহঙ্কারের চোটে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।"

এস. পি-সাহেব বললেন, "তা হলে দেখলেন তো, ঠাকুর সিংকে আমরা কেন জেলে ভরতে পারি না? ও কোনও প্রমাণ রাখে না। সাইমন বুবুম্বাকে যে ও কিংবা ওর দল গুম করেছে, তা এখনও প্রমাণিত হল না। ও বলবে, একজন নকল লোককে সাজিয়ে রেখে ও আমাদের সঙ্গে মজা করেছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, "রাজা, তোমার এত পরিশ্রম, সব নষ্ট হয়ে গেল! টাকা না দিলে সাইমনকে ওরা মেরে ফেলবে। টাকা দিতেই হবে। আমরা কিছুই করতে পারলাম না!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন? এখনও তো তিনদিন সময় আছে। একবার যখন এই কাজে নেমে পড়েছি, তখন এর শেষ না দেখে ছাড়ব না! সাইমন বুবুম্বাকে আমি উদ্ধার করবই!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। তিনদিনের মধ্যে কি তা সম্ভব!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠাকুর সিংকে আমি ছাড়ব না। ও যেখানেই লুকিয়ে রেখে থাকুক..."

"এস. পি-সাহেব বললেন, "ঠাকুর সিংকে এখনও আপনার চিনতে বাকি আছে। হাজার জেরা করলেও ওর মুখ থেকে একটা কথা বার করা যায় না। অবশ্য আমরা তবু চেষ্টা করব—"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের যা করার করবেন। তার আগে আমি একলা ওর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। একটা জলের জাগ নিয়ে আয় তো, সন্তু—"

কাকাবাবু পাশের ঘরের দরজাটা খুলে আলো জ্বাললেন। ঠাকুর সিং এখনও চোখ বুজে আছে। সন্তুর কাছ থেকে জলের জাগটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু

বললেন, "তুই বাইরে থাক।"

খাটের কাছে এসে কাকাবাবু ঠাকুর সিংয়ের মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন। বিছানা ভিজে যেতে লাগল, তাতে কাকাবাবু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বেশ কয়েকবার ছিটে দেওয়ার পর বাকি জলটা সবটাই ঢেলে দিলেন ঠাকুর সিংয়ের মুখে।

ঠাকুর সিংয়ের ঘোর অনেকটা কেটে গিয়েছিল এর মধ্যে, তারপর জল লাগায় চোখ পিটপিট করতে লাগল। একসময় পুরো চোখ মেলে কাকাবাবুকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসল, তারপর টের পেল যে তার হাত-পা বাঁধা।

প্রথমে সে যেন কিছুই মনে করতে পারল না।

বেশ কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি... তুমি... রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, "হাঁ জনাব!"

ঠাকুর সিং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার ওপর আমি দু' দুবার গুলি চালালাম, তবু তুমি বেঁচে আছ?"

"ওরকম দু-চারটে রাইফেলের গুলি আমি হজম করে ফেলতে পারি!"

"তুমি জঙ্গল থেকে... একটা জানোয়ারের মতন আমাকে বেঁধে এনেছ?"

"বেঁধে আনতেই হয়েছে।"

"অনেক লোক দেখেছে?"

"এত রাত্রে খুব বেশি লোক দেখেনি। কাল সকালে দেখবে। তোমাকে এখান থেকে এই অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে থানায়!"

ঠাকুর সিং মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে কাতরভাবে বলল, "হায় ভগবান!"

তারপর জ্বলন্ত চোখে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী, বাংগালিবাবু, তোমাকে দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানো? দুটো ইচ্ছে হচ্ছে। প্রথমটা হল, আমার এই দু' হাতে তোমার গলা টিপে মেরে ফেললে আমার মনে শান্তি হবে!"

কাকাবাবু জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন, "না, না, না, না, ওরকম ইচ্ছে মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়। আমাকে গলা টিপে মারা মোটেই সহজ নয়। আমার গলাটা বেশ শক্ত। আমার হাত দু'খানায় বেশ জোর আছে। আমায় কেউ গলা টিপতে এলে তারও আমি গলা টিপে ধরব যে!"

ঠাকুর সিং বলল, "আর দ্বিতীয় ইচ্ছেটা হল, তোমার দু' পায়ে হাত দিয়ে একবার প্রণাম করি। আমার মাথা তোমার পায়ে ঠেকাই!"

কাকাবাবু একটু চমকে গিয়ে বললেন, "ওরে বাবা! এ যে উলটো কথা। হঠাৎ এরকম অতিভক্তির কারণটা কী?"

"রায়চৌধুরী সাব, আমাদের যোদ্ধার বংশ। আমাদের পূর্বপুরুষ সিপাই মিউটিনির সময় লড়েছে। আমার বাপ-দাদার ভয়ে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে

জল খেত। আমার সামনেও এ-তল্লাটে কেউ উঁচু গলায় কথা বলে না। একমাত্র তুমি আমাকে দু'-দু'বার জব্দ করেছ! তোমাকে সম্মান করব না? তুমি এক আজব মানুষ!"

"ওসব কথা থাক। তোমার সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হয়নি, ঠাকুর সিং! সাইমন বুবুম্বাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

"তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম, আমার বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে না।"

"এ আবার কীরকম চ্যালেঞ্জ! একটা নকল লোক সাজিয়ে রেখেছিলে। ওকে দেখিয়ে দিলে, যাতে ওর পেছনে আমরা সময় নষ্ট করি। তোমার বাড়িতে সাইমন বুবুম্বা নেই। যদি থাকত, আর আমি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হতাম, তা হলে চ্যালেঞ্জের একটা মানে হত।"

"তুমি তাকে খুঁজে পাবে না।"

"এমন কোন জায়গায় লুকিয়েছ, যাতে খুঁজে পাব না? তোমাকে আমি ছাড়ব না ঠাকুর সিং!"

"পুলিশকে আমি গ্রাহ্য করি না। পুলিশ আমার কাছ থেকে কোনও কথা বার করতে পারবে না। তুমি এ-কাজ থেকে সরে যাও। তুমি ঝুঁকি কেন নিচ্ছ? টাকার জন্য?"

"না, টাকার পরোয়া আমি করি না। আমার যা টাকা আছে তাতে আমার বেশ চলে যায়। আমি এ-কাজ করছি দেশের জন্য। আমাদের দেশের সম্মান বাঁচাবার জন্য। তুমি দেশটেশ গ্রাহ্য করো না। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে তোমার কী হেনস্থা করি, তুমি কাল সকালে দেখবে। তোমার হাতে দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যাব রাস্তা দিয়ে, সবাইকে বলব, দ্যাখো, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঠাকুর সিংকে আমি জানোয়ারের মতন বেঁধে এনেছি। এই লোকটা টাকার লোভে একজন সম্মানীয় বিদেশি অতিথিকে গুম করেছে, তাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। যারা এমন দেশের শত্রুতা করে, তাদের এই শাস্তি। এর মুখে এক ঘা করে জুতো মেরে যাও!"

ঠাকুর সিংয়ের গায়ে যেন লোহার ছ্যাঁকা লেগেছে, সে কাতরে উঠল। ব্যাকুলভাবে মিনতি করে বলল, "না, না, ওরকম কোরো না। বরং আমায় গুলি করে মারো।"

কাকাবাবু কঠোর স্বরে বললেন, "তুমি আমাকে মারার জন্য দু'বার রাইফেলের গুলি ছুড়েছিলে। তার বদলা হিসেবে আমি কাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার দু' গালে দুটো জুতো মারবই!"

"তোমার পায়ে পড়ি, রায়চৌধুরীসাহেব, তুমি এখানেই আমার মাথায় দুটো গুলি ফুঁড়ে দাও! লোকের সামনে আমার অমন বে-ইজ্জত কোরো না। আমার ছেলেমেয়েরা তা হলে আর মুখ দেখাতে পারবে না। আমরা একসময়

এখানকার জমিদার ছিলাম। এ-তল্লাটের সব মানুষ আমাদের মানে।"

"আগে জমিদার ছিলে, এখন টাকার জন্য চুরি-ডাকাতি করো।"

"না, আমি চুরি-ডাকাতি করি না। ব্যবসা করি। সে-ব্যবসা তোমরা বুঝবে না। তোমাকে একটা কথা বলি, সাইমন বুবুম্বাকে আমি লুকিয়ে রাখিনি।"

"তোমার বাড়িতে রাখোনি, অন্য কোথাও রেখেছ।"

"না। তাও রাখিনি। সে আমার জিম্মায় নেই!"

"কাল যে বলেছিলে সে তোমার জিম্মায় আছে। সেটা তা হলে ভাঁওতা দিয়েছিলে আমাদের? কোনটা সত্যি, কালকের কথা, না আজকের কথা?"

"আজকের কথা। রামজির নাম নিয়ে বলছি, ওই আফ্রিকানকে আমার জিম্মায় রাখিনি।"

"সাইমন বুবুম্বার গুম হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই? তাহলে বাড়িতে একজনকে সাজিয়ে রেখেছিলে কেন?"

"সম্পর্ক আছে। তা ঠিক!"

"সম্পর্ক আছে, অথচ তোমার জিম্মায় রাখোনি, এটা কি ধাঁধা নাকি? তবে কি তোমার চেনা অন্য কারও জিম্মায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ?"

ঠাকুর সিং একদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, তুমি আমায় তলোয়ার লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছ, তোমার ছোকরা দুটো সে-কথা রটিয়ে দিয়েছে। তাতেই আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এর পর লোকে যদি জানে যে, জঙ্গলের মধ্যে তুমি একটা খোঁড়া মানুষ হয়েও আমাকে পেড়ে ফেলেছ, তারপর জানোয়ারের মতন হাত-পা বেঁধে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে এসেছ, তা হলে আর আমার সম্মান কিছুই থাকবে না। তারপর আমার আর বেঁচে থাকারও মানে থাকবে না। আমাদের এদিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে কিংবা জেল খাটলে মান যায় না। কিন্তু কারও কাছে লড়াইয়ে হেরে গেলে সবাই ছি-ছি করে। তুমি যদি এই কথাটা কাউকে না বলো, আমার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দাও, তা হলে তোমাকে একটা গোপন কথা জানাতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তোমার গোপন কথাটা শুনি, তারপর তোমার শর্ত মানব কি না ভেবে দেখব।"

ঠাকুর সিং বলল, "কাছে এসো, কানে-কানে বলব।"

কাকাবাবু বললেন, "কানে-কানে কেন? এমনই বলো, আমি শুনতে পাব।"

ঠাকুর সিং বলল, "না, শুধু তোমাকে বলব, দরজার বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে, সব শুনছে। একটু কাছে এসো—"

কাকাবাবু নাকটা একবার কোঁচকালেন। কারও কানে-কানে কথা বলা তিনি পছন্দ করেন না। অনেকের মুখে গন্ধ থাকে।

তা ছাড়া, কাকাবাবু ভাবলেন, লোকটা তাঁর কানটা কামড়ে ধরবে না তো ?

অবশ্য লোকটা বেশ নরম হয়ে এসেছে। অপমানের ভয় ওর প্রাণের ভয়ের চেয়েও বেশি।

কাকাবাবু কানটা এগিয়ে দিলেন, ঠাকুর সিং ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

প্রথমে কাকাবাবুর মুখে বিরক্তি ও অস্বস্তির ভাব ছিল। তারপর সেখানে ফুটে উঠল বিস্ময়। তারপর সারা মুখে ছড়িয়ে গেল হাসি।

মাথাটা সরিয়ে এনে কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন।

॥ ৮ ॥

রাত একটার সময় কাঠমাণ্ডু শহর একেবারে নিঝুম, ঘুমন্ত। অন্যদিন এ-সময়ে যাও-বা দু-চারটে ট্যাক্সি বা দু-চারজন মানুষ দেখা যায়, আজ তাও নেই। কারণ, রাত দশটা থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার।

একটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে একটা হোটেলের গাড়ি কাকাবাবুকে নিউ রোডের একটা কাপড়ের দোকানের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল।

দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তায় আলো আছে বটে, কিন্তু তাও বৃষ্টির জন্য ঝাপসা।

বৃষ্টির জন্যই হঠাৎ এখানে বেশ শীত পড়ে গেছে। কাকাবাবু সুটের ওপর একটা লম্বা রেইন কোট পরে আছেন। তাঁর সঙ্গে দু'খানা বেশ বড় চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ দুটিই বেশ ভারী, কারণ গাড়ি থেকে তাঁকে দু'বারে দুটো ব্যাগ নামাতে হয়েছে।

কাকাবাবু কাপড়ের দোকানের নামটা একবার পড়লেন, তারপর ঘড়ি দেখলেন।

একটা বেজে গেল, তারপরেও পাঁচ-দশ মিনিট। কেউ এল না। কাকাবাবু ব্যস্ত হলেন না। আমাদের দেশে ক'জন লোকই বা সময়ানুবর্তী হয় ?

আরও পাঁচ মিনিট কাটল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ইউ আর ফ্রম ?"

কাকাবাবু দেখলেন, যেন মাটি ফুঁড়ে দুটো লোক তাঁর দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

এরা বাংলা জানে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য কাকাবাবু প্রথমে বললেন, "আমি ভারত সরকারের কাছ থেকে এসেছি।"

একটু থেমে আবার বললেন, "ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া।"

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, "টাকা এনেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই যে দুটি ব্যাগ।"

"এতে সব টাকা আছে ?"

"হ্যাঁ। সব একশো ডলারের নোট।

"আপনাকে তো আমরা এখন ছাড়তে পারব না। সব টাকা গুনে নিয়ে ঠিকঠাক থাকলে তারপর আপনি ছাড়া পাবেন।"

"আমি তো ছাড়া পাওয়ার জন্য ব্যস্ত নই। টাকা আপনারা গুনে নেওয়ার পর সাইমন বুবুম্বাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ফিরব।"

"তাকে তো ছাড়া হবে কাল সকাল সাতটায়।"

"আমি ততক্ষণই থাকব।"

"না, সেটা সম্ভব নয়। যাক, চলুন এখন আমাদের সঙ্গে।"

লোক দুটিই বেশ লম্বা-চওড়া, ওভারকোট পরা। মাথায় টুপি। একজন কথা বলছে ভাঙা বাংলায়। দন্তের স আর ছ-এর উচ্চারণ অন্যরকম। খুব সম্ভবত অসমের লোক। অন্যজন চুপ করে আছে। একজনের গালে অনেকখানি দাড়ি-গোঁফ, দু'জনেরই চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

চামড়ার ব্যাগ দুটো ওই দু'জনই তুলে নিল।

একটুখানি এগোবার পর একটা গলি। তার মুখে এসে ওদের একজন বলল, "আপনার সঙ্গে আর কেউ নেই? কেউ ফলো করবে না? তা হলে কিন্তু আপনার মরণ নিশ্চিত!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যতদূর জানি, আমাকে একাই পাঠানো হয়েছে। কেউ কাছাকাছি আছে কি না আপনারাই দেখে নিন।"

লোকটি বলল, "আমরা পনেরো মিনিট ধরে আপনাকে ওয়াচ করেছি। আর কেউ নেই। ঠিক আছে, তবে আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে কিনা একবার সার্চ করে দেখতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে অস্ত্র থাকবে কেন? আমি তো মোটবাহক মাত্র। বাংলায় যাকে বলে চিনির বলদ। আপনারা এ-কথাটার মানে জানেন কিনা জানি না।"

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "ওসব বাজে কথা বন্ধ করুন। হাত তুলে দাঁড়ান।"

দুটি লোকই কাকাবাবুর সারা গা থাবড়ে পরীক্ষা করল। কিছুই পেল না। কাকাবাবু ইচ্ছে করেই আজ রিভলভারটা সঙ্গে আনেননি।

লোক দুটি বলল, "ঠিক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "হয়ে গেছে তো? আমার শীত লাগছে। বোতামগুলো আটকে নিই!"

কাকাবাবুর রেইন কোটের বোতামগুলো বড়-বড়। তিনি ওপরে গলার কাছের বোতামটা পর্যন্ত আটকে দিলেন।

গলির মধ্যে একটা স্টেশান ওয়াগন দাঁড় করানো। কাকাবাবু তাতে উঠতে যাচ্ছেন, তাঁকে বাধা দিয়ে অন্য লোকটি বলল, "আপনার ক্রাচ দুটো, ও দুটোও

পরীক্ষা করব। ক্রাচ এনেছেন কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি খোঁড়া মানুষ, ক্রাচ লাগবে না ? এ দুটো শুধুই ক্রাচ, এর মধ্যে গুপ্তি-টুপ্তি কিংবা পাইপগান কিছুই নেই।”

লোকটি ক্রাচ দুটো নিয়ে উলটে-পালটে-মুচড়ে দেখল। সন্দেহজনক কিছুই পেল না।

এবার গাড়িটা স্টার্ট দিল। একজন নেপালি ড্রাইভার সেটা চালাচ্ছে।

শহর ছাড়িয়ে গাড়িটা চলল বাইরের দিকে। নেপালে কাকাবাবু অনেকবার এসেছেন, মোটামুটি সব রাস্তাই চেনা। তাঁর মনে হল, গাড়িটা যাচ্ছে ধূলিখেল-এর দিকে।

কাকাবাবুকে দেখে মনেই হয় না, তাঁর কোনও ভয় কিংবা উদ্বেগ আছে। শান্তভাবে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, আর নিজের বুকে একটা হাত বুলোচ্ছেন।

এক জায়গায় কী কারণে গাড়িটা একটু আস্তে হতেই কাকাবাবু জানলার কাচে মুখ লাগিয়ে বাইরেটা দেখতে গেলেন।

অমনই একজন লোক রুক্ষভাবে তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, “ওদিকে কী দেখছেন ? চুপটি করে মুখ নিচু করে বসে থাকুন। টাকা পেয়ে গেছি, আপনাকে আমরা মেরে রাস্তায় ফেলে দিতে পারি তা জানেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “এমনই-এমনই মারতে ইচ্ছে হয় তো মারুন। সরকারি চাকরি করি। সরকার আমাকে পাঠিয়েছে এই দায়িত্ব দিয়ে, তাই বাধ্য হয়ে এসেছি।”

অন্য লোকটি বলল, “আগে টাকাগুলো গুনে দেখতে হবে।”

কাকাবাবু হালকা গলায় বললেন, “অনেক টাকার ব্যাপার। গুনতে-গুনতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।”

দাড়িওয়ালা লোকটি জিজ্ঞেস করল, “আপনি সরকারের কী কাজ করেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি নিতান্ত চুনোপুঁটি। বড়-বড় অফিসাররা কেউ আসতে রাজি হননি, তাঁদের প্রাণের দাম অনেক বেশি।”

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, “তা হলে চুপ করে বসে থাকো !”

বাকি রাস্তা কেউ কোনও কথা বলল না। কাকাবাবু নিজের বুকে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

গাড়িটা এসে থামল একটা টিলার কাছে। এর পর সিঁড়ি, গাড়ি আর যাবে না। টিলার ওপরে একটা বাড়ি।

লোক দুটি তাদের কোটের পকেট থেকে দুটো বিদঘুটে অস্ত্র বার করল। ঠিক রিভলভার নয়, মনে হয় যেন রাইফেলের নল কেটে ছোট করা হয়েছে।

সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তারা চারপাশ দেখল। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। চতুর্দিক এমনই শান্ত যেন একটা গাছের পাতা

পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। খুব মিহি বৃষ্টিপাতও হচ্ছে নিঃশব্দে।

একজন কাকাবাবুকে বলল, "নেমে এসো !"

কাকাবাবু নেমে এসে খানিকটা আতঙ্কের সঙ্গে বললেন, "ওরে বাবা, কতগুলো সিঁড়ি ? আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট হয় !"

লোকটি বলল, "তোমাদের গভর্নমেন্ট একটা খোঁড়াকে পাঠাল কেন ? আর কোনও লোক পায়নি ?"

কাকাবাবু বললেন, "ছিঃ ! কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই। ছোটবেলা কেউ আপনাদের এটা শেখায়নি ?"

দাড়িওয়ালা লোকটি তার অস্ত্র দিয়ে কাকাবাবুর পিঠে বেশ জোরে একটা খোঁচা মেরে বলল, "শাট আপ ! তুমি আমাদের জ্ঞান দিচ্ছ ? ওঠো— !"

কাকাবাবু খোঁচা খেয়ে উঃ শব্দ করে বললেন, "উঠছি, উঠছি। একটু আস্তে, বেশি জোরে জোরে পারব না !"

ব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে লোক দু'জনের একজন কাকাবাবুর সামনে, একজন পেছনে উঠতে লাগলেন। ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু কয়েক ধাপ উঠে-উঠে হাঁফ নেওয়ার জন্য একটু করে থামতে লাগলেন।

লোক দুটোর আর ধৈর্য থাকছে না। কাকাবাবুকে ধাক্কা মারতে মারতে বলতে লাগল, "তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো।"

প্রায় ষাট-সত্তর ধাপ ওঠার পর একটা চাতাল। একটা অসমাপ্ত বাড়ি। মনে হয় যেন একটা হোটেল, এখনও চালু হয়নি, চাতালটায় পাথর, সিমেন্ট, গ্রিল ছড়ানো রয়েছে। এখান থেকে দিনের বেলা নিশ্চয়ই অনেক বরফমাখা পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়।

দোতলার একটা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে।

ওদের একজন টর্চ জ্বেলে সামনের দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর কাকাবাবুকে নিয়ে উঠে এল ওপরে। কাকাবাবু একজন বাতিকগ্রস্ত বুড়োর মতন বলতে লাগলেন "উফ, উফ, আর পারি না ! আর পারি না !"

আলো-জ্বলা ঘরটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এদের একজন সেই দরজায় টোকা মারতেই ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, "হু ইজ ইট ?"

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "সেম পার্টি।"

এবার দরজা খুলে দিল একজন বেঁটেমতন লোক।

ঘরে অন্য কোনও আসবাব নেই, একটা ছোট টেবিল আর দুটি চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা দাবার ছক পাতা। দু'জন লোক বসে এখানে দাবা খেলে সময় কাটাচ্ছিল। বেঁটে লোকটি ছাড়া অন্য লোকটি বেশ লম্বা-চওড়া, সুট-টাই পরা, মুখে চাপ-দাড়ি ও গোঁফ, এর চশমা নেই। মাথায় শিখদের মতন পাগড়ি, হাতে লোহার বালা। এই লোকটিকেই নেতা গোছের মনে হয়।

সে জিজ্ঞেস করল, "মিশান কমপ্লিট ?"

অন্য লোক দুটি হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল।

পাগড়ি-পরা লোকটি চেয়ারে বসেই হাত বাড়িয়ে দিল, সকলে তাকে করমর্দন করল।

প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটি এবার তার সঙ্গী আর ঘরের বেঁটে লোকটিকে বলল, "তোমরা বাইরে গিয়ে পাহারা দাও।"

কাকাবাবু ভেবেছিলেন, এখানে আরও অনেক আতঙ্কবাদীদের দেখতে পাবেন। কিন্তু সব মিলিয়ে মাত্র চারজন। এত টাকা পয়সার ব্যাপার বলেই বোধ হয় অতি বিশ্বস্ত সঙ্গী ছাড়া আর কাউকে এরা সঙ্গে রাখে না। অনেক সময় বেশি টাকা দেখে মাথা খারাপ হয়ে এরা নিজেরাই মারামারি শুরু করে দেয়।

ওরা দু'জনে চেয়ারে বসল। আর বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে থাকতে হল কাকাবাবুকে।

পাগড়ি-পরা লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, "কাউন্ট দা ডো ! কুইক !"

দুটো চামড়ার ব্যাগই তালা দেওয়া। প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটি কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "চাবি ?"

কাকাবাবু এ-পকেট ও-পকেট খুঁজতে লাগলেন। ওপরে রেইন কোট, তার তলায় জ্যাকেট, তার তলায় শার্ট। অনেক পকেট, চাবি আর খুঁজে পাওয়াই যায় না।

অতি কষ্টে একটা চাবি শেষপর্যন্ত পেয়ে কাকাবাবু সেটা এগিয়ে দিলেন।

প্রথম দাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি সেই চাবি দিয়ে ব্যাগ খুলতে গেল। চাবি লাগল না। দু-চারবার চেষ্টা করার পর বোঝা গেল, সেটা ভুল চাবি।

কাকাবাবু লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললেন, "এই রে, ওটা আমার বাড়ির আলমারির চাবি। এই চাবি দুটো গেল কোথায় ? ফেলে এলাম নাকি !"

প্রথম দাড়িওয়ালা এবার উঠে দাঁড়িয়ে ঠাস করে কাকাবাবুর গালে একটা চড় কষিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "কুত্তার বাচ্চা, তুমি আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছ এখানে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মারবেন না, আর মারবেন না। এবার ভাল করে খুঁজছি। আমার কি এত লক্ষ-কোটি টাকা নিয়ে চলাফেরা করার অভ্যেস আছে ? দেখুন না, আমার হাত কাঁপছে।"

এবার কয়েকটা পকেট খুঁজে কাকাবাবু অন্য একটা চাবি বার করলেন।

সেটা লাগাতেই একটা ব্যাগ খুলে গেল। প্রথমেই একটা সাদা কাগজ। প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটিকে দ্রুত সেটা সরিয়ে ফেলতে দেখা গেল, ভেতরেও দিস্তে-দিস্তে সাদা কাগজ। একটা টাকাও নেই।

দু'জন লোকই কাকাবাবুর দিকে রক্তচক্ষে তাকাল।

কাকাবাবু ফ্যাকাসে মুখে বললেন, "এই রে ? ভুল ব্যাগ দিয়ে দিল নাকি ?

আমি তো কিছু জানি না, আমি তো আর ব্যাগ খুলে দেখিনি।"

প্রথম দাড়িওয়ালা তার অস্ত্র তুলে কাকাবাবুকে মারতে আসতেই তিনি বললেন, "আগেই অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? অন্য ব্যাগটা খুলে দেখুন হয়তো ওটার মধ্যেই সব টাকা আছে।"

প্রথম দাড়িওয়ালা এবার দ্বিতীয় ব্যাগটা খুলে ফেলল।

সেটার মধ্যেও শুধু সাদা কাগজ। ওপরের কাগজটায় বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে, "টিট ফর ট্যাট!"

কাকাবাবু হা-হা করে হাসতে গিয়ে ওদের রাগে গনগনে মুখ দেখে চেপে গেলেন।

পাগড়ি-পরা শিখটি বলল, "উই আর ডিউপ্‌ড! এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "এই খোঁড়াটাকে নিয়ে কী করব? একে শেষ করে দিই?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমাকে মেরে কী করবে? আমি তো সামান্য একজন দূত মাত্র। দূত অবধ্য, তা জানো না?"

পাগড়ি-পরা লোকটি বলল, "এই খোঁড়াটাকেও আমাদের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলো বরং। আবার চিঠি পাঠাও যে, টাকা না পেলে একেও ছাড়া হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার জীবনের কোনও দাম নেই। আমাকে বন্দি করলে কেউ এক টাকা দিয়েও ছাড়াতে যাবে না।"

পাগড়ি-পরা লোকটি বলল, "এর হাত দিয়েই চিঠি পাঠানো যাক। আর তিনদিন সময় বাড়িয়ে ফাইনাল আলটিমেটাম। টাকা না পেলে সাইমন বুবুম্বার চর খুন হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "তাতেও বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। ভারত সরকারের টাকার টানাটানি চলছে। এক কোটি ডলার দিতে পারবে না!"

পাগড়ি-পরা লোকটি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তবে সাইমন বুবুম্বা খুন হবে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি যাও, গিয়ে তোমার সরকারকে এই কথাটা জানিয়ে দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "সাইমন বুবুম্বা তো সোনার হাঁস। তাকে খুন করলে কি আর টাকা পাওয়ার কোনও আশা থাকবে? তা ছাড়া, সাইমন বুবুম্বা খুব চালাক লোক। তাকে খুন করা সহজ নয়। কে তাকে খুন করতে যাবে?"

পাগড়ি-পরা লোকটি বলল, "আমি। আমি নিজের হাতে তাকে খুন করব!"

কাকাবাবু বললেন, "অসম্ভব! তোমার পক্ষে সাইমন বুবুম্বাকে খুন করা অসম্ভব। তুমি বড়জোর আত্মহত্যা করতে পারো। কিন্তু তুমি তাকে কিছুতেই খুন করতে পারবে না। কারণ, তুমি নিজেই মহামান্য সাইমন বুবুম্বা। ভারত

সরকারের বিশিষ্ট অতিথি !”

একটুক্ষণের জন্য দু'জনেই থ হয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, “তুমি যতই পাঞ্জাবি শিখের ছদ্মবেশ ধরে থাকো, তোমার উচ্চারণই তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। খাঁটি অক্সফোর্ডের ইংরেজি। তুমি টাকাকে বললে 'ডো' (Dough)। এখানে সবাই 'মানি' বলে। এই লোকটি অসমের। অন্য যে-লোকটি ছিল সে অন্ধ্রপ্রদেশের। উচ্চারণ শুনে কে কোথাকার লোক আমি বুঝতে পারি।”

প্রথম দাড়িওয়ালা বলল, “এই লোকটা বড্ড বেশি জেনে গেছে। একে খতম করে দিতেই হবে !”

সাইমন বুবুম্বা বলল, “ফিনিশ হিম !”

প্রথম দাড়িওয়ালা তার ওভারকোটের পকেট থেকে অস্ত্রটা বার করতে লাগল।

কাকাবাবু যেন সত্যিই এবার ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর আত্মরক্ষার কোনও অস্ত্র নেই। তাঁর সারা শরীর বাঁশপাতার মতন কাঁপতে লাগল। তিনি অসহায়ভাবে বুকের কাছে হাত এনে রেইন কোটের একটা বোতাম ঘোরাতে লাগলেন।

প্রথম দাড়িওয়ালা তাঁর দিকে অস্ত্রটা তুলতেই কাকাবাবুর মুখটা আবার বদলে গেল। জ্বলে উঠল দু' চোখ। ঠাণ্ডা কঠিন গলায় তিনি বললেন, “ব্লাডি ফুল, তুমি কাকে মারতে যাচ্ছ ? এই লোকটা বিদেশি, কিন্তু তুমি তো আমাদের দেশের লোক। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তুমি আমাকে চেনো না ? আমাকে মারা অত সহজ ? ভেবেছ আমি তৈরি হয়ে আসিনি !”

কাকাবাবুর দৃষ্টিতে সম্মোহন আছে। প্রথম দাড়িওয়ালার মাথাটা একবার বোধ হয় ঝিমঝিম করে উঠল। মাথাটা দু'বার ঝাঁকিয়ে সেটা কাটিয়ে বলল, “কে রাজা রায়চৌধুরী ? আমি চিনি না। তখন থেকে কথা বাড়িয়ে তুমি আমাদের ভাঁওতা দিচ্ছ।”

সাইমন বুবুম্বা বলল, “কিল হিম !”

কাকাবাবু রেইন কোটের ওপরের বোতামটায় জোরে চাপ দিলেন। সেটা থেকে বিপ, বিপ, বিপ শব্দ হতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, “এটা কী জানো না ? এটা একটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটার। অন্তত তিনটে ওয়ারলেস ভ্যান এক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে, তারা জানে আমি ঠিক কোন জায়গাটায় আছি। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এই জায়গাটা কমান্ডো ফোর্স ঘিরে ফেলবে। তার মধ্যে আমাকে মেরে পালাতে পারবে ?”

প্রথম দাড়িওয়ালা কাকাবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রেইন কোটের বোতামটা এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিল। তারপর মাটিতে সেটাকে ফেলে নিজের অস্ত্রের কুঁদো দিয়ে দুম-দুম পিটতে লাগল।

বোতামটা ভেঙে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট ব্যাটারি দেওয়া যন্ত্র।

লোকটি মুখ তোলার আগেই কাকাবাবু একটা ক্রাচ ঘুরিয়ে দারুণ জোরে মারলেন তার হাতে। তার অস্ত্রটা ছিটকে চলে গেল ঘরের কোণে।

কাকাবাবু অবশ্য সেটা ধরতে পারলেন না। লোকটাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার ওপর।

তখনই বাইরে শোনা গেল সাব মেশিনগানের গুলির শব্দ।

কাকাবাবু বলে উঠলেন, "যান, সাত মিনিটও লাগল না। ওরা এসে গেছে!"

প্রথম দাড়িওয়ালা অস্ত্রটা তুলে এবার আর কাকাবাবুকে মারতে গেল না। সে চট করে অস্ত্রের মুখটা সাইমন বুবুম্বার গলায় চেপে ধরল।

তারপর হিংস্রভাবে বলল, "আমাকে ধরতে পারবে না। আমি এই সাহেবকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। আমাকে ধরার চেষ্টা করলেই একে আমি গুলি করব!"

সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র ভার্মা, তাঁর পাশে সাব মেশিনগান হাতে একজন কমান্ডো সেনা।

নরেন্দ্র ভার্মা দাড়িওয়ালা লোকটিকে ওই অবস্থায় দেখে বললেন, "ক'টা গুলিতে ওর বডিটা ফুঁড়ে দেব? দশটা, না পনেরোটা?"

লোকটা খ্যাপার মতন চেঁচিয়ে উঠল, "খবরদার, আমাকে মারার চেষ্টা করা হলেই আমি একে আগে মারব। পথ ছেড়ে দাও, আমাদের বেরিয়ে যেতে দাও।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "না! তুমি ওকে গুলি করতে চাও, করো। ওকে মারো। তাতে এখন আর আমাদের কিছু যাবে-আসবে না। সাইমন বুবুম্বা নিজেই আমাদের সিকিউরিটির চোখ এড়িয়ে পালিয়েছে। তারপর রটিয়ে দিয়েছে যে বিপ্লবীরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আসলে মুক্তিপণের এক কোটি ডলার ও নিজেই নেওয়ার মতলবে ছিল। তোমাদের মতন কয়েকটা বিপ্লবী দলের সাহায্য নিয়েছে, এখানে-ওখানে দু'-একটা নকল সাইমন বুবুম্বা সাজিয়ে পুলিশের চোখকে ধুলো দিতে চেয়েছে। এখন ও মারা গেলেও আমরা প্রমাণ করব, নিজের দোষে মরেছে!"

সাইমন বুবুম্বা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। কোনও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু প্রথম দাড়িওয়ালাকে ধমকে দিয়ে বললেন, "দেরি করছ কেন, ওকে মারো। তাতে আমাদের অনেক ঝামেলা চুকে যায়। তারপর কিন্তু তুমি আর কাল সকালের সূর্যের আলো দেখতে পাবে না। এখনও ধরা দিলে তবু প্রাণে বাঁচতে পারো।"

কমান্ডোটি নিজের সাব মেশিনগান তুলে বলল, "কে আগে গুলি করবে?"

প্রথম দাড়িওয়ালাটি এবার তার হাতের অস্ত্র ফেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে পেছন

থেকে আর-একজন এসে বেঁধে ফেলল তার হাত।

নরেন্দ্র ভার্মার পাশ দিয়ে সন্তু ঠেলেঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তোমার কিছু হয়নি তো? ওরা তোমাকে মারেনি তো? ওঃ, এতক্ষণ ধরে..."

কাকাবাবু বললেন, "না রে, আমার কিছু হয়নি! আমার চোখের দিকে তাকালে কেউ আর আমাকে গুলি করতে পারে না, আমি লক্ষ করেছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "চেহারায় তো মিলছে না। সাইমন বুবুম্বার দাড়ি-গোঁফ নেই। এদের দু'জনেরই দেখছি ঘন দাড়ি। ছদ্মবেশ? কোনজন আসল সাইমন বুবুম্বা?"

কাকাবাবু বললেন, "নকল দাড়ি-গোঁফ বোঝাই যাচ্ছে। আমি দেখছি।"

তারপর তিনি হঠাৎ প্রথম দাড়িওয়ালাটির দাড়ি ধরে এক টান দিলেন। সে আঁ-আঁ করে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমারটা নকল না, নকল না..."

কাকাবাবু তবু ছাড়লেন না। লোকটার আসল দাড়ি হলেও এক মুঠো উপড়ে তুলে আনলেন। লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

কাকাবাবু তেতো গলায় বললেন, "এ আমাকে চড় মেরেছিল। আমাকে খুন করার জন্য অস্ত্র তুলেছিল। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমার দিকে অস্ত্র তুলবে, তাকে আমি কিছু না কিছু শাস্তি দেবই! এরা সামান্য টাকার জন্য একজন বিদেশির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এরা তো পাঁচ-দশ লাখ টাকা পেলেই খুশি। সাইমন বুবুম্বা এক কোটি ডলার আদায় করার তালে ছিল, তার থেকে বিশ-পঁচিশ লাখ খরচ করাও কিছুই না।"

তারপর তিনি সাইমন বুবুম্বার দিকে চেয়ে বললেন, "কী, তোমার দাড়ি-গোঁফও টেনে খুলতে হবে নাকি?"

সাইমন বুবুম্বা এবার নিজেই দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলল।

একজন কমান্ডো অমনই তার পাশে গিয়ে কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে গেল।

সাইমন বুবুম্বা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "খবর্দার, আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। আমার ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি আছে। আমি আমার দেশের প্রতিনিধি।"

কাকাবাবু বললেন, "ফের বড়-বড় কথা! তুমি বাধা দিলে তোমাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে সার্চ করা হবে।"

সাইমন বুবুম্বা নিজেই কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট কোল্ট রিভলভার বার করে বলল, "এটা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই।"

কমান্ডোটি তবু অন্য পকেটটাও দেখল। সেখানে রয়েছে শুধু একটা চকোলেট বার।

কাকাবাবু বললেন, "এবার চেহারা মিলেছে তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উফ বাবা ! পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত !"

কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, এর আবার টিকিফিকি নেই তো ? ভাল করে দেখে নিয়েছিস ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি একবার সাইমন বুবুম্বাকে সার্চ করে দেখতে পারি ?" কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন ? ওর কাছে আরও অস্ত্র লুকনো আছে নাকি ?"

সন্তু বলল, "তবু আমি একবার দেখতে চাই। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

কাকাবাবু নরেন্দ্র ভার্মার দিকে তাকালেন। নরেন্দ্র ভার্মা মাথা নেড়ে বললেন, "গো অ্যাহেড, সনটু !"

সন্তু এগিয়ে যেতেই সাইমন বুবুম্বা চিৎকার করে উঠল, "না, না, আমাকে ছোঁবে না। আমার ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি আছে। তোমাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে !"

নরেন্দ্র ভার্মা দু'জন কমান্ডোকে ইঙ্গিত করলেন, তারা দু'দিক থেকে সাইমন বুবুম্বার হাত চেপে ধরল শক্ত করে।

সন্তু ওর সারা শরীর থাবড়ে-থাবড়ে দেখতে লাগল। পেটের কাছে শক্ত কিছুতে হাত ঠেকতেই সাইমন বুবুম্বা দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল আর-একবার। সন্তু ওর ওভারকোটের বোতাম খুলে, ভেতরের জামা খুলে একটা ছোট ভেলভেটের বাক্স টেনে বার করল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সাবধান, ওর মধ্যে বোমা-টোমা আছে নাকি ?"

কোনও দ্বিধা না করে সন্তু বাক্সটা খুলে ফেলল, ভেতরের জিনিসটা দেখে হাসিতে ভরে গেল তার মুখ। সে বলল, "এই নাও, চাঁদের পাথর !"

কাকাবাবু বিরাট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "অ্যাঁ ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হোয়াট ?"

দু'জনেই দেখলেন, ওরকম একটা দামি বাক্সের মধ্যে রয়েছে একটা সাধারণ চেহারার পাথর। তার একটা কোণ সদ্য ভাঙা হয়েছে !

কাকাবাবু বললেন, "এর সাইজ আর শেপ তো চাঁদের পাথরের মতনই। কলকাতা থেকে যেটা চুরি গেছে। তুই এটা কী করে আন্দাজ করলি রে, সন্তু ? চাঁদের পাথরটার ব্যাপার তো আমার মাথাতেই ছিল না। সাইমনের সঙ্গে ওই চুরির কোনও যোগ থাকতে পারে, তাও আমি একবারও ভাবিনি।"

সন্তু বলল, "ওর হাতের আংটিটা দ্যাখো !"

সাইমনের হাতে একটা মাত্র আংটি। তার মাঝখানে একটা এবড়ো-খেবড়ো সাধারণ পাথর বসানো।

সন্তু বলল, "জোজোর কাছে শুনেছি, ইনি যাতে তাড়াতাড়ি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, সেইজন্য জোজোর বাবা এঁকে একটা মুনস্টোনের আংটি ধারণ করতে

দিয়েছিলেন। মুনস্টোন তো হলদে-বাদামি, চকচকে পাথর। এঁর আংটির পাথরটা সেরকম নয়। তাইতে আমার সন্দেহ হল। ইনি বোধ হয় ভেবেছেন, আসল চাঁদের পাথর দিয়ে আংটি পরলে আরও বেশি কাজ হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্য চাঁদের পাথরটা নিজে চুরি করেছে কিংবা টাকা দিয়ে চুরি করিয়েছে! তুই ঠিক ধরেছিস তো, সন্তু! তোর তো সাঙ্ঘাতিক চোখ হয়েছে। আমরা কেউ লক্ষই করিনি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ব্রাভো, সন্তু, ব্রাভো। চাঁদের পাথরটা পাওয়া গেল, আমেরিকার কাছে আমাদের মুখরক্ষা হবে। এ যে দারুণ ব্যাপার। রাজা, সন্তুর যেরকম চোখ আর বুদ্ধি হয়েছে, তাতে কালে-কালে ও তোমাকেও ছাড়িয়ে যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো দেখছি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ওঃ, যা আনন্দ হচ্ছে আমার! কাল সকালেই এঁকে দিল্লি নিয়ে যেতে হবে স্পেশ্যাল প্লেনে!"

সাইমন বুবুম্বা এবার বলে উঠল, "আমাকে এখানকার কোনও হোটেলে নিয়ে চলো। আমি এখন দিল্লি যাব না। এখানে বিশ্রাম নেব!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দিল্লি গিয়ে চুক্তিটা সই করবেন, তারপর যত খুশি বিশ্রাম নেবেন।"

সাইমন বুবুম্বা বলল, "আমি তোমাদের দেশের সঙ্গে চুক্তিতে সই করব না।"

নরেন্দ্র ভার্মা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, "সই করবেন না মানে? আপনাকে আমি ঘাড় ধরে দিল্লি নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে চুক্তিটা সই করবার পর আমার শান্তি হবে!"

সাইমন বুবুম্বাও তেজের সঙ্গে বলে উঠল, "আমি সই না করলে, আমাকে দিয়ে জোর করে সই করাবে? দেখি কেমন পারো!"

কাকাবাবু বললেন, "না, জোর করে সই করানো যায় না! দশ মিলিয়ান ডলার ফসকে গেল বলে বুঝি আর সই করতে চাও না? ঠিক আছে, সই কোরো না? কিন্তু তা হলে তুমি দেশে ফিরতেও পারবে না। চাঁদের পাথর চুরি করাটাই একটা বিরাট অপরাধ। তা ছাড়া ভারত সরকারকে দশ মিলিয়ান ডলার ঠকাবার ষড়যন্ত্রের জন্যও তোমার বিচার হবে। অন্তত দশটি বছর জেল হবে নির্ঘাতি। তোমার দাদা, প্রেসিডেন্ট বুবুম্বাকে জানানো হবে সব কথা। তোমাকে জেলে পাঠালে আশা করি তিনি খুশিই হবেন। তোমার আর পরের বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানো হবে না।"

সাইমন বুবুম্বা এবার লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এখন চলুন। আপনাকে আর কী বলব। দু' বছর আগে টার্কিতে আপনি এই একই কায়দায় দু' কোটি ডলার আদায় করেছিলেন,

ইচ্ছে করে এক জায়গায় লুকিয়ে থেকে মুক্তিপণ নিয়ে নিয়েছেন নিজেই। টার্কিতে তো রাজা রায়চৌধুরী নেই। এখানে আপনার জারিজুরি কিছুই খাটল না শেষপর্যন্ত। রাজা রায়চৌধুরী সব বানচাল করে দিল।"

কাকাবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, "আরে যাঃ, আমি আর এমন কী করেছি! চাঁদের পাথরটা তো বার করল সন্তুই। তারপর তুমি দলবল নিয়ে ঠিক সময়ে এসে গেলে, নেপাল সরকার সবরকম সাহায্য করল, সেইজন্যই তো এদের প্ল্যান ভেস্তে গেল!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা ঠিক। তুমি কিছুই করোনি! তুমি একা এদের কাছে এলে, ব্যাগের মধ্যে সাদা কাগজ ভরে... অন্তত আমার তো এত সাহস হত না!"

এর দু'দিন পরে টিভিতে দেখানো হল যে মুরুণ্ডির সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই হল দিল্লিতে। সই হওয়ার পর সাইমন বুবুম্বা আর আমাদের অর্থমন্ত্রী করমর্দন করে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন ক্যামেরার দিকে। পটাপট অনেক ছবি উঠল। এই চুক্তি সইয়ের পেছনে যে কত কাণ্ড ঘটেছে, তা কেউ জানল না, খবরের কাগজেও কিছু ছাপা হল না।

এরও এক মাস পরে কাকাবাবু একটা চিঠি পেলেন দিল্লির এক দূতাবাস থেকে। মুরুন্ডির রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এই চিঠি লিখছেন। প্রেসিডেন্ট জানাতে বলেছেন যে, তাঁর ভাই সাইমন বুবুম্বা ভারতে এসে কী-কী অপকীর্তি করেছে, তা ভারত সরকার না জানালেও তিনি জানতে পেরেছেন অন্য সূত্র থেকে। সেজন্য তিনি মর্মান্তিক দুঃখিত। সাইমন বুবুম্বার কাছ থেকে সমস্ত সরকারি ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এও জেনেছেন যে, প্রধানত মিঃ রাজা রায়চৌধুরীর চেষ্টাতেই সাইমন বুবুম্বার ওইসব অপচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য প্রেসিডেন্ট মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশে আমন্ত্রণ জানাতে চান। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী যদি সপরিবারে এক মাসের জন্য মুরুণ্ডিতে এসে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে থেকে যান, তা হলে প্রেসিডেন্ট খুব খুশি হবেন।

সন্তু আর জেজো তখন পাশের ঘরে ক্যারাম খেলছে।

কাকাবাবু চিঠিখানা ওদের পড়ে শোনালেন। তারপর বললেন, "শেষের প্রস্তাবটা মন্দ না। শুনেছি মুরুন্ডি দেশটা ছোট্ট হলেও খুব সুন্দর। ওদের পয়সায় ওখানে কিছুদিন বেড়িয়ে এলে বেশ হয়। এবার আর কোনও চোর-ছ্যাঁচোড় কিংবা খুনে-গুণ্ডার পেছনে ছোটাছুটি নয়। শুধু ভ্রমণ আর বিশ্রাম। কী রে, যাবি নাকি সন্তু?"

সন্তু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "হ্যাঁ, যাব। তুমি ওদের শিগগির লিখে

দাও।”

জোজোও বলে উঠল, “আমিও যাব। আমাকেও নিয়ে চলুন কাকাবাবু। আমি কখনও আফ্রিকায় যাইনি!”

সন্তু অবাক হয়ে, বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল জোজোর দিকে।

গ্রন্থ-পরিচয়

নীলমূর্তি রহস্য। বিকাশ গ্রন্থ-ভবন। দ্বিতীয় প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯২। পৃ. [৬]+১৪২। মূল্য পঁচিশ টাকা।

প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ১৯৯১।

উৎসর্গ ॥ স্নেহের দীপ্র সেনকে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ অনুপ রায়।

ইচ্ছাশক্তি। বিকাশ গ্রন্থ-ভবন। প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯২। পৃ. [৪]+১৪৫। মূল্য পঁচিশ টাকা।

উৎসর্গ ॥ স্নেহের জ্যোতিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ দেবাশিস দেব।

সূচী ॥ ইচ্ছাশক্তি, মহাকালের লিখন, পঞ্চম শক্তি, তৃতীয় চক্ষু, সাধুবাবার হাত, জলচুরি, বিশ্বমামার রহস্য, বিশ্বমামার হায় হায়, চোর আর সাধু, মাঝরাতের অতিথি, অদৃশ্য পাখি, ভরত দাশের গণ্ডার, ইষ্টকুটুম।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও পঞ্চম গল্প—'মহাকালের লিখন' ও 'সাধুবাবার হাত'—এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

উল্কা-রহস্য। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯০। পৃ. ১২৩। মূল্য ২০·০০।

প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি লাল লঙ্কা। সাহিত্যবিহার। প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৫, মে ১৯৮৮। পৃ. ১২৩। মূল্য পনেরো টাকা।

উৎসর্গ ॥ শ্রীমতী রাজেশ্বরী সেনগুপ্তকে/স্নেহের উপহার।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ দেবাশিস দেব।

সূচী ॥ একটি লাল লঙ্কা, তেপান্তর, বুবাইয়ের বন্ধু, মহিষাসুর, হুপা, ডাকাতের দল আর গুরুদেব, রাক্ষুসে পাথর, বারুইপুরের সিংহ সম্রাট, সেই অদ্ভুত লোকটা, যাচ্ছেতাই ডাকাত, পার্বতীপুরের রাজকুমার, জ্যান্ত খেলনা, লাল জঙ্গল।

এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'একটি লাল লঙ্কা' এই সঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে।

কাকাবাবু হেরে গেলেন ?। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯২। পৃ. ১০৩। মূল্য ১৬·০০।

উৎসর্গ ॥ স্নেহের/সায়ক দাশকে।
প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩। পৃ. ১১৬। মূল্য ২০·০০।
উৎসর্গ ॥ মায়া চট্টোপাধ্যায় ও/ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়কে।
প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য চরিত্র কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে কাকাবাবুর একটি পা ভাঙা, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন, কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল, অনমনীয় তাঁর দৃঢ়তা, অদম্য তাঁর সাহস। একইসঙ্গে প্রখর বিশ্লেষণশক্তি, প্রচুর পড়াশোনা। কত ধরনের রহস্যের যে জট খুলেছেন তিনি, মোকাবিলা করেছেন কত রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতির, গিয়েছেন কত যে নতুন জায়গায়—তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গে কিশোর সন্তু ওরফে সুনন্দ, যে কিনা প্রতিটি অভিযানের সাক্ষী। ফেলুদার যেমন তোপসে, অনেকটা সেইরকমই কাকাবাবুর কাহিনীতে সন্তু।

সন্তু আর কাকাবাবুর দুর্ধর্ষ অভিযানের নানান কাহিনী নিয়েই দু-মলাটের মধ্যে এবার খণ্ডে-খণ্ডে 'কাকাবাবু সমগ্র'। এই তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে চারটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস—নীলমূর্তি রহস্য, উল্কা-রহস্য, কাকাবাবু হেরে গেলেন ?, সন্তু ও একটুকরো চাঁদ। তিনটি গল্প—মহাকালের লিখন, একটি লাল লঙ্কা, সাধুবাবার হাত।

9 788172 153403